শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি
ও সমস্যার ইতিহাস
রণজিৎ ঘোষ, এম, এ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কিছুদিন পূর্বে ভারতের শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক, স্নাতক-স্তর ও শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য "ভারতের শিক্ষাধারা—প্রাচীন ও মধ্যযুগ" এবং "আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা স্ত্রার ইতিহাস" দুখানি বই লিখেছি। শিক্ষক-শিক্ষণ স্তরের পরিবর্তিত পাঠক্রমে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে রাখা হয়েছে। চতুর্থ পত্রে ভারতের শিক্ষার সমস্যাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ও সেই সাথে আরও বহু বিষয়ের স্থান দিতে গিয়ে চতুর্থ পত্রটিকে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত করা হয়েছে। পাঠক্রম রচয়িতারা চেয়েছেন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হোক, কিন্তু এক বছরের শিক্ষাকালে কতটা আয়ত্ত করা সম্ভব সেকথা বোধ হয় তাঁরা চিন্তা করেন নি।

শক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষার্থীদের নতুন প্রয়োজন মেটাতে আমার বই দু'খানা পুনর্বিন্যাস করে ও নতুন বিষয়বস্তুর সংযোগে বর্তমান বই লেখা হ'ল। পাঠক্রম যেভাবে বিস্তৃত কর হয়েছে তার ফলে লেখক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষে বিষয়টির উপর সুবিচার করা কঠিন। মূল বিষয়বস্তুকে যতটা সম্ভব সহজবোধ্য ক'রে প্রয়োজনীয় অংশের অঙ্গহানি না ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি। আমার শিক্ষক সহকর্মীরা উপকৃত হলেই শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

শেষ করবার আগে শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে একটি কথ৷ বলব। জাতির জীবনে কোন সমস্যা একটা স্থির বিন্দুতে থাকে না। আজ যে সমস্যা সমাধান করা হ'ল, কাল তাই নতুন সমস্যারূপে দেখা দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কমিশনের নির্দেশ সম্পূর্ণ কার্যকরী করবার পূর্বেই আবার শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার "শিক্ষা কমিশন" গঠন করেছেন। এঁরা কি শেষ কথা উচ্চারণ করতে পারবেন? না, তা সম্ভব নয়। মুদালিয়র কমিশন পরিষ্কার-ভাবে বলেছেন—In a changihg world the problems of education are also likely to change. The emphasis placed on one aspect of it today may not be necessary at a future date. প্রগতিশীল জাতির জীবনে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। দেশের শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ মাত্রেরই একটা বক্তব্য আছে। যাঁরা বি. টি. পড়েন তাঁরা উচ্চশিক্ষিত ও দেশের শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে তাঁদেরও একটা বক্তব্য থাকা স্বাভাবিক। আমার মনে হয় প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা কালে, সে পরীক্ষার খাতাতেই হোক, আর সভা সমিতিতেই হোক সম্পূর্ণ পুঁথি নির্ভর না হয়ে তাঁরা তাঁদের মতামত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যুক্তিপূর্ণভাবে ও বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করবেন। শিক্ষা সমস্যা আলোচনার অংশে যে সব কমিশন কমিটি বসেছে তাদের মতামত আলোচনা করে আমার নিজস্ব বক্তব্য বলেছি। আমার শিক্ষক বন্ধুরাও প্রয়োজন হলে তাঁদের কথা

বিকাশের সাথে সাথে ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত জীবিকা গ্রহণের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এই স্তরে। আবার যারা উচ্চতর শিক্ষায় এগিয়ে যেতে চাইবে তাদেরও শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য করে তুলতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই ভারতে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরাধীন জাতির জন্য বিদেশী শাসক সম্প্রদায় তাদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে সজীব রাখতে যে পাঠক্রমের সৃষ্টি করেছিল দেশের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করে সে পাঠক্রমকে আমরা কতটা রাখব কতটা বর্জন করে নতুন করে পাঠক্রম রচনা করব সে প্রশ্ন বিচার করে দেখতে হবে।

শিক্ষার সাথে জড়িয়ে আছে শিক্ষক সমস্যা। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুযোগ্য শিক্ষকের। শিক্ষকের জীবনের মান উন্নয়নসমস্যা আর শিক্ষকতার মান উন্নয়নের প্রশ্ন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংকটপূর্ণ করে তুলেছে। জাতিকে গড়ে তুলবার মহান দায়িত্ব যারা বহন করবেন তাঁদের জীবনের সমস্যাকে বাদ দিয়ে শিক্ষার কোন সমস্যাই সমাধান করা সম্ভব নয়।

স্বাধীন ভারতের শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে প্রয়োজন হ'ল বহু দক্ষ কুশলী যন্ত্র শিল্পীর। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কি করে ব্যাপকভাবে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় সে সমস্যার আশু সমাধানের জন্যও শিক্ষা পুনর্গঠন করা প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা, ডাঃ তারাচাঁদের সভাপতিত্বে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। কমিটি সাধারণভাবে শিক্ষা সংস্কারের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন। কিন্তু দেখা গেল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য আরও ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌দের অভিমত গ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন। ১৯৫২ খ্রীঃ ভারত সরকার ডাঃ এ. লক্ষণস্বামী মুদালিয়রকে সভাপতি করে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী ও নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম ও নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী এমন নাগরিক সৃষ্টির জন্য এবং গণতান্ত্রিক ভারতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে একটি ব্যাপক শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা মুদালিয়র কমিশন সুপারিশ করেন। [মুদালিয়র কমিশন বা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন অংশ দেখুন]

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশসমূহ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বিচার বিবেচনা করে অধিকাংশ সুপারিশই গ্রহণ করেছেন। কমিশনের সুপারিশ মত স্থির হয় কেন্দ্রীয় বিষয় (*core subjects*) ছাড়া শিক্ষার্থীকে সাতটি শাখা (*stream*) থেকে নিজের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোন একটা শাখা বেছে নিতে হবে। প্রচলিত উচ্চ-

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে বহু অর্থের প্রয়োজন, তাই স্থির হয় ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে স্কুলগুলিকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ মত ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার হয়।

কমিশন তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে একটি কথা বলেছিলেন তা হচ্ছে এই পরিবর্তনশীল জগতে শিক্ষা সমস্যারও পরিবর্তন হবে। আজ শিক্ষায় যে দিকে জোর দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে হয়ত তার প্রয়োজন থাকবে না। তাই আজ যে সুপারিশ করা হ'ল তা চিরদিনের জন্য নয়। কমিশনের বিশ্বাস ছিল তাদের সুপারিশগুলি বেশ কিছুকালের জন্য :(*for a fair period*) কার্যকরী থাকবে। মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে যা বলেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষার সেটাই শেষ কথা নয়, কমিশন সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু দশ বছর না যেতেই আবার এক নতুন শিক্ষা কমিশনের প্রয়োজন হবে একথা বোধ হয় মুদালিয়র কমিশনও ভাবতে পারে নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর দু'টি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত সুপারিশ সরকারকে জানিয়েছেন। তাঁদের সুপারিশ মত শিক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থাও হয়েছে। শিক্ষার জন্য পরাধীন ভারতে যে অর্থ ব্যয় হ'ত তার চেয়ে দশগুণ অর্থ বেশী ব্যয় করা হচ্ছে তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে অজস্র দোষত্রুটির হাত থেকে আমরাও মুক্ত হতে পারি নি। যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয় আমরা সে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক গণশিক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ আমরা গ্রহণ করি নি। রাধাকৃষ্ণন কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সুপারিশ করেছিলেন তাও কার্যকরী হয় নি। আমরা এখনও ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সামান্য পরিবর্তন করে আঁকড়ে ধরে আছি, দেশের চিন্তাশীল সমাজ এ সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। তাই ১৯৬৪ খ্রীঃ ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সভাপতি ডাঃ ডি. এস. কোঠারীকে সভাপতি করে ভারত সরকার "এডুকেশন কমিশন" নামে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করবার দায়িত্ব কমিশনকে দেওয়া হয়েছিল। কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে…"*to survey the entire field of education in the country and to advise the Government on the national pattern of education and to advise the Government on the general principles and policies for educational development at all stages.*"

শিক্ষা কমিশনের অনুসন্ধান ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর ভারতের শিক্ষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন সুপারিশ সহ ১৯৬৬ খ্রীঃ জুন মাসে কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। একটা পরিবর্তনের মুখে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা কালে আমাদের আলোচনা

বলবেন এই আশাই করি। শিক্ষা কমিশন থেকে যে Discussion Paper পাঠান হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছে শিক্ষকেরা আলোচনা করে ভবিষ্যৎ শিক্ষার রূপ সম্পর্কে তাঁদের মত প্রকাশ করবেন। আমাকে যে কোন রকম পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

বইখানি পুনর্বিন্যাস করা দরকার এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীবনোয়ারীলাল চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে প্রথম পরামর্শ দেন ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি বইখানি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন সেইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। ইতি—

৪।২৯ নেতাজী নগর
কলিকাতা-৪০

বিনীত—
রণজিৎ ঘোষ

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

"শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাসের" চতুর্থ সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে। প্রেসের অসুবিধার জন্য পঞ্চম সংস্করণ বের হতে কিছুদিন দেরী হ'ল, এজন্য আমি দুঃখিত। বইখানা পঃ বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. টি. ও বি. এড. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়েছে, এতে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

যখন পঞ্চম সংস্করণে সম্পাদনার কাজ শুরু করি তখন সারা বাংলায় শিক্ষার কাঠামোর ভবিষ্যৎ রূপ কি হবে তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আসবার চেষ্টায় পঃ বঙ্গ সরকার প্রয়াসী হয়েছে। তার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আগামী বছর থেকে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার স্থলে দশম শ্রেণী শিক্ষা স্কুলগুলিতে চালু হবে। নতুন দশম শ্রেণীর শিক্ষায় পাঠ্যক্রম কি হবে এবং পরবর্তী দু'বছরের শিক্ষাও যে কি রকম হবে তার কোন সঠিক রূপ আমাদের কাছে নেই। তাই এই সম্পর্কে সামান্য আলোচনা মাত্র করেছি। যা এখন আলোচনার স্তরে তার সম্পর্কে কিছু বলার সময় এখন আসে নি। তবু একটা কথা বলা দরকার সে হচ্ছে শুধু শিক্ষার কঠামো বদলালেই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বা উন্নতি হয় না।

বর্তমান সংস্করণে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নির্ভর-যোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে এই দিক থেকে একটু ত্রুটি থেকে গেল। আশাকরি বইখানা অন্যান্য সংস্করণের মতই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবে। ইতি—

৪।২৯ নেতাজী নগর
কলিকাতা-৪০

বিনীত—
রণজিৎ ঘোষ

বি, এড ; বি. টি. ছাত্রছাত্রীদের জন্য
লেখকের অন্যান্য পুস্তক

১। **শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ**

বি. টি. তৃতীয় পত্রের নতুন আঙ্গিকে লিখিত একমাত্র পাঠ্যপুস্তক।

২। **আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা সমস্যার ইতিহাস**

বৃটিশ যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

৩। **ভারতের শিক্ষাধারা—প্রাচীন ও মধ্যযুগ**

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাস সম্বলিত।

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব ঃ প্রাচীন যুগ

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

STATE INSTITUTE OF EDUCATION * Govt. of West Bengal *

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

॥ নবম অধ্যায় ॥

॥ দশম অধ্যায় ॥

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

তৃতীয় পর্ব

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন, কোঠারী কমিশন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

6101

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ পর্ব

বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার প্রসার ও বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

বিষয় — পৃষ্ঠা

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

পঞ্চম পর্ব

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ষষ্ঠপর্ব ঃ শিক্ষাগুরুদের কথা

3027

শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস

প্রথম পর্ব

প্রাচীন যুগ

STATE INSTITUTE OF EDUCATION
W. Bengal, Banipur, 24-Parganas

প্রথম অধ্যায়

বৈদিক সমাজ ও শিক্ষার সূচনা

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি আর্যরা যে সভ্যতাকে এদেশে বহন করে এনেছিল ও যে সভ্যতা নানাভাবে পুষ্ট হয়ে ও নানা ধারায় প্রবাহিত হয়ে ভারতের জনজীবন ও সমাজকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করেছে সেই সভ্যতাকে। কোন অলিখিত যুগে ভারতে আর্যদের আগমন হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। ইতিহাস বিমুখ ভারতীয় আর্যরা বহু সম্পদ আমাদের দিয়ে গেলেও ঐতিহাসিক এমন কোন অথ্য আমাদের জন্য রেখে যান নি যা থেকে আমরা ভারতীয় আর্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক কোন কাল নির্দেশ করতে পারি। সেই যুগের যে সব তথ্য আমরা পেয়েছি তা থেকে অনুমান করা হয় ভারতীয় আর্য সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ দু'হাজার বছরের পুরানো। কিন্তু পাঞ্জাবের হরপ্পা; সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো, বেলুচিস্তানের নাল ও সিন্ধু উপত্যকার বহুস্থানে প্রাচীন সভ্যতার বহু পুরাতন নিদর্শন সমূহ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। আর্যদের এদেশে আসবার বহু পূর্বেই যে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা সিন্ধু উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল সেই সম্পর্কে বহু তথ্যাদি আবিষ্কৃত হবার পর ভারতীয় সভ্যতা যে অবিমিশ্র আর্য সভ্যতা, আমাদের এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন থেকে আমরা বলতে পারি ভারতীয় সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বছরের চেয়েও প্রাচীন, ভারতীয় সভ্যতা মিশর, ব্যাবিলন ও আসুরীয় সভ্যতার সমকালীন সভ্যতা।

আর্যরা এদেশে এসে প্রথম স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছিল সেকথা ঋগ্বেদ থেকে জানতে পারি। ঋগ্বেদে আছে আর্যরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের সুরক্ষিত নগরে (পুর) এসে বারবার হানা দিয়েছে। ইন্দ্র এসব নগর বা পুর ধ্বংস করতে আর্যদের সাহায্য করেছিলেন, তাই তাকে বলা হয় পুরন্দর। আর্যরা এদেশে উন্নত সভ্যতার সম্মুখীন হয়েছিল তাকে ধ্বংস করলেও তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকতে পারে নি। সিন্ধু-উপত্যকায় যারা একটি উন্নত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পত্তন করেছিল, অনুমান করা যায় তাদের একটা নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। পাঁচশ'য়ের বেশী শীল মোহর মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গিয়েছে। শীল মোহরের লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যারা লিপির ব্যবহার জানত তারা নিশ্চয়ই লিখতে পড়তে জানত। সিন্ধু সভ্যতার বহু তথ্যই আমরা জানতে পারি নি তবু ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন আর্য সভ্যতা প্রাচীন ভারতীয় প্রাক্-আর্য সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। **আর্য সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র উৎস নয়। সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সন্ধান করতে হবে। সিন্ধু**

সিন্ধু সভ্যতা

ও আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাই হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা।

আর্যরা এদেশে এসে প্রথমে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আদি যুগে সপ্তসিন্ধু বলতে ইরাণ, আফগানিস্তানের কিছুটা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব অঞ্চলকে বোঝাত। এরপর ধীরে ধীরে গঙ্গা, যমুনা, সরযূ নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আর্যদের বসতি প্রসারিত হয়। আর্য সভ্যতা ছিল পল্লীকেন্দ্রিক। ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা ছোট ছোট পরিবারে গ্রামে বাস করত। পিতৃ-প্রধান আর্য সমাজে পরিবার ছিল গৃহপতির অধীন। প্রাচীন আর্য সমাজ ছিল গণতান্ত্রিক। বৈদিক যুগে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। প্রথম অবস্থায় রাজা নির্বাচিত হতেন —বুদ্ধদেবের সময় পর্যন্ত কয়েকটি রাষ্ট্রে রাজা নির্বাচিত হতেন বলে আমরা বলতে পারি। পরবর্তীকালে রাজশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

আর্য সমাজ

আর্যগণের সভ্যতা তপোবনের সভ্যতা। আর্য সমাজ ছিল ধর্মভিত্তিক। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের প্রাচুর্য্যের জন্য তাদের জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে হয় নি। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় পরিবেশে সরল অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাত্রা আর্যদের আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছিল। এর ফলে তাদের জীবন জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানা বিস্ময় তাদের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাই রূপ পেয়েছে তাদের দর্শনে, কাব্যে আর সাহিত্যে।

তপোবনের সভ্যতা

আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করে পূজা করত। তাঁদের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি পাঠ করে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত। আর্যদের উপাসনা প্রথম যুগে সহজ হলেও ক্রমে যজ্ঞের অনুষ্ঠান যথাবিহিত ভাবে পালন করা সাধারণের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠায় এ কাজের জন্য সমাজে পুরোহিত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হ'ল। পুরোহিতরা মন্ত্রাদি রচনা করতেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা তাঁরা ঋষি বলে পরিচিত হলেন। ধীরে ধীরে পুরোহিতরা ধর্মের ধারক, বাহক ও রক্ষক হয়ে উঠলেন। **আর্য ঋষি-পরিবার থেকেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় এবং এই ঋষি-পরিবারেই বৈদিক শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়।** বৈদিক সাহিত্য দিন দিন বিশালতা লাভ করায় ও বেদের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়ায় এক একটি পুরোহিত দল এক একটি শাখা অনুসারী হ'ল। বেদের কোন একটি শাখায় অধিকার না জন্মালে কেহ পৌরহিত্য করতে পারত না।

বৈদিক শিক্ষার সূচনা
ঋষি ও পুরোহিত

আর্য সমাজে প্রথম জাতিভেদ প্রথা ছিল না—গৌরবর্ণ আর্য আর কৃষ্ণবর্ণ অনার্য। ক্রমে সমাজে জটিলতা বৃদ্ধির সাথে গুণ ও কর্মের দ্বারা শ্রেণীভেদ প্রথা গড়ে ওঠে। যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা নিয়ে যারা রইল তারা ব্রাহ্মণ; রাষ্ট্রনীতিতে দক্ষ, রণনিপুণ, বীর সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়; কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পশুপালনে দক্ষ সম্প্রদায় বৈশ্য ও অনার্য জাতি শূদ্র বলে পরিচিত

জাতিভেদের সূচনা

হ'ল। ঋগ্বেদের সময় দেখা যায় জাতিভেদ প্রথা খুব কঠোর বা স্পষ্ট ছিল না। যতদিন পর্যন্ত জাতিভেদ গুণ ও কর্মনির্ভর ছিল ততদিন আর্যসমাজের গতিশীলতা ব্যাহত হয় নি। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, জনক ক্ষত্রিয় হয়ে রাজর্ষি ছিলেন। দাসীপুত্র সত্যকাম বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন। জন্মই জাতিভেদের একমাত্র নিয়ন্তা ছিল না। রুচি, প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে বৃত্তি ত্যাগ ও গ্রহণের স্বাধীনতা প্রথম অবস্থায় ছিল।

চতুরাশ্রম

আর্যসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এ তিন বর্ণের জন্য চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য পালন করে গুরুগৃহে ছাত্ররূপে থাকতে হ'ত। ভোগবিলাস বর্জন করে নানাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভই ছিল এ জীবনের লক্ষ্য। ছাত্রজীবন শেষ করে শিক্ষার্থী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত। তারপর বানপ্রস্থ, চতুর্থ আশ্রম হচ্ছে সন্ন্যাস বা যতি। এ আশ্রমে পরমার্থিক তত্ত্বের অনুশীলনে মোক্ষের সাধনায় কাটাতে হ'ত। কেহ কেহ আবার গার্হস্থ্য ধর্মপালন না করে অধ্যাপনা তপস্যা ও তত্ত্বানুসন্ধানে জীবন অতিবাহিত করতেন।

বেদ

আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ—আর্যধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বহু তথ্যই আমরা বেদ থেকে জানতে পারি। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। হিন্দুরা বিশ্বাস করে বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। ঋষিরা ধ্যানস্থ হয়ে বেদের বাণীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদ চার ভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব। প্রত্যেক বেদ আবার ব্রাহ্মণ ও সংহিতা এই দুই ভাগে বিভক্ত। সংহিতা অংশ পদ্যে ও ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত। বহুদিন পর্যন্ত বেদ লিপিবদ্ধ হয় নি, মুখে মুখেই বেদের মন্ত্র বংশানুক্রমে সংরক্ষিত হয়েছে, পরবর্তীকালে আরণ্যক ও উপনিষদ নামে দুটি বিভাগ গড়ে ওঠে। সংহিতা অংশে মন্ত্র, ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের বিধি নির্দেশ ও তত্ত্বকথা গভীর আরণ্যকে বেদের দার্শনিকতত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে। অরণ্যস্থিত ঋষিদের গভীর উপলব্ধি জাত জ্ঞান এতে আছে বলে একে আরণ্যক বলা হয়। আরণ্যকের মধ্যে যে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশ তার পূর্ণ পরিণতি উপনিষদের মধ্যে—এজন্য উপনিষদকে বেদান্ত (বেদের অন্ত) বলা হয়। উপনিষদের বুৎপত্তিগত অর্থ নিকটে বসা। পুত্র বা অতি বিশস্ত প্রিয় ছাত্রকে নিকটে বসিয়ে আত্মা ও ব্রহ্ম সম্পর্কে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দেওয়া হ'ত বলেই একে উপনিষদ (উপ-নৈকট্য-নিষদ অবস্থিত বা উপবিষ্ট্য) বলা হয়।

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদ বেদ সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। ঋগ্বেদের ১০১৭টি সূক্ত (পরে আরো ১১টি যুক্ত হয়) ১০টি মণ্ডলে বিভক্ত। সাম বেদের ৭৫টি মন্ত্র বাদে সব মন্ত্রই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। সামবেদের মন্ত্রসমূহ তাল-মান-লয়ের সাথে স্বর সংযোগে গীত হ'ত। ঋগ্বেদের এক একটি মণ্ডলের মন্ত্রসমূহ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বংশধরেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করতেন। প্রাচীন ঋষি পরিবারের মধ্যেই আমরা সন্ধান পাই ভারতের আদিমতম শিক্ষককুলের। ঋষি পরিবারই ছিল প্রথম যুগের গুরুকূল। পুরোহিতের শিক্ষার মধ্য দিয়েই প্রথম শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু।

বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যাগযজ্ঞের বিভিন্ন পদ্ধতি ও মন্ত্রসমূহের সঠিক উচ্চারণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'ত। দিন দিন বৈদিক সাহিত্যের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু শাখার সৃষ্টি হওয়ার সাথে বৈদিক সাহিত্যে পাঠভেদও কিছুটা অসামঞ্জস্য দেখা দিল। বেদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য পদপাঠ, ক্রমপাঠ প্রভৃতি পাঠপদ্ধতির সৃষ্টি হ'ল। পৌরোহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমে সুসংবদ্ধ রূপ পেল। বেদ বা শ্রুতি সাহিত্য বিশালকায় হয়ে ওঠায় বেদের সংক্ষিপ্ত রূপ সূত্র সাহিত্য গড়ে ওঠে।

বৈদিক শিক্ষার বিবর্তন

ব্রাহ্মণদের স্মৃতিতে সূত্র সাহিত্য রক্ষিত হয়েছে, এজন্য একে বলা হয় স্মৃতি। স্মৃতি ও শ্রুতির মধ্যে শ্রুতিই অধিকতর প্রামাণ্য। বেদাঙ্গ ষড়দর্শন সূত্র সাহিত্যের অন্তর্গত। ষড়দর্শন হচ্ছে কপিলের সাংখ্য ; পতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কর্নদের বৈশেষিক, জৈমিনীর পূর্ব মীমাংসা, ব্যাসের উত্তর মীমাংসা। বেদাঙ্গ হচ্ছে বেদপাঠের জন্য অপরিহার্য ছয়টি বিদ্যা। শিক্ষা (উচ্চারণ) ছন্দঃ, ব্যাকরণ নিরুক্ত (শব্দসমূহের উৎপত্তি), জ্যোতিষ এবং কল্প নিয়ে হচ্ছে বেদাঙ্গ। ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে কল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কল্প থেকে নানা সূত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

কল্পসূত্র থেকে উদ্ভূত ধর্মসূত্রে সমাজনীতি, অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি বর্ণিত আছে। ধর্মসূত্রের কোন কোন অংশে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ রয়েছে। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কীয় নির্দেশ সমূহ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে লিপিবদ্ধ হলেও অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দরচনায় যথাক্রমে যাস্ক, পাণিনি ও পিঙ্গলের নাম অমর হয়ে আছে।

বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মৌখিক। উচ্চারণ শুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত। মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ না হলে অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে বলে

বৈদিক শিক্ষা পদ্ধতি

বিশ্বাস করা হ'ত। প্রতিটি মন্ত্রের ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতির তাৎপর্য বিশেষ যত্নের সাথে শিখতে হ'ত। বৈদিক শিক্ষায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হ'ত তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শিক্ষার প্রক্রিয়া সমূহ প্রথম থেকেই অনুশীলন করা হচ্ছে। প্রথমে শিক্ষার্থী গুরুর কাছ থেকে শুনত—শুনে আবৃত্তি করত ; তারপর মননের সাহায্যে তাকে মনে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করত। মননের পর আয়ত্তাধীন বিদ্যাকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা চলত। বেদ বহুদিন লিপিবদ্ধ হয় নি। মনে হয় গুরু-শিষ্যের প্রত্যক্ষ শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভাষার ধ্বনি ও ছন্দরূপ অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে লিপির ব্যবহার জানা সত্ত্বেও বেদকে লিপিবদ্ধ করা হয় নি।

বৈদিক যুগে পৌরোহিত্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহেব জন্য প্রথম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ক্রমে শিক্ষাসূচী বিস্তৃত হওয়ায় শিক্ষার্থীকে বেদ, বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন ও বিভিন্ন

বৈদিক শিক্ষাসূচী

সূত্র-সাহিত্য অনুশীলন করতে হয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখি এই পাঠ্য-সূচী বিস্তৃত হয়ে বিশালকায় ধারণ করেছে। নারদ সনৎ কুমারের কছে তাঁর অধীত বিদ্যার এক বিস্তৃত তালিকা পেশ করেন, সেখানো দেখা যায় তিনি চতুর্বেদ ছাড়াও ইতিহাস, পুরাণ, ব্রাহ্মবিদ্যা, ব্যাকরণ, রাশি,

পিতৃলোক সম্পর্কীয় বিদ্যা, জ্যোতিষ, একায়ণ (নীতিশাস্ত্র), বাক্যো বাক্যম (তর্কশাস্ত্র) নক্ষত্র-বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, নিধিবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা দেবজনবিদ্যা, (নৃত্যগীত শিল্প) প্রভৃতি বিদ্যার উল্লেখ করেছেন। সনৎ কুমার নারদকে বলেছিলেন—আপনি যা শিখেছেন তা শুধু কথা, তিনি নারদকে আত্মজ্ঞান সত্যোপলব্ধির জন্য পরা বিদ্যার অনুশীলন বা সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

বৈদিক শিক্ষার বিবর্তনে বেদবিহিত ক্রিয়া কর্মকে যথাযথরূপে শাস্ত্রীয় ভাবে সম্পাদনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু হয়েছিল। কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য যুগে ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনের বাইরে বহু ব্যবহারিক বিদ্যার প্রচলন হয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় সমগ্র শিক্ষাকে সংহত ও বিধিবদ্ধ একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়া হয়।

॥ প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ॥

ভারতের সভ্যতা সমন্বয়ী-ধর্মী। যুগ যুগ ধরে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনাই ভারত করেছে। সিন্ধু সভ্যতাকে আত্মস্থ করে বৈদিক সভ্যতা আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ই দিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সভ্যতার সঞ্চিত পলির উপর ভারতীয় সভ্যতার মহীরুহ আপন মহিমায় বেড়ে উঠেছে। ভারতের এই পরমত সহিষ্ণুতা এবং অপরকে গ্রহণ করাবার বৈশিষ্ট্যই কবির কথায় রূপ পেয়েছে—

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।

* * *

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

ভারতের তপস্বীকুল আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই আধ্যাত্মবাদই বিশ্বজনীনতার প্রেরণা যুগিয়েছে। আর্য-সমাজের জীবন-বেদ সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব অরণ্যে, সুদূর অতীত থেকেই ভারতবর্ষ অস্ত্রশক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তিকেই জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের পাতায় এবং আরো দূর অতীতের অলিখিত ইতিহাসে দৃকপাত করলেই দেখা যাবে যে বিশ্বের মানুষ যখন ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, সভ্যতার সূর্যালোক যখন পৃথিবীর অন্য অংশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি, সেই সময়ে ভারতের জ্ঞানী ঋষিগণ তপোবনের কুটীরে বসে বিশ্ববিধাতার মহত্ব ও বিশালতা উপলব্ধির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্যভেদ করার দুরূহতম কার্যে তাঁরা ব্রতী ছিলেন। 'ভূমা,-কে উপলব্ধি করাই ছিল তাঁদের একমাত্র চেষ্টা। পরম ব্রহ্মের সহিত আত্মিক যোগ স্থাপনে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন, শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে বিশ্বাসে সুদৃঢ় কণ্ঠে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন :

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

বেদাহম্ এতম্ পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ
ত্বমেব বিদিত্বঽতি মৃত্যুম এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে আয়নায় ।

আর্যঋষি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। বিশ্বমানবকে "অমৃতস্য পুত্রা" অমৃতের পুত্র—ঈশ্বরের পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। বিশ্বজনীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী সেই সুপ্রাচীন যুগে ভারতের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল। সবাই অমৃতের পুত্র, ঈশ্বর আমাদের পিতা—

ওঁ পিতা নোঽসি
পিতা নো বোধি
নমস্তেস্তু

তুমি আমাদের পিতা, তুমিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা এই বোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত কর। তোমায় প্রণাম।

সারা বিশ্বের সবশ্রেণীর মধ্যে এই সাম্যবোধ ভারতীয় ঋষি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন,

"ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"। যাঁদের মন সাম্যে স্থিত হয়েছে তাঁরা জীবদ্দশাতেই সংসার জয় করেছেন। যতদিন না এই সাম্য ভাব আয়ত্ব হচ্ছে ততদিন কেউ কখনই মুক্ত হতে পারে না।

স্বামীজি এ সম্পর্কে বলেছেন—"সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে সমজ্ঞানের মহান উপদেশ পালন করুণ, সর্বভূতে সেই ভগবান দেখুন। এই হ'ল মুক্তির পথ, বৈষম্যই বন্ধনের পথ। কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি একত্ব জ্ঞান ছাড়া সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। আর সকলের মানসিক একত্ব জ্ঞান ছাড়া মানসিক স্বাধীনতাও লাভ করতে পারে না। অজ্ঞান, অসাম্য ও বাসনা—এই তিনটিই মানুষের দুঃখের কারণ, আর এদের মধ্যে একটির সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। একজন মানুষ নিজেকে অপর কোন মানুষ থেকে, এমন কি পশু থেকেও শ্রেষ্ঠ ভাববে কেন? বাস্তবিক সর্বত্রই ত এক বস্তু বিরাজ করছে"।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী।

এই সমত্ব ভাব লাভ করাই সমস্ত সমাজের, সমস্ত জীবের ও সমস্ত প্রকৃতির আদর্শ। বৈষম্য মনুষ্য প্রকৃতিতে বিষের কাজ করে, মানুষের উপর এ এক অভিশাপ। সকল দুঃখের মূল কারণ এই বৈষম্য। এই বৈষম্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব রকম বন্ধনের মূল।

সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

—ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি লাভ করেন।

আমাদের দেশে ধর্ম সম্পর্কে অনেক মতবাদ আছে, তার মধ্যে বাহিক বিভেদ সত্ত্বেও ভারত বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বর বিশ্বাসে অবিচল। ভারত অতি প্রাচীন যুগ থেকেই বিশ্ববাসীকে প্রেম, শান্তি ও বিশ্বজনীনতার বাণী শুনিয়েছে।

শিক্ষার মধ্য দিয়ে একটি জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। শিক্ষার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সেই জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপকে। ভারতের সভ্যতা তপোবনের সভ্যতা। আর্য সমাজ ছিল ধর্ম ভিত্তিক। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের প্রাচুর্যের ফলে তাদের জীবনযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হতে হয় নি। জীবনের অবসর মুহূর্তগুলিকে তারা শুধুমাত্র অলস অবসর বিনোদনে অপচয় না করে জ্ঞান চর্চাও করেছেন। জীবন যাত্রা সরল ও স্বচ্ছন্দ হওয়ায় জীবন জিজ্ঞাসা তাঁদের কাছে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। আর্যঋষির মনে আত্মজিজ্ঞাসার যে প্রশ্ন জেগেছিল—জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানা বিস্ময় তাঁর মনে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তাকে সমাধানের চেষ্টা তাঁরা বহু ভাবে করেছেন।

॥ শিক্ষার গুরুত্ব ॥

বৈদেশিক ও তৎপরবর্তী হিন্দু সমাজ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যে বিশেষভাবে অবহিত ছিল তা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রাচীন অভিমত থেকেই জানতে পারি। আর্য-ঋষিরা মনে করতেন আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধিই হচ্ছে শিক্ষার চরম লক্ষ্য "আত্মানং-বিদ্ধি" নিজেকে জানবার মধ্য দিয়েই সত্যোপলব্ধির সাধনা তাঁরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত করেছেন। জ্ঞানার্জনের শেষ নেই তাই শিক্ষারও শেষ নাই, 'যাবজ্জীবনং অধীতে বিপ্রঃ।' সত্যিকারের জ্ঞানের যে সন্ধানী সে আজীবন শিক্ষার্থী। বিদ্যাই দেয় মানুষকে মুক্তির সন্ধান 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। অর্থ, বিত্ত, সামাজিক মান- মর্যাদা মানুষকে অমৃতের সন্ধান দিতে পারে না তাই সত্যিকারের মুক্তিকামী তাকে অসার বলে পরিত্যাগ করে মুক্তির সন্ধান অমৃতের সন্ধান করেছেন "যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্যাম।"

সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে—সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যসাধনে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হওয়ার শক্তি লাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞান হচ্ছে মানুষের তৃতীয় নেত্র, এ দৃষ্টির সাহায্যেই আমরা সব কিছুর গভীরে প্রবেশ করতে পারি। মহাভারতে বলা হয়েছে, "নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুঃ নাস্তি সত্য সমং তপঃ।" ঋগ্বেদে ঋষি বলেছেন—একজন মানুষ যে অপর একজন থেকে শ্রেষ্ঠ হয় তা তার অতিরিক্ত হাত বা চক্ষুর জন্য নয়, শিক্ষার দ্বারা তার মন বুদ্ধি উন্নত হয়েছে বলেই সে শ্রেষ্ঠ। ভর্তহরি বিদ্যাহীনকে পশু বলে অভিহিত করেছেন। শুধু জন্মগত দাবী নিয়ে বৈদিক সামাজে কেহ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারত না। বিদ্যাই সমাজে মানুষকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই শিক্ষা গ্রহনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। জাগতিক ও পারমার্থিক সবদিক থেকেই বিদ্যার প্রয়োজন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলেছে।

॥ শিক্ষার লক্ষ্য ॥

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার চরম লক্ষ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেকে জানবার (আত্মানং বিদ্ধি), সত্যোপলব্ধি করার সাধনা আর্যঋষিরা করেছেন। জাগতিক সুখকেই তারা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন নি। সুখ ও দুঃখের অতীত এক উপলব্ধির সন্ধান তাঁরা করেছেন। তাঁরা জানতে চেয়েছেন নিজেদের স্বরূপকে। মানুষ স্বরূপতঃ পূর্ণ। এই পূর্ণতা পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি, পূর্ণ আনন্দ জীবাত্মায় নিহিত। শিক্ষার লক্ষ্য সেই পরিপূর্ণতার বিকাশ। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ আনন্দকে ফুটিয়ে তোলা। স্বামীজি তাই বলেছেন, *"Education is the manifestation of the perfectian already in man"* পূর্ণতা (perfection) লাভই হচ্ছে শিক্ষার চরম লক্ষ্য। পূর্ণতালাভই আত্মার মুক্তি বা মোক্ষ। মোক্ষের মধ্যে জীবের স্বীয় অন্তরস্থ আত্মাকে উপলব্ধি করে। সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ স্বীয় নিত্য স্বরূপকে, স্বীয় নিত্য ব্রহ্মস্বরূপকে উপলব্ধি করে। শিক্ষাই এই সাধনা। স্বামীজি বলেছেন *'Through Education and Faith the inherent Brahman works up in them'*। শিক্ষা হ'ল মানবের অন্তর্নিহিত সত্ত্বাগত, স্বরূপ ভূত-ব্রহ্মের জাগরণ। ব্রহ্ম চিরজাগ্রত, চিরদীপ্ত, চিরবিরাজিত। তাসত্ত্বেও মনে হয় যেন তিনি নিদ্রিত, আবৃত, বিলুপ্ত, যেহেতু অজ্ঞানবশতঃ আমরা তাকে জানতে পারি না, চিনতে পারি না। এই না জানার, না চেনার প্রতিকার করে শিক্ষা। এরূপ জানার চেনার পথ করে দেয় শিক্ষা। এখানেই শিক্ষার সার্থকতা।

আমরা বলেছি আর্য সমাজ ধর্ম-ভিত্তিক। "ধর্ম কি ? ধর্মমানবাত্মার পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ বিকাশ, মানব মনের তিনটি প্রধান দিক—জ্ঞানের দিক, অনুভবের দিক, প্রবৃত্তির দিক, যাকে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে বলা হয়েছে, Thinking-Feeling-Willing। জ্ঞানের দিক থেকে সেই পরম তত্ত্বকে সাক্ষাৎভাবে স্থিরভাবে, পূর্ণভাবে জানা, অনুভবের দিক থেকে সেই পরম তত্ত্বের সঙ্গে প্রাণের আবেগবহুল ভক্তি-প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত করা, প্রবৃত্তির দিক থেকে সেই পূর্ণজ্ঞান ও ধন্য-ভক্তি প্রীতিকে পূণ্য আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা'—ধর্মের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থতা লাভ করে শিক্ষারূপ সাধনার মধ্য দিয়ে।

॥ পরা ও অপরাবিদ্যা ॥

আত্মার মুক্তি জীবনের চরম লক্ষ্য হলেও ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্পর্কেও আর্য ঋষিরা উদাসীন ছিলেন না। এই দেহকে অতিক্রম করার শিক্ষাই হ'ল প্রকৃত শিক্ষা। দেহকে অতিক্রম কর, কিন্তু দেহকে অবজ্ঞা করো না। দেহের নিজস্ব মূল্য আছে, নিজস্ব দাবী আছে। তবে সে দাবীর ঊর্দ্ধে তাকে স্থান দেওয়া চলবে না। শুধু ব্রাহ্মবিদ্যা অনুশীলন করলেই চলবে না। তাই উপনিষদের ঋষির নির্দেশ—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাচৈবাপরা চ।" দুই প্রকার বিদ্যার অনুশীলন করতে হবে পরা এবং অপরাবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা আর যাবতীয় বিজ্ঞান, শিল্প, কলা ইত্যাদি অপরাবিদ্যা। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, "অবিদ্যয়া মৃতুংতীর্ত্বা

বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"—অবিদ্যা অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান, শিল্প বিদ্যার অনুশীলনের প্রয়োজন জগতে বেঁচে থাকবার জন্য। আর ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন অমৃতত্ব বা চরম শান্তির জন্য। পাখী যেমন দুটি পাখার উপর ভর দিয়ে আকাশে উড়ে, একখানি পাখা দিয়ে পারে না, তেমনি শুধুমাত্র লৌকিক বিদ্যা অথবা কেবল মাত্র আধ্যাত্ম বিদ্যা নিয়ে চললে মানুষের কল্যাণ হয় না। তাই উপনিষদে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাং উপাসতে
তত ভূয় এব তে উ বিদ্যায়াং রতাঃ।"

যারা কেবলমাত্র বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি লৌকিক বিদ্যার অনুশীল করে, তারা অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। কিন্তু তার চেয়ে অধিকতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তারা, যারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করে।

পরাবিদ্যার লক্ষ্য আত্মার মুক্তি—ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার এই শেষ কথা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই গৃহের বন্ধন কাটিয়ে গার্হস্থাশ্রমকে অবহেলা করে সন্ন্যাস অবলম্বন করতে হবে। বৈদিক যুগে কি ব্রাহ্মণ্যযুগে অতি সামান্য সংখ্যক শিক্ষার্থী আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হ'ত। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত, তাই শিক্ষার নিকট লক্ষ্য বা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। লৌকিক বিদ্যায় (অপরাবিদ্যা) দ্বিজাতির প্রতিটি বর্ণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। লৌকিকবিদ্যার্জনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, শিক্ষার্থীর মনে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি, আত্মসংযম, সামাজিক কর্তব্য পালন, জাতীয় সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রভৃতি সম্পর্কে বিদ্যার্থী যাতে সচেতন হয় সে ব্যবস্থাও প্রাচীন শিক্ষার অঙ্গ ছিল। পরাবিদ্যা শিক্ষার শেষ কথা হলেও অপরাবিদ্যা প্রাচীন শিক্ষায় অবহেলিত হয় নি।

॥ বিদ্যারম্ভ ॥

ভারতের তপোবন হচ্ছে আদি বিদ্যালয় ও ঋষিরা হচ্ছেন আদি গুরুকুল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তপোবনস্থ গুরু গৃহই ছিল বিদ্যার্থীর পূণ্যতীর্থ। নবীন বিদ্যার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা "বিদ্যারম্ভ" বা "অক্ষর স্বীকরণ" এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হ'ত। পাঁচ বছর বয়সে চূড়াকর্ম বা চৌল কর্মের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ত। বর্তমান যুগের হাতে খড়ি অনুষ্ঠান 'বিদ্যারম্ভ' সংস্কারের কথা মনে করিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিশু যথাক্রমে ৮, ১১ ও ১২ বছর বয়স পর্যন্ত গৃহে পিতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করত। প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় পিতা পুত্রকে বেদ শিক্ষা দিচ্ছেন। বৈদিক শিক্ষার প্রস্তুতিরূপে বিদ্যারম্ভ সংস্কারের পর পরিবারের মধ্য থেকেই শিশু বেদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করত। ক্রমে বৈদিক শিক্ষা জটিল হয়ে উঠল ও শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গুরুকুলের আবির্ভাব হ'ল—তখন গুরুগৃহে শিক্ষারম্ভ অপরিহার্য হয়ে উঠল।

॥ উপনয়ন ॥

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় উপনয়ন একটি অতি প্রাচীন সংস্কার। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য উপনয়ন একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হ'ত। মেয়েদেরও উপনয়ন সংস্কার হত। ঋগ্বেদের আদিযুগে উপনয়ন অবশ্য পালনীয় ছিল বলে মনে হয় না। পরে তিন বর্ণের বৈদিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে যথাসময়ে বালকের উপনয়ন না হলে সে জাতিচ্যুত হ'ত। উপনয়নের পর নবীন ব্রহ্মচারীর নতুন জন্ম লাভ হত, এজন্য তাকে বলা হয় দ্বিজ। উপনয়ন অর্থ হচ্ছে সমীপে নিয়ে যাওয়া—অর্থাৎ গুরুর নিকটে নিয়ে যাওয়া। উপনয়নের মধ্য দিয়ে আর্য শিশু বিদ্যা গ্রহণের উপযুক্ত হ'ত—তার নব জন্ম হ'ত—গুরুর নিকটে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করত। শিক্ষাকালে গুরু পরিবর্তন করলেও নতুন করে উপনয়নের প্রয়োজন হ'ত। 'ব্রাহ্মণ সন্তানের আট, ক্ষত্রিয়ের এগার ও বৈশ্যের বার বছর বয়সে উপনয়ন হ'ত। এর যে ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। এ বয়স যথাক্রমে ১৬, ২২, ২৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেত। যাজ্ঞবল্ক্য কুলরীতি অনুসারে সুবিধামত উপনয়নের বিধান দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ সন্তান শ্বেতকেতুর বার বছর বয়সে উপনয়ন হয় ও সাথে সাথেই গুরুগৃহে শিক্ষার জন্য যায়। পৌরহিত্য ব্রাহ্মণের প্রধান কাজ ও বেদ অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। এজন্য ব্রাহ্মাণ সন্তানকে বেদ যতটা পড়তে হ'ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বেদ ততটা ব্যাপকভাবে পড়বার প্রয়োজন হ'ত না। তাই ব্রাহ্মণ সন্তানকে একটু কম বয়সেই উপযুক্ত গুরুর অধীনে শিক্ষার জন্য অন্তেবাসী বা আচার্য কুলবাসী হতে হ'ত। শিক্ষাশেষ না হওয়া পর্যন্ত গুরুগৃহে থাকতে হ'ত। তার পূর্বে গুরুগৃহ ত্যাগ ছিল ধর্ম বিরোধী।

ব্রহ্মচারীর বস্ত্র, দণ্ড ও গুরু বরণ

প্রথম যুগে সরল একটি অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থী সমিধ ভার বহন করে আচার্য্যের সমীপে যেত এবং গুরুকে প্রণাম করে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করত। পরে অনুষ্ঠানে অনেক জটিলতা প্রবেশ করে। উপনয়নকালে নবীন শিক্ষার্থীকে মস্তক মুণ্ডন, কৌপীন ও মেখলা ধারণ করতে হ'ত। উপনয়নকালে দেহ আচ্ছাদনের জন্য একখণ্ড বস্ত্র দেওয়া হ'ত। বর্ণভেদে এই বস্ত্র বিভিন্ন রংএর হ'ত। প্রাচীনকালে শিক্ষার্থীকে মৃগচর্ম দেওয়া হ'ত। উপনয়ন কালে যজ্ঞোপবীত ধারনের নিয়ম পরবর্তীকালের রীতি, প্রথম যুগে ব্রহ্মচারীকে যজ্ঞোপবীত দেওয়া হ'ত না, দেওয়া হ'ত উত্তরীয়। আচার্য ব্রহ্মচারীকে একটি দণ্ড দিতেন—সত্য পথের সন্ধানে দণ্ড ব্রহ্মচারীর সহায়ক হবে এজন্য দণ্ড দেওয়া হ'ত। কার্যক্ষেত্রে আচার্য্যের গোধন রক্ষা সমিধ আহরণে বনে যাওয়ার সময় আত্মরক্ষার উপায় রূপে এ দণ্ড অনেক উপকারে আসত। উপনয়নকালে তরুণ ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা করতে হ'ত, উপনয়নকালে তা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হ'ত। উপনয়নের পর শিক্ষার্থী গুরু বরণ করত। সমিধভার বহন করে শিক্ষার্থী গুরু গৃহে উপস্থিত হলে গুরু তার, নাম পিতৃপরিচয়, গোত্র, ইত্যাদি জেনে তাকে গ্রহণের উপযুক্ত বলে মনে করলেই

তাকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করতেন। বহু সময়ে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বিদ্যার্থীকে বহু দূরে যেতে হ'ত। গুরু ছাত্র নির্বাচনের সময় দেখতেন ছাত্র শারীরিক দিক থেকে রোগমুক্ত, মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ, বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ সুশীল ও ঈর্ষাহীন কি না।

শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার ছিল না—তাদের উপনয়ন সংস্কারও হ'ত না। পুরাণ ও বেদাঙ্গে শূদ্রদের অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় শূদ্রদের কোন স্থান ছিল না বলে আর্যদের অনেকে অনুদার বলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের বৃত্তির সাথে বেদের কোন সম্পর্ক না থাকায় তাদের বৃত্তির দিকেই তারা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়ে ওঠে—তাদের মধ্য থেকে বেদচর্চা উঠে যাওয়ায় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে উপনয়ন উঠে যেতে থাকে। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটা অর্থহীন কৌলিক সংস্কার রূপে উপনয়ন প্রথা বজায় ছিল।

উপনয়ন প্রথার বিলোপ

॥ আচার্য ॥

প্রাচীন হিন্দু সমাজে গুরু ছিলেন পরম শ্রদ্ধার পাত্র। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে—পিতামাতা সন্তানের দেহ সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষা দিয়েছে আমাদের নতুন জন্ম—আর এই শিক্ষা আমরা লাভ করেছি গুরুর কাছ থেকে। গুরুকে শুধু শ্রদ্ধাই করা হ'ত না, শিষ্য সম্পূর্ণভাবে গুরুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করত। গীতায় অর্জুন শ্রীভগবানকে বলেছেন—"শিষ্যস্তেহহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম"। গুরু ও শিষ্যকে অতি আপন করে গ্রহণ করতেন—তাই দেখি উপনিষদের আচার্য ও শিষ্য সমবেত ভাবে প্রার্থনা করেছেন—

সহনাববতু
সহনৌ ভুনক্তু
সহবীর্যংকরবাবহৈ
তেজস্বিনাবধীতমস্তু
মা বিদ্বিষা বহৈ।

পরম পুরুষ আমাদের উভয়কে রক্ষা করুন; আমাদের উভয়কে অন্নদান করুন। আমরা মিলিত হয়ে যেন বীর্য প্রকাশ করি। আমরা যেন তেজস্বীভাবে অধ্যয়ন করি। আমরা যেন বিদ্বেষ পরায়ণ না হই।

সে যুগে গুরুর সাহায্য ছাড়া বেদবিদ্যা আয়ত্ত করা ছিল অসম্ভব। বৈদিক শিক্ষা ছিল মৌখিক—শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তির জন্য গুরুর সাহায্য ছিল অপরিহার্য। স্মৃতিশাস্ত্র সূত্রমধ্যে এত সংক্ষিপ্তভাবে নিবদ্ধ ছিল যে তার ব্যাখ্যা, টীকা ইত্যাদি গুরুর কাছ থেকেই জেনে নিতে হ'ত। উপনিষদের গূঢ় তত্ত্বকে জানতে হলেও গুরুর সাহায্য দরকার হ'ত।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি; পক্ষপাতশূন্য সমদৃষ্টি নিয়ে গুরু সমভাবে সব শিষ্যকে বিদ্যাদান করতেন। গুরু হবেন সুবক্তা, প্রত্যুৎপন্নমতি, বহু সরস কাহিনীর ভাণ্ডার

ও অতি কঠিন সূত্রেরও অতি সুন্দর ব্যাখ্যায় পারদর্শী। অর্থাৎ বিদ্বান্ হলেই সার্থক শিক্ষক হওয়া যায় না বিদ্যাদানেও তাকে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়। অকুণ্ঠচিত্তে গুরু শিষ্যকে তার সমস্ত বিদ্যাদান করতেন। শিষ্যের প্রতিভা গুরুকে ম্লান করে দেবে এই ভয়ে গুরু যদি নিজের জ্ঞাত কোন বিদ্যা থেকে শিষ্যকে বঞ্চিত করতেন তাহলে তিনি আচার্য নামের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। আচার্য—"শিষ্যাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্"—শিষ্যের নিকট পরাজয় গুরুর কাছে অগৌরবের ছিল না।

প্রাচীন ভারতের আচার্যগণ বিদ্যানকে জীবনের মহত্তম ব্রত বলে মনে করতেন। অর্থ, রাজসম্মান, যশঃ সব কিছুকে ত্যাগ করে শিক্ষকতাকে যাঁরা জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন সমাজে তাঁদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। ব্যক্তিত্ব, সমুন্নত চরিত্র, ত্যাগ, গভীর জ্ঞান, ধর্মে ঐকান্তিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য গুরুই ছিলেন সমাজে সর্বাধিক পূজ্য।

গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের সম্পর্কের মত পবিত্র ও মধুর। শিষ্য গুরুর পরিবারস্থ জন বলেই বিবেচিত হ'ত। গুরু শিষ্যের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন। আহার-বিহার, নিদ্রা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে করণীয় ও অকরণীয় বিষয়ে গুরু উপদেশ দিতেন। এছাড়া গুরু শিষ্যের রোগশয্যার পাশে থেকে মায়ের মত সেবা করতেন। গুরু কোন আর্থিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে শিক্ষকতা করতেন না। বিনা পারিশ্রমিকেই গুরু শিক্ষা দিতেন। শিক্ষাশেষে গুরু দক্ষিণা ছাড়া তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না। গুরুর আশীর্বাদেই শিষ্য সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠত।

॥ ব্রহ্মচারী ॥

উপনয়নের পর তরুণ ব্রহ্মচারী শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে যেত। সমগ্র শিক্ষাকাল গুরু গৃহে থাকতে হ'ত। শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা শেষ না করে গুরুগৃহ ত্যাগ ছিল ধর্মবিরুদ্ধ। গুরু গৃহবাসী শিষ্যকে অন্তেবাসী বা আচার্যকুলবাসী বলা হ'ত। গুরুগৃহে যাবার পরই শিক্ষা শুরু হ'ত না—গুরু শিক্ষার্থীকে নানা ভাবে পরীক্ষা করতেন। উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেই তাকে শিক্ষা দিতেন।

গুরুগৃহে বাস কালে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে ব্রহ্মচারীকে সংযত জীবন যাপন করতে হ'ত। অতি প্রত্যুষে গুরুর শয্যা ত্যাগের পূর্বে শিষ্য শয্যা ত্যাগ করত ও রাতে গুরু শয্যাগ্রহণ করার পর শিষ্য নিদ্রা যেত। প্রত্যুষে স্নান সেরে সন্ধ্যা আহ্নিক করে শিষ্য গুরুর পরিচর্যায় রত হ'ত। গুরুগৃহের যজ্ঞাগ্নি রক্ষার জন্য সমিধ আহরণ, গোধনের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও গুরুগৃহের দৈনন্দিন কাজে শিষ্যকে অংশ গ্রহণ করতে হ'ত। শিক্ষার্থী সংযত ও ইন্দ্রিয় সুখ থেকে বিরত হয়ে সর্বাধিক আরাম ও বিলাস পরিহার করে গুরুগৃহে বাস করত। দিবানিদ্রা, অপরিমিত আহার, মিষ্টান্ন ও মসলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ, গন্ধদ্রব্য, মাল্যচন্দন ইত্যাদি ব্যবহার; নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি থেকে ছাত্রদের দূরে থাকতে হ'ত। স্ত্রীলোকের সঙ্গ, মাদক দ্রব্য গ্রহণ, জুয়া খেলা ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কামোদ্দীপক কোন খাদ্য বা কার্য থেকে ব্রহ্মচারিকে দূরে থাকতে

হ'ত। ছাত্রদের পাদুকা ও ছত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল, তবে সমিধ আহরণ ও দূরদেশ গমনে পাদুকা ও ছত্র ব্যবহার চলত।

গুরুর আদেশ শিষ্যকে সর্বভাবে মেনে চলতে হ'ত। কোনক্ষেত্রে যদি জাতিচ্যুত হ'বার ভয় থাকত সেখানে গুরুর আদেশ অমান্য করা চলত। গুরুর সামনে থুথু ফেলা, হাই তোলা, হাস্য পরিহাস করা, আঙ্গুল মটকানো, হেলান দিয়ে বসা, পায়ের উপর পা তুলে বসা নিষিদ্ধ ছিল। শিষ্যকে নীচাসনে বসতে হ'ত, গুরু ডাকলে শিষ্য দূরে থাকলেও দাঁড়িয়ে সাড়া দিতে হ'ত। কোন ছাত্র ব্যক্তিগত খরচের জন্য কোন অর্থ রাখতে পারত না—এ নিয়ম রাজপুত্র ও অভিজাতদের পক্ষেও প্রযোজ্য ছিল। সকলকেই সমান ভাবে কৃচ্ছ্র সাধন করতে হ'ত।

ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাব্রত

শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীকে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ভিক্ষা করতে হ'ত। ভিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচারী ও নম্রতার শিক্ষা পেত। সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'ত না। যে সমাজের সাহায্যে ও দানে শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পেল সেই সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে সে-ও সচেতন থাকত। এ ছাড়া দেশের শিক্ষা সম্পর্কে দেশবাসীর যে একটা নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে; সমাজের মধ্যে সে বোধ জাগ্রত হ'ত। গৃহস্থের দ্বার হতে শিক্ষার্থী ভিক্ষুককে কখনও বিমুখ হয়ে ফিরতে হ'ত না—তাদের ভিক্ষাদান ছিল গৃহস্থের প্রতি শাস্ত্রের নির্দেশ। কোন শিক্ষার্থী প্রয়োজনের অধিক ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারত না। শিক্ষা শেষ হয়ে গেলে কোন ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করত না। তবে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের জন্য শিক্ষাশেষেও ভিক্ষার বিধান ছিল। ব্রহ্মণ্যযুগের পরবর্তীকালে শিক্ষার্থী সম্পর্কে ভিক্ষার বিধান আর কঠোর ভাবে পালিত হত না। তক্ষশীলায় দেখা গিয়েছে সঙ্গতিপন্ন ছাত্ররা এককালীন শিক্ষাপণ দিয়ে গুরুগৃহে আহার করত। শুধুমাত্র দরিদ্র ছাত্ররা ভিক্ষার দ্বারা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করত। এজন্য শাস্ত্রের বিধানও পাল্টে গিয়েছিল—মনুতে ও গৃহ্যসূত্রে শিক্ষার্থীকে আচার্যের গৃহে অন্নগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা ব্যবস্থায় কঠোর বাধা নিষেধের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে চলতে হলেও এর বিরুদ্ধে কেহ কোথাও আপত্তি তোলেনি। শিষ্যের কল্যাণের কথা চিন্তা করে ছাত্রজীবনের জন্য যে সব বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা শিষ্যের জীবনে কল্যাণকর রূপেই দেখা গিয়েছে।

॥ বাৎসরিক অধ্যয়নকাল ॥

প্রতি বছর সাড়ে চার মাস থেকে সাড়ে পাঁচ মাস বা ছয় মাস শিক্ষাকার্য চলত। শ্রাবণ মাসের জোছ্‌না পক্ষে কখনও শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন পাঠ শুরু হ'ত। পৌষ, মাঘ মাস কাল পর্যন্ত পাঠ চলত। তারপর দীর্ঘ বিরতি। পাঠ শুরু হ'ত 'উপাকরণ' উৎসবের মধ্য দিয়ে, সাধারণতঃ মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথমদিন উৎসর্জন অনুষ্ঠান হয়ে বাৎসরিক অধ্যয়নকার্য শেষ হ'ত। উপকর্মন ও উৎসর্জন কালে দু'টি দিন ছুটি থাকত। ধর্মসূত্র অনুযায়ী জানা যায় শুক্লপক্ষে বেদ ও কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গ পড়া হত।

সে যুগেও অনধ্যায় দিবস বা ছুটির দিন কিছু কম ছিল না। চন্দ্র সূর্য গ্রহণের দিনে, কোন কোন মাসের অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথির দিন, রাজার মৃত্যু, রাজপুত্রের জন্ম ও মৃত্যু, রাজার পরাজয়, অশৌচকালে, শিষ্যের মৃত্যুতে পড়া হত না। এছাড়া ধর্মশাস্ত্র প্রণেতারা, নানা উপলক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ করে গিয়েছিল। দিনে বজ্রপাত হলে, ধূলি ঝড় উঠলে, রাতে শোঁ শোঁ করে বাতাস বইলে, বাদ্যের শব্দ শোনা গেলে, কুকুর বা শেয়ালের ডাক, বানরের কিচিরমিচির শোনা গেলে, রামধনু উঠলে বা আকাশ অস্বাভাবিক ভাবে লাল হয়ে উঠলে, রথের চাকার শব্দ এলে, রোগীর কাতরানি শোনা গেলে বেদপাঠ বন্ধ থাকত। যে সব তিথিতে নিয়মিত পাঠ বন্ধ থাকত তাকে নিত্য অনধ্যায় ও যখন বিশেষ কারণে পাঠ বন্ধ থাকত তাকে নৈমিত্তিক অনধ্যায় বলা হত। এই অনধ্যায় দিবস নির্ধারণের পিছনে অধিকাংশই ছিল সংস্কার। পরবর্তীকালে ছুটির দিন কমিয়ে দেওয়া হয় ও পাঠের সময় দীর্ঘতর হয়। নৈমিত্তিক অনধ্যায় দিবসগুলিতে বেদ ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের পাঠ হত।

॥ শিক্ষাকাল ॥

বেদ শিক্ষার জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকাররা বলেছেন ব্রহ্মচারী আমৃত্যু গুরুগৃহে বাস করে বেদপাঠ করতে পারত। মহাভারতে বলা হয়েছে জীবনের এক চতুর্থাংশ অধ্যয়নের জন্য অতিবাহিত করা উচিত। উপনিষদে বেদপাঠের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় ভারতের ছাত্ররা সাইত্রিশ বছর কাল গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন করত। যদি প্রতিটি বেদের জন্য ১২ বছর করে ধরা হয় তাহলে তিনটি বেদের জন্যই ৩৬ বছর সময় লাগবার কথা আর অথর্ববেদ ধরলে তো ৪৮ বৎসর কাল গুরুগৃহে থাকতে হত। এত দীর্ঘ দিন গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন করা খুব কম ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। মনে হয় পরবর্তীকালে বেদপাঠের বার বছর সময় নির্দ্ধারিত ছিল। চল্লিশ বছর পার করে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করে গৃহাশ্রমে প্রবেশ করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক ছিল না, তাই বিদ্যা শিক্ষার কাল বোধ হয় কমিয়ে দেওয়া হয়।

॥ বেতন ॥

প্রাচীন শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচিত হ'ত। দরিদ্রতম শিক্ষার্থীকেও গুরু ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের সম্পর্কের ন্যায়, এখানে দেনা পাওনার সম্পর্ক ছিল নিন্দনীয়। যে শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা বিক্রয় করতেন সেই বিদ্যাব্যবসায়ী শিক্ষক কোনরূপ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। ছাত্ররা ভিক্ষা করে ব্যয় নির্বাহ করত। শিক্ষাশেষে স্নাতক গুরুদক্ষিণা দিতেন। মনু বলেছেন— সমাবর্তনের পূর্বে কোনও ছাত্র গুরুকে কোন উপহার দেবে না। গুরুর অনুমতি নিয়ে গৃহে ফিরবার পূর্বে স্নাতক তার সাধ্যানুসারে গুরুদক্ষিণা (গুরু প্রণামী) দেবে। ভূমি, গাভী, অশ্ব, ছত্র, পাদুকা, আসন, শস্য যে কোন দ্রব্য দিয়ে গুরুর সন্তোষ বিধান করা

যেত। দক্ষিণার জন্য ভিক্ষা করা চলত। রাজদ্বারে বা বিত্তবানের নিকট ব্রহ্মচারীরা অনেক সময় গুরুদক্ষিণার জন্য ভিক্ষাপ্রার্থী হতেন। মহাভারতে বলা হয়েছে—শিষ্যের কাজে ও ব্যবহারে গুরুর সন্তুষ্টি বিধানই তাঁর প্রকৃত গুরুদক্ষিণা। শিক্ষার্থীদের থেকে বেতন না নিয়ে যাতে সুষ্ঠুভাবে আচার্য্যরা কাজ চালিয়ে যেতে পারে সমাজ সে ব্যবস্থা করেছিল। বেদ উপনিষদ থেকে জানা যায়—অভিষেক, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সময় রাজারা ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করতেন। পারলৌকিক কার্যে ব্রাহ্মণেরা বিত্তবানদের কাছ থেকে স্বেচ্ছামূলক দান পেতেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিদায়ী দেওয়া অতি প্রাচীন প্রথা। রাজারা গুরুকুলের ভরণপোষণের জন্য গ্রামদান করতেন। এসব গ্রামকে আগ্রাহার গ্রাম বলা হ'ত। ব্রাহ্মণকে কোন রাজকর দিতে হ'ত না। পরবর্তী-কালে আচার্য্যেরা বিদ্যার্থীর কাছ থেকে বিদ্যাপণ গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। জাতক থেকে জানা যায় বারাণসীর রাজপুত্র সহস্রমুদ্রা বিদ্যাপণ সম্বল করে তক্ষশীলায় শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন, পুরো অর্থই সেখানে গুরুকে দিতে হয়েছিল। যারা বিদ্যাপণ দিতে অসমর্থ তারা শ্রমমূল্যে বিদ্যা অর্জন করত। প্রথম যুগে গোপালন, সমিধ আহরণ; গুরুগৃহের পবিত্র অগ্নির রক্ষণাবেক্ষণ সকল শিষ্যের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল, পরে যারা শ্রমমূল্যে বিদ্যার্জন করত তারাই গুরুগৃহের যাবতীয় কাজ করত। রাতে ধর্মীয় আলোচনার বিধান না থাকলেও তক্ষশীলার দরিদ্র ছাত্রদের সুবিধার জন্য যারা শ্রমমূল্যে পড়ত তাদের জন্য রাতে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

॥ শাস্তি ॥

সর্বকালে সর্বদেশেই দু'একটি অশিষ্ট বা অমনযোগী ছাত্র দেখা যায়—ব্রাহ্মণ্য যুগেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। আপাস্তম্ব ধর্মসূত্রে অপরাধী ছাত্রকে ভয় দেখিয়ে, ঠাণ্ডা জলের স্নানের ব্যবস্থা করে; না খেতে দিয়ে সংশোধনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে—দৈহিক শাস্তির কোন ব্যবস্থা এখানে নেই; শেষ শাস্তি গুরুগৃহ থেকে বহিষ্কার। মনু এবং গৌতমও ছাত্রকে বুঝিয়ে শোধরাবার পক্ষপাতী, প্রয়োজন হলে সরু বেত দিয়ে প্রহারের বিধান দিয়েছেন। তবে উত্তমাঙ্গে প্রহার করা চলবে না। বেতের জন্য পিঠই প্রশস্ত স্থান বলে তাঁরা বিবেচনা করেছেন। তক্ষশীলায় নৈতিক দোষ সংশোধনের জন্য বেতের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষকের পক্ষে বেত বর্জন অসম্ভব বলেই তক্ষশীলার শিক্ষকরা মনে করতেন।

॥ পাঠক্রম ॥

বৈদিক যুগে পাঠক্রম খুব ব্যাপক ছিল না। ক্রমে বেদ বিপুল আয়তন হয়ে ওঠে—স্মৃতিশাস্ত্র বেদ পাঠের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যযুগে বর্ণভেদে শিক্ষার তারতম্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষা পাঠক্রমে স্থান পায়। প্রথম অবস্থায় দ্বিজমাত্রেই বেদ পাঠের অধিকারী ছিল পরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য দুই বর্ণের পাঠক্রমে বেদ গৌণ স্থান অধিকার করে। পরে এরা বেদ পাঠের অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়।

॥ ব্রাহ্মণ ॥

ধর্মের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ও অধ্যাপনার কাজের জন্য ব্রাহ্মণদের বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতে হ'ত। বেদাঙ্গে পারদর্শিতা লাভ না করলে বৈদিক অনুষ্ঠান ও বেদপাঠ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেত না এ জন্য ছন্দ শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও কল্পশাস্ত্র পড়তে হ'ত। শতপথ ব্রাহ্মণে পাঠক্রমের একটি বিস্তৃত তালিকা আছে। সেখানে বেদ, বেদাঙ্গ ছাড়াও বিদ্যা (বিজ্ঞান) বাকবাক্যম (তর্কশাস্ত্র) ইতিহাস, পুরাণ, গাঁথা, সর্পবিদ্যা, রক্ষবিদ্যা, ও অসুরবিদ্যার উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও পিত্য (পিতৃ পুরুষের তৃপ্তির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান), রাশি, দৈব, নিধি, একায়ন, ভূতবিদ্যা (পদার্থ ও জীববিদ্যা) ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, দেবজান (নাচ গান, বাজনা প্রলেপ তৈরী) প্রভৃতি বহু বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রম কি পরিমাণ বিস্তৃত ও ব্যাপকরূপ নিয়েছিল।

এ তালিকা দেখে একথা মনে করলে ভুল করা হবে যে, প্রতিটি ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীকেই সমস্ত বিদ্যা অর্জন করতে হ'ত।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুরু তার অধীত বিদ্যা শিষ্যকে দান করেছেন, গুরুর মুখ থেকে শুনে শিষ্য তা মুখস্থ করেছে এমনি করে প্রাচীন শিক্ষার ধারা বংশানুক্রমে রক্ষিত হয়েছে। বৈদিক ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে, যজ্ঞের বেদী নির্মাণ থেকে জ্যামিতি ও বীজগণিত সৃষ্টি হয়েছে। শুভকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য তিথি, মাস, ঋতু প্রভৃতি গণনার মধ্যে দিয়ে নক্ষত্র বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। যজ্ঞে উৎসর্গিত পশুদেহের ব্যবচ্ছেদ থেকে দেহ বিজ্ঞান (Anatomy) সৃষ্টি হয়েছে। পাঠকালে অশুদ্ধ উচ্চারণজনিত ভ্রান্তি নিরসনের জন্য ও স্পষ্ট পদগঠনরীতিকে জানবার জন্য ব্যাকরণ, ছন্দ ও ধ্বনি তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। বিপুলায়তন এই পাঠক্রম দু'একটি নিষ্ঠাবান ছাত্রের পক্ষেই সারা জীবনব্যাপী সাধনার ফলে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সাধারণভাবে বেদপাঠ ও মৌলিক আচার প্রতিপালনের জন্য যজ্ঞীয় আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকত।

বেদ-বেদাঙ্গ ছাড়াও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি সম্পর্কে ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীকে পারদর্শিতা লাভ করতে হ'ত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণ-গুরুর কাছ থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করত। অস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা, রামায়ণ ও মহাভারতে দেখা যায় ক্ষত্রিয় রাজকুমারেরা ব্রাহ্মণ-গুরুর থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছে, তক্ষশীলার ব্রাহ্মণ আচার্যগণ বহু বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। অস্ত্রবিদ্যা ছাড়াও আয়ুর্বেদ, শল্যশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হ'ত।

॥ ক্ষত্রিয় ॥

বৈদিক যুগে ও ব্রাহ্মণ্য যুগের প্রথম দিকে ক্ষত্রিয় সন্তান উপনয়নের পর গুরুগৃহে বেদ পাঠ করত। বেদ ও উপনিষদে পারদর্শিতা লাভ করে ক্ষত্রিয়েরাও ব্রহ্মবিদ্ হয়েছেন। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র বেদের বিখ্যাত সাবিত্রী মন্ত্রের স্রষ্টা, রাজর্ষি জনক রাজা ও প্রবাহ জৈবলির কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য আসতেন। অশ্বপতি কৈকয় ও অজাতশত্রুকে বহু

ব্রাহ্মণ আচার্যরূপে বরণ করেছেন। ধর্মসূত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অব্রাহ্মণ গুরুর কাছে শিক্ষা নেবার সময় ব্রাহ্মণকেও সর্বভাবে গুরুর সেবা করতে হবে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ক্ষত্রিয় সমাজ বেদবিদ্যা পরিহার করতে শুরু করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায় বেদ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ক্ষত্রিয়কে প্রধানতঃ তার জাতিগত বৃত্তি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় কালক্ষেপ করতে হয়। রথ, অশ্ব, গজ, পদাতিক (চতুরঙ্গ) এই চার ভাগে সৈন্যদল বিভক্ত ছিল। তরবারি, তীরধনু, গদা, ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষার বিধান ছিল। অস্ত্রবিদ্যা ছাড়া সমর পরিচালনার কৌশল এবং ব্যূহ রচনার কৌশল শিখতে হ'ত।

শাসনকার্যের যোগ্যতা অর্জনের জন্য রাজপুত্রদের সমরকৌশল ও অস্ত্রবিদ্যা ছাড়াও রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্পর্কীয় বহু বিষয় জানতে হ'ত। কল্পশাস্ত্র থেকে জানা যায় 'নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বার্তা (কৃষি. গো-পালন, বাণিজ্য), দণ্ডনীতি (রাজ্য শাসন ও শত্রুদমন), সংগীত, কাব্য, লেখন প্রভৃতি রাজকীয় বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। রাজপুত্রদের ব্রাহ্মণ আচার্যের কাছে থেকে পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও রাজকর্মচারীর কাছ থেকে বার্তা ও দণ্ডনীতি সম্পর্কে বিদ্যা হাতে-কলমে শিখতে হ'ত। শিক্ষাবিমুখ রাজপুত্রদের জন্য গল্পচ্ছলে শিক্ষার জন্য বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্র রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

॥ বৈশ্য ॥

কৃষি ও বাণিজ্য ছিল বৈশ্যদের কৌলিক বৃত্তি। বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে বৈশ্য সমাজ বহু শাখায় বিভক্ত ছিল। প্রাচীনকালে ৬৪ কলা বিদ্যার কথা আমরা জানি। এক এক সম্প্রদায় এক একটি বিদ্যা শিখত। ঋক্‌বেদের সময় থেকেই বহু শিল্পী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। বৈশ্যকে শস্য বপন, জমির গুণাগুণ নির্ণয়, পশুপালন, বিভিন্ন প্রথার ওজন, ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম, দ্রব্য সংরক্ষণের উপায়, বিভিন্নপ্রকার রত্নের ও ধাতুর মূল্য নির্ধারণ করতে শিখতে হ'ত। যেহেতু বৈশ্য সমাজকে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের লোকের সংস্পর্শে আসতে হ'ত, এজন্য বিভিন্ন দেশের ভাষা, মুদ্রামূল্য ও ভৌগোলিক অবস্থান জানতে হ'ত।

বৈশ্যদের মধ্যে পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পিতার নিকট পুত্র প্রথম কৌলিক বৃত্তিতে দীক্ষিত হ'ত। জাতিগতভাবে শিক্ষালাভের ফলে পুরুষানুক্রমে পিতার নৈপুণ্য পুত্রের মধ্যে রক্ষিত হ'ত এবং শিল্পের উৎকর্ষ সাধন হ'ত। উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা তক্ষশীলায় যেত। তক্ষশীলায় ১৮টি 'শিল্প' (শিল্প) শেখানো হ'ত। চিকিৎসা বিদ্যা, শল্যবিদ্যা, কৃষিবাণিজ্য, হিসাব সংরক্ষণ, রথচালনা, প্রতিমা নির্মাণ, সর্পবিদ্যা, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বৈশ্যবিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা তক্ষশীলায় ছিল। এ ছাড়া পশুচিকিৎসাও-বৈশ্যরা শিখত।

॥ শূদ্র ॥

শূদ্রের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য যুগে দেখি না। শূদ্রের বেদ পাঠে অধিকার ছিল না। শূদ্র ছিল শিক্ষার দরবারে অপাংক্তেয়। দৈহিক পরিশ্রম সাধ্য কাজ শূদ্রের

জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কাজে তাদের নিয়োগ করা হ'ত। এজন্য দেবযান বিদ্যা শূদ্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল বলে জানা যায়। বেদে শূদ্রের অধিকার না থাকলেও পুরাণে অধিকার ছিল। মহাত্মা বিদুর শূদ্রাণীর গর্ভজাত। বেদজ্ঞ সত্যকাম দাসী গর্ভজাত।

॥ শিক্ষাপদ্ধতি ॥

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু কখনও ব্যক্তিগত—কখনও সমষ্টিগতভাবে শিক্ষা দিতেন। সমষ্টিগত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও গুরু প্রতিটি ছাত্রের সামর্থ্য বিচার করে শিক্ষা দিতেন। মহাভারত থেকে জানা যায় সাধারণতঃ ছাত্র সংখ্যা পাঁচজন থেকে বেশী হ'ত না—অবশ্য ব্যতিক্রমও ছিল, তবু প্রতিটি ছাত্র সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে যত্ন নেবার অসুবিধা ছিল না। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মুখ্যতঃ ব্যক্তিমুখীন। শিক্ষা ছিল মৌখিক, গুরুর মুখে শুনে শিক্ষার্থীকে রোজকার পাঠ মুখস্থ করতে হ'ত। না বুঝে মুখস্থ করা ছিল নিন্দনীয়। নিরুক্তে বলা হয়েছে, যে না বুঝে মুখস্থ করে সে গাছ ও যষ্টির মত ভারবাহীমাত্র। পড়বার সময় শিক্ষার্থীরা পাদ-বন্দনা করে বসত। গুরু দু'টি কি একটি শব্দ উচ্চারণ করতেন, ছাত্ররা গুরুর আবৃত্তির পর সমস্বরে আবৃত্তি করত। আবৃত্তির সাথে ব্যাখ্যার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ ও শুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত। সূত্র সাহিত্য এত সংক্ষিপ্ত ছিল যে ব্যাখা ভিন্ন তা সহজে বোধগম্য হ'ত না। এক্ষেত্রে গুরু প্রতিটি শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করতেন। এরপর প্রশ্ন ও বিচার হ'ত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় যুক্তি ও বিচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত। প্রতিপাদ্য বিষয় বিচার-বিতর্কের পরই গ্রহণ করা হ'ত। এক একদিন তিনটি কিংবা বড় হলে দু'টি শ্লোক পড়া হ'ত।

সে যুগের পাঠ-পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি স্তরভেদ ছিল। যেমন—উপক্রম (প্রস্তুতি), শ্রবণ, আবৃত্তি, অর্থবাদ, ফল, উপপত্তি। ছাত্রদের গুরুর কাছে জানবার আগ্রহ থেকে উপক্রম বা পাঠ প্রস্তুতি পর্বের সূচনা হ'ত। শ্রবণ—গুরু যা বলেন তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। আবৃত্তি—গুরুর কাছ থেকে শুনে তা বার বার আবৃত্তি বা অভ্যাস করে আয়ত্ত করা। অর্থবাদ—যা শেখান হ'ল তার অর্থ বুঝতে সচেষ্ট হওয়া। এরপর আলোচনা করে যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করে তার প্রয়োগ করা হ'ত। মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা শিক্ষার্থী তার জীবনে সত্যকে উপলব্ধি করত। গভীরভাবে চিন্তা করাকে বলা হ'ত মনন। নিদিধ্যাসনের অর্থ হচ্ছে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে সত্যকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতিতে মেধা ও স্মৃতি-শক্তির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। স্মৃতির অনুশীলনে শিক্ষার্থীরা বিরাট বৈদিক সাহিত্যকে যেভাবে মুখস্থ করত তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা যুক্তি-নির্ভর হওয়ায় শিক্ষায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রচলন ছিল। প্রশ্নিন, অভিপ্রশ্নিন, উত্তরদাতা ও প্রশ্নবিচারক এদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ও বিচারের মধ্যে দিয়েও পাঠ চলত। গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পদ্ধতিও ছিল। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ ছাড়াও বহু উপনিষদে দেখা যায় ধর্মের গূঢ় তত্ত্বকে

প্রাঞ্জল করবার জন্য গল্পের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। জটিল ও নীরস বিষয়কে সহজ ও সরল করে তোলবার জন্য এ পদ্ধতির অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। মনু থেকে জানা যায় আচার্যপুত্র অধ্যাপনায় পিতাকে সাহায্য করতেন। পরবর্তীকালে অগ্রবর্তী শিক্ষার্থীরা নবাগতদের শিক্ষায় সাহায্য করত। এই 'সমাদিষ্ট' বা পড়ুয়া শিক্ষক আচার্যের আদেশেই পাঠ দিত ,তাই তাকে গুরুর মতই সম্মান দিতে হ'ত।

॥ পরীক্ষা ॥

প্রাচীন শিক্ষায় পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সংবাদাভিজয় অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায় বিতর্ক, আলোচনা সভা বা বিদ্বৎসম্মেলন এসবের ব্যবস্থা ছিল। বিতর্ক-সভার মধ্য দিয়েই পণ্ডিতদের বিদ্যার পরীক্ষা হ'ত। বৈদিক গ্রন্থে এই বিতর্ককে বলা হয় ব্রহ্মোদয়। সংস্কৃত-সাহিত্যে বিদ্যাবিবাদ বা বিদ্যাবিচার বলা হয়েছে। বিচারকের সামনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিচার হ'ত। অনেকে মনে করেন "বাক্যে বাক্যম্" বলতে এরূপ বিতর্ককেই বোঝান হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ভব এই বিতর্কের মধ্যেই হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। তপোবন, রাজসভা ও যজ্ঞক্ষেত্রে এসব বিতর্ক বা আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হ'ত।

॥ সমাবর্তন ॥

সমাবর্তন উৎসবের মধ্য দিয়ে গুরুগৃহে বাসের সমাপ্তি পর্ব সূচিত হ'ত। পাঠ শেষ করে বিদ্যার্থী তার সাধ্যমত গুরুদক্ষিণা দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করে, গুরুর অনুমতি নিয়ে 'স্নাতক' গৃহে ফিরে আসতেন। বিদ্যার্থী শিক্ষা শেষে আনুষ্ঠানিক স্নান শেষ করে স্নাতক উপাধিধারী হতেন। উপনয়নের মধ্য দিয়ে যে জীবনের শুরু হ'ত, সমাবর্তনের বিশেষ স্নান করে এবং দণ্ড, মেখলা ও অজিন (মৃগচর্ম) ত্যাগ করে সে জীবনের শেষ হ'ত। স্নাতক তিন রকমের হ'ত। বিদ্যা স্নাতক—যে বেদ অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু সমস্ত ব্রত পালন করে নি। ব্রত স্নাতক—যে সমস্ত ব্রত পালন করেছে কিন্তু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে নি। বিদ্যাব্রত স্নাতক—যে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন ও ব্রত পালন করেছে। আনুষ্ঠানিক স্নান শেষ হবার পর থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত বিদ্যার্থীকে স্নাতক বলা হ'ত। সমাবর্তন উৎসব বেশ জাঁকজমকপূর্ণ হ'ত। স্নান করে, নতুন কাপড় পরে, গলায় মালা ঝুলিয়ে, রথে বা হাতীতে চড়ে বিদ্যার্থী বিদ্বৎ সমাবেশে উপস্থিত হ'ত। পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছে গুরু তাকে স্নাতক বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এখানে স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়েই তার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিসমাপ্তি হ'ত।

শিক্ষাশেষে সমাবর্তন উৎসবে ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথের পাথের রূপে যে উপদেশ গুরু শিষ্যকে দিতেন তা সর্বকালে সর্বদেশে শ্রেষ্ঠ আচরণীয় ধর্ম বলে বিবেচিত হবে। এখানে তার অংশ বিশেষ দেওয়া হ'ল তা থেকেই বোঝা যাবে গার্হস্থ্য জীবনে কি মহান আদর্শকে সামনে রেখে হিন্দুজীবন শুরু হ'ত :—

"সতং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়নে মা প্রমদঃ"

সত্য কথা বলবে। ন্যায় আচরণ করবে। বিদ্যাচর্চার পথ বর্জন করো না।

S.C.E.R.T, W.B. LIBRARY

সত্যান্ন প্রনদিতব্যম। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম।

সত্য হতে বিচ্যুত হয়ো না। ন্যায় আচরণের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। সৎ ভিন্ন অন্য পথে যেও ন ।

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য দেবো ভব।

মাতা, পিতা ও গুরুকে দেবতা জ্ঞান করবে।

যান্যনবদ্যামি কর্মানি তানি সেবিত ব্যাসি নো ইতরাণি ॥

যান্যাস্মাকং স্থচরিতানি তানি তয়ো পাস্যামি নো ইতরাণি ॥

সৎ কর্ম করবে, যা ঘৃণ্য সে কাজ করবে না। আমাদের যা ভাল অনুকরণ করবে, মন্দগুলি নয়।

শ্রদ্ধায়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

শ্রদ্ধার সাথে দান করবে। অশ্রদ্ধার সাথে দান করবে না। শক্তি অনুসারে দান করবে। লজ্জার সাথে দান করবে। ভয়ের সাথে দান করবে। মিত্রাদি কার্যের জন্য দান করবে।

অস্মা ভব। পরশুর্ভব। হিরণ্য মস্তৃতং ভব।

পর্বতের মত অচঞ্চল হও। কুঠারের মত তীক্ষ্ণধার হও। স্বর্ণের মত মূল্যবান হও।

শিবো ভূঃ সথা চ শূর সবিতা চ নৃণাম।

সর্ব গুণান্বিত হও। মানুষের বন্ধু ও রক্ষক হও।

শতং শরদ আয়ু বো জীব সৌম্য। হে সৌম্য, তোমরা শত জীবি হও।

॥ পরিষদ ॥

প্রাচীন যুগে তপোবনের শিক্ষালয়ের বাইরে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে শিক্ষা বিষয়ক বহু জটিল প্রশ্নের সমাধানের ব্যবস্থা ছিল। এই জ্ঞানীজন সমাবেশকে বলা হ'ত পরিষদ। অনেকে মনে করেন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সঙ্ঘের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল। পরিষদ জটিল সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রশ্নের মীমাংসা করত। পরিষদের গঠন সম্পর্কে শাস্ত্রকারগণ বহুরূপ নির্দেশ দিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যাদের নিয়ে পরিষদ গঠিত হ'ত তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন অধ্যাপক। জনসাধারণের সমাজ জীবনে কোন কোন ধর্মীয় আচরণ বা সামাজিক আচরণ নিয়ে কোন সংকট দেখা দিলে বা শিক্ষা সম্পর্কে কোন সমস্যা দেখা দিলে পরিষদেই তার মীমাংসা হ'ত। বেদের ও হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ ছাড়াও শিক্ষার্থীরাও পরিষদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করত। পরিষদে বহু জ্ঞানীজনের সমাবেশ হ'ত বলেই জিজ্ঞাসু ছাত্ররাও নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের জন্য পরিষদের অধিবেশনে সমবেত হ'ত। এইভাবে পরিষদসমূহের খ্যাতি বিস্তার লাভ ঘটে। সেই যুগের ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণে পরিষদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। পরিষদে শিক্ষার্থীরা শুধু উপস্থিত থাকত না, তারা আলোচনায় অংশ গ্রহণও করত।

যজ্ঞসভায় ও পরিষদে ধর্ম, দর্শন ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে বিদ্বৎ সমাজে আলোচনা অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে জানা যায় শ্বেতকেতু পাঞ্চাল দেশের এক পরিষদে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। এতে বোঝা যায় পরিষদের অধিবেশনে দূর দূর থেকে পণ্ডিতগণ এসে যোগ দিতেন। প্রাচীন যুগে দশজন সদস্য নিয়ে পরিষদ গঠনের নির্দেশ থাকলেও জরুরী অবস্থায় সদস্য-সংখ্যা কম হলেও চলত। মধ্যযুগে ইউরোপে বিদ্বৎ সমাজের প্রতিষ্ঠানই ক্রমে যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছিল, ভারতেও পরিষদের মত প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখার অধ্যাপকগণ সমবেত হতেন, তার মধ্য দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি রূপটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

॥ নারীশিক্ষা ॥

বৈদিক যুগে সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে। সে যুগে শিক্ষায় নারী-পুরুষে ভেদ ছিল না। নারীর বেদে অধিকার ছিল ও তারা যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করত। পত্নীকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ সম্ভব ছিল না। মেয়েদের উপনয়ন হ'ত এবং তারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করত। গুরু-গৃহে বাসকালে ব্রহ্মচর্য পালন করত। বৈদিক সমাজে বাল্য-বিবাহ ছিল না। মেয়েরা গুরুগৃহে থেকে বেদ-বেদাঙ্গ উপনিষদ ইত্যাদি পড়ত। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে যে ছাত্রীজীবন শেষ না হ'লে কুমারীদের বিবাহে অধিকার ছিল না।

নারীরা শুধু শিক্ষা গ্রহণ করতেন না, তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টাও ছিলেন। ঋগ্‌বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টাদের মধ্যে কুড়িজন বিদুষী মহিলার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশ্ববরা, ঘোষা, রোমশ, লোপা মুদ্রা, অপলা, বাক্‌যমী, ইন্দ্রাণী, উর্বশী প্রভৃতি বিদুষীরা ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন বলে এদের মন্ত্রদৃক বা ঋত্বিক বলা হয়েছে। যারা মন্ত্রে পারদর্শিনী হতেন তাঁদের মন্ত্রোবিদ্ বলা হ'ত। রামায়ণে কৌশল্যা ও তারাকে মন্ত্রবিদ্ বলা হয়েছে। দ্রৌপদীকে মহাভারতে পণ্ডিতা বলা হয়েছে। মেয়েরা শুধু বেদ অধ্যয়নই করতেন না। অনেক সময় ব্রহ্মসম্পর্কীয় গূঢ় আলোচনা ও বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতেন। জনকসভায় গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে ব্রহ্ম সম্পর্কীয় বিতর্ক বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী, সুলভা, প্রথিতেয়ী, কার্শকৃৎস্নী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন।

প্রাচীন যুগে মেয়েদের শুধু উপনয়ন ও সাবিত্রী মন্ত্রেই অধিকার ছিল না তাঁরা বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। পাণিনি, আচার্যা ও উপাধ্যায়া শব্দের দ্বারা আচার্যানী, উপাধ্যায়িনী অর্থাৎ আচার্যের স্ত্রী এ দু'টি শব্দ থেকে পৃথক করে নারী অধ্যাপিকাকে বুঝিয়েছেন। পাতঞ্জলী যৌদমেধী শব্দে অধ্যাপিকা ও যৌদমেধা শব্দ ছাত্রী অর্থে ব্যবহার করেছেন। নৃত্য, গীত ও বাদ্যে বৈদিক যুগে নারীদের পারদর্শিতার কথা জানা যায়। বয়ন, সূচীশিল্প ও অন্যান্য চারুশিল্পে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করত। সূচীশিল্পকে বলা হ'ত পেশ। স্ত্রী সূচীশিল্পীকে বলা হ'ত পেশাস্বরী। শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায় মেয়েরা উলের কাজে (ঊর্নসূত্র) বিশেষ পারদর্শিনী ছিল। বাৎসায়নের কামসূত্রে মেয়েদের ৬৪ কলা শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাটক,

কবিতা রচনা, পাশাখেলা, মাল্যরচনা, দেহচর্চা, প্রহেলিকা প্রভৃতি এই তালিকাভুক্ত ছিল। অর্থশাস্ত্রে বারবনিতা, ক্রীতদাসী ও নটীদের নৃত্যগীত ও বাদ্য শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। বারস্ত্রীদের গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োগ করা হ'ত।

মেয়েরা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত বলে বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। পাতঞ্জলী তার মহাভাষ্যে বর্শানিক্ষেপকারিণী শাক্তিকী নামে নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থানিস চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে যোদ্ধার বেশে সজ্জিতা বীর নারীদের দেখেছেন। নারীরা অন্তঃপুরে দেহরক্ষিণীর কাজ করত। যুদ্ধকালে নারীরা পথ্য ও পানীয় দিয়ে আর্তের সেবা করত।

বৈদিগ যুগে বাল্য-বিবাহের প্রচলন ছিল না। মেয়েদের সাধারণতঃ ১৬।১৭ বছর বয়সে বিয়ে হ'ত। মেয়েদের বর বেছে নেবার অধিকার ছিল। স্বয়ম্বর প্রথা মহাভারতের যুগ পার হয়ে ঐতিহাসিক যুগে বর্তমান ছিল।

নারীরা অধ্যাপনা করতেন ; তাঁরা পুস্তক রচনাও করেছেন। কার্শকৃৎস্নী মীমাংসা শাস্ত্রের উপর একখানা বই লেখেন। ব্রাহ্মী আপিশলি ব্যাকরণের উপর বই লিখেছিলেন।

বৈদিক সমাজে নারীদের যে সম্মানের আসন ছিল, উপনিষদের ও মহাকাব্যের যুগেও তাঁরা সে আসন থেকে বঞ্চিত হন নি। কিন্তু স্মৃতির যুগে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নারীদের বাদ দেওয়া হতে থাকে। উপনয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার পর বাল্য-বিবাহ প্রবর্তন হলে নারী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মনুসংহিতায় দেখি বিধান দেওয়া হয়েছে—নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকবে। মনু আরো বলেছেন, মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে বেদ অধ্যয়নের সমান, স্বামীর সেবা আর আশ্রমে পাঠ করা এক এবং গৃহকার্য করাই হচ্ছে সন্ধ্যাবন্দনা।

সাধারণভাবে নারী সমাজের নানারকম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলেও ধনী অভিজাত পরিবারের মেয়েদের জন্য পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সাহিত্য অনুশীলনে অভিজাত পরিবারের মেয়েদের আগ্রহ দেখা যায়, মধ্যযুগে সাধারণ নারী সমাজ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলেও বহু নারী কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। চারুশিল্প, নৃত্যগীত, মাল্যরচনা প্রভৃতিতে মেয়েদের পারদর্শিতার কথা আঞ্চলিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। হালের গাথা সপ্তশতীতে সাতজন মহিলা কবির-কবিতা সংগৃহীত হয়েছে।

হিন্দুযুগ অবসানের পর সমাজে নারীর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। মুসলিম-যুগে রাজনৈতিক কারণে হিন্দুসমাজে যে বিপর্যয় দেখা দেয় তার প্রতিক্রিয়ায় অন্তঃপুরের অবরোধে ভারতীয় নারী সমাজ শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়।

॥ বৃত্তি শিক্ষা ॥

হিন্দু জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ হলেও ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারে নি। পরাবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও অপরাবিদ্যার প্রয়োজন হিন্দু সমাজ অনুভব করেছিল। বৈদিক যুগে জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে বৃত্তি দিয়েই

সমাজে জাতিভেদ প্রথা গড়ে উঠেছিল। আদি যুগে বৃত্তি দিয়েই সমাজে জাতি নির্ধারিত হ'ত। পরবর্তীকালে জাতিভেদ প্রথা গড়ে উঠেছিল জন্মসূত্রে। শ্রমবিভাগ অনুসারে সমাজে বিভিন্ন সামাজিক বর্ণের সৃষ্টি হয়। সামাজিক ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেজন্য বিভিন্ন বর্ণের লোককে বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দেওয়া হ'ত। নিজ বর্ণের কাজ ছেড়ে অন্য বর্ণের কাজ করতে যাওয়া অনুচিত বলেই বিবেচিত হ'ত। এরপর যখন থেকে জন্মসূত্রে বর্ণভেদ প্রথা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু হ'ল, তখন থেকে এক বর্ণের পক্ষে অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ প্রায় নিষিদ্ধ হ'ল।

॥ সমর বিদ্যা ॥

আর্যরা এদেশে এসেছিল অস্ত্র-নির্ভর হয়ে। শত্রুভাবাপন্ন একটি দেশের উপর আধিপত্য রাখবার প্রয়োজনে বৈদিক যুগ থেকেই যুদ্ধবিদ্যার আদর ছিল। প্রথম যুগে যুদ্ধবিদ্যা ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিল না। আর্যরা রথ ও অশ্বচালনায় অতি নিপুণ ছিল। এ ছাড়া তীর, ধনুক ও বর্শা চালনায়ও তাদের দক্ষতা ছিল। ব্রাহ্মণ্য যুগের রাষ্ট্র থেকে সমর শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। নগর ও জনপদের অধিবাসীরা নিজের রক্ষার প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে যারা অস্ত্রনিপুণ তাদের কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখত। ফলে সাধারণ লোকও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হয়ে উঠত। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলেছেন—আলেকজাণ্ডার কোন কোন জায়গায় রাজকীয় বাহিনী ছাড়া দেশের সাধারণ লোকদের কাছ থেকেও বাধা পেয়েছেন। তক্ষশীলা যখন শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করে তখন এখানে সামরিক শিক্ষার জন্য ভারতের সুদূর অঞ্চল থেকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা সমবেত হ'ত। সামরিক বৃত্তি ক্ষত্রিয়দের জন্য নির্দিষ্ট হলেও রামায়ণ-মহাভারত থেকে জানা যায় ক্ষত্রিয় রাজকুমারেরা গুরুর কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করত। জাতক থেকে জানা যায়, তক্ষশীলায় একটি বিদ্যালয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ১০৩ জন রাজপুত্র সামরিক শিক্ষার জন্য সমবেত হয়েছিল। গ্রীক আক্রমণের পর থেকে দেশরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায় এবং রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনী গঠনের প্রয়োজনে সামরিক শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করা হয়। যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার সাথে সাথে ভারতীয় যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পালনীয় রীতি-নীতি সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ভারতীয় যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়িত, পরাজিত, ভীত, আশ্রয়প্রার্থীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করত না। যুদ্ধে অসম্মত, অস্ত্রহীন, নারী, শিশু ও বৃদ্ধের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক্ষাত্ররীতি বিরুদ্ধ ছিল। মল্লক্রীড়া ক্ষত্রিয়দের অতি প্রিয় ছিল।

ক্ষত্রিয়দের উপনয়ন ছাড়াও ধনুর্বেদ উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র দেওয়া হ'ত। সামরিক শিক্ষা শেষে শিক্ষা সমাপ্তির স্বীকৃতিসূচক ছুরিকা-বন্দন উৎসবে শিক্ষার্থীকে ছুরিকা দেওয়া হ'ত। একে অস্ত্রবিদ্যার সমাবর্তন বলা হ'ত। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাশেষে রাজপুত্রদের জন্য যে অস্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সাধারন ক্ষত্রিয়ের জন্য সেরূপ কোনও ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায় না।

॥ চিকিৎসা বিদ্যা ॥

ভারতে চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ভব অতি প্রাচীনকালে হয়েছিল। বৈদিক গ্রন্থে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেববৈদ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। খ্রীষ্ট জন্মের বহু পূর্বেই গ্রীক ঐতিহাসিকরা ভারতীয় চিকিৎসকদের প্রশংসা করেছেন। ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্রোপচার দু'দিকেই তাদের সমান দক্ষতা ছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র উপবেদ বলে গণ্য হ'ত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কণিষ্কের চিকিৎসক রাজবৈদ্য চরক সংহিতা রচনা করেন। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অন্যতম প্রণেতা সুশ্রুতের আবির্ভাব হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে সাধারণতঃ সব বর্ণেরই অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণের বর্ণের কাছেও আয়ুর্বেদ শিক্ষা করা যেত। সুশ্রুত বলেছেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য চিকিৎসকেরা নিজ নিজ বর্ণের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে পারেন। তিনি শৈল্য বিদ্যায় শূদ্রের অধিকার স্বীকার করেছেন। আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীকে উপনয়ন সংস্কার পালন করতে হ'ত, কিন্তু শূদ্রের ক্ষেত্রে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে আয়ুর্বেদিক উপনয়ন নিষিদ্ধ ছিল।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সংস্কৃতে লেখা তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রকে সংস্কৃত ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে হ'ত। না বুঝে মুখস্থ করার উপায় ছিল না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুঁথি যে না বুঝে মুখস্থ করে সুশ্রুত তাকে ভারবাহী গাধার সহিত তুলনা করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রকে শল্যবিদ্যা শিক্ষাকালে কৃত্রিম নরদেহ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও শেলাই শিখতে হ'ত। অস্ত্রোপচার শুধুমাত্র বই পড়ে শেখা যায় না বলে আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীদের শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হ'ত। পরবর্তীকালে সামাজিক বিধি-নিষেধের ফলে শব-ব্যবচ্ছেদ প্রথা রহিত হয়ে যাওয়ায় শল্য চিকিৎসার অবনতি ঘটে। শিক্ষানবীশ থাকাকালে শিক্ষার্থীরা যে সব রোগী তাদের গুরুর কাছে আসত, তাদের পরীক্ষা করত। হাসপাতালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের কতদিন শিক্ষা নিতে হবে সে সম্পর্কে কোন সঠিক নির্দেশ নেই। তক্ষশীলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষাকাল দীর্ঘ ছিল বলে জানা যায়। ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক জীবক তক্ষশীলায় সাত বছর শিক্ষার পর যখন গৃহে ফিরে যেতে চান তখন তাঁর অধ্যাপক অনিচ্ছার সাথে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন, এই অল্পকাল শিক্ষা গ্রহণ করে সে যেন মনে না করে যে সে এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এত বিশাল যে, চরক বলেছেন—এই শাস্ত্রে কেহ সব দিক থেকে সমান দক্ষতা লাভ করতে পারে না। সেই যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ হ'বার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা সমাপ্তির পর সমাবর্তন উৎসব হ'ত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে চিকিৎসার ছাড়পত্র মিলত। চরক, সুশ্রুত, শুক্র, সবাই বলেছেন—রাজার সনদ বা ছাড়পত্র ছাড়া কোন লোককে চিকিৎসা করতে দেওয়া উচিত নয়।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অতি উন্নত ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বাগ্‌দাদের খলিফা হারুণ-অল রসিদ তাঁর রাজ্য থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ছাত্র পাঠান। ভারত থেকে তিনি চিকিৎসক নিয়ে গিয়েছিলেন।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি তাঁদের দ্বারা আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। মধ্য যুগে সামাজিক কারণে শব ব্যবচ্ছেদ উঠে যাওয়ায় শল্য চিকিৎসার অবনতি ঘটতে থাকে। ক্রমে আয়ুর্বেদ থেকে অস্ত্রপ্রচার একেবারে উঠে যায়। মধ্য যুগে চিকিৎসকগণ পূর্ব সম্মানের আসন থেকে বিচ্যুত হওয়ায় ও চিকিৎসা বিদ্যার সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাওয়ায় ধীরে ধীরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবনতি ঘটতে থাকে।

॥ কারিগরি শিক্ষা ॥

প্রাচীন যুগে সাধারণ বৃত্তিজীবীদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিল। ঋগ্‌বেদে বিভিন্ন শিল্পের উল্লেখ দেখা যায়। সে যুগে তক্ষণশিল্পীর অত্যন্ত আদর ছিল। যুদ্ধের জন্য রথ ও অস্ত্র এবং কৃষি কাজের জন্য নানা উপকরণ এরা তৈরী করত। এছাড়া মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, চর্মশিল্প ও সীবনশিল্পের উল্লেখ আছে। গৃহ নির্মাণ, নগর নির্মাণ যাতায়াতের যানবাহন নির্মাণের জন্য বহুলোক নিযুক্ত থাকত। বিভিন্ন সম্প্রদায় আপন আপন সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করত। বৃত্তি জাতিগত হওয়ায় শৈশবে পিতা অতি যত্নসহকারে সন্তানকে নিজবৃত্তিতে শিক্ষা দিতেন। পিতার নিকট শিক্ষার প্রাথমিক স্তর শেষ হবার পর নিপুণ শিল্পীর কাছে দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠানো হ'ত। কুশলী শিল্পীর কাছে শিক্ষানবিশী (apprentice-ship) করবার প্রথা সে যুগে বহুল প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীকে একটা নির্দিষ্ট সময় শিক্ষা গ্রহণ করবার অঙ্গীকার করতে হ'ত। শিক্ষাকালে গুরুগৃহে থাকা-কালীন আহার ও বাসস্থানের জন্য কোনরূপ খরচ দিতে হ'ত না। শিক্ষার্থীর তৈরী জিনিস গুরুর অধিকারে থাকত তবে বিক্রয় মূল্য গুরু গ্রহণ করতেন। শিক্ষাশেষে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দিয়ে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে কাজ করবার অনুমতি পেত।

যে কোন বৃত্তিতে প্রাথমিক জ্ঞানের জন্য সাধারণ লেখাপড়ার বিশেষ প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে হ'ত। কারণ এ সম্পর্কে পুঁথিসমূহ সংস্কৃতে লেখা ছিল। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সংস্কৃত না শিখেও এরা পুরুষানুক্রমে সূত্রগুলি করে নিয়েছে। স্থপতিকে হিসাবের অঙ্ক শিখতে হ'ত। বিভিন্ন শিল্পে উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা অনেক সময় তক্ষশীলায় যেত।

প্রাচীন যুগের শিল্পী সঙ্ঘ (Trade Guild) আমাদের সমাজ জীবনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কামার, কুমোর, ছুতোর, দর্জি, সেকরা, ধোপা, নাপিত সবাই বৈশ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ নিজেদের শিল্পের সার্থের জন্য শিল্পী সঙ্ঘে ঐক্যবদ্ধ হ'ত। শিল্পীসঙ্ঘের সভ্যপদ ছিল পুরুষানুক্রমিক। সঙ্ঘ সভ্যদের থেকে চাঁদা সংগ্রহ করত। সঙ্ঘ সভ্যদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বিচার করে শাস্তি বিধান করত। জরিমানা আদায় করত। সংগৃহীত অর্থ নানা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হ'ত। সঙ্ঘ হতে কাজের সময় শিল্পকর্মের মান (Standard) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ত। কোন সভ্যের দুর্দিন পড়লে সঙ্ঘ থেকে তাকে সাহায্য করা হ'ত।

প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা চিরদিন রাজানুকূল্য লাভ করেছে। অশোকের সময়

দেখা যায় রাজকীয় শিল্পীদলের সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন সময় মন্দির বা মঠের সাথে শিল্পী পরিবার যুক্ত থাকত। প্রাচীন ও মধ্য যুগে রাজা ও বিত্তবানদের পৃষ্টপোষকতায় ও অর্থ সাহায্যে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে রাজা ও ধনীদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য বহু নিগ্রহও সহ্য করতে হয়েছে। নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়েও ভারতীয় শিল্পীরা বহুদিন পর্যন্ত তাদের জাতিগত শিল্পের উন্নত মানকে বজায় রেখে ভারতে শিল্পকলার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিল্পীদের তৈরী নানা শিল্পদ্রব্য ইউরোপের বণিক সম্প্রদায়কে ভারতের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

॥ বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা ॥

বণিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈদিক যুগের বণিক সম্প্রদায়ের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিল না—পরে এই সম্প্রদায় বিত্তবান হয়ে ওঠায় অবস্থার পরিবর্তন হয়। মৌর্য যুগে আন্তঃ-প্রাদেশিক বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব থেকে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। সুদূর রোমান সাম্রাজ্যের সাথে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

মনু বণিকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের উল্লেখ করেছেন। বণিক-শিক্ষার্থীকে প্রথমেই জানতে হ'ত, যে সব জিনিস নিয়ে ব্যবসা চলত তার প্রকারভেদ ও গুণগত বৈষম্য। তারপর শিখতে হ'ত বাণিজ্যিক ভূগোল—কোথায় কোন্ জিনিস উৎপাদিত হয় এবং কোথায় কোন্ পথে সেখান থেকে জিনিস রপ্তানি হয়। সে যুগে শুল্ক ব্যবস্থার অত্যন্ত বাহুল্য ছিল, তাই কোন্ পথে মাল আমদানি রপ্তানী করলে কম শুল্ক দিয়ে জিনিস পাঠান বা আনান যায় সে জন্য পথের বিস্তৃত বিবরণ জানতে হ'ত। বছরের বিভিন্ন সময় কোথায় কোন্ মেলা বসত, সেখানে কি দ্রব্য পাওয়া যেত এবং কোথায় কোন্ জিনিসের চাহিদা তার খবর জানতে হ'ত। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য জানা দরকার হ'ত। বৈদেশিক বাণিজ্য চালানোর জন্য, কাজ চালাবার মত বিদেশী ভাষাও শিখতে হ'ত। প্রাচীন যুগ থেকে ধনী শ্রেণীরাই ছিল দেশের ব্যাঙ্কার—তাই দাদন দেবার রীতি-নীতিও কিছুটা জানতে হ'ত। শিক্ষার এই ব্যাপক পাঠক্রম থাকলেও সবাইয়ের পক্ষে সবটা জানার প্রয়োজন ছিল না। বণিকদের শিক্ষার জন্য বণিক সমিতি বা সঙ্ঘ থেকে ব্যবস্থা করা হ'ত। নিজ নিজ কারবারে শিক্ষানবিশী করেও শিক্ষার্থী কাজ শিখত। কিছুদিন পূর্বেও বড় বড় নগরে মহাজনী বিদ্যালয় ছিল। বণিক সঙ্ঘ বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সাথে এই বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা করত। এখানে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল।

প্রশ্নাবলী

1. What were the aims of Education in ancient India and how were they realised? What features of the system may be adopted to day? Discuss. [C. U. B. T. '68]
2. Give a critical estimate of Education in ancient India. How has it been affected by the changed condition of modern times. [C U. B. T. 64]
3. Is it correct to describe the Buddhist system of Education as but a phase of the Brahmanic system? Give reasons? [C. U. B. T. 70]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাকাব্যে শিক্ষা

(Education in the Epics)

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এপিক বা মহাকব্যের যুগ বলে কোন যুগ-বিভাগ নেই। রামায়ণ ও মহাভারত এই দু'খানি মহাকাব্য থেকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে আমরা মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। এই দু'খানি মহাকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম কিন্তু এই মহাকাব্যদ্বয়ের তথ্যের সময়-সীমা অত্যন্ত ব্যাপক। মহাকাব্য দু'খানি একদিনে লিখিত হয় নি। এর সময় নিয়ে বহু মতভেদ আছে। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে এর শুরু হলেও সমাপ্তিকাল গুপ্ত যুগ বলে অনেকে নির্দেশ করেন। আমরা তাই যুগ-বিভাগ না করে রামায়ণ ও মহাভারতে শিক্ষা সম্পর্কীয় যে তথ্য পাওয়া যায় তাই নিয়েই আলোচনা করব। মহাকাব্যে যে শিক্ষা-তথ্য ছড়ান রয়েছে তাকে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা বললে ভুল হবে না, কারণ দু'টি মহাকাব্যের রচনাকাল এই দু'যুগেই বিস্তৃত। ব্রাহ্মণ্য যুগের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যসমূহই মহাকাব্যের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিস্ফুট।

প্রাচীন শিক্ষায় মহাকাব্যের যুগ' নির্দেশের অসুবিধা

মহাভারত ও রামায়ণে রাজনৈতিক ও সামাজিক তথ্য যে পরিমাণে আছে সে তুলনায় শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য অতি সামান্যই আছে। দু'খানি মহাকাব্যই ঘটনাবহুল—কর্মের ক্ষেত্রেই এর বিস্তৃতি, জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়। দেশের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল আর্য-ঋষিদের তপোবনসমূহ। রাজা রাজচক্রবর্তীদের জীবনের কাহিনী বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক-ভাবে যেখানে তপোবনের কথা বা তপোবনের শিক্ষার কথা এসেছে সেখানেই শিক্ষার কথা আলোচিত হয়েছে। মহাকাব্যে কর্মকাণ্ডই প্রধান, জ্ঞানকাণ্ড গৌণ। মহাকাব্য থেকে আশ্রম ও আশ্রমিকদের জীবন, শিক্ষার্থীদের জীবন, কিছু আদর্শ শিক্ষার্থীদের কাহিনী, প্রাচীন যুগের তপোবনস্থ কয়েকটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রের কথা ও রাজপুত্র ও ক্ষত্রিয়দের শিক্ষার কথা জানতে পারি।

ঘটনা-প্রধান মহাকাব্যে শিক্ষা-তথ্যের অভাব

চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্যাশ্রম, এটাকে বলা হয়েছে জীবনের প্রস্তুতি কাল। এই প্রস্তুতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে। সবার জন্য এই প্রস্তুতি একই রকম ছিল না। জীবনের লক্ষ্য ভেদে ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষাও ভিন্নরূপ হ'ত। যেমন ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি যেভাবে হবে ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি সেরূপ হবে না। যে যেরূপ বৃত্তি গ্রহণ করবে শিক্ষা সেরূপই হবে। মহাকাব্যে বিভিন্ন বর্ণের জন্য যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে একদিক থেকে বিচার করলে তাকে বৃত্তি শিক্ষাই বলা সঙ্গত। মহাভারতে বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করবে ও সংযম পালন করবে। ব্রাহ্মণের জীবনের প্রধান কর্তব্য অধ্যয়নে রত থাকা। ব্রাহ্মণ জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, তাই সেভাবেই তাকে প্রস্তুত হতে হবে। ক্ষত্রিয় শুধু দান করবে, গ্রহণ করবে না, যজ্ঞ করবে কিন্তু পৌরহিত্য করবে না। বেদ পাঠ

ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বর্ণভেদে শিক্ষা

করবে কিন্তু শিক্ষা দেবে না। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্তব্য। তার প্রস্তুতিও সেইভাবেই হবে। বৈশ্য বেদ পাঠ করবে, যজ্ঞ করবে, দান করবে ও সৎপথে থেকে ধন উপার্জন করবে। তিনটি বর্ণের (যাঁরা দ্বিজ) শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। তবে জ্ঞান বা বিদ্যাচর্চা সবার জন্য এক ছিল না। ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল রাজনীতি, বৈশ্যের জন্য ব্যবসা।

মহাভারতে বলা হয়েছে, পিতামাতার থেকে আমরা দেহটি পেয়েছি, গুরুর কাছ থেকে যা পেয়েছি তা পবিত্র, ধ্বংসহীন, অমর। প্রতিদিন গুরুকে প্রণাম করে পবিত্র মনে শিক্ষার্থী পাঠে রত হবে। গুরুর গৃহে নানাবিধ কাজে কখনও বিরক্ত বা রাগ হবে না। জীবিকার জন্য শিক্ষার্থী গুরুর উপর নির্ভরশীল না হয়ে ভিক্ষা করে জ্ঞান অর্জন করবে, এটা তার প্রথম কর্তব্য, দ্বিতীয় কর্তব্য, শিক্ষার্থী সর্ব প্রযত্নে গুরুর ইচ্ছা পূরণ করবে। এজন্য যদি জীবন বিপন্ন হয় তাহলেও পশ্চাৎপদ হবে না। তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে, গুরু যে শিক্ষা দিলেন তার গুরুত্ব উপলব্ধি, গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে শিক্ষার্থী যে উপকৃত হ'ল সেই বোধ। চতুর্থ, দক্ষিণা না দিয়ে গুরুগৃহ পরিত্যাগ না করা।

শিক্ষার্থীর চারিটি কর্তব্য

শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম ছিল। যে দীক্ষা গ্রহণ করে নি, যার মন অপবিত্র, যে ধর্মীয় নিয়ম পালন করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নি তাকে বেদ শিক্ষা দেওয়া হ'ত না। যার চরিত্র সম্পর্কে জানা নেই তাকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত না। একটি নির্দেশ থেকে জানা যায় চারি বর্ণের লোকেরই বৈদিক আলোচনা ও বেদ আবৃত্তি শোনবার অধিকার ছিল। একটি শিক্ষানীতি থেকে জানা যায় শিক্ষার্থীর ক্ষমতা অনুযায়ীই তাকে শিক্ষা দেওয়া হবে (*"One's knowledge is always proportionate to his understanding and diligence in study"*)।

শিক্ষার যোগ্যতা অর্জন

শিক্ষার্থীর নানাবিধ করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে মহাকাব্য থেকে জানা যায় :—

গুরুগৃহে বাসকালে গুরু শয্যা ত্যাগ করবার পূর্বে শিষ্য শয্যা ত্যাগ করবে ও গুরু শয়ন করবার পর শয়ন করবে। গুরুগৃহে সাধারণ কাজসমূহ করবে, সব কাজ শেষ করে গুরুর কাছে পাঠ গ্রহণ করবে। গুরু আসন গ্রহণ করবার পূর্বে আসন গ্রহণ করবে না। গুরুর আহারের পূর্বে আহার করবে না। গুরুগৃহে কখনও কু-বাক্য বলবে না। জীবনের এক-চতুর্থাংশ কঠোর সংযমের মধ্যে গুরুগৃহে বাস করে বেদ পাঠ সমাপ্ত করে গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করবার জন্য সংসারে ফিরে আসবে।

শিক্ষার্থীর নানাবিধ কর্তব্য

মহাভারতে বহু আশ্রমের উল্লেখ আছে। সেখানে প্রখ্যাত আচার্যদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা আসত। তপোবনস্থ এই সব শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহে শিক্ষার বিভাগ ছিল। যেমন—(১) অগ্নিস্থান এখানে অগ্নির পূজা ও উপাসনা হ'ত ; (২) ব্রহ্মাস্থান—বেদ বিভাগ ; (৩) বিষ্ণুস্থান—এখানে রাজনীতি, অর্থনীতি বা বার্তাশিক্ষা দেওয়া হ'ত ; (৪) মহেন্দ্রস্থান—সামরিক বিভাগ ; (৫) সোমস্থান—উদ্ভিদ বিভাগ ; (৬) গরুড়স্থান—

আশ্রম

পরিবহন বিষয়ক ব্যবস্থাপনা বিভাগ ; (৭) কার্তিকেয়স্থান—সৈন্য পরিচালনা, ব্যূহ গঠন সংক্রান্ত বিভাগ ; (৮) জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগ।

প্রাচীন খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের মধ্যে নৈমিষারণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে কুলপতি ছিলেন শৌনক। দশ হাজার শিষ্যের গুরুকে কুলপতি আখ্যা দেওয়া হ'ত। মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রমে বহু দূর দেশ থেকে শিক্ষার্থীদের সমাবেশ হ'ত। এখানে বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ব্যাসদেবের আশ্রম আর একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। ব্যাসদেব তাঁর শিষ্যদের বেদ শিক্ষা দিতেন। সরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বনে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের আশ্রমেও বহু শিষ্যের সমাবেশ হ'ত। কুরুক্ষেত্রের নিকটে একটি আশ্রমে দুই তপস্বিনী ছিলেন যাঁরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মহাকাব্যে উল্লিখিত আশ্রমের মধ্যে প্রয়াগের ভরদ্বাজ আশ্রমকে সর্ববৃহৎ আশ্রম বলা হয়।

মহাকাব্যের কয়েকটি আশ্রম

মহাকাব্যে প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তাই মহাকাব্য থেকে ক্ষত্রিয়দের শিক্ষা সম্পর্কেই জানতে পারি। তিনটি দ্বিজ বর্ণকেই জীবনের শুরুতেই গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যার্জন করতে হ'ত। পাঠক্রম কিন্তু অভিন্ন হ'ত না। বর্ণ ভেদে বৃত্তি ভেদ হ'ত ; পাঠক্রম তাই ভিন্নরূপ হ'ত। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিল না একথা বলা যায় না। ক্ষত্রিয় সন্তানকে বেদ পাঠ করতে হ'ত। কিন্তু সবাইকে সমানভাবে বেদ অভ্যাস করতে হ'ত না। যে ক্ষত্রিয়-সন্তান রাজা হবে তাকেই বেদ মুখস্থ করতে হ'ত। পাণ্ডবরা সমগ্র বেদ পাঠ করেছিল বলে জানা যায়। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের শিক্ষার ভার স্বয়ং ভীষ্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁদের সর্ববিধ শাস্ত্রে পারদর্শী করেছিলেন। কুরু ও পাণ্ডবদের শিক্ষার ভার ভীষ্ম দ্রোণের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি সর্ব বেদে পারদর্শী হলেও তার শিষ্যদের প্রধানতঃ ধনুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

মহাকাব্যের ক্ষত্রিয় কুমারদের শিক্ষা

রামায়ণ থেকে জানা যায় রাজকুমারদের বেদ, ধেনুর্বেদ, নীতিসার, রথ চালনা, হস্তী চালনা প্রভৃতি শিখতে হ'ত। এ ছাড়া লেখা, চিত্রবিদ্যা, সন্তরণ, লম্ফন, গন্ধর্ববিদ্যা (নৃত্য, গীত ইত্যাদি) প্রভৃতি বিষয়ও জানতে হ'ত।

মহাভারতের একটি তালিকা থেকে জানা যায় ক্ষত্রিয় রাজকুমারদের শব্দশাস্ত্র, চৌষট্টিকলা ও যুক্তিশাস্ত্র শিখতে হ'ত। ক্ষত্রিয়দের প্রধানতঃ ধনুর্বেদে পারদর্শী হতে হ'ত। ধনুর্বেদ বলতে সমগ্র সামরিক বিষয়ই বুঝান হ'ত—শর চালনা, রথ চালনা, অসি চালনা, গদাযুদ্ধ, ব্যূহ রচনা, সৈন্য পরিচালনা সব কিছু এর মধ্যে ছিল।

॥ নারী-শিক্ষা ॥

রামায়ণে নারী তপস্বিনীর উল্লেখ আছে। এদের ভিক্ষুণী বলা হ'ত। শবরীর নাম রামায়ণে বিখ্যাত। পম্পা নদীর তীরে তাঁর আশ্রম ছিল। তিনি গুরু মাতঙ্গের শিষ্যা। শবরী নামে তাঁকে শবর জাতীয়া বলে মনে হলেও এটা তাঁর নাম, তিনি শবর ছিলেন না। মহাভারতেও ব্রহ্মচারিণীদের উল্লেখ আছে। শাণ্ডিল্য ঋষির কন্যা

ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। গার্গী ব্রহ্মবাদিনী বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারের কথা জানা যায়। ভিক্ষুণী শুলভার সহিত রাজর্ষি জনককে বিচারে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।

মহাকাব্যে বিক্ষিপ্তভাবে শিক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য রয়েছে, তা প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় বিশেষ করে ক্ষত্রিয় কুমারদের শিক্ষা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় তা ব্রাহ্মণ্য যুগের শিক্ষা বৈশিষ্ট্যরূপেই প্রতিভাত হয়। চতুরাশ্রম, উপনয়ন সংস্কার, গুরুবরণ, আচার্য-শিষ্য সম্পর্ক, আশ্রমের শিক্ষা, বর্ণভেদে পাঠক্রম ভেদ, গুরু দক্ষিণাপ্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। মহাকাব্যদ্বয় বৈদিক যুগ শুরু হয়ে পৌরাণিক যুগে যদি সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মহাকাব্য থেকে আমরা যে শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্য পাই তা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপোষক হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা

বৈদিক ধর্মের জটিলতার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারূপে একদিন ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই বৈদিক ধর্মে যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নানাবিধ দুর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থায় নিম্ন বর্ণের লোকের প্রতি উচ্চ বর্ণের ঘৃণার ভাব সমাজ জীবনে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি করে। সহজ, সরল মানুষের পক্ষে বোধগম্য ও সর্বসাধারণের যেখানে সমান অধিকার থাকবে এমন একটা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সমাজে দেখা দেয়।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদ বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব

আর্য ধর্মের জ্ঞান কাণ্ডকে কেন্দ্র করে নতুন চিন্তার ফলেই বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধদেবকে ক্রিয়াকাণ্ড বহুল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী বলা যায়। বুদ্ধদেব হিন্দু ধর্মের প্রচলিত প্রথাসমূহের বিরোধিতা করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি বেদ বিরোধী ছিলেন বলা যায় না। তিনি সকলের পক্ষে বোধগম্য প্রাকৃত জনের ভাষায় নতুন ধর্মে যে মহাবাণী প্রচার করেছিলেন, তা তিনি উপনিষদ থেকেই লাভ করেছিলেন। ম্যাক্সমুলার বলেছেন—ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাদ দিলে বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। বুদ্ধদেব যাগযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন, বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত একথা তিনি মানতেন না। কিন্তু তিনি এমন কোনও তত্ত্বের সন্ধান দেন নি যা উপনিষদের মধ্যে পাই নি। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে তিনি সকলকে মুক্তির পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জীবন দুঃখময়—শাক্য রাজকুমারের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—এই দুঃখ কি? এই দুঃখের কারণ কি? এই রহস্যকে তিনি চারটি আর্য সত্যরূপে প্রকাশ করেছেন (১) এ সংসার দুঃখময় (২) দুঃখের কারণ আছে (৩) এই দুঃখের নিরোধ ঘটান সম্ভব; (৪) এই দুঃখ নিরোধের উপায় বা পথ আছে। বুদ্ধদেব বলেছেন, মানুষের অজ্ঞতাই তার দুঃখের কারণ। অজ্ঞতা দূর হলেই সে নিজের স্বরূপ জানতে পারবে ও দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবে। দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ আটটি পথের কথা বলেছেন—(১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক্য, (৪) সম্যক কর্ম, (৫) সম্যক জীবিকা, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক দান, (৮) সম্যক সমাধি বা ধ্যান, একে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। বুদ্ধ প্রদর্শিত সৎ পথে চললে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্মমত

বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের সাথে সাথে ভারতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পৃথক এক নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। নবদীক্ষিত বৌদ্ধদের ধর্মের রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি শিক্ষা দেবার জন্যই বৌদ্ধরা একটা নতুন ও নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনবোধ করেছিলেন। সেই প্রয়োজন মেটাতেই বৌদ্ধ শিক্ষ-ব্যবস্থার শুরু।

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

প্রবজ্যাঃ হিন্দু শিক্ষা যেমন উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হ'ত তেমনি বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনের আরম্ভ একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হ'ত। বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করবার প্রথম অনুষ্ঠানকে বলা হয় প্রবজ্যা (পবজ্যা)। বৌদ্ধধর্মে জাত বিচার না থাকায় যে কোন বর্ণের লোকই প্রবজ্যা গ্রহণ করতে পারত। তবে প্রবজ্যা গ্রহণকারীর বয়স আট বছরের কম হলে চলত না ও পিতামাতার অনুমতি বিনা ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশ করা যেত না। এ ছাড়া রাজকর্মচারী, ক্রীতদাস, চোর-ডাকাত, হত্যাকারী, ঋণী, বিকলাঙ্গ, নপুংসক, কুষ্ঠ, চর্ম, ক্ষয় ও মৃগীরোগীর সঙ্ঘে যোগ দেবার অধিকার ছিল না।

শ্রমণঃ বিনয়পিটক থেকে জানা যায় প্রবেশার্থীকে প্রথম সঙ্ঘে প্রবেশ করবার পর দশ থেকে ত্রিশ দিন উপাসক থাকতে হয়। এই সময় তাকে পঞ্চশীল সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হ'ত। তারপর কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করে হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করতে হ'ত। তখন তাকে দশজন ভিক্ষু নিয়ে গঠিত একটি পরিষদের সামনে উপস্থিত করা হ'ত। তাঁরা প্রবজ্যা দান করলে সে গুরুকে প্রণাম করে জোড়হাতে বলত, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"—একে বলা হয় ত্রিশরণ। প্রবজ্যা লাভের পর থেকেই তার শিক্ষা শুরু হ'ত। প্রথম প্রবেশকারী তরুণ ভিক্ষুকে বলা হ'ত শ্রমণ, শ্রমণকে গুরুর অধীনে থাকতে হ'ত। প্রবজ্যার কাল ছিল বার বছর ব্যাপী। এরপর উপসম্পদা—কুড়ি বছর বয়স হবার পর যদি উপযুক্ত বিবেচিত হ'ত তাহলে শ্রমণকে উপসম্পদা দেওয়া হ'ত। উপসম্পদা হতে হলে দশজনের এক ভিক্ষু সঙ্ঘের অনুমোদনের প্রয়োজন হ'ত। ভিক্ষুদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেই তাকে উপসম্পদা দেওয়া হ'ত। দশ বৎসর উপসম্পদা জীবন অতিবাহিত করে সে উপাধ্যায় হতে পারত।

ভিক্ষুর আচরণীয় ধর্ম

মঠবাসী ভিক্ষুকে দশটি শীল পালন করতে হ'ত ঃ—(১) অদত্ত গ্রহণ করবে না। (২) প্রাণহরণ করবে না। (৩) মিথ্যা কথা বলবে না। (৪) মত্ততা আনতে পারে এমন পানীয় গ্রহণ করবে না। (৫) ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করবে না। (৬) নৃত্য-গীত করবে না। (৭) মালা-চন্দন, সুগন্ধ ব্যবহার করবে না। (৮) কোমল বিলাস শয্যা বা উচ্চ শয্যায় শয়ন করবে না। (৯) সোনা-রূপা দান গ্রহণ করবে না। (১০) বিকালে আহার করবে না।

প্রথম পাঁচটি শীল বৌদ্ধমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় ধর্ম ছিল, তাই ভিক্ষু-মাত্রেই ভিক্ষা করত। তবে গৃহীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ বা গৃহীর প্রেরিত অন্ন গ্রহণে বাধা ছিল না। বৌদ্ধ বিহারে সাধারণ কায়িক পরিশ্রমের কাজ শ্রমণেরা করত। প্রধান উপাধ্যায়েরা ধ্যান, সাধন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি নিয়ে থাকতেন। ভিক্ষুরা বছরের প্রধান অংশ ধর্মপ্রচারের জন্য দেশ ভ্রমণ করত। বর্ষায় এসে বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করত—এ সময়কে বর্ষাকাল বলা হ'ত।

মঠবাসী ভিক্ষুকে মঠের নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হ'ত। গুরুজনদের সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। কোন ভিক্ষু অপরাধ করলে দশজন প্রধান ভিক্ষু

মিলে অপরাধীর শাস্তি বিধান করত। প্রতিমাসে দু'বার ভিক্ষু সভায় বৌদ্ধ সঙ্ঘের অনুশাসন ও অনুশাসন ভঙ্গে শাস্তি সম্পর্কীয় প্রতিমোক্ষ গ্রন্থপাঠ হ'ত। সেই অনুশাসন ভঙ্গ করলে সভায় সে কথা স্বীকার করত। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হ'ত। ভিক্ষু জীবনের প্রধান বা চরম শাস্তি ছিল ভিক্ষুত্ব চ্যুতি।

মঠবাসী ভিক্ষুক

বিনয়পিটক থেকে জানা যায় শ্রমণকে একজন উপাধ্যায় বেছে নিতে হ'ত ; উত্তরীয় দ্বারা এক স্কন্ধ আবৃত করে শ্রমণ সেই উপাধ্যায়কে যুক্ত করে তিনবার বলত, "প্রভু আপনি আমার উপাধ্যায় হোন।" গুরু সম্মতি প্রকাশ করলেই উভয়ের মধ্যে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হ'ত। ভিক্ষুব্রত পালনকারী শিক্ষা-ব্রতীকে বলা হ'ত সদ্ধিবিহারিক'। বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল আবাসিক বিদ্যালয়। বৌদ্ধ শিক্ষায় বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলি নবীন দীক্ষিতদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করত। বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বাণের সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলি তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্থান গ্রহণ করবে।

উপাধ্যায় ও বৌদ্ধ সঙ্ঘ

মহাবগ্‌গে শ্রমণের করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মত এখানেও গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত মধুর। শ্রমণ নানাভাবে গুরুর সেবা করত। ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রমণ শয্যাত্যাগ করে নিজের প্রাতঃকৃত সমাধা করে গুরুর মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করে দিত, তারপর আসন করে আহার্য এনে দিত। খাওয়া হয়ে গেলে সেই পাত্র ও আহারের স্থান পরিষ্কার করে রাখত। ভিক্ষায় বেরুবার জন্য বেশ পরিধানে সাহায্য করত, ভিক্ষাপাত্র এনে দিত। আচার্য যদি বলতেন তাহলে শ্রমণকে ভিক্ষায় যেতে হ'ত ও শ্রমণ দূর থেকে আচার্যকে অনুসরণ করত। ভিক্ষা থেকে ফিরে এলে স্নানের ব্যবস্থা আহার্য এনে দেওয়া, বিশ্রামের ব্যবস্থা করা সব কিছুই ভিক্ষুকে করতে হ'ত। গুরুর অনুমতি ব্যতীত কোন উপহার গ্রহণ করতে পারত না, কখন কারও সেবা করতে পারত না, বা বাহিরে যেতে পারত না। গুরু অসুস্থ হলে শিষ্যকে সর্বপ্রকার সেবা করতে হ'ত।

শ্রমণের কর্তব্য

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুর নির্দেশ মেনে চলাই শিক্ষার্থীর একমাত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হ'ত। গুরুর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার শিষ্যের ছিল না। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্রমণকে গুরুর স্বভাব, চরিত্র ও আচরণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হ'ত ও উপাধ্যায়ের জীবনে যদি কোন বিভ্রান্তি দেখা দিত বা কোন ধর্মীয় সংকট উপস্থিত হ'ত তাহলে শিষ্যকে তার প্রতি-বিধানের ব্যবস্থা করতে হ'ত। গুরুর মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনতে শ্রমণ সর্বতোভাবে চেষ্টা করত। গুরু রুষ্ট হলে বা অপ্রসন্ন হলে মিষ্টবাক্যে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে হ'ত। গুরু যদি সঙ্ঘের আদর্শ বিরোধী কোন কাজ করতেন তাহলে গুরুর সেই পতনের কথা সঙ্ঘের গোচরে এনে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতে হ'ত। সঙ্ঘ থেকে কোন কঠোর বিধান গুরুর উপর

গুরুর কর্তব্য পালনে

শ্রমণের বিশেষ দায়িত্ব

আরোপ হলে তার কঠোরতা লাঘবের জন্য সঙ্ঘের নিকট আবেদন ছাত্রকেই করতে হ'ত। প্রায়শ্চিত্ত শেষে গুরুকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার ভার শ্রমণকেই নিতে হ'ত।

নবীন শিষ্যের প্রতি গুরুরও কতকগুলি কর্তব্য ছিল। মহাবগ্‌গে বলা হয়েছে—শিষ্যের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গড়ে তুলবার দায়িত্ব উপাধ্যায়ের। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য গুরু কঠোরভাবে শ্রমণের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন। আচার্য শ্রমণকে উপদেশ দেবেন, প্রশ্ন করবেন ও কর্তব্য নির্দেশ করবেন। শিষ্য ভিক্ষুর পালনীয় অনুশাসনসমূহ মেনে চলছে কি না সে সম্পর্কে দৃষ্টি রাখতেন। শ্রমণের ভিক্ষাপাত্র, পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে দেওয়া ছিল গুরুর কর্তব্য। শিষ্য অসুস্থ হলে গুরুকে তার পরিচর্যা ও শুশ্রূষা করতে হ'ত। গুরু যদি মনে করতেন শিষ্য সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বা ধর্মসম্পর্কে বিশ্বাসী নয় সঙ্ঘের নিয়ম কানুন মেনে চলছে না তাহলে শিষ্যকে সঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত করতে পারতেন।

গুরুর কর্তব্য

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া। বুদ্ধদেব কুটতত্ত্বের আলোচনা থেকে তাঁর ধর্মকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। প্রথম যুগের পাঠ্যসূচী সে ভাবেই রচিত হয়েছিল। শ্রমণের পাঠ্যসূচী খুব ব্যাপক বা দীর্ঘ ছিল না। প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধ পাঠক্রমে লৌকিক বিদ্যার কোন স্থান ছিল না, মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ের পাঠ্যসূচী বিভিন্ন ছিল—আইসিং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় শ্রমণরা রাত্রির প্রথম ও শেষ যামে আচার্যের কাছে যেত। তিনি ত্রিপিটক থেকে সময়োপযোগী কোন অধ্যায় পাঠ দিতেন এবং তা বুঝিয়ে দিতেন। কোন বিষয়ই ছাত্রের নিকট অস্পষ্ট রাখতেন না। 'বিনয়পিটক' পাঠে পারদর্শী হ'বার পাঁচ বৎসর পরে ছাত্র গুরুর কাছ থেকে আলাদা হতে পারত, কিন্তু সে যেখানেই থাক না কেন 'বিনয়' আয়ত্ত করবার পর আরও দশ বছর কোন গুরুর কাছে তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত। শিক্ষা মৌখিক ভাষায় দেওয়া হ'ত। প্রথম যুগে সংস্কৃত, জ্যোতিষ, যাদু, লোকায়ত দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা শ্রমণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এই পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন হয়। নালন্দা ও বিক্রমশীলার পাঠ্যসূচী নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠক্রম পরবর্তী যুগে ব্যাপকতর হয়েছে। হিন্দু ও জৈনধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ এই বিদ্যালয় দুটিতে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। লৌকিক বিদ্যাচর্চাও এখানে হ'ত। লৌকিক বিদ্যার মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের মর্যাদা বৌদ্ধ শিক্ষায় প্রায় আদি যুগ থেকেই স্বীকৃত। ভেষজ, রসায়ন, স্থাপত্য প্রভৃতি বিদ্যার চর্চাও ক্রমে বৌদ্ধ শিক্ষায় স্থান পেয়েছিল।

বৌদ্ধ পাঠ্যসূচী

শিক্ষা পদ্ধতি—বিহারগুলিতে শিক্ষাদান-পদ্ধতি ছিল প্রধানতঃ মৌখিক। বৌদ্ধযুগে লিপির প্রচলন ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় লিপির ব্যবহার কম ছিল। ফাহিয়েন বলেছেন—পাঞ্জাবে মৌখিক ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ভারতের পূর্ব অঞ্চলগুলিতে লিপির ব্যবস্থা ছিল। মুখস্থ

করা ও আবৃত্তি করা এই দুটি ছিল শিক্ষার প্রধান উপায়। বুদ্ধদেব আলোচনা, উপদেশপূর্ণ গল্প, উপকথার সাহায্যে শিক্ষা দিতেন। বিহারগুলিতেও সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ধর্মের বাণী প্রচার করেন নি, বুদ্ধের বাণী বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষা ও প্রচার হতে থাকে। বুদ্ধদেব কুটতর্ককে পরিহার করতে চাইলেও বৌদ্ধধর্মের নীতিগুলিকে দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপনের উদ্দেশ্যে ও প্রতিপক্ষের কুটযুক্তিকে খণ্ডন করবার জন্য বৌদ্ধভিক্ষুকদেরও জ্ঞান মার্গিক শিক্ষায় পারদর্শী হতে হ'ত। তাই বৌদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিতর্ক ও আলোচনার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল।

সঙ্ঘ জীবনে বৈচিত্র্য

সঙ্ঘের জীবনযাত্রা কঠোর ছিল কিন্তু একেবারে নীরস ছিল না। সংঘে বল ছোঁড়া, তীর চালানো, হাতি ঘোড়ায় চড়া, রথ চালানো, কুস্তি, তরবারি চালানো প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিযোগিতা হ'ত, এছাড়া ভেঁপু বাজান, পাশা খেলা, অঙ্গভঙ্গী নকল করা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও বৌদ্ধ সঙ্ঘে ছিল। মেয়েদের সাথে নাচবার ও গাইবার প্রথাও অনুমোদিত ছিল বলে জানা যায়।

বৌদ্ধ সঙ্ঘে নারীর স্থান ঃ বুদ্ধদেব নারীদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না, মহা প্রজাপতি গৌতমী ও প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধেই তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘে নারীদের গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সঙ্ঘে ভিক্ষুণীদের গ্রহণ করা হলেও তাদের ভিক্ষুদের প্রাধান্য মেনে চলতে হ'ত। তাদের সম্পর্কে বাধা-নিষেধও কঠোরতর ছিল। ভিক্ষুণীদের শিক্ষার জন্য একজন ভিক্ষুকে মনোনীত করা হ'ত। তিনি অন্য এক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভিক্ষুণীদের শিক্ষা দিতেন। দীর্ঘ দু'বছর কাল পরীক্ষাধীন থাকার পর ভিক্ষুণীকে দীক্ষা দেওয়া হ'ত। ভিক্ষু সঙ্ঘের সাধারণ অনুশাসন ছাড়াও এদের আরও বারটি বিশেষ নিয়ম পালন করতে হ'ত। পুরুষদের সাথে এক ঘরে থাকা, পুরুষ স্পর্শ করা, একা বেড়ানো, নদী পার হওয়া, বিয়েতে ঘটকের কাজ করা, গুরুতর পাপ গোপন করা ভিক্ষুণীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তাদের জন্য ভিক্ষুণী প্রতিমোক্ষ রচিত হয়েছিল, বুদ্ধের অন্যতমা প্রধানা শিষ্যা থেরী ধর্মদিনা ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে ধর্মশিক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই ভিক্ষুণী সঙ্ঘের বিলুপ্তি ঘটে। বৌদ্ধ শিক্ষায় লৌকিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ না হলেও ভিক্ষুরা সূতা কাটা, কাপড় বোনা, দর্জির কাজ প্রভৃতি শিখত। জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার মত কতকগুলি বৃত্তি শিক্ষাকে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, এছাড়া বহু গৃহীও সঙ্ঘে শিক্ষার জন্য আসত—এদের জন্যও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

প্রথম অবস্থায় সঙ্ঘগুলিতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করায় সাধারণ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের নীতি শিক্ষা দেবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পরিচালিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। খৃষ্টীয়

প্রথম শতাব্দী থেকেই দেখা যায় জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রসারের জন্য বৌদ্ধ বিহারগুলিতেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রবেশের অধিকার লাভ করেছিল। এসব গৃহী শিক্ষার্থীদের ব্যয়ভার সঙ্ঘ হতে করা হ'ত না। এখানে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগ দেবার পরও কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর গৃহীর জীবনে ফিরে যাবার কোন বাধা ছিল না।

বৌদ্ধ বিহারের শিক্ষায় জনসাধারণের অধিকার

বৌদ্ধ শিক্ষা প্রথম অবস্থায় ব্যক্তিমুখীন ছিল। আচার্য ব্যক্তিগতভাবে শিষ্যের শিক্ষাবিধান করতেন। পরে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে বৌদ্ধ শ্রমণের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সেখানে শ্রেণী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যে সব বিহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রূপ পেয়েছিল, যেমন—নালন্দা, বল্লভী, বিক্রমশীলা, প্রভৃতি স্থানেই শ্রেণী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তবু প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই একজন আচার্য্যের অধীনে থাকতে হ'ত, তাই বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যক্তিমুখীনতা কোনদিন লোপ পায় নি।

ব্যক্তিগত শিক্ষা

॥ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার তুলনা ॥

প্রায় দেড় হাজার বছর বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে ভারতের বুকে সগৌরবে বিরাজ করেছে। বৌদ্ধধর্ম যেমন বেদ বিরোধী হয়েও প্রধানতঃ বেদাশ্রয়ী এবং দুটি ধর্মের পার্থক্য থেকে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার সৃষ্টি হলেও এদের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দু'টি শিক্ষা-ব্যবস্থাই ধর্মাশ্রয়ী। ধর্মকে কেন্দ্র করে ধর্মের নীতি, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঠিক পালনের জন্য ও ধর্মের তত্ত্বকে সম্যকভাবে আয়ত্ত করবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। উভয় ধর্মেই শিক্ষার লক্ষ্য সংসার বন্ধন ও দুঃখ থেকে মুক্তি। দু'টি শিক্ষা-ব্যবস্থায় লৌকিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে নি, কিন্তু তাকে গৌণস্থান দেওয়া হয়েছে। গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিল মধুর ও পবিত্র। ভিক্ষু ও ব্রহ্মচারী উভয়েই গুরুসেবাকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য মনে করত। উভয়েই জীবনে কঠোর সংযম অভ্যাস করত ও ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করত। উভয় শিক্ষাই ছিল আবাসিক।

ধর্মাশ্রয়ী শিক্ষা

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য ছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা বেদনির্ভর, বৌদ্ধ শিক্ষা বেদ বিরোধী। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত একথা মেনে নেয় নি। হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি উচ্চবর্ণের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল—শূদ্ররা ছিল হিন্দু শিক্ষা পরিকল্পনার বাইরে। বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ ছিল না। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে শূদ্রও শিক্ষার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল। সেইদিক থেকে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরই শিক্ষাদানের অধিকার ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় যোগ্যতা অনুসারে যে কেহ আচার্য বা উপাধ্যায় পদের অধিকারী হতে পারত। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় আচার্যের গৃহে গিয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করত। আচার্য সংসারে থেকে পুত্র-কন্যা পরিবৃত হয়েই শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধ

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পার্থক্য

তপোবন বনাম সঙ্ঘ

ভিক্ষুরা সংসারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সঙ্ঘে এসে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। আচার্যেরাও ছিলেন সঙ্ঘবাসী সন্ন্যাসী। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থায় চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রম সন্ন্যাস আর বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার শুরুই হ'ত সন্ন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাই দু'টি শিক্ষা-ব্যবস্থা আবাসিক হলেও বৈদিক গুরুকুলের শিক্ষা অনেকটা পারিবারিক শিক্ষার মত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ছিল প্রতিষ্ঠানগত, তাই বৌদ্ধ সঙ্ঘের মধ্যে নালন্দার মত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গ্রন্থাদি সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় সংস্কৃতে জ্ঞান ছিল অপরিহার্য। বুদ্ধদেব সাধারণের বোধগম্য ভাষায় (পালি) ধর্মপ্রচার করায় প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কৃতের স্থান ছিল না। পরবর্তী-কালে বৌদ্ধ পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃত স্থান পায়।

একটি গৌরবময় অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম ভারতের বুক থেকে লোপ পেয়ে গেলেও বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। নালন্দার মত সুগঠিত ও সুপরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয় যে কোন যুগ যে কোন জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যায়সমূহের জন্য ভারতের শিক্ষার খ্যাতি ভারতের সীমা ছাড়িয়ে বহু দূর দূরান্তে প্রসারিত হয়। বৌদ্ধযুগের প্রথম অবস্থায় মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় আঞ্চলিক ভাষাসমূহ সমৃদ্ধ হয়, পরে যখন বৌদ্ধ শিক্ষায় সংস্কৃত গৃহীত হয় তখন মহাযান বৌদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। নাগার্জুন, দিঙ্‌নাগ, আর্যদেব, বসুবন্ধু প্রভৃতির রচনা ভারতের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্ণভেদকে অস্বীকার করে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা সমবর্ণের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ায় শুধু মৌলিক বৃত্তি শিক্ষা ছাড়াও সর্বসাধারণের নিকট বৃহত্তর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ভারতের জন-শিক্ষার ব্যবস্থা বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সে সব দেশ থেকে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থী আসবার ফলেই হয়েছিল।

প্রশ্নাবলী

1. Buddhism developed a system to education in India which was a rival of the Brahmanic system though in many ways similar to it, Discuss.
2. Discuss the main features of the Buddhistic system of education as distinguished from the Brahmanic system.
3. Bring out the salient features of the Brahmanic system of Education in ancient India which of these features appeal to you most and why ?

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছল মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত। গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাত্র শিক্ষালাভ করত। তপোবনের ছাত্রসংখ্যা ছিল পরিমিত। বৈদিক যুগে ও তৎপরবর্তী ব্রাহ্মণ্যযুগে নালন্দা বা বিক্রমশীলার মত সংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় (Organised University) ছিল। নৈমিষারণ্য, ভরদ্বাজ আশ্রম, কণ্বমুণির আশ্রম, বদরিকাশ্রম, প্রভৃতি স্থানে বহু জ্ঞানতপস্বী সমবেত হওয়ায় এসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পেয়েছিল।

শিক্ষাকেন্দ্র : প্রাচীন ভারতের প্রধান প্রধান নগরীতে যেখানে রাজা ও বিত্তবানেরা গুণীজনের সমাদর করতেন ও আর্থিক সাহায্য করতেন, যে সব স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীদের সমাবেশ হ'ত। তার ফলে তক্ষশীলা, কনৌজ, মিথিলা, তাঞ্জোর, পাটলীপুত্র প্রভৃতি স্থান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। তীর্থস্থানে বহু পুণ্যকামী পণ্ডিতের সমাবেশ হ'ত, এদের কাছে জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যার্থীরা তীর্থক্ষেত্রে এসে সমবেত হ'ত। এইভাবে বারাণসী, কাঞ্চি, নাসিক প্রভৃতি স্থান জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করে। বৌদ্ধ সঙ্ঘে ধর্মচর্চার সাথে জ্ঞানচর্চাও হ'ত। বৌদ্ধযুগে নালন্দা. বিক্রমশীলা, বল্লভী প্রভৃতি বৌদ্ধ-শিক্ষাকেন্দ্র জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এত দূর খ্যাতি অর্জন করেছিল যে ভারতের দূর দূরান্ত থেকে ও সুদূর জাভা, চীন, কোরিয়া থেকেও ছাত্ররা এখানে আচার্যদের কাছে শিক্ষার জন্য আসত।

॥ তক্ষশীলা ॥

প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের মধ্যে তক্ষশীলা হচ্ছে প্রাচীনতম। গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা প্রাচীন তক্ষশীলার গৌরবময় ইতিহাস জানবার মত উপাদান আমাদের খুবই কম আছে। বৌদ্ধ জাতক ও অন্যান্য গ্রন্থাদি থেকে আমরা প্রধানতঃ তক্ষশীলার ইতিহাস জানতে পারি। রামায়ণ মহাভারতেও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে তক্ষশীলার উল্লেখ আছে। গ্রীক বিবরণ থেকেও তক্ষশীলার খ্যাতির কথা জানা যায়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠলেও বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্ররূপে তক্ষশীলা খ্যাতিলাভ করে।

বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডির কুড়ি মাইল পশ্চিমে সরাইকালা স্টেশনে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রায় বার বর্গমাইল স্থান জুড়ে প্রাচীন তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

ব্যক্তিগত শিক্ষা

তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নালন্দা মহাবিহারের মত কোন স্তূপ বা বহু সখ্যক ছাত্রের স্থান সংকুলানের মত কোন অট্টালিকার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাই মনে হয় তক্ষশীলার কোন কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয় ছিল না। প্রখ্যাত অধ্যাপকমণ্ডলীর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষার জন্য আসত। শিক্ষকেরা এখানে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিতেন। কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের

দ্বারা এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হ'তনো। আচার্যেরা নিজেরাই ছিলেন এক একটি প্রতিষ্ঠান। কোন কোন আচার্যের অধীনে 'পাঁচশ' পর্যন্ত ছাত্র ছিল বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছাত্ররা নবাগতদের শিক্ষার দায়িত্ব অনেকখানি গ্রহণ করত। এই প্রথা থেকেই পরবর্তীকালে 'সর্দার পড়ো' প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়।

তক্ষশীলার ছাত্রদের মধ্যে বহু প্রতিভাবান ছাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণিক পাণিনি, অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য এবং বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন।

আবাসিক শিক্ষার রূপান্তর

প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, রাজগৃহ, কোশল, মিথিলা, বারাণসী প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য দলে দলে শিক্ষার্থীরা তক্ষশীলায় আসত। এখানে সাধারণতঃ ষোল বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা হ'ত না। তক্ষশীলার শিক্ষা-ব্যবস্থা আবাসিক হলেও সবাই গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত না। অনেক ছাত্র নিজেরাই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করত। ব্রহ্মচারী ছাড়া বিবাহিতেরাও এখানে শিক্ষা গ্রহণ করত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন সম্প্রদায়ের ছেলেরা এখানে শিক্ষা নিতে পারত। শিক্ষক ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমভাবে শিক্ষা দিতেন।

বেতন—অর্থ বা শ্রমমূল্য

তক্ষশীলার শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক ছিল না। বিত্তবান শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ব্যয়ের সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গুরুকে দিয়ে পড়াশুনা করত। এই টাকা ছাত্রের খাওয়া বেশ-বাস প্রভৃতির জন্য করা হ'ত। যাদের অর্থ ছিল না, তারাও ফিরে যেত না। শ্রমমূল্যে তারা শিক্ষালাভ করত। দিনের বেলায় গুরুর সংসারে যাবতীয় কাজকর্ম করে রাতে অবসর সময়ে গুরুর কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করত। সে যুগেও কোন কোন ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি নিয়ে পড়তে আসত। গ্রামের লোকেরা দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে অর্থ সাহায্য করত। তক্ষশীলার ছাত্রদের জীবনে অতি বিলাসিতা বা অমিতব্যয়িতার সুযোগ ছিল না। জাতক থেকে জানা যায় অপরাধ করলে সকলকেই শাস্তি পেতে হ'ত। শিক্ষা শেষে ছাত্ররা গুরুদক্ষিণা দিত।

অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা

তক্ষশীলার কৃতি ছাত্রদের নাম যেমন পাই তেমনি কৃতী অধ্যাপকদের নাম পাওয়া যায় না। অধ্যাপকদের গুরু, আচার্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হ'ত। এ ছাড়া চাণক্য শিষ্ট, দণ্ডকনীতি প্রভৃতি না পণ্ডিতদের জন্য ব্যবহার করেছেন। পাণিনি আচার্যা, উপ[illegible]ায়া প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করায় মনে হয় নারীরা শিক্ষকতা করতেন। সাধারণভাবে একজন অধ্যাপক কুড়িজন ছাত্র গ্রহণ করতেন। কোন কোন প্রখ্যাতা নামা গুরুর অধীনে ৫০০ ছাত্র ছিল বলে জানা যায়, তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটত।

লিপির ব্যবহার

তক্ষশীলার শিক্ষা-পদ্ধতিতে আবৃত্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত। গুরু কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করে দিতেন। লিপির ব্যবহার ছিল। মৌখিক-পদ্ধতির সাথে এখানে পুঁথিরও ব্যবহার ছিল। মুখস্থ করতে গিয়ে কোন অংশ বাদ পড়ে গেলে পুঁথি দেখে সে অংশ ঠিক করে নেওয়া হ'ত।

তক্ষশীলার পাঠ্যসূচী ছিল বিরাট ও ব্যাপক। জাতক থেকে জানা যায় এখানে তিন বেদ ও আঠারটি কলাবিদ্যা শেখান হ'ত। বেদ ছাড়া বেদাঙ্গ ও বিভিন্ন দর্শন পড়ান হ'ত। তক্ষশীলা ছিল বিশেষজ্ঞ হবার স্থান। রাজপুত্রেরা সমর বিদ্যা, রাজ্যশাসন কার্যে পারদর্শিতা লাভের জন্য এখানে আসত। এখানে সমর বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল। চিত্রাঙ্কণ, ভাস্কর্য, স্থাপত্য শিল্পও এখানে শেখান হ'ত। এখানে অভিনয় শেখারও ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া হস্তীসূত্র, পশু চিকিৎসা সঞ্জীবনী বিদ্যা, মায়াবিদ্যা প্রভৃতি শেখার সুযোগ এখানে ছিল।

পাঠক্রম

গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয়ে এখানে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত গান্ধার রীতির শিল্পকলার উদ্ভব হয়। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্যই তক্ষশীলা সমধিক খ্যাতি লাভ করেছিল। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভারতের সব অঞ্চল থেকে ছাত্র আসত বলে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছিল। তক্ষশীলাকে সংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় (Organised University) না বলে স্বাভাবিক বিশ্ববিদ্যালয় (University of natural growth) বলা যায়।

ব্যবহারিক শিক্ষা

॥ অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকেন্দ্র ॥

প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার ব্যয় রাজা, মহারাজার দানে এবং বিত্তবান ও ধর্ম-প্রাণ নরনারীর দানে বহুলাংশে নির্বাহ হ'ত। প্রাচীন ভারতের তীর্থক্ষেত্রসমূহে বহু পণ্ডিত বাস করতেন। তীর্থযাত্রীদের দানে তাদের ও শিক্ষার্থীদের ভরণ-পোষণে বিশেষ অসুবিধা হ'ত না। ভারতের তীর্থক্ষেত্রসমূহের মধ্যে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বারাণসীর খ্যাতি উপনিষদের যুগ থেকে চলে আসছে। জাতকের বহু কাহিনীতে বারাণসীকে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সুখ্যাতি করা হয়েছে। তক্ষশীলার পর বারাণসী সর্ব-ভারতীয় শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। এখানে তক্ষশীলার মত বেদ, উপনিষদ ও বহুবিধ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হ'ত। খৃষ্ট জন্মের পূর্বে বারাণসী ছিল পূর্ব-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। বুদ্ধদেব বারাণসীর নিকটস্থ সারনাথ থেকে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। বারাণসীর শিক্ষা প্রচেষ্টা ছিল নিতান্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। বিভিন্ন পণ্ডিতের গৃহে ছাত্রেরা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষালাভ করত। একজন গুরুর অধীনে ৫।৬ জন থেকে ১২।১৪ জন শিক্ষার্থী থাকত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ণিয়ার বেনারসকে প্রাচ্যের এথেন্স বলে বর্ণনা করেছেন।

বারাণসী

হিন্দু শিক্ষার কেন্দ্ররূপে মিথিলার খ্যাতি ও প্রাচীন মিথিলার রাজা জনকের খ্যাতি উপনিষদে ও পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। মধ্যযুগে মিথিলা পূর্বভারতের একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়। এখানে নব্য ন্যায়ের খ্যাতি ছিল ভারত-জোড়া। মিথিলার শলাকা পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন ছিল—এখানকার শলাকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থীকে উপাধি দেওয়া হ'ত।

মিথিলা

মধ্যযুগে নবদ্বীপ পূর্ব-ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করে। লক্ষ্মন সেন নবদ্বীপে গৌড়ের রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হলায়ুধ ন্যায়, মীমাংসা ও স্মৃতির উপর গ্রন্থ রচনা করেন। গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব, পবনদূত রচয়িতা ধোয়ী ও উমাপতি ধর প্রভৃতি কবিরা তাঁর সভা অলংকৃত করেন। বাসুদেব সার্বভৌম ও তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন, গদাধর ভট্টাচার্য টোল স্থাপন করেন। নবদ্বীপে নব্য-ন্যায় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করা হ'ত। রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করে নবদ্বীপকে নব্য-ন্যায়ের উপাধিদানের কেন্দ্রে পরিণত করেন। নবদ্বীপ তথা সারা বাংলার গৌরব শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। এখানে টোলে অধ্যয়ন করে এখানেই তিনি টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা করেছিলেন।

নবদ্বীপ

॥ চতুষ্পাঠী বা টোল ॥

নবদ্বীপের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল আবাসিক। এখানে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে বলা হ'ত টোল বা চতুষ্পাঠী। যেখানে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও দর্শন এই চারটি দর্শন পড়ান হয় তাকেই চতুষ্পাঠী বলা হয়। কিন্তু এখানকার টোলে প্রধাণতঃ ন্যায়ের অধ্যাপনা হলেও ব্যাকরণ ও স্মৃতির অধ্যাপনাও হ'ত। বেদ-বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন প্রভৃতি পড়াবার ব্যবস্থাও ছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখবার জন্যও এখানে টোল ছিল। আলোচনা ও তর্কযুদ্ধ প্রায়ই হ'ত। কূট প্রশ্ন ও চুলচেরা বিচারে প্রতিপক্ষকে নির্বাক করে দেওয়াই ছিল শিক্ষার্থীমাত্রের একমাত্র বাসনা। নদীয়ার শিক্ষার্থীদের বয়সের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। মধ্য বয়স্ক এমনকি পক্ককেশ ব্যক্তিরা পর্যন্ত টোলে পড়তেন। টোলের ছাত্রদের থাকা-খাওয়া, বেশ-ভূষা সব কিছুর ব্যবস্থা অধ্যাপকই করতেন। ছাত্ররা এজন্য কোন অর্থ দিত না। এক একটি টোলে ২০।২৫ জন ছাত্র পড়ত। খ্যাতি সম্পন্ন অধ্যাপকের নিকট ৫০।৬০ জন পর্যন্ত ছাত্র পড়ত। রাজা, জমিদার, ধনী ও তীর্থযাত্রীদের দানে এসব টোলের ব্যয় নির্বাহ হ'ত। ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে নদীয়া শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে।

॥ নালন্দা ॥

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে নালন্দাই সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন। নালন্দার খ্যাতি ভারতের সীমা ছাড়িয়ে সুদূর তিব্বত চীন, কোরিয়া, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজি এই মহাবিদ্যালয়টিকে ধ্বংস করবার পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাযান মত প্রভাবিত বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও তাদের যাবতীয় প্রশ্ন ও সংশয় নিরসনের জন্য শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হ'ত। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নালন্দা ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নালন্দাকে প্রাচীন যুগের প্রথম সংগঠিত (organised) বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়।

সংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়

পাটলিপুত্রের ৪০ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন মগধের রাজধানী, রাজগৃহের সাত মাইল উত্তরে বর্তমান পাটনা জেলার বিহার সরীফ মহকুমার বড়গাঁও-এর নিকটে নালন্দা অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্তের জন্মভূমি নালন্দা। কথিত আছে এই সময়ে বুদ্ধদেব এখানে লেপ নামে এক বণিকের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। স্থানীয় শ্রেষ্ঠ সঙ্ঘ একটি বিহার নির্মাণের জন্য বহু অর্থব্যয়ে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড কিনে বুদ্ধদেবকে দান করেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে নালন্দা শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ৪১০ খ্রীঃ যখন নালন্দায় আসেন তখন নালন্দার শিক্ষাকেন্দ্ররূপে কোন খ্যাতি ছিল না। মনে হয় ফাহিয়ান নালন্দায় তীর্থযাত্রীরূপে এসেছিলেন। তাঁর পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ৬২৯ খ্রীঃ থেকে ৬৪৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন। সে সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তাই মনে হয় ফাহিয়ানের ভারত ত্যাগের (৪১৪ খ্রীঃ) পর থেকে হিউয়েন সাঙের আগমনের মধ্যে নালন্দা দ্রুত শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করে।

শিক্ষাকেন্দ্ররূপে নালন্দার আত্মপ্রকাশ

নালন্দার নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রথমতঃ, সঙ্ঘারামের নিকটবর্তী নাগানন্দ সরোবর থেকে নালন্দা নাম হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধদেব এখানে এক সময়ে অবিশ্রান্ত দান করেন ন-অলম-দা অর্থাৎ অবিশ্রান্ত দাতা এই অর্থে নালন্দা মহাবিহারের নাম হয়।

নালন্দার দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। হিন্দু গুপ্ত রাজাদের অর্থানুকূল্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা গড়ে ওঠে। সম্রাট শক্রাদিত্য (কুমার গুপ্ত) এই মহাবিহারের প্রথম মঠটি স্থাপন করেন, তারপর তথাগত গুপ্ত, নরহরি গুপ্ত, বালাদিত্য, বুধ গুপ্ত ও বজ্র একটি করে বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ বিহারটি অনুমান করা হয় মহারাজ হর্ষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিব্বতীয় বিবরণ অনুসারে নালন্দার সুবৃহৎ উপনিবেশটির নাম ছিল ধর্মগঞ্জ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এক মাইল দীর্ঘ ও আধমাইল প্রস্থ ব্যাপী এলাকায় বিস্তৃত ছিল। নালন্দার কেন্দ্রীয় কলেজ সংলগ্ন সাতটি বড় বড় হলঘর ছিল। এছাড়া ৩০০টি ছোট কক্ষে পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন ১০০-টি বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র মহাবিদ্যালয়টি ঘিরে একটি প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে ছিল মহাবিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার।

শ্রমণ শিক্ষার্থীরা বিহারে থাকত। খননের ফলে ১৩-টি ছাত্রাবাস পাওয়া গিয়েছে। ছাত্রাবাসগুলি সাধারণতঃ দোতলা হ'ত। কোন ঘরে একজন, কোন ঘরে দু'জন ছাত্র থাকত। কক্ষমধ্যে পাথরের তৈরী খাট দেখলেই বোঝা যায় কোন্ কক্ষে কতজন ছাত্র থাকত। কক্ষমধ্যে বই, আলো প্রভৃতি রাখবার জন্য কুলুঙ্গি ছিল। মহাবিদ্যালয় থেকে বিনামূল্যে ছাত্রদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ত। হিউয়েন সাঙ্ বলেন ১০০-টি গ্রামের আয় থেকে নালন্দার সব খরচ চলত। গ্রামবাসীরা রোজ চাল, দুধ, মাখন ইত্যাদি দিয়ে যেত। ই-ৎ শিঙের বিবরণ থেকে জানা যায় নালন্দা মহাবিহারের

অধীনে ২০০-টি গ্রাম ছিল। মনে হয় হিউয়েন সাঙ্ চলে যাবার পরে আরও বহু গ্রাম পাওয়া গিয়েছিল।

হিউয়েন সাঙ্ পাঁচ বছর নালন্দায় ছিলেন। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন মহাস্থবির শীলভদ্র। হিউয়েন সাঙের জীবনী থেকে জানা যায় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দশহাজার ছাত্র এখানে ছিল। আইসিঙ দশ বছর নালন্দায় ছিলেন, তিন হাজারেরও বেশী ছাত্র এখানে ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা হয় হিউয়েন সাঙ্ বর্ণিত কয়েক হাজারকে তাঁর জীবনী লেখক দশ হাজার বলে বর্ণনা করেছেন। সে সময়ে ৫০০০ ছাত্র ছিল—এ অনুমানই ঠিক বলে মনে হয়। এ সময় এখানে অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল এক হাজারের উপরে। যদি ধরে নেওয়া যায় দশ হাজার ছাত্র ছিল তাহলে প্রতি উপাধ্যায়ের অধীনে ১০ জন ছাত্র ছিল। অধ্যাপকেরা ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের উপর নজর রাখতেন। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ঘনিষ্ট হওয়ায় ও সতর্ক দৃষ্টির ফলে শিক্ষার উচ্চমান বজায় ছিল।

নালন্দা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র, যে কোন বর্ণের বা যে কোন ধর্মের শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষার জন্য প্রবেশ করতে পারত। সাধারণ মেধার ছাত্রদের এখানে প্রবেশ করা প্রায় অসাধ্য ছিল। প্রবেশদ্বারে প্রার্থীকে দ্বার-পণ্ডিতের নিকট নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে তবে নালন্দায় ভর্তি হবার অধিকার মিলত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্য হতে দ্বার-পণ্ডিত নিয়োগ করা হ'ত। প্রবেশেচ্ছু ১০ জনের মধ্যে ৭।৮ জনকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেত হ'ত।

নালন্দার খ্যাতির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এখানকার বিরাট গ্রন্থাগার। রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক ও রত্নোদধি নামে তিনটি গ্রন্থাগার এখানে ছিল। সর্বোচ্চ রত্নোদধি ছিল নয় তালা। বৈদেশিক ছাত্ররা নালন্দায় অধ্যয়নের সাথে সাথে বৌদ্ধধর্মের মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ নকল করতেন। এখান থেকে বৈদেশিক ছাত্ররা পুঁথির নকল নিয়ে যাবার ফলে এই গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদের সামান্য অংশ তিব্বতে ও নেপালে রক্ষা পেয়েছে।

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম যুগে পাঠক্রম ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু নালন্দার পাঠ্যসূচী ছিল বিস্তৃত। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের গ্রন্থাদি পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। নালন্দা ছিল মহাযান বৌদ্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র, কিন্তু হীনযান পন্থীদের ধর্মমত ও ধর্মতত্ত্বও পড়ান হ'ত। শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণ পাঠের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত। হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থার মত বেদ, বেদাঙ্গ, শাঙ্খ্য-দর্শন, সাহিত্য নালন্দার পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। জ্যোতিষ্ক ও নক্ষত্র চর্চাও এখানে হ'ত। ধর্মগঞ্জের মধ্যে একটি মানমন্দির ছিল। নালন্দায় চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার সাথে রামায়ণ শাস্ত্রের চর্চাও কিছুটা হ'ত। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তান্ত্রিক মতবাদ ও আচার অনুষ্ঠানাদি প্রবেশ করায় তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। মনে হয় বিক্রমশীলার প্রভাবে তান্ত্রিক শাস্ত্র, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি নালন্দার পাঠ্যসূচীতে স্থান পায়। এ ছাড়া ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের চর্চাও হ'ত।

নালন্দায় তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তর্কের ভিত্তি হ'ল

শিক্ষা কমিশন যেভাবে সমস্যাকে দেখেছেন প্রধানতঃ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, প্রয়োজন বোধে আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হবে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান রূপ ॥

শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের মতামত সংগ্রহের জন্য যে আলোচনাপত্র (*Discussion Paper on Major Problems of Secondary Education*) তৈরী করেছিলেন তারা ভূমিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও আধুনিক সমস্যাটিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য তা এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

"এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে নিকট ভবিষ্যতে ভারতের যে কোন শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনার মাধ্যমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির সাথে প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার উন্নতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরবর্তী দু'টি পরিকল্পনাকালের মধ্যে ৬—১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সবার জন্য ও ১২—১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশের জন্য শিক্ষার সুবিধা প্রসারিত হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপর এখনই যথেষ্ট চাপ রয়েছে, এ চাপ আরও বেড়েই যাবে। এর ফলে শিক্ষার মানের অবনতি যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। নতুন করে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের কাজে উচ্চ শিক্ষাতে যদি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে হয় তাহলে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের উচ্চশিক্ষার মানের সমান মানে আমাদের পৌছাতে হবে। এজন্য প্রয়োজন মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি প্রগতিশীল পরিকল্পনা (*dynamic programme*) গ্রহণ করা।"

১৯৫২ খ্রীঃ নিয়োজিত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও পুনর্গঠনের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন। বিগত দশ বছর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি কার্যকরী করবার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে উন্নতি বেশ উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তনে ফল খুব ভাল হয় নি। সত্যি কথা হচ্ছে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার যে সব দোষ ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সে সব দোষ ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা কমবেশী জীবনের সাথে সম্পর্কশূন্য ; পাঠক্রম এখনও সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী ও তরুণ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে সহায়ক নয়। শিক্ষা পদ্ধতি প্রধানতঃ প্রাণহীন ও নীরস ও উদ্ভাবনী শক্তি হীন। এ শিক্ষা পদ্ধতি জীবনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও কার্যের অভ্যাস গঠনের পক্ষে সহায়ক নয়। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কিছু ব্যবস্থা হলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা এখনও খুবই খারাপ। তাঁদের অসন্তোষ ও কখনও কখনও

যুক্তিসঙ্গত হতাশা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের নানা ভাবকে প্রভাবিত করে। তারপর পরীক্ষা পদ্ধতি—যার গুরুত্ব একটুও কম নয়—যদিও বহিঃপরীক্ষার কুপ্রভাব দূর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে—তবুও বহিঃ পরীক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। মাধ্যমিক শিক্ষার যে সব দুর্বলতা আগের ক্ষেত্রে রয়ে গিয়েছে তা ছাড়াও কমিশনের প্রধান সুপারিশসমূহ কার্যকরী করতে গিয়ে আরও বহু নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে যা সংস্কার কার্যকরী করবার আগে বোঝা যায় নি। এ ছাড়াও কয়েক বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে বহু নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং পুরান সমস্যা জটিল হয়ে আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্রে পুনঃবিচার করে দেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এডুকেশন কমিশন স্বীকার করে গিয়েছেন দশ বছর চেষ্টার পর মুদালিয়র কমিশন যে সব দোষ ত্রুটি মাধ্যমিক শিক্ষায় দেখেছিলেন আজও শিক্ষায় সেই সব দোষ ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। মানুষের দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও আত্মীক যাবতীয় বৃত্তি ও শক্তির যুগপৎ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য বলা হলেও আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তব বিমুখ একদেশদর্শী একথাই কমিশন মেনে নিয়েছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য :—

যে কোন শিক্ষা সংস্কার কার্যে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে কাজ শুরু হয়। মুদালিয়র কমিশন ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজন বিচার করে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে যে সব বিষয় বিবেচনা করেছিলেন তা হচ্ছে (ক) গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ উদার জাতীয় মনোভাব (*a board, national and secular outlook*)। (খ) দেশের চরম দারিদ্র্য ও অভাব মোচনের জন্য অর্থ নৈতিক উন্নতির জরুরী প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা। (গ) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এ বিষয় সমূহ চিন্তা করে মুদালিয়র কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছিলেন। পাঠক্রম ও সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী স্বাধীন চিন্তাশক্তি অর্জন করবে—লেখা ও ভাষণের মধ্যে তার স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হবে, নতুন আদর্শ গ্রহণের জন্য উদার মনোভাব সৃষ্টি হবে। ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকবে। শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, সামাজিক-বোধ জাগরিত হবে যাতে সে সমাজে সবার সাথে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে।

দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষার্থী বৃত্তিগত শিক্ষার পারদর্শিতা অর্জন করবে। শ্রমের মর্যাদা ও কাজ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হবে। মাধ্যমিক স্তরে নানাপ্রকার বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক দিকে শিক্ষার্থীর মনের উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে যার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ হবে।

ন্যায়শাস্ত্র, সেজন্য ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষভাবে পঠন-পাঠন হ'ত। শ্রমণরা ভোরে উপাধ্যায়ের সেবা করে ধর্মশাস্ত্রের একটি অধ্যায় পাঠ করত এবং সে পাঠ্য বিষয়টি চিন্তা করত। নালন্দায় আবৃত্তি ও উপাসনাদির উপর জোর দেওয়া হ'ত। আলোচনা ও বিতর্কের ব্যবস্থা থাকায় অধীত বিদ্যাকে উপলব্ধি না করে কেহ বিতর্কে সাফল্যলাভ করতে পারত না। প্রবন্ধ রচনা, বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি এখানে অভ্যাস করান হ'ত। শিক্ষা শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত উভয় পদ্ধতিতেই দেওয়া হ'ত।

নালন্দায় পরীক্ষা ও উপাধিদানের রীতি ছিল। শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কৃতিত্বের পরীক্ষা দেবার জন্য রাজসভায় উপনীত হ'ত। রাজসভা থেকে কৃতী ছাত্রকে উপাধি ও ভূমি দান করা হ'ত। কৃতিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ সু-উচ্চ সিংহদ্বারে তার নাম লেখা হ'ত। শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থী ভিক্ষু বা গৃহজীবন বেছে নিতে পারত।

নালন্দার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলা হ'ত। নালন্দার প্রধান সচিবকে বলা হ'ত সর্বাধ্যক্ষ। সর্বাধ্যক্ষ নিয়োগে তাঁর জ্ঞান, সাধনা, বয়স সবদিক থেকে বিচার করে নির্বাচিত করা হ'ত। সর্বাধ্যক্ষকে সাহায্য করবার জন্য দু'জন মহাবীর ধর্মাধ্যক্ষ ছিল, এঁদের বলা হ'ত কর্মদান ও স্থবির। এঁদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দিক দেখতেন—ভর্তি, পাঠক্রম, শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, ক্লাশের ব্যবস্থা এ সব তিনি করতেন। অপরজন শৃঙ্খলা রক্ষা, গৃহ নির্মাণ ও মেরামত, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন, পোষাক পরিচ্ছদ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা বাসকক্ষের বিলি-বণ্টন প্রভৃতি দেখতেন। এখানকার শাসন-ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিকসম্মত। পাক্ষিক প্রতিমোক্ষ পাঠ হবার পর সেখানে আলোচনা করে সকল বিষয় সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত হ'ত।

নালান্দার খ্যাতির আর একটি কারণ এখানকার বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক মণ্ডলী। তারানাথ বিখ্যাত দার্শনিক নাগার্জুনকে নালন্দার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। একসময় ধর্মপাল এখানকার কুলপতি বা সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মহাস্থবির শীলভদ্রের গুরু। শীলভদ্র ছিলেন সমতটের এক রাজবংশের সন্তান। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে আমরা গুণমতি, চন্দ্রপাল স্থিরমতি প্রভৃতি উপাধ্যায়ের কথা শুনতে পাই। বরেন্দ্রবাসী স্থিরমতির শিষ্য চন্দ্রগোমিন বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এখানকার অধ্যাপকগণ নানা শাস্ত্রের বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সংস্কারে এখানকার অধ্যাপকদের অবদান স্মরণীয়। নালন্দার উপাধ্যায় চন্দ্রগোমিন তিব্বতে ধর্মপ্রচারের একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। শান্ত রক্ষিত তিব্বতে রাজার নিমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে প্রথম বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠার পর নালন্দার খ্যাতি কিছুটা ম্লান হয়ে আসে। পাল রাজাদের সময় বিক্রমশীলার পরিচালকমণ্ডলী নালন্দার পরিচালনা করতেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী বর্বরোচিতভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস করে। ধর্মান্ধতার ফলে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ও তার সাথে গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদ ভস্মস্তূপে পরিণত হয়ে ভারতের তথা বিশ্বের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

॥ বিক্রমশীলা ॥

ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের মধ্যে নালন্দার পরেই বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে যখন নালন্দার খ্যাতি ম্লান হয়ে আসছিল সেই সময়ে বিক্রমশীলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিক থেকে বিক্রমশীলা নালন্দারই উত্তর-সাধক। বিক্রমশীলার কোনরূপ ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত না হওয়ায় আজ পর্যন্ত বিক্রমশীলারই অবস্থিতি সম্পর্কে আমরা কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি নি। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের বিবরণ থেকে জানা যায়, নবম শতাব্দীতে সম্রাট ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা এই দেব বিহারটি গঙ্গা তীরবর্তী কোন পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। অনেকে মনে করেন ভাগলপুরের কাছাকাছি রাজমহলের গিরিশ্রেণীর মধ্যে বিক্রমশীলা অবস্থিত ছিল। অনেকে আবার মনে করেন ইহা ভাগলপুর জিলার সুলতানগঞ্জে অবস্থিত ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১০৮-টি মন্দির, ভিক্ষু শ্রমণের জন্য বিহার, বক্তৃতার জন্য বড় বড় হলঘর নির্মাণ করেন। এ সময় অধ্যাপনার জন্য ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন। ক্রমে এই মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হলে এখানে ছটি মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ১০৮ জন করে অধ্যাপক অধ্যাপনা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল আবাসিক। তিব্বত থেকে বহু ছাত্র ও পরিব্রাজক আসত বলে তিব্বতীয়দের জন্য এখানে একটি পৃথক বিহার ছিল। বিক্রমশীলার কেন্দ্রীয় মহাকক্ষটির নাম ছিল বিজ্ঞানবান ও সেখানে প্রজ্ঞাপরমিতার অধ্যাপনা হ'ত। মহাবিদ্যালয়টি ছিল প্রাচীর বেষ্টিত এবং বিদ্যালয়ে ছয়টি দ্বার ছিল। প্রধান প্রাসাদের পাশে নাগার্জুন ও অতীশ দীপঙ্করের চিত্র অঙ্কিত ছিল। দ্বারগুলি সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যেত। যে সব অতিথি বা ছাত্র সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছত তাদের থাকা খাওয়ার জন্য ফটকের পাশে ধর্মশালা ছিল। পাল রাজাদের দানে ও ধার্মিক বিত্তবানদের অর্থ সাহায্যে বিক্রমশীলার ব্যয় নির্বাহ হ'ত। বিদ্যার্থীদের এখানে থাকা খাওয়ার জন্য কোন অর্থ দিতে হ'ত না।

বিক্রমশীলার সাংগঠনিক দিক

বিক্রমশীলার পাঠ-পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সর্বাধ্যক্ষের উপর। পরিচালনার সুবিধার জন্য তিনি ছয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কর্মপরিষদের সাহায্যে কার্য পরিচালনা করতেন। সর্বাধ্যক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কর্ম পরিষদের কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হ'ত না। কথিত আছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ সময়ে বিক্রমশীলার পরিচালকমণ্ডলীর অধীন ছিল। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধ্যাপক বিনিময় হ'ত। দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান ও অভয়ঙ্কর দুই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক ছিলেন। নালন্দার মত এই বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি প্রবেশ-দ্বারে ছয়জন দ্বার-পণ্ডিত নতুন প্রবেশার্থীদের পরীক্ষা করে গ্রহণ করতেন। মনে হয় ছয়টি মহাবিদ্যালয়ের ছয়জন অধ্যক্ষই এই দ্বার-পণ্ডিতের কাজ করতেন।

বিক্রমশীলার পরিচালনা ও ভর্তি ব্যবস্থা

নালন্দার মত এখানেও মহাযান পন্থীদের ধর্মমত চর্চার প্রাধান্য ছিল, কিন্তু হীনযান বৌদ্ধ মতের স্থান ও পাঠক্রম ছিল। পাঠক্রমে শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ), হেতুবিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র), যোগশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, শিল্পবিদ্যা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতির স্থান ছিল। কালক্রমে তান্ত্রিক বৌদ্ধ শাস্ত্রই পাঠক্রমে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। মূল বৌদ্ধধর্মের সাথে তান্ত্রিকবাদের কোন সম্পর্ক নেই, হিন্দু তান্ত্রিকবাদের প্রভাবেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকবাদ প্রবেশ করে। বিক্রমশীলার অধ্যাপকদের মধ্যে রত্নাকর শান্তি নারোপা, অতীশ দীপঙ্কর, দিবাকর চন্দ্র, অভয়ঙ্কর গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা করেন।

পাঠ্যক্রম

বিক্রমশীলার শিক্ষা-পদ্ধতিতে শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল। শ্রেণী শিক্ষায় বক্তৃতার রীতি প্রচলিত ছিল। বক্তৃতার সাথে আলোচনা ও বিতর্ক থাকায় বিদ্যার্থীরা শিক্ষায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পেত। বিক্রমশীলায় পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষা ছিল মৌখিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যোগ্য শিক্ষার্থীরা রাজার কাছ থেকে উপাধি লাভ করত। পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, উপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি দেবার রীতি ছিল।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

বিক্রমশীলার অধ্যাপকদের খ্যাতি ভারতের বাইরে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তিব্বতীয় সূত্র থেকে জানা যায় বুদ্ধ, জ্ঞানপদ, বিরোচনা, জেতারী রত্নাকর শান্তি, জ্ঞানশ্রী মিত্র, রত্নবজ্র, অভয়ঙ্কর গুপ্ত তথাগত রক্ষিত পণ্ডিতগণ সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

অধ্যাপক

বিক্রমশীলার পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন আচার্য হচ্ছেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। অতীশ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন গৌড়ের রাজ-পরিবারের ছেলে। ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করে এবং দন্তপুরী ও কৃষ্ণগিরিতে শিক্ষা শেষ করে সিংহল পরিভ্রমণ করেন। সেখান থেকে বিক্রমশীলায় এসে আচার্য জেতারীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বিক্রমশীলায় দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হন পরে সর্বাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। তিব্বতরাজ চানচুর তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিক্ষুনাগছোকে পাঠিয়েছিলেন, তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য বিক্রমশীলার পণ্ডিত ভূমিগর্ভ ও বীর্যচক্রের সাথে অতীশ তিব্বত যাত্রা করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী থেকে তিনি ৭৩ বছর বয়সে নির্বাণ লাভ করেন। তিব্বতীয় বিবরণ থেকে জানা যায় মূল ও অনুবাদ নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ-সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

অতীশের ভারত ত্যাগের পর বিক্রমশীলার পরবর্তী ইতিহাস খুব গৌরবোজ্জ্বল নয়। অতীশের পরবর্তী কালে রত্নকীর্তি, অভয়ঙ্কর গুপ্ত, শাক্যশ্রী ভদ্র প্রভৃতি অধ্যাপকদের নাম উল্লেখযোগ্য। মুসলিম ঐতিহাসিক মীনহাজের বিবরণ থেকে জানা যায় ওদন্তপুরীর মহাবিদ্যালয় ধ্বংস করে বখতিয়ার বিক্রমশীলা ধ্বংস করে। বিশ্ব-বিদ্যালয়টিকে নাকি তার দুর্গ বলে ভ্রম হয়েছিল।

॥ অন্যান্য বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ॥

বিক্রমশীলা ও নালন্দা ছাড়াও কয়েকটি মহাবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অর্জন করেছিল। হিউয়েন্-সাঙ ও ইৎসিঙ দু'জনেই পশ্চিম ভারতের বলভী মহাবিদ্যালয়ের প্রশংসা করেছেন, বলভী হীনযান বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। হিউয়েন্-সাঙ এখানে ৬০০০ ভিক্ষু দেখতে পান। নালন্দার প্রখ্যাত অধ্যাপক গুণমতি ও স্থিরমতি এখানের ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে বলভীর রাজা শিলাদিত্য এই মহাবিদ্যালয়টি স্থাপন করেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রাদির সাথে নানা ব্যবহারিক শাস্ত্র ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে ছিল।

বলভী

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল নালন্দার ষাট মাইল উত্তরে ওদন্তপুরীতে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু শিক্ষার্থী ছিল। এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গ্রন্থসমূহের একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। বখতিয়ার এই মহাবিদ্যালয়টি ধ্বংস করেন।

উত্তর বঙ্গে জগদ্দল বিশ্ববিদ্যালয় এক সময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। রামপাল এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার একশ বছরের মধ্যে মুসলিম আক্রমণে এই বিহারটি ধ্বংস হয়।

বুদ্ধদেব বারাণসীর উপকণ্ঠস্থ সারনাথ থেকে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় সারনাথ বিহার বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে দেড় হাজার বৌদ্ধ শ্রমিক ও ভিক্ষু বাস করত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা বৌদ্ধদের তীর্থক্ষেত্র ও শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বিখ্যাত ছিল।

প্রশ্নাবলী

1. Describe any two of the following educational institutions of India : Asram, Tol, Parishad and compare them with their present form, if any. [B. T. 1965]
2. Discuss the special features of universities in ancient India with reference to at least one of them. [B. T .1963]
3. Trace the history of education in ancient India with special reference to Parishads. Tole & Pathsalas. [B. T. 1961]
4. Bring out the essential feature of the Buddhist system of Education in ancient India.

STATE INSTITUTE OF EDUCATION Govt of West Bengal.

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার অবদান

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ধর্মভিত্তিক প্রাচীন ঋষিরা জীবনে যে সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই সত্যের আলোকে তাঁরা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিলেন। মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে নিজের অমরসত্তার সন্ধান পাওয়া বা পূর্ণতালাভ করাই হচ্ছে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার উদ্দেশ্য। একেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "*Education is the manifestation of perfection already in man.*"

বহুশত বর্ষ আমরা পার হয়ে এসেছি। প্রাচীন জীবনের ধারা ও শিক্ষাদর্শ দুই থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন। আত্মোপলব্ধির আদর্শ অপেক্ষা বস্তুতান্ত্রিক জগতে সাফল্যলাভই আমাদের জীবনের পরম কাম্য। শ্রেয়ঃ বোধ যখন এমনিভাবেই বদলে গিয়েছে, তখন তপোবনের শিক্ষার মূল্যায়নের কি প্রয়োজন?

পরা ও অপরা বিদ্যা—পরিপূর্ণতার বিকাশ বা অমৃতত্ব লাভই জীবনের শেষ কথা হলেও আর্যঋষিগণ জগতে বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় লৌকিক শিক্ষার উপযোগিতার কথাও শিকার করেছেন। উপনিষদে বিদ্যাকে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই লৌকিক বিদ্যার মূল্য স্বীকৃত। কিন্তু ঋষিরা সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন—অমৃতত্বলাভই যেন জীবনের শেষ কথা বলে গ্রহণ না করি। তাই উপনিষদের ঋষি বলেছেন, মানুষের সাংসারিক সুখসমৃদ্ধির জন্য লৌকিক বিদ্যা বা অপরা বিদ্যার প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য তাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা করতে হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে যে শুধুমাত্র লৌকিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করে সে অজ্ঞতার তিমিরেই ডুবে থাকে। তেমনি সে যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে, তাহলে সে আরও বেশী অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে
অবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইবতে তমো
য উ বিদ্যায়াং রতাঃ। (ঈশ-উপনিষদ)

শুদ্ধ বিদ্যা ও লৌকিক বিদ্যার সমন্বয়—আদর্শ মানুষ গড়ে তুলতে হলে লৌকিক বিদ্যা ও শুদ্ধ বিদ্যার সমন্বয় দরকার। ভারতের শিক্ষায় জড়-বিজ্ঞান ও ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় হয়েছিল। উপনিষদে বলেছে বিদ্যা ও অবিদ্যা যারা যুক্ত করে দেখেন তারাই সত্যকে দেখেন। শুধুমাত্র বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি হলেই যদি জীবনে শান্তি আসত, তাহলে জড়বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করেও পশ্চিম জগতে এত অস্থিরতা দেখা দিত না। কল্যাণের পথ, যে পথ হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে বাঁচাবার পথের সন্ধান দিতে পারবে, সে পথের সন্ধান জড়বিজ্ঞান দিতে পারে নি। সে পথের সন্ধান দিয়েছিল ভারতের আর্য

ঋষিগণ। নিজেকে জানা—মানুষের মধ্যে দেবত্বের সন্ধান পেয়েছিলেনতাঁরা। সেই দেবত্বকে উদ্বোধিত করাই ছিল ভারতের শিক্ষার শেষ কথা। যে শিক্ষা আমাদের কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে, আমাদের শ্রেয়ঃ বোধকে উদ্বোধিত করবে তাকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইলে সে শিক্ষা হবে নীতিজ্ঞানহীন শিক্ষা।

আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যদি আমরা ভবিষ্যৎ ভারতের নাগরিকদের গড়ে তুলতে চাই তাহলে শুদ্ধ বিদ্যা ও লৌকিক বিদ্যার সমন্বয় করতে হবে। পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা জীবনে দুই-ই প্রয়োজনীয়। তাই আর্য ঋষিগণ উভয়কেই তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় গ্রহণ করেছিলেন।

আধুনিক শিক্ষা—ইউরোপীয়দের আগমনের পর এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মিশনারীগণ ধর্মপ্রচার ও ভারতীয়দের খৃষ্টধর্মে দিক্ষীত করার জন্য ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে এগিয়ে আসেন। বণিক ইংরেজ নবলব্ধ সাম্রাজ্য রক্ষা ও ব্যবসায়িক স্বার্থে ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ভারতের শিক্ষা-বিস্তারের লক্ষ্য সম্পর্কে ইংরেজ মনোভাব উডের ডেস্‌পাচে (১৮৪৫ খ্রীঃ) স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। নৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারী সৃষ্টি ও ইংলণ্ডের কারখানার জন্য ভারতীয় কাঁচামালের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়াই ছিল কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের লক্ষ্য। ইংরেজ শাসনকালে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসকে আলোচনা করলে দেখা যায় উডের ঘোষিত নীতিই প্রায় ১০০ বছর ভারতের শিক্ষা-নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার প্রয়োজন অনুভব হয়। জাতীয় শিক্ষা হবে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপোষক। জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি তার প্রধান বাহন, জাতীয় আদর্শ তার মুখ্য উপজীব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার মূল্যায়ণের প্রয়োজন আছে।

॥ প্রাচীন শিক্ষার স্বরূপ ॥

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হচ্ছে, সে শিক্ষা মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাধারা আলোচনায় আমরা দেখেছি এ ধারণা বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য লৌকিক শিক্ষার যে রূপটি আমরা দেখতে পাই তাতে দেখা যায় ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই লৌকিক শিক্ষা সীমারদ্ধ ছিল না। যে সমাজ ধর্মভিত্তিক সেই সমাজের সর্বস্তরের শিক্ষার লক্ষ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীর ধর্ম-জীবন ও নৈতিক-জীবন যাতে গড়ে উঠতে পারে তার সহায়তা করা। ধর্ম ও নীতির উপর প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। আমাদের শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সমন্বয় সাধন। এই সমন্বয়ই হচ্ছে অন্তরাত্মার বাণী। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা শিক্ষাক্ষেত্রেও সাফল্যলাভ করেছে। বহুদেশের পর্যটকগণ অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত বিবরণ রেখে গিয়েছেন তা এই শিক্ষারই ফল। বিদেশী পর্যটকগণ ছিলেন তীক্ষ্ণ

সমালোচক। কোন দোষ-ত্রুটিকে তাঁরা ক্ষমার চোখে দেখতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত পর্যটক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভারতীয়দের নীতিবোধ ও উচ্চ-চরিত্র সম্পর্কে প্রশংসা করে গিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য উন্নত জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় চরিত্রের নিন্দাসূচক কোন বিবরণী আমরা পাই নি।

চরিত্র গঠনের সাথে সাথে শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠন ছিল প্রাচীন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এদিক থেকেও শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। শিক্ষাকে যদি বলা যায় জীবনের প্রস্তুতি, তাহলে দেখি ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় এ সত্য স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

মুসলিম বিজয়ের অব্যবহতি পূর্বে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাণশক্তির অভাব সূচিত হয়। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নানা মানুষের বন্ধনে যেভাবে সমাজ-জীবনকে আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে দেয়, তার ফলে হিন্দু সমাজ তার পূর্ণ গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা সংস্কারের বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে একটি প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থার অপমৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে।

প্রাচীন শিক্ষার অধোগতি—মধ্যযুগে হিন্দুদের স্বাধীন চিন্তা প্রায় লোপ পেতে বসে। যতদিন পর্যন্ত ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছে ততদিন তাদের সৃজনশীল মনের মৌলিক চিন্তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। নবম কি দশম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় মনে জড়ত্ব দেখা দেয়। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা প্রাণশক্তি হারিয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে এক গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। তারপর মুসলিম বিজয়ের পর থেকে হিন্দু সমাজ কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে। তার চিন্তাও কর্মের ক্ষেত্রকে সঙ্কোচিত করে সমাজকে কতকগুলি নিয়মের নিগড়ে বেঁধে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। ভারতীয় হিন্দু সমাজ নিজের গণ্ডীকে অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে স্বেচ্ছা বন্দীত্ব স্বীকার করে নেয়। মৌলিক চিন্তার সাথে মৌলিক পথও রুদ্ধ হয়। প্রায় এক হাজার বছর হিন্দু পণ্ডিতগণ টিকা-টিপ্পনী, ভাষ্য, ব্যাখ্যা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন মৌলিক রচনায় ব্রতী হন নি। মুসলিম বিজয়ের পর ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা অতি শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অতি কষ্টে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর অতি প্রাচীন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়।

॥ প্রাচীন শিক্ষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ॥

জাতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—একটা জাতিকে গড়ে তুলতে হলে উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে যেভাবে নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তা দেখে মনে হয়—আমাদের দেশের শিক্ষা জগতের বিধাতারা আজ শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যেভাবে নতুন শিক্ষা-

ব্যবস্থার রূপ দিতে যাচ্ছি তাতে আমাদের জাতীয় ভাবধারা পুষ্ট হচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখাপ্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। পৃথিবীর কোন সুসভ্য জাতির ইতিহাসে শিক্ষার এমন একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সন্ধান মেলে না। যে শিক্ষাধারাসুদীর্ঘ যাত্রাপথে ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রায় অপরিবর্তিত থেকেই বিশাল হিন্দু সমাজের প্রয়োজন মিটিয়েছে আধুনিক যুগেও তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য উপাদান কিছু আছে কি না দেখা দরকার।

তপোবনের শিক্ষা—প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তপোবনের শিক্ষা-ব্যবস্থা। নগরের কৃত্রিমতা ও কলকোলাহলের বাহিরে নির্জন প্রকৃতির সান্নিধ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি হ'ত, তা সবদিক থেকেই আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ। প্রাচীন ভারতে তীর্থক্ষেত্র বা নগরে যে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না তা নয় আজ তপোবনের শিক্ষাকেই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়গুলিকে যথাসম্ভব কোলাহলমুখর শহর থেকে দূরে সরিয়ে আনবার কথাই চিন্তা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী ও হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে পল্লীপ্রকৃতির মনোরম পরিবেশের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষাদর্শেরই শ্রেষ্ঠতার স্বীকৃতি।

গুরুশিষ্য সম্পর্ক—প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় সবচেয়ে আকর্ষণের দিক হচ্ছে গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক। ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে নিবীড় প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠত তা যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনুকরণীয়। প্রাচীন ভারতে শিক্ষকতা বৃত্তি ছিল জীবনের ব্রত। আচার্য শিক্ষাদান পবিত্র সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন দেনা পাওনার সম্পর্ক ছিল না। আচার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীর জীবন গড়ে উঠত। শ্রদ্ধাবনত, একনিষ্ঠ, সংযত ইন্দ্রিয় শিক্ষার্থীগণ সেবা করে, প্রশ্ন করে গুরুর কাছ থেকে গুণ আহরণ করত। আবাসিক ও ব্যক্তিগত শিক্ষার সমস্ত সুবিধাই এ ব্যবস্থায় ছিল। গুরু তার সাধ্যের অতিরিক্ত ছাত্র গ্রহণ করতেন না। আবাসিক-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মনোযোগ কয়েকটি ছাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্ষীণ যোগসূত্রকে দৃঢ় করে তুলতে পারলে শিক্ষা জগৎকে বহু ব্যাধিমুক্ত করা সম্ভব বলে শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করেন। ছাত্র-শিক্ষকের যোগাযোগ গভীর হলে একটা প্রীতির সম্পর্কই শুধু গড়ে উঠবে না, শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা পেলে শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্রের মানও শিক্ষার দুই-ই উন্নত হবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ এজন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর হার কমিয়ে আনবার কথা বলেছেন।

সমাদিষ্ট বা পড়ুয়া শিক্ষক—প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছাত্ররা শিক্ষাদানে গুরুর সহায়তা করত। প্রাথমিক শিক্ষায় এই প্রথা 'সর্দার পোড়ো' প্রথা নামে কিছুদিন পূর্বেও প্রচলিত ছিল। এই প্রথাই Monitorial system নামে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। এক শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই প্রথায় উপযোগিতা এখনও রয়েছে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। শিক্ষার্থীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও গুরু করতেন। অতি অল্পদিন পূর্বেও নবদ্বীপে প্রায় দশ হাজার ছাত্র টোল থেকে শিক্ষালাভ করত। বর্তমানকালে নীতিগতভাবে অধিকাংশ রাষ্ট্রই শিক্ষা যতদূর সম্ভব অবৈতনিক হওয়া উচিত বলে মেনে নিয়েছে। ভারতেও মাধ্যমিক শিক্ষা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক করার নীতিগত-ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় তবে 'মিড্‌ডে টিফিনে'র ব্যবস্থা সরকার থেকে করা সম্ভব কি না তার চেষ্টাও চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি সর্বত্র বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা যেত তাহলে অতি স্বল্পদিনেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জনসাধারণ মুক্তি পেত।

অবৈতনিক শিক্ষা

জীবনের সার্থক রূপায়ণ ও পরিপূর্ণ বিকাশে প্রাচীন শিক্ষার অবদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমার মনে হয়েছিল জীবনের লক্ষ্য কি?" এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষা-প্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের বিচিত্র তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষা সাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীনকালে গুরু একই সাধন ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে। তপোবনের গুরুগৃহের শিক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে প্রীতির সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সম্বন্ধে যুক্ত করে। আবার মানুষের সঙ্গে মানুষকেও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ সংযোগ শুধু স্বার্থের সংযোগ নয়, একাত্মবোধের সংযোগ।

গুরুগৃহে শিক্ষার তাৎপর্য

প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সামনে একটা নৈতিক আদর্শ ছিল। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় আমাদের সামাজিক আদর্শবোধ পরিবর্তিত হয়েছে। নৈতিক নয়, অর্থনৈতিক মাপকাঠিই হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র উপায়। বৈশ্য মনোবৃত্তিদ্বারা চালিত হয়েই আমরা শিক্ষায় তৎপর হই। শিক্ষার্থীকে কোন একটা বৃত্তিলাভের উপযোগী করে তোলাই বর্তমান শিক্ষার শেষ কথা। ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন যুগেও অস্বীকার করা হয় নি। কিন্তু নৈতিক ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন শিক্ষাই আমাদের দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। "এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষালয়, স্কুল কলেজের পরীক্ষা পাশ করা নয়। আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে" (রবীন্দ্রনাথ) পরা ও অপরা বিদ্যার সমন্বয় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় সম্ভব হয়েছিল। জাতি গঠনে সেই সনাতন শিক্ষার আদর্শই আমাদের যুগোপযোগী করে গ্রহণ করতে হবে।

ফলশ্রুতি

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম যুগের শিক্ষা

॥ সুলতানী যুগ ॥

মুসলিম বিজয়ের পর ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। পবিত্র কোরানে শিক্ষাকে একটি অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। মুসলিম বিজয়ের পর প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা রাজানুকুল্য থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলিম শাসক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি নতুন শাসন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন

ভারতের মুসলিম অভিযান শুরু হয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পর। নিজ দেশে তিনি ধর্মপ্রাণ ও বিদ্যানুরাগী বলেই পরিচিত ছিলেন। জ্ঞানী, গুণী ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে সুলতান মামুদের পরিচয় দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী নামে। তার আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য-স্থল ছিল ভারতের ধর্মস্থানগুলি। যে ধর্মস্থানগুলিতে সেকালে শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ গড়ে উঠেছিল তিনি সেগুলি ধ্বংস করেন।

সুলাতন মামুদ

তাঁর আক্রমণের ফলে ভারতের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন মহম্মদ ঘোরী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। তিনি আজমীরে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি ক্রীতদাসদের সু-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর অন্যতম ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন দিল্লীতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মুসলিম শিক্ষার সূচনা

ভারতে মুসলিম বিজয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিজয়ী মুসলমানেরা যেখানে পেরেছে বিজিত রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেখা যায় মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম শিক্ষার প্রসার হয়েছে। মুসলিম বিজয়ের ফলে ভারতে কিছু লোক ধর্মান্তরিত হয়। তাদের শিক্ষার জন্য মসজিদ-সংলগ্ন মক্তব সৃষ্টি হয়। প্রাচীন অন্যান্য শিক্ষার মত মুসলিম শিক্ষাও ছিল ধর্ম-কেন্দ্রীক। মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষকের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ছিল। শিক্ষা-প্রীতির জন্যই হোক আর ধর্মের অনু-শাসনের জন্যই হোক এদেশের গোঁড়া মুসলিম শাসকেরা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও এদেশে শিক্ষা প্রসারের কোনরূপ উৎসাহের অভাব দেখান নি। শাসকগণ নিজ নিজ এলাকায় মসজিদের সাথে মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থ সাহায্য করেন।

মন্দিরের স্থলে মসজিদ ও মক্তব মাদ্রাসা

কুতুবুদ্দিন অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সেনাপতি বক্তিয়ার বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ধ্বংস করেন, ইলতুত্ মিস ও রাজিয়া বিদ্যানুরাগী ছিল বলে জানা যায়। রাজিয়ার সময় দিল্লীতে একটি কলেজ ছিল। নাসিরুদ্দিনের বিদ্যানুরাগ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তিনি আজীবন বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর সময় জলন্ধরে একটি উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। দাস বংশেও বলবনের পুত্র মহম্মদের সময় দিল্লীতে অনেক সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ও দিল্লী বিদ্যাচর্চার একটি কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়।

দাস বংশ

খিলজী-বংশ—খিলজী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুদ্দিন বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি একটি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত আমীর খসরুকে তাঁর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। আলাউদ্দিন নিজে নিরক্ষর ছিলেন। বিদ্যা প্রসারে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি সরকারী তহবিল থেকে শিক্ষার জন্য ব্যয় বন্ধ করে দেন ও এজন্য প্রদত্ত জমি বাজেয়াপ্ত করেন। আলাউদ্দিনের এই বিরূপতা সত্ত্বেও দিল্লী মুসলীম শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কবি আমীর খসরু ও দার্শনিক নিজামুদ্দিন আউলিয়া এই সময় দিল্লীতে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন।

ফিরোজ শাহ—তুঘলক্-বংশীয় মহম্মদ বিন তুঘলক্ বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বহু সদ্গুণ ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই খামখেয়ালী রাজার রাজত্বকালে শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে দিল্লীর অবনতি ঘটে। সুলতানী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ফিরোজ শাহ্। পণ্ডিত ও ধার্মিকেদের জন্য দান ও শিক্ষার জন্য তাঁর ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ টাকা। শোনা যায় তিনি ১৮০০০ হাজার ক্রীতদাসের শিক্ষার ব্যয় বহন করতেন। তিনি কমপক্ষে ৩০-টি মস্জিদ সমন্বিত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নতুন রাজধানী ফিরোজাবাদে তিনি ফিরোজশাহী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসার প্রতিটি ছাত্র, অধ্যাপক ও অথিতির জন্য দৈনিক ভাতা দেওয়া হ'ত। প্রাচীন ঐতিহাসিক চিহ্ন সংরক্ষণের জন্য তিনি দুইটি অশোক-স্তম্ভ দিল্লীতে এনেছিলেন। কবি জালালুদ্দিন রুমী তাঁর সভাকবি ছিলেন। ফিরোজের আদেশে—আজউদ্দিন-খালিদ-খানি তিনশ' সংস্কৃত গ্রন্থ ফরাসীতে অনুবাদ করেছিলেন।

উর্দু ভাষার উদ্ভব—সৈয়দ বংশের রাজত্বে শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয় নি। সৈয়দ আলাউদ্দিনের সময় বাদাউন মুসলিম শিক্ষার একটি কেন্দ্ররূপে পরিচিত হয়ে ওঠে। সিকন্দার লোদী তাঁর রাজধানী আগ্রায় একটি উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে হিন্দুরা প্রথম ফার্সী শিখতে শুরু করে। অনেকেই মনে করেন এই সময়ই উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়। সিকন্দরের রাজত্বকালে বহুপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে আর্বী ও ফার্সীতে অনুদিত হয়।

সুলতানী যুগে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে যে সব মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে প্রাদেশিক শাসকগণ মুসলিম শিক্ষার জন্য যত্নবান হন। উত্তর ভারতে জৌনপুর মারকী বংশের রাজত্বকালে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য

জৌনপুর

প্রসিদ্ধ লাভ করে। ইব্রাহিম শরকীর পৃষ্ঠপোষকতায় জৌনপুর মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র-স্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ ভারতে বাহ্‌মনি রাজ্যের শাসকগণ শিক্ষা-বিস্তারে উদ্‌যোগী ছিলেন। বাহ্‌মন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৩৭৮ খ্রীঃ দাক্ষিণাত্যে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এরপর তাঁরা মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁরা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে

বাহ্‌মনি রাজ মাহ্‌মুদশাহের মন্ত্রী মামুদ গাওয়ন্‌ বিদরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানী আমলে গুজরাট, মালব প্রভৃতি স্থানে মুসলিম শিক্ষার জন্য বহু মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুলতানি আমলে বাবরের ভারত আক্রমণের পূর্বে এদেশের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলা চলে। তবে মুসলিম বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাদেশিক রাজধানীর মধ্যে বা বৃহৎ নগরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুলতানি যুগে শিক্ষার উন্নতি বা অবনতি রাজ্যের শাসকের খেয়াল-খুসীর উপর নির্ভরশীল ছিল। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে মুসলিম উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে মুসলমানদের সঙ্গে সরকারী চাকুরীর জন্য হিন্দুরাও ফার্সী পড়ত। সারা ভারতময় মস্‌জিদের সাথে মক্তব ছিল। মক্তবে কোরানের বয়াত মুখস্থ করবার সাথে সামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানো হ'ত— মাদ্রাসা ছাড়াও মুসলিম অভিজাত পরিবারে "আখেঞ্জি" রেখে পড়াবার প্রথা ছিল। সেই যুগে সংগীত, বাদ্য ও চিত্রকলা অভিজাত সমাজে আদৃত ছিল। বাবর আত্ম-জীবনীতে বহু অভাবের সাথে কলেজের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। বাবরের এই মন্তব্য অনেকেই মেনে নিতে রাজী নন।

সুলতানি যুগের বৈশিষ্ট্য

মোগল যুগ ঃ—বাবর ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। অল্প যতদিন তিনি রাজত্ব করেছিলেন ততদিন এদেশের শিক্ষার অভাব অনুভব করলেও শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। হুমায়ুনের বিদ্যানুরাগ সর্বজনবিদিত। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেন। দিল্লীতে হুমায়ুন একটি কলেজ স্থাপন করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার তিনি পণ্ডিতদের নিয়ে বৈঠক করতেন। দিল্লীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী থেকে সন্ধ্যায় নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করবার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে তিনি মারা যান।

হুমায়ুন

আকবর—মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহানুভব আকবর। শোনা যায় তিনি নাকি লিখতে পড়তে জানতেন না। নিরক্ষর হলেও আকবর ছিলেন শিক্ষিতমনা। যাকে বলা যায় বিদগ্ধ, আকবর ছিলেন তাই। বহু গুণী-জ্ঞানীর সমাবেশ হয়েছিল তাঁর সভায়। তিনি ছিলেন এক বিশাল গ্রন্থাগারের মালিক। সাহিত্য, ধর্ম, সংগীত, চারুশিল্প, লিপিশিল্প সবকিছুতেই তাঁর সমান উৎসাহ ছিল।

ফতেপুর সিক্রির "এবাদতখানা"য় প্রায়ই বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিতর্ক আলোচনার আয়োজন করতেন। এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ত। আকবরের সময় আবুল ফজল "আকবর নামা" নামে আকবরের জীবন-চরিত ও "আইন-ই আকবর" নামে আকবরের শাসন-প্রণালী সম্পর্কে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, লীলাবতীর বই, বত্রিশ সিংহাসনের গল্প, বাইবেলের সু-সমাচার প্রভৃতি গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। অনুবাদ কার্যে তিনি বহু হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করতেন।

আকবর শুধু বিদগ্ধই ছিলেন না, তিনি বিদ্যানুরাগীও ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানী ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদ্রাসায় হিন্দুদের শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেন। শিক্ষার দ্রুততার উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। "আইন-ই আকবরী" গ্রন্থে দেখা যায় শিক্ষার কাজকে দ্রুততর করবার জন্য তিনি একটি শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে সময়ের অপচয় না করে শিক্ষার্থীরা অল্প সময়ে লেখা-পড়া শিখতে পারে।

আকবরের সময় পাঠক্রম

মাদ্রাসায় ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। আকবরের সময় পাঠ-ক্রমের মধ্যে ছিল গণিত, জ্যামিতি, হিসাব, কৃষিবিদ্যা, জমির জরিপ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, দেহ-বিজ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি। সংস্কৃত পাঠক্রমের জন্য ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত ইত্যাদি নির্দিষ্ট ছিল। আকবর চেয়েছিলেন একটা যান্ত্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে একটা গতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন করতে যাতে শিক্ষার্থীরা অল্প সময়ে লেখা-পড়া শিখতে পারে। হিন্দু শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে তিনি পড়ার আগে লেখার প্রথা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ছাত্ররা যতটা সম্ভব নিজেরাই শিখবে। শিক্ষক তাদের সাহায্য করবেন মাত্র।

জাহাঙ্গীর সু-পণ্ডিত ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি নিয়ম করেন, কোন ধনীর উত্তরাধিকারী না থাকলে তার বিষয়সম্পত্তি শিক্ষামূলক কাজে ব্যয় হবে। তিনি বহু মাদ্রাসা স্থাপন করেন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংস্কার করেন। শাহ্‌জাহান যতটা জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন ততটা শিক্ষাপ্রিয় ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকালে দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক ভ্রমণকারী বার্ণিয়ে তাঁর সময়কার শিক্ষা-ব্যবস্থার হতাশজনক বিবরণ দিয়ে গেছেন। শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি হিন্দুদর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন ও উপনিষদ, গীতা সহ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

ঔরঙ্গজেব—ভারতের শেষ বিদ্যানুরাগী মুসলিম বাদশা হচ্ছেন ঔরঙ্গজেব। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন এবং এই ধর্মান্ধতাই তাঁকে মুসলিম শিক্ষা প্রসারের প্রেরণা যুগিয়েছে। যে উৎসাহ নিয়ে তিনি হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করেছেন, হিন্দু শিক্ষার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন, সেই উৎসাহ নিয়েই তিনি মুসলিম শিক্ষা-বিস্তারে মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি বড় বড় শহরে বিদ্বান মুসলমানদের জন্য পেন্সন ভাতার ব্যবস্থা

করেন। শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বহু মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গুজরাটে বোহরা সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ঔরঙ্গজেবের সময় রাজকীয় গ্রন্থাগার বহু মুসলিম ধর্মগ্রন্থে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর সময় শিয়ালকোট ইসলামিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থলরূপে খ্যাতি অর্জন করে। তাঁর নির্দেশে 'ফতোয়া-ই-আলমগীরি' নামে বিখ্যাত মুসলিম আইন-গ্রন্থ সংকলিত হয়।

ঔরঙ্গজেবের বাল্যের এক শিক্ষক মোল্লাসাহের সাথে কথোপকথনের বিবরণ 'বার্ণিয়ে' দিয়েছেন—তাতে দেখা যায়, তিনি তাঁর মোল্লাজীকে সংকীর্ণ শিক্ষা দেবার জন্য তিরস্কার করেছেন। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, মাতৃভাষা, অন্যান্য দেশের ভাষা ও দর্শন প্রভৃতি নিয়ে পাঠক্রম হওয়া উচিত বলে ঔরঙ্গজেব মনে করতেন। তিনি শিক্ষাকে দ্রুত ও কার্যকরী করার পক্ষপাতী ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের পর মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগের অবসান হয়। নাদিরশাহের আক্রমণের পর মোগল সাম্রাজ্য শুধু নামেই টিকে রইল। এর বহু পূর্বেই ইউরোপীয় মিশনারীদের উদ্যোগে ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গোড়া পত্তন হয়।

নারী শিক্ষা

মুসলিম যুগে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘরে বসে বসে কোরানের সুরা আবৃত্তি করতে শিখত। রাজ পরিবার ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মধ্যে বিদ্যার সমাদর ছিল বলে মনে হয়। মোগল যুগে কয়েকজন বিদুষী মহিলা সাহিত্যচর্চা করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। মক্তবে বালিকারা সাত বছর পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত; তারপরই তারা অন্তঃপুরের কারাগারে আবদ্ধ হ'ত।

মক্তব ও মাদ্রাসা :—মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থায় মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। প্রতিটি মস্‌জিদের সাথেই প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্ররূপে মক্তব যুক্ত থাকত। ধর্মীয় রীতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় কোরানের অংশবিশেষ শিক্ষার জন্য মুসলিম শিশুকে মক্তবে পাঠান হ'ত। শিশুর বয়স যখন চার বছর চার মাস চার দিন সেদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুকে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করা হ'ত। মক্তব-গুলিকে প্রধানতঃ কোরান শিক্ষার স্কুলই বলা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য মক্তবে প্রাথমিক লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখান হ'ত। মুসলিম যুগে মাদ্রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। মাদ্রাসা সাধারণতঃ মস্‌জিদ সংলগ্ন হ'ত। এখানে পাঠক্রম ছিল ব্যাপক। ফার্সী ভাষার মাধ্যমে এখানে ব্যাকরণ, অলংকার, তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, আইন, বিজ্ঞান চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। মাদ্রাসায় আরবী ভাষা শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। মাদ্রাসার শিক্ষাকে বর্তমান যুগের কলেজের শিক্ষার সমতুল বলে গ্রহণ করা যায়।

॥ ভারতে মুসলিম শিক্ষার অবদান ॥

ভারতে মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল অল্প-সংখ্যক ধর্মান্তরিত লোকের কোরাণ ও ধর্মীয় আচরণ শিক্ষা দেবার জন্য। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে

একটা বিরূপ মনোভাব নিয়ে বিজয়ী মুসলিম শক্তি যেভাবে মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তা কোনদিনই জাতীয় শিক্ষার রূপ গ্রহণ করে নি। ইসলামিয় শিক্ষা-ব্যবস্থা অত্যন্ত ধর্মকেন্দ্রিক হওয়ায় দেশের জনসাধারণ ঐ শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ পান নি। মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে মাদ্রাসায় শুধুমাত্র মুসলিম শিক্ষার্থীরাই শিক্ষালাভ করত। সেকেন্দার লোদীর সময় থেকে হিন্দুরা সরকারী চাকুরী পাবার জন্য ফার্সী শিখতে শুরু করে। বাস্তব বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে হিন্দুরা মাদ্রাসার শিক্ষাকে গ্রহণ করে।

ধর্মকেন্দ্রীক শিক্ষা

ভারতে মুসলিম শাসনকালে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়। মুসলমানেরা বহুদিন এদেশে থাকার ফলে হিন্দু-মুসলমানের একটি সংমিশ্রিত সাংস্কৃতিক ধারার সৃষ্টি হয়। এই মিলন থেকেই উর্দু ভাষার উদ্ভব। হিন্দীর সাথে ফার্সী ও আরবী ভাষার বহু শব্দ মিলিয়ে এই ভাষাটির সৃষ্টি। ফার্সী হরফে উর্দু ভাষা লেখা হয়। উর্দু কথার অর্থ হচ্ছে শিবির, সৈন্যদের শিবির থেকেই এই ভাষার উদ্ভব হয়েছিল বলে একে উর্দু বলা হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভাবের আদান-প্রদান সহজতর করবার জন্যই এ ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল।

উর্দু ভাষার উদ্ভব

সুলতানী আমলে আমরা দেখতে পাই আঞ্চলিক ভাষা সমূহ বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দী, মারাঠা, বাংলা ও ব্রজ ভাষা প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ এ-যুগে সাধিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ ও মহাভারত বাংলায় অনুদিত হয়েছিল। নুসরৎ শাহের আমলেও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুকে হুসেন শাহ "গুণরাজ খাঁ" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারত অনুবাদ করিয়েছিলেন। এই অনুবাদ পরাগলী মহাভারত নামে খ্যাত। পরাগল খাঁয়ের পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব বাংলায় অনুবাদ করান। মুসলিম যুগে চণ্ডী ও মনসার কাহিনী নিয়ে চণ্ডী মঙ্গল ও মনসা মঙ্গলের বহু কবির আবির্ভাব ঘটে। এছাড়া ধর্ম মঙ্গলের কাহিনী নিয়েও অনেক কবি কাব্য রচনা করেন। চৈতন্যদেবের জীবনকে অবলম্বন করে এই যুগে রচিত 'চরিত সাহিত্য' সমূহ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

মুসলিম আমলে বাংলা ভাষাও সাহিত্যের সমৃদ্ধি

মধ্য যুগে হিন্দুদের টোল ও পাঠশালার মত মুসলমানদের মাদ্রাসা ও মক্তব উচ্চ ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়েছে। উভয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুশিষ্যের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। মুসলিম সমাজেও শিক্ষকের জন্য একটা মর্যাদার আসন নির্দিষ্ট ছিল। 'সর্দার পোড়ো' প্রথা উভয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল।

সুলতানী আমলে ইতিহাস রচনার এক বিস্ময়কর আগ্রহ দেখা যায়। সেই যুগের ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে আমরা সুলতানী যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে পারি। ইতিহাস রচনার ধারা মোগল যুগেও অব্যাহত ছিল। প্রাচীন ভারতের

ইতিহাস বিমুখীনতার জন্য ইতিহাস কি চরিতকাহিনী সে যুগে রচিত হয় নি। মুসলিম যুগে ইতিহাস জীবনস্মৃতি ও জীবনী রচনায় সমৃদ্ধ। মোগল সম্রাটদের সকলেরই জীবনী আমরা পেয়েছি। মুসলিম যুগেই প্রথম চরিত-সাহিত্য রচিত হয়। সাহিত্য শুধুমাত্র দেব-দেবীর কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেবোপম মানুষের জীবনী রচিত হয়।

ইতিহাস রচনা

মুসলিম শিক্ষা দেশের শাসকের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ায়, মুসলিম আমলে শিক্ষার গতির স্থিরতা ছিল না। কোন সম্রাট হয়ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন সুতরাং তাঁর সময় শিক্ষার যে উদ্দীপনা দেখা যেত, ঠিক তার পরবর্তী শাসক যদি শিক্ষায় ততটা অনুরাগী না হতেন তাহলে সেই সময়ে সে পরিমাণে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা হ'ত। মুসলিম যুগের সমৃদ্ধির অবসানের সাথে সাথে মাদ্রাসাগুলিও চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়। শাসনতান্ত্রিক অনির্ভরশীলতার জন্য মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থা কোনদিনই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে পারে নি, তবুও ধর্মশিক্ষার কেন্দ্ররূপে মসজিদ-সংলগ্ন মক্তবগুলি চিরদিনই মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়েছে। মক্তবের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে লৌকিক শিক্ষার দিকে একটু উৎসাহী হ'ত, তাহলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরক্ষরতা এতটা ব্যাপক হ'ত না।

মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

বর্তমান যুগে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে যা বোঝান হয় (—লেখা, পড়া ও সামান্য গণিত শেখার ব্যবস্থা করা) প্রাচীন ভারতে সে অর্থে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের কাজ চালাবার মত শিক্ষাই যে শিক্ষাদর্শের শেষ কথা সেরূপ শিক্ষাদর্শ প্রাচীন ভারতীয়দের মনে কোন রেখাপাত করে নি। আদি ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বেদ শিক্ষাই ছিল শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। লৌকিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা তখনও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। বেদ শিক্ষার প্রস্তুতিই ছিল বাল্যের শিক্ষা।

লিপির ব্যবহার প্রচলিত হবার পর লেখা ও পড়া প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়। মহাবগ্‌গ থেকে জানা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বছরের পূর্বেই লেখা-পড়া ও অঙ্ক শেখার ব্যবস্থা ছিল। হস্তীগুম্ফার খোদিত শিলালিপিতে (খ্রীঃ পূঃ ১৫৭ বা ১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) কলিঙ্গের রাজা খারবেলের শিক্ষার যে বর্ণনা আছে তা থেকে জানা যায় তিনি লেখা-পড়া বাল্যে শিখেছিলেন।

লিপির প্রচলন

লিপির প্রচলন হবার পর শিক্ষার্থীরা লিখে শিখবার সুযোগকে অবহেলা করত বলে মনে হয় না। প্রথম অবস্থায় যখন প্রাকৃত ভাষার লিখিত রূপ হয় নি তখন প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতই শিখতে হ'ত। প্রাথমিক ব্যাকরণ, ধ্বনি-তত্ত্ব, ছন্দ ও গণিত প্রাথমিক পাঠক্রমের অন্তর্গত ছিল বলে মনে হয়। সে যুগে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার কি ব্যবস্থা ছিল সে সম্পর্কে আমাদের

লিপির ব্যবহার

সঠিক ধারণা নেই। প্রথম অবস্থায় পরিবারের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, পরে বৈদিক শিক্ষার জন্য শিশুকে গুরুগৃহে পাঠান হলে সেখানে গুরুই প্রাথমিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন। কোন কোন অঞ্চলে সম্ভবতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। জাতক থেকে জানা যায় ধনীর পুত্ররা যখন পাঠশালায় যেত তখন ভৃত্যেরা তাদের কাষ্ঠফলক (শ্লেট) নিয়ে তাদের অনুসরণ করত। ললিত-বিস্তর থেকে জানা যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দ্বারকাচার্য বলা হ'ত। অনুমান করা হয় বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিহারের নিকটবর্তী গ্রামে শিশুদের শিক্ষা দিতেন।

খ্রীষ্ট জন্মের পর থেকে দেখা যায় আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা একটা সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে। শিশুর পাঁচ বছর বয়সে শুভদিন দেখে বিদ্যারম্ভ বা অক্ষর স্বীকরণ সংস্কারের মধ্য দিয়ে শিশুকে বর্ণ পরিচয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। অক্ষর পরিচয়, যুক্তাক্ষর প্রভৃতি শিখতে প্রায় ছয় মাস ব্যয় হ'ত। গণিতের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রায় এক বছর লাগত। খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দ থেকে ২৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিল প্রাকৃতের প্রাধান্যের যুগ। তাই শিক্ষার্থীকে প্রাকৃত শিখতে কিছু সময় ব্যয় করতে হ'ত। ২৫০ খ্রীঃ পর আবার সংস্কৃত প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় থেকে আবার প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কৃত দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্যায় ৮—১১ বছর বয়সে শিক্ষার্থীকে পাণিনির সূত্র ও সহজ ব্যাকরণের সূত্র অভ্যাস করতে হ'ত।

প্রাথমিক শিক্ষার রূপ

প্রাচীন ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্ভব কি করে হয়েছিল এ সম্পর্কে সঠিক কিছুই বলা যায় না। তবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়েছিল। সর্বসাধারণের জন্য লিপিমালা প্রথম অবস্থায় খুব কমই ছিল। তখন শিক্ষা ছিল প্রধানতঃ পরিবারনির্ভর। এ ছাড়া শিক্ষক নিজগৃহে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। পরিবারের পুরোহিতের উপরও কোন কোন স্থানে প্রাথমিক শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। মন্দির সংলগ্ন গ্রাম্য পাঠশালা দেখে অনুমান হয়—প্রাচীন যুগে কোন কোন স্থানে এই ভাবেই পাঠশালার উদ্ভব হয়েছিল। শুধু মাত্র রোজগারের উপায়রূপে ও পরবর্তীকালে যে কোন বর্ণের সামান্য শিক্ষিত লোকও পাঠশালা খুলে বসত। বৈশ্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজ নিজ শিশুদের পৈতৃক বৃত্তি শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করত। এই মহাজনী বিদ্যালয়গুলি দক্ষিণ ভারতে বহুদিন টিকে ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা

প্রাথমিক শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য—সব বর্ণের লোকেরই এখানে শিক্ষকতার অধিকার ছিল। স্মৃতির যুগ থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে অ-ব্রাহ্মণ শিক্ষকের আবির্ভাব হয়েছিল বলে জানা যায়। কোন কোন স্মৃতিতে অব্রাহ্মণ শিক্ষকের নিকট ব্রাহ্মণ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা-গ্রহণে আপত্তি জানান হয়েছে। শিক্ষকদের অবস্থা আবার সর্বত্র একরূপ ছিল না। ছাত্রদের স্বেচ্ছাদত্ত দক্ষিণা (বেতন), বিভিন্ন পালা-পার্বণে ও পূজা-শ্রাদ্ধে পাওনা দানের উপর শিক্ষককে নির্ভর করতে হ'ত।

শিক্ষাদানে সবার অধিকার

সে যুগের শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত। ধনী সন্তানেরা কাঠের ফলকের উপর রং দিয়ে লিখত। গরীব ছেলেরা মাটির উপর বালু ছড়িয়ে আঙ্গুল বা কাঠি দিয়ে বর্ণমালা লিখতে শিখত। শিক্ষক একটি বর্ণ লিখতেন, শিক্ষার্থীরা তা উচ্চারণ করে লিখত। এরপর লোহার শলা দিয়ে তালপাতার উপর অক্ষর লিখে দেওয়া হ'ত। ছাত্ররা খাগের কলম বা পালকের কলম দিয়ে তার উপর লিখত। বর্ণমালা শিক্ষার এই প্রাচীন পদ্ধতি কিছুদিন পূর্বেও প্রচলিত ছিল। গুণের নামতা সমস্বরে আবৃত্তি করে পড়বার পদ্ধতিও অতি প্রাচীন। সে যুগে হাতের লেখার প্রতি বেশী জোর দেওয়া হ'ত। সুন্দর হস্তাক্ষরকে সে যুগে শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া হ'ত।

ব্যক্তিগত শিক্ষা

আধুনিক যুগের প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব। কিন্তু সে যুগের প্রাথমিক শিক্ষাকে টোলের শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব বলে গ্রহণ করা যায় না। টোলের উচ্চ শিক্ষার সাথে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা যতই ত্রুটিপূর্ণ হউক না কেন, সাধারণ মানুষ একে প্রয়োজনীয় শিক্ষা (Useful Knowledge) বলেই মনে করত।

প্রয়োজনীয় শিক্ষা

যতদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উপণয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল ততদিন প্রাথমিক শিক্ষা এদেশে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছিল। বিদ্যারম্ভ সংস্কারের পর স্বাভাবিকভাবেই উচ্চবর্ণের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষালাভ করত। ডঃ আলটেকার অনুমান করেন খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী ত্রি-বর্ণের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৮০জন।

ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষা

ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের মধ্যে উপণয়ন প্রথা বন্ধ হয়ে যাবার পর শিক্ষার চাপ কমে যাওয়ায় অতি অল্প-সংখ্যক লোক স্বেচ্ছায় শিক্ষাগ্রহণ করত। এছাড়া মেয়েরাও শিক্ষায় বঞ্চিত হয়েছিল। তাই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দেশে স্বাক্ষরের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল।

অবস্থার অবনতি

প্রাচীন যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্ভব পাঠক্রম, শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষক প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা কোন বিস্তৃত বিবরণ পাই নি। আধুনিক যুগের শুরুতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাম্য পাঠশালার যে চিত্রটি আমরা পাই তা থেকেই সে যুগের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পাঠশালার রূপ কল্পনা করে নিতে হয়। আধুনিক সমালোচকগণ আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনায় মুখর হলেও দেশীয় শিক্ষার প্রশংসার দিকটাও আছে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত। যোগ্য শিক্ষার্থী আপন যোগ্যতা বলে এগিয়ে যেতে পারত। এর ফলে প্রতিভার অপচয়ের সম্ভাবনা কম ছিল। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিক্ষার্থীকে গুরুমহাশয় তাঁর কাজের সাহায্যে নিয়োগ করতেন। এর ফলে এক শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অভাব কিছুটা পূর্ণ হ'ত। পড়ার আগে লেখা

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসংশনীয় দিক

শেখানো, বালুর উপর লিখে মাংসপেশীকে লেখায় অভ্যস্ত করা এ সব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথা এদেশে বহুদিন থেকেই প্রচলিত ছিল।

অতি প্রাচীন যুগে যে প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল, বহু ভাঙ্গা-গড়া ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও সেই শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রামীণ ভারতের শিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়েছে। আধুনিক শিক্ষারীতি প্রচলিত হওয়ার বহুদিন পরেও দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাই জনপ্রিয় শিক্ষা ব্যবস্থা। এডাম, মনরো, থমসন্ প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণ এই সম্ভাবনাপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করে এর উপর জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন।

প্রশ্নাবলী

1. Estimate the contributions of the Muslim kings in the field of education.
2. Give a brief account of education that prevailed in India in the mediaeval period and its influence on the present system, if any. [B. T. 1967]
3. Describe briefly the contributions of some Mughal emperors for furthering the fame of education in mediaeval India. [C. U. 71]

শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস

দ্বিতীয় পর্ব

আধুনিক যুগ

শি. দ. প.—৫

দ্বিতীয় পর্ব

আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে দেশীয় শিক্ষা—ব্যবস্থা ও এডামের রিপোর্ট

বর্তমান ভারতে আমরা যে শিক্ষাধারার সাথে পরিচিত সেই নব্য শিক্ষা-ধারার প্রবর্তন হয় ইউরোপীয় বণিকগণ এদেশে আসবার পর। পাশ্চাত্য বণিকগণ এদেশে আসবার প্রায় সাথে সাথেই মিশনারীগণ এদেশে এসে উপস্থিত হন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উন্মাদনায় দেশীয় ভাষা শিখে তাঁরা বাইবেলের অনুবাদ, খ্রীষ্টের বাণী প্রচার এবং দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনভার লাভ করবার পর ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত হয়। ইংরেজ এদেশে শাসনভার গ্রহণ করবার পূর্বে এদেশে অতি প্রাচীন একটি নিজস্ব শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল।

॥ আধুনিক পূর্ব ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ॥

একটি সুপ্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিকে সমূলে উৎপাটিত করে যে বিদেশী শিক্ষা-পদ্ধতি চালু হ'ল সেই নতুনকে জানবার আগে জাতীয় শিক্ষার লুপ্ত ধারাটিকে জানা দরকার।

মুসলিম যুগে প্রাচীন হিন্দুবৌদ্ধ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা অতীত গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেও তাহা দেশের জনসাধারণের শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতেও আপন সম্মানের স্থানটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই সময়ে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল কিন্তু রুদ্ধ হয়ে যায় নি। মুসলিম আমলে মুসলিম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটা নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল। ভারতের বুকে এই দুইটি শিক্ষা-ধারাই সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হ'বার পরেও বহুদিন এই দুইটি ধারার মধ্যেই অতীতের ঐতিহ্যময় শিক্ষাব্যবস্থা আপন অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিদেশী শাসকগণ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এরা দেশীয় শিক্ষাকে 'অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন' মনে করত। ভারতবন্ধু যে সামান্য কয়েকজন ইংরেজ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন নব্যতন্ত্রীদের বিরোধিতায় তাঁদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ভারতের লুপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্যকরূপে জেনেই আধুনিক ভারতের শিক্ষার ধারাকে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে কিন্তু এই চলার পথে বিঘ্ন অনেক। ভারতীয়গণ ইতিহাস বিমুখ জাতি। এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের নেই যা দিয়ে জাতীয়

শিক্ষার সঠিক ইতিহাস আমরা জানতে পারি। উনবিংশ শতকে ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু এই তথ্য পর্যাপ্ত বা খুব নির্ভরশীল নয়, যার উপর নির্ভর করে জাতীয় শিক্ষার সঠিক রূপটিকে আমরা ধারণা করতে পারি। তথ্য যা সংগ্রহ করা হয়েছে তা ইংরেজ শাসিত অঞ্চল থেকেই হয়েছিল।

দেশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা শাসিত ভারতের একটা বিশাল অংশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা করবার মত কোন উপাদানই আমাদের নেই।

॥ E. I. CO.-র কোর্ট অব ডিরেক্টর্স'দের নির্দেশ ॥

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর্স্ এক পত্র লেখেন। এই পত্রের নির্দেশ অনুসারে ১৮২২ খ্রীঃ মাদ্রাজের গভর্ণর স্যার টমাস মনরো প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহের আদেশ দেন। বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলিফিনস্টোনের আদেশে ১৮২৩ খ্রীঃ এই প্রদেশের কলেক্টরগণ প্রথম শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। দু'বছর বাদে আবার বিচার বিভাগের দ্বারা তথ্য সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশে লর্ড বেণ্টিংকের আদেশে উইলিয়ম এডাম নামে একজন ভারতহিতৈষী শিক্ষাব্রতী মিশনারী ১৮৩৫-৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করে পরপর তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন। দিল্লী ও নাগপুর জেলায়ও কিছু তদন্ত হয়েছিল, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। সংগৃহীত তথ্য সমূহের মধ্যে এডামের তথ্যই নির্ভরযোগ্য ও প্রায় নির্ভুল।

মাদ্রাজ :—

মনরো যে রিপোর্ট পেয়েছিলেন তাতে দেখা যায় মাদ্রাজে প্রতি ৬৭ জনে ১ জন শিক্ষা পেত। এই সময় এই প্রদেশে মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাদি ছিল না, তাছাড়া রিপোর্টে এক মাদ্রাজ শহর ভিন্ন অন্য কোন জেলার গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের ধরা হয় নি, মনরো হিসেব করে দেখেছেন যে, মোট জনসংখ্যা থেকে মেয়েদের বাদ দিয়ে ৫ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের এক তৃতীয়াংশ বা সমগ্র জনসংখ্যার এক নবমাংশ শিক্ষালাভ করেছিল।

মনরো বলেছিলেন ইংলণ্ডের তুলনায় এদেশের শিক্ষার ব্যবস্থা খারাপ, কিন্তু ইউরোপের জন্য যে কোন দেশে কিছুদিন পূর্বেও শিক্ষার যে অবস্থা ছিল সেই তুলনায় এদেশের (ভারতের) শিক্ষার অবস্থা ভাল। নিঃসন্দেহে বলা যায় কিছুদিন পূর্বে আরও অনেক ভাল ছিল।

বোম্বাই :—

বোম্বাই প্রদেশে ১৮২৪-২৫ খ্রীঃ এবং ১৮২৯ খ্রীঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শিক্ষা সম্পর্কীত তথ্য সংগৃহিত হয়, এই তথ্যসমূহ পরস্পর বিরোধী বলে খুব নির্ভরযোগ্য নয়। এই প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে শ্রী আর, ভি, পার্লেকর তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন রাজ-পুরুষেরা যে সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা দেখে মনে হয় এই প্রদেশের সাধারণ

অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। বোম্বের গভর্ণর কাউন্সিলের সদস্য জি. এল. প্রেণ্ডারগাষ্ট লিখেছেন: *"There is hardly a village, great or small throughout our territories in which there is not at least one school and in larger villages more, many in every town and in larger cities in every division where young natives are taught reading, writing and arithmetic……"*

॥ এডামের বিবরণী ॥

বাংলার শিক্ষা সমীক্ষা এডামের প্রচেষ্টা :—

বাংলা দেশে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তার পিছনে কোন সরকারী প্রচেষ্টা ছিল না। স্কটল্যাণ্ডবাসী সহৃদয় মিশনারী উইলিয়াম এডাম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের ভার গ্রহণ করেন। ১৮২৯ খ্রীঃ তিনি তৎকালীন গভর্ণরজেনারেল বেণ্টিংককে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। তাঁর থেকে কোন জবাব না পেয়ে তিনি ১৮৩৪ খ্রীঃ আবার পত্র দেন। এই পত্রে তিনি জানান তিনি নিজেই এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী আছেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ সপরিষদ বড়লাট তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। বাংলা-দেশের শিক্ষা সম্পর্কীয় অনুসন্ধানের জন্য এডাম কমিশনার নিযুক্ত হন। তাঁকে মাত্র কয়েকটি জেলার অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮৩৫—৩৮ খ্রীঃ মধ্যে এডাম এই অনুসন্ধানের কাজ শেষ করেন। বহু পরিশ্রম করে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টে তাহা সরকারের নিকটে পেশ করেন। বাংলা ও বিহারের তৎকালীন দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কীয় একটি নির্ভুল ও অবিকৃত চিত্র তুলে ধরাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কিত এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ আমাদের আর নেই।

॥ এডামের প্রথম রিপোর্ট ॥

১৮৩৫ খ্রীঃ ১লা জুলাই এডাম প্রথম বিবরণীটি পেশ করেন। এই বিবরণীটিতে পূর্বে সংগৃহীত কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটা সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে। এডাম এই বিবরণীতে জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইন্সষ্ট্রাকসনের এক বিশিষ্ট সদস্যের মতামতের উপর নির্ভর করে বলেছিলেন বাংলা বিহারে চার কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ পাঠশালা ও মক্তব ছিল। বাংলা ও বিহারের লোক সংখ্যার অনুপাতে প্রতি ৪০০ লোকের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। দেশে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। গৃহ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল।

হার্টগের প্রতিবাদ ও এডামের সততা :—

স্যার ফিলিপ হার্টগ এক লক্ষ বিদ্যালয়ের হিসেবটিকে কাল্পনিক বা উপকথার (myth or legend') সামিল বলে মন্তব্য করেছেন। এডামের এই উক্তি নিয়ে বহু

বাদ প্রতিবাদ হয়েছে। তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মক্তব ও বিদ্যালয় বলতে এডাম কি বুঝাতে চেয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করলে এই হিসেবকে অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় না। স্কুল বলতে বর্তমান ধারণা অনুযায়ী আমরা যদি বুঝি 'আধুনিক' "কেতাদুরস্ত বিদ্যালয়" তাহলে এডামের উক্তি নিশ্চয়ই সত্যের অতিরঞ্জিত অপলাপ (fantastic exaggeration of facts)। কিন্তু এডাম, স্কুল বলতে আধুনিক ধরনের যে স্কুল আমরা বুঝি তা মনে করেন নি। তখন গৃহ শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল, কোন পরিবারে শিক্ষক দিয়ে বা আপন পরিজনদের দিয়ে এককভাবে সমষ্টিগতভাবে যে শিক্ষা দেওয়া হ'ত তাকেও বিদ্যালয় বলা হ'ত। এডাম রাজসাহী জেলা সম্পর্কে বলেছেন, এই জেলার প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থা ও গৃহ শিক্ষা ব্যবস্থা (*"Public private according as it is communicated in Public School or in private families"*)। এডামের সততা সম্পর্কে কেউ সন্দেহ করেন নি। তাঁর সবচেয়ে বড় বিরুদ্ধ সমালোচক হার্টগ বলেছেন এডাম প্রদত্ত পরিসংখ্যান সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি (*could not "summarize his statistics clearly"*)। এডামের সমগ্র রিপোর্ট থেকে আমরা তাঁর বিচার বুদ্ধি ও পর্যালোচনা শক্তির যে পরিচয় পাই তাতে হার্টগের উক্তি মেনে নেওয়া যায় না। এডামের পূর্বে মন্‌রো বলেছেন, মাদ্রাজে প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, বাংলা দেশে মিঃ ওয়ার্ড দেখেছেন প্রায় প্রতি গ্রামে লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখবার মত বিদ্যালয় রয়েছে, মিঃ ম্যালকম দেখেছেন মালবে যেখানে একশ' ঘর বাসিন্দা আছে সেখানেই একটা স্কুল আছে এমন কি লর্ড মেকলে পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে বাংলা দেশে আশী হাজার বিদ্যালয় আছে। সর্বপ্রকার সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েও ভারতের গ্রাম সমূহে যে একটা নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্যে তাই প্রমাণিত হয়। বাংলার প্রতি গ্রামেই একটি স্কুল ছিল (পারিবারিক বা সাধারণ স্কুল) একথা সরকারী তথ্যের সাহায্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সবদিক বিচার করে এডামের হিসেবকে অবিশ্বাস করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

॥ এডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট ॥

রাজসাহী জেলার নাটোর-থানার শিক্ষা সমীক্ষা :—

এডাম ১৮৩৫ খ্রীঃ ২৩শে ডিসেম্বর তাঁর দ্বিতীয় বিবরণী পেশ করেন। এই বিবরণীতে তিনি রাজসাহী জেলার নাটোর থানার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করে তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে উপস্থাপিত করেন। নাটোর থানার লোক-সংখ্যা ছিল, ১,৯৬,২৯৬ জন, এর মধ্যে মুসলমান ১,২৯,৬৪০ জন, ৬৫,৬৫৬ জন হিন্দু। এই থানার মোট ৪৮৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২৭টি, যার মোট সংখ্যা ২৬২ জন এর মধ্যে ১০টি বাংলা স্কুলে ছাত্র ছিল ১৬৭ জন, ২টি ফার্সী স্কুলে ২৩ জন, ১১টি

কোরান শিক্ষার আরবী স্কুলে ছাত্র ছিল ৪২ জন, ২টি ফার্সী ও বাংলা মিশ্র স্কুলে ছাত্র ছিল ৩০ জন। এই প্রাথমিক স্কুলগুলির বাইরে ১৫৮৮টি পরিবারে তাদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল যেখানে ২৩৪২টি শিশু শিক্ষা পেত অর্থাৎ সাধারণ স্কুলে যে ছাত্র পড়ত তার চেয়ে নয় গুণ বেশী ছাত্র পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষালাভ করত। মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এডাম লিখেছেন, অজ্ঞতার গভীর ও হতাশাময় অন্ধকারে মেয়েরা ডুবে ছিল। কোন কোন পরিবারে একান্ত নিজস্বভাবে মেয়েদের কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হ'ত।

স্কুলগুলিতে গড় ৮ বছর বয়সে ছেলেরা ভর্তি হ'ত আর ১৮ বছর বয়সে শিক্ষা শেষ করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গড় মাসিক বেতন ছিল সাড়ে পাঁচ টাকা। নাটোর থানায় এডাম ৩৮টি সংস্কৃত শিক্ষার কলেজ (টোল) দেখেছেন। এখানে ৩৯৭ জন ছাত্র শিক্ষা পেত। উচ্চ শিক্ষা শুরু হ'ত সাধারণতঃ ১১ বছর বয়স থেকে, শেষ হ'ত ২৭ বছর বয়সে। সব ছাত্র এখানে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করত। দূরবর্তী স্থান থেকে এসব উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে ছাত্ররা আসত, তাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা অধ্যাপকই করতেন। নাটোর থানায় সমগ্র পুরুষ জনসংখ্যার আনুপাতিক শিক্ষার হার ছিল ৬.১% নারী, পুরুষ মিলিয়ে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ৩.১%

॥ এডামের তৃতীয় রিপোর্ট ॥

পাঁচটি জেলার সমীক্ষা :—

১৮৩৭ খ্রীঃ ২৮শে এপ্রিল এডাম তাঁর তৃতীয় বিবরণীটি পেশ করেন। তিনটি বিবরণীর মধ্যে এইটি বিশেষ মুল্যবান ও উল্লেখযোগ্য। এই বিবরণীতে বাংলা ও বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ব্যাপক চিত্র দেওয়া হয়েছে. এই বিবরণীর প্রথম **অংশে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিহুত, এবং দক্ষিণ বিহার এই পাঁচটি জেলার শিক্ষা সম্পর্কীয় তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।** দ্বিতীয় অংশে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এডাম তাঁর নিজস্ব প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন।

এই বিবরণীর মুখবন্ধেই তিনি স্বীকার করেছেন যে, প্রতি জেলায় মাত্র একটি থানার কাজ তিনি পরিচালনা করেছেন, বাকী থানার কাজ লোক দিয়ে করাতে হয়েছে। ফলে পরিসংখ্যাগত কিছু ক্রটি হয়ত রয়ে গিয়েছে।

যে পাঁচটি জেলায় তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন সে পাঁচটি জেলায় মোট ২৫৬৭টি স্কুলে ৩০,৯১৫ জন ছাত্র শিক্ষা পেত। তিনি ২৪২ জন ইংরাজী শিক্ষার্থীর সন্ধানও এই স্কুলগুলিতে পেয়েছিলেন। এই হিসেবে পারিবারিক বিদ্যালয় সমূহকে ধরা হয় নি। বিদ্যালয়গুলি ছিল সাত প্রকার—বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবীয়, ফরমাল আরবী ও মেয়েদের স্কুল। সমগ্র জেলায় পারিবারিক বিদ্যালয়ের সন্ধান না করতে পারলেও তিনি প্রতি জেলায় একটি করে থানার পারিবারিক বিদ্যালয়ের অনুসন্ধান করেছিলেন।

এডাম বর্দ্ধমান জেলায় ৪টি, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় একটি করে মোট ৬টি বালিকা বিদ্যালয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই ছয়টি বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ২১৪ জন।

॥ এডামের প্রদত্ত শিক্ষা পরিসংখ্যান ॥

দেশের শিক্ষিতের হার সম্পর্কে এডাম একটি তথ্যপূর্ণ পরিসংখ্যান (statistics) দিয়েছেন। এই তথ্য সম্পর্কে হার্টগ মন্তব্য করেছেন, "*the first systematic census of literacy in India.*" এই পরিসংখ্যানে এডাম শিক্ষিত জনসংখ্যাকে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ধরা হয়েছিল যারা শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারে। শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষরকারীদের শিক্ষত বলে স্বীকার করতে হার্টগের আপত্তি আছে তাই তিনি এই হিসেবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বর্তমান যুগের শিক্ষার মানদণ্ডে সেই যুগের বিচার করতে বসলে বিচারের নামে অবিচারই করা হবে। শিক্ষিতের হার নির্ণয়ে এডাম যে নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই নীতিই যুগোপযোগী। **এডামের প্রদত্ত হিসেব অনুসারে দেখা যায় ছয়টি থানার মোট জনসংখ্যা ৪,৯৬,৯৭৪ জন। এর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৮,৬৯৭ জন অর্থাৎ মোট সংখ্যার ৫·৮% শিক্ষিত।** ১৯২১ খ্রীঃ জনগণনায় শিক্ষিতের হার ছিল ৭·৩%। **মহাত্মা গান্ধী ১৯৩১ খ্রীঃ গোলটেবিল বৈঠকে এই পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে ভারতে ইংরেজ শাসনের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা বলেন।** গান্ধীজির উক্তির অসারতা প্রমাণের জন্য স্যার ফিলিফ হার্টগ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বক্তৃতা দেন, এবং এডামের পরিসংখ্যানকে কল্পনা বলে ঘোষণা করেন। এডামের দেওয়া হিসেব যে বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা ভারতের বহু শিক্ষাবিদ্ যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেছেন। উপরের আলোচনায় এডামের সিদ্ধান্ত যে প্রকৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই প্রমাণিত হয়।

॥ এডামের রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষা ॥

টোল :—এডামের বিবরণীতে আমরা দেখতে পাই দেশের শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক। বর্তমানের ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষা বলে কিছু ছিল না। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি পড়ান হ'ত। দেশীয় ধনী ব্যক্তিগণ আর্থিক সহায়তার দ্বারা উচ্চশিক্ষার পরিপোষণ করতেন। প্রাথমিক শিক্ষার বেতন লাগত কিন্তু উচ্চশিক্ষা ছিল অবৈতনিক। দূরাগত ছাত্রদের জন্য অধ্যাপকগণ নিজগৃহে ছাত্রদের থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা করতেন। উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্রদের কোন ব্যয় বহন করতে হ'ত না। রিপোর্টে দেখা যায় আলোচ্য এলাকায় ১৯০টি টোল ও ২৯টি কেন্দ্রে আরবী-ফারসী উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এডামের অনুমান সারা বাংলায় ১৮০০টি টোল ও ১২,৬০০ জন অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপকগণ নিজগৃহে বা ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় বা চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপনা করতেন। ছাত্ররা ছিল

অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, সামান্য সংখ্যক অন্য উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রও টোলে পড়ত। এখানে ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি পড়ান হ'ত।

মাদ্রাসার শিক্ষা :—

আরবী ফারসী মাদ্রাসাগুলি বসত সাধারণতঃ মসজিদে। মাদ্রাসার অধ্যাপকগণ মুসলমানই হতেন। তবে ফার্সী শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু অধ্যাপকও দেখা গিয়েছে। ফার্সী ছিল তখনকার সরকারী ভাষা। তাই চাকুরীর জন্য হিন্দু কায়স্থরা ফার্সী ভাষা শিক্ষা করতেন। দেখা যায় আলোচ্য এলাকার ফার্সী স্কুলগুলিতে মুসলমান ছাত্র ছিল ৫৫৯ জন, হিন্দু ছাত্র ৮৩৫ জন। এই হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কায়স্থ ছিল ৭১১ জন। ধনী মুসলমানদের মধ্যে 'আখন্‌জি' রেখে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা ছিল। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত আর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অতি অপ্রচুর। এই শিক্ষায় পাণ্ডিত্য লাভ হ'ত কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ছিল প্রাথমিক শিক্ষা। এই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য এডাম কয়েকটি সুপারিশ করেন।

এডামের মন্তব্য :—

তৃতীয় বিবরণীর শেষ অংশে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে মৃত্যুপথযাত্রী দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে কি করে বাঁচিয়ে তুলে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিরূপে দাঁড় করান যায় সে সম্পর্কে এডাম কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে এবং বেশ কিছু দিন ধরেই ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। **এই শিক্ষা ব্যবস্থা স্থিতিশীল, প্রগতিশীল, ক্ষয়িষ্ণু যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার যে কোন আয়োজন সার্থক করে তুলতে হলে এই ভিত্তির উপরই তাকে দৃঢ় করে দাঁড় করাতে হবে। স্মরণাতীতকাল থেকে এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, প্রগতিশীল স্থায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে একেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে।**

এডাম তাঁর মন্তব্যে **চুঁইয়ে পড়া নীতির** (downward filteration theory) তীব্র সমালোচনা করে এর বিরোধিতা করেছেন। উনবিংশ শতকে বিদেশী শাসকসম্প্রদায় ও দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতেন যে প্রথমে উচ্চবর্ণের লোকদের শিক্ষা দিতে হবে। উচ্চবর্ণের মধ্যে নব্য শিক্ষার প্রসার হলে সেই শিক্ষা ধীরে ধীরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে চুঁইয়ে নেমে অবশেষে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তাই প্রথমে জনসাধারণের শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেবার আবশ্যকতা নেই। উচ্চ বর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হলেই তা আপনা থেকেই জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এডাম বললেন, লোকে শুরুতেই কলেজে যায় না—বর্ণ পরিচয় থেকেই শুরু হোক। সুউচ্চ প্রসাদের ভিং থাকে মাটির গভীরে। ধাপে ধাপে শিক্ষাসৌধ গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দেবার জন্য তিনি যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন পরীক্ষামূলকভাবে তিনি তা মাত্র দু'টি জেলায় প্রয়োগ করবার কথা বলেছিলেন।

এডামের প্রস্তাব ঃ—

(১) প্রথমেই নির্বাচিত জেলায় শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(২) শিক্ষক ও ছাত্রদের উপযোগী ভারতীয় ভাষায় একপ্রস্থ পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার প্রচার করতে হবে।

(৩) প্রতি জেলায় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য একজন পরীক্ষক (examiner) নিযুক্ত করতে হবে। তিনি শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে, শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। পাঠ্য পুস্তক কি করে ব্যবহার করতে হয় তা বুঝিয়ে দেবেন ; পরীক্ষা পরিচালনা, পুরস্কার বিতরণ এবং সমগ্রভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

(৪) শিক্ষকদের বই পড়তে উৎসাহিত করা হবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে। শিক্ষকগণ স্কুল ছুটির সময় বছরে একমাস থেকে তিনমাস পর্যন্ত একাধিকক্রমে চার বছর কালের মধ্যে তাঁদের শিক্ষণ-শিক্ষা সমাপ্ত করবেন।

(৫) শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সেই শিক্ষা ছাত্রদের দান করবেন। ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) শিক্ষকদের গ্রাম থেকে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করবার জন্য তাঁদের ভূমিদানের ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারের বিরূপ মনোভাব ঃ—

তৎকালীন শাসক-সম্প্রদায় এডামের সুপারিশসমূহ বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করেন নি। এই রিপোর্ট বের হ'বার আগেই সেকালে পাঠশালা ও দেশীয় শিক্ষকদের মান উন্নয়নের চেষ্টাকে অবাস্তব ও অসম্ভব বলে ঘোষণা করেন। জাতীয় শিক্ষা উন্নয়নের একটি প্রচেষ্টা সরকারী বিমুখতায় সূচনাতেই ব্যর্থ হয়ে যায়। এডামের প্রস্তাবকে তখন প্রত্যাখ্যান না করা হলে মনে হয় জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি এতটা পিছিয়ে থাকত না। অশিক্ষার অন্ধকার যেভাবে দেশকে গ্রাস করেছিল জাতীয় শিক্ষাধারাকে বাঁচিয়ে রাখলে তা কখনই হ'ত না। যদিও তৎকালীন শাসকগণ এডামের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি কিন্তু পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনায় তাঁর নীতিকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন আলোচনায় দেখা যায় তাঁর প্রস্তাবসমূহ পরবর্তীকালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

॥ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাতীয় শিক্ষার সাধারণ রূপ॥

মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং বাংলার শিক্ষা মানচিত্রের যে রূপটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা থেকে সমগ্র ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক রূপকে আমরা কল্পনা করতে পারি। শ্রদ্ধেয় অনাথ বসু মহাশয় বলেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন নবীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হইল, তখনও সেই সুপ্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা

সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় নাই, তখনও দেশের সর্বত্র বহু টোল চতুষ্পাঠী ছিল, মক্তব, মাদ্রাসা ছিল, তখনও গ্রামে গ্রামে গুরুমহাশয়গণ পাঠশালায় দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে ছিলেন, টোলে অধ্যাপকগণ শাস্ত্র চর্চায় রত ছিলেন।"

বিদ্যালয় ছিল দুই শ্রেণীর :—

প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষালয়। হিন্দু-মুসলমানদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় ছিল, **হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা, মুসলমানদের জন্য মক্তব।** উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দুদের (পশ্চিম-ভারতে হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রকে পাঠশালা বলা হ'ত, বাংলায় আমরা তাকে টোল বলি) আর মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা. উভয় সম্প্রদায়ের বিদ্যায়তনগুলোই রাজা, জমিদার, ও ধর্মপ্রাণ নরনারীদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেত। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ঘর কোথাও ছিল না—চণ্ডিমণ্ডপ, মসজিদ, অধ্যাপকদের গৃহ, বড়লোকের বৈঠকখানা এইগুলিই শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। ধনী মুসলমানদের জন্য 'আখেনজী' রেখে উচ্চ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষাদান করতে গুরুমশায় প্রায়ই গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতেন। গাছের ছায়ায় বেত্রপাণি গুরুমহাশয় বিদ্যাবিতরণ করছেন—পল্লী-বাংলার এই রূপটির সাথে বাস্তব পরিচয় আমাদের মনে গেঁথে রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা :—

পাঠশালার যেমন নিজস্ব ঘর ছিল না, তেমনি বসবার নির্দিষ্ট সময়ও ছিল না। গুরুমহাশয়ের সুবিধা মত সময়ই ছিল পাঠশালা বসবার সময়। একজন গুরুমহাশয় এক একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। এ যুগের মত ছুটিরও বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না। পূজা-পার্বন, গ্রাম্য উৎসবে পাঠশালা ছুটি থাকত; এছাড়াও ছুটির প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। নিয়ম-কানুন বলতে গুরুমহাশয়ের মর্জি আর মেজাজ; শাসন-ব্যবস্থা বলতে রক্তচক্ষু আর উদ্যত বেত্র। সে যুগের শাস্তি অনেক সময় নির্মমই হ'ত। তবু ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠত। ছাত্রসংখ্যা অল্প হওয়ায় গুরুমহাশয় ব্যক্তিগত মনোযোগ বেশী দিতে পারতেন।

শিক্ষা পদ্ধতি :—

বর্তমানের মত শ্রেণী বিভাগ সে সময়ে ছিল না; যে কোন সময়ে ভর্তি হওয়া যেত। স্কুল ছেড়ে যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। শিক্ষার উপকরণের কোন বাহুল্য সে যুগে ছিল না। বালির উপর আঙ্গুল চালিয়ে একটু রপ্ত হয়ে উঠলে তালপাতা বা কলাপাতায় লিখতে শেখানো হ'ত। এরপর স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তাক্ষর প্রভৃতি লিখতে ও পড়তে শেখানো হ'ত। ছেলেরা গুরুমশায়ের থেকে মুখে মুখে শুনে নদী, গ্রাম, জন্তু জানোয়ারের নাম মুখস্থ করত আর লিখতে শিখত। মুখে মুখেই পৌরাণিক কাহিনী আরম্ভ করত। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, নামতা, শুভঙ্করী আর্য্যা প্রভৃতি শেখান হ'ত। হাতের লেখার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত। পাঠশালা পাঠের শেষ পর্যায়ে পুঁথি, চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি পড়তে ও লিখতে শেখান হ'ত। কাজ

চালানোর মত হিসেব রাখতেও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বাস্তব জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর শিক্ষালাভ হলেই পাঠশালার পাঠ শেষ হ'ত।

সর্দ্দার পোড়ো প্রথা :—

তখনকার দিনে পাঠশালায় একটি অভিনব প্রথা ছিল। ছেলেদের যোগ্যতা অনুসারে দুটি ভাগ করা হ'ত। উঁচু শ্রেণীর ছেলেদের হাতে ছোট ছোট ছেলেদের পড়ানোর ভার দেওয়া হ'ত। বড়দের পড়ানোর কাজ গুরুমশায় নিজেই করতেন। এতে বড়দের পড়াটা ভালভাবে আয়ত্ত হ'ত, আর গুরুমশায় কিছুটা বেশী সময় পেতেন বড়দের দিকে নজর দেবার। **একে 'সর্দ্দার পোড়ো প্রথা' বলা হ'ত।** বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অনেকখানি এদের হাতে থাকত। মাদ্রাজের মিশনারী ডাঃ বেল এই সর্দ্দার পোড়ো প্রথার উপযোগিতায় মুগ্ধ হন এবং বিলেত গিয়ে এই প্রথাটির প্রবর্তন করেন। এই স্বল্পব্যয়ী শিক্ষা পদ্ধতি ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এই ব্যবস্থা Monitorial system নামে ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

শিক্ষায় সার্বজনীন রূপ ও শিক্ষকের অর্থ নৈতিক অবস্থা :—

পাঠশালার পড়ুয়া সব সম্প্রদায় থেকেই আসত। উচ্চবর্ণের ছাত্র সংখ্যাই ছিল বেশী, নিম্নবর্ণ থেকেও ছাত্র যে আসত না তা নয়, এমন কি হাড়ি, বাগ্দী, মুচি, বাউরি, জেলে, কানু, মানু, চামার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ছাত্রের সন্ধানও আমরা পাই। মেয়েরা পাঠশালায় পড়তে আসত না—যেটুকু লেখাপড়া শিখত বাড়ীতেই শিখত। তখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষা ছিল অবৈতনিক কিন্তু পাঠশালায় মাইনে দিয়ে পড়তে হ'ত। এই বেতনের কোন নির্দ্দিষ্ট হার ছিল না। যার যেমন সাধ্য সে সেই রকম বেতন দিত। কেহ কেহ নগদ পয়সা দিতে পারত না চাল, ডাল, তরী-তরকারী দিয়ে গুরু দক্ষিণা দিত। এছাড়া পূজা পার্বণীতে বিদায়ী ও সিধা গুরুমহাশয়ের প্রাপ্য ছিল। বিশেষ করে দেখা গিয়েছে তাঁরা মাসে তিন টাকা পর্যন্ত রোজগার করতেন। আজকালকার তুলনায় তাদের অবস্থা ভালই ছিল বলা যায়। তখনকার দিনে পাঁচ টাকায় দোল দুর্গোৎসব সব করা যেত। সমাজে শিক্ষকদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের কেউ করুণার চোখে দেখত না। তাঁরা সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

উচ্চ শিক্ষা :—

উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোল ও মাদ্রাসা। উচ্চশিক্ষা অতি অল্পলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঠশালা যেমন প্রতি গ্রামের অঙ্গ ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলি ছিল দেশময় ছড়ান। নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। আরবী, ফার্সী চর্চ্চা হ'ত দিল্লী, পাটনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরে। দেশদেশান্তর হতে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা এসে এসব কেন্দ্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করত। টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসা, পুরাণ প্রভৃতি চর্চ্চা হ'ত। টোলের

অধ্যাপকগণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হতেন, **ছাত্রদের শিক্ষা শুধু অবৈতনিক ছিল না —থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার জন্য অধ্যাপক কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না।** মাদ্রাসাগুলিও অবৈতনিক ছিল। ফার্সী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই দেখা যেত। ফার্সীর হিন্দু অধ্যাপকও ছিল। ধনী ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্যেই উচ্চশিক্ষা চলত। যোগ্যতা অনুসারে অধ্যাপকগণ বৃত্তি লাভ করতেন। উচ্চ-শিক্ষার বিশেষ প্রসার ছিল না। **উচ্চশিক্ষা জীবনানুসারী না হওয়ায় পাণ্ডিত্য লাভ যতটা হ'ত বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ততটা এ শিক্ষায় মিটত না।**

মন্তব্য ঃ—

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এই বিস্তৃত আলোচনার কারণ হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব ছিল কি না তার বিচার করা। **এডাম দৃঢ়স্বরে বলেছেন, এই সম্ভাবনাময় শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দোষত্রুটি আমরা দেখেছি,** কিন্তু আজকের জগতে যে সব জাতি শিক্ষায় প্রগতিশীল একশ' বছর আগে সে সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কি আমাদের দেশের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে উন্নত ছিল? ইংলণ্ডের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে সংস্কার করে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়েছে। Monitorial প্রথার উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই ইংলণ্ডের জনশিক্ষা প্রসারের প্রথম ধাপে এই প্রথাকে গ্রহণ করা হয়েছিল। ইংলণ্ড যে প্রথার সদ্ব্যবহার করল আমরা তাকে ত্যাগ করলাম। চুঁইয়ে পড়া নীতি'র ভূত আমাদের এমনি ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে এডাম, মনরো, থমসন প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌দের সব সুপারিশ উপেক্ষা করে আমাদের 'শাসকবর্গ এমন এক শিক্ষানীতি গ্রহণ করলেন যার সাথে জাতির আত্মিক কোন যোগই ছিল না।' এর শোচনীয় পরিণাম আমরা ইংরেজ শাসনে প্রত্যক্ষ করেছি। ইংরেজ দেশের মুষ্টিমেয়ের জন্য শিক্ষার যে আয়োজন করেছিল তার ফলে দেশের প্রকৃত জনসাধারণ অজ্ঞতার তিমিরে ডুবে রইল। স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বছর বাদে আজও আমরা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাই নি।

দেশ স্বাধীন হ'বার পর থেকেই আমরা একটা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। কিভাবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে এই ব্যবস্থাকেই জাতীয় শিক্ষায় রূপ দেওয়া যায় তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এডাম দেড়শ' বছর আগে লিখেছিলেন প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার যে কোন আয়োজন সার্থক করে তুলতে হলে জাতীয় ভিত্তির উপর তাকে দাঁড় করাতে হবে। স্মরণাতীত কাল থেকে এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জীবনের সাথে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে একে বাঁচিয়ে রেখে এর উপর ভিত্তি করেই প্রগতিশীল শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। চুঁইয়ে পড়া নীতির অসারতা সম্পর্কে এডাম মন্তব্য করেছিলেন শিক্ষাকে নীচের থেকে ধাপে ধাপে গড়ে তুলতে হবে। তৎকালীন শাসক সম্প্রদায় এডামের কথায় কান দেয় নি। তাঁর রিপোর্ট সম্পূর্ণ বের হবার আগেই সরকার নতুন শিক্ষা নীতি ঘোষণা করেন। এডাম মাত্র দু'টি

জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে তাঁর সুপারিশ নিয়ে পরীক্ষা করতে বলেছিলেন। তখন যদি সরকার এডামের রিপোর্ট অনুসারে কাজ করত তা হলে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা হ'ত না। বহুদিন প্রচলিত একটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করে তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হ'ল, কিন্তু তার স্থানে কোন নতুন ব্যবস্থা করা হ'ল না, যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এডামের সুপারিশ সমূহ রূপায়িত করলে নিরক্ষরতা এত ব্যাপক প্রসার এদেশে হ'ত না। সেই দিনের সেই ভুলের মাশুল আজও আমরা যোগাচ্ছি।

প্রশ্নাবলী

1. What was the state of education in Bengal as revealed by Adam's report ? Give your views on Adam's findings. [B. T. 1964]
2. Describe the state of indigenous system of education that prevailed in Bengal at the beginning of the 19th century as revealed by Adam's reports. What are authoritative comments on them. [B. T. 1968]
3. What picture of the Indigenous education in India do you get from Adam's report ? [B. T, 1942, '50]
4. What were the proposals of William Adam for the reorganisation of education in Bengal ? What happened of these proposals and what were their consequences ? [B. T. 1952]
5. What were the main ideas suggested by William Adam for the reconstruction of education in India in his report dated 1838 ? [C· U. 70]

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক শিক্ষায় মিশনারীদের দান

॥ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সূচনা ॥

ঝটিকা বিক্ষুব্ধ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৬ খ্রীঃ কালিকটের উপকূলে উপস্থিত হন। সেদিন ভারতের ইতিহাসে সূচনা হ'ল এক নতুন যুগের। ভারতের অফুরন্ত ধন সম্পদের লোভে পর্তুগীজদের পিছে পিছে এল দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিককূল। বণিকদল এল পণ্যের লোভে. তাদের অনুসরণ করে কিছুদিনের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উন্মাদনায় এল মিশনারী সম্প্রদায়। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এদেশে মিশনারীদের আসার কারণই হচ্ছে ভারতীয়দের মধ্যে খৃষ্টের বাণী প্রচার ও তাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। ভারতীয়দের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা শিখল, ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারের জন্য প্রাদেশিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করল। যারা **খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করল তাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করল ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার সহজ হবে এই বিশ্বাসে মিশনারীরা শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করল**। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের অবদান অস্বীকার না করেও বলা যায় সম্পূর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়েই তারা এদেশে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হয়েছিলেন। **কোথায়ও তারা চেষ্টা করেছেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রচার করতে কোথাও ধর্মান্তরিতদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন**। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মিশনারীগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করে তারা কাজ শুরু করেন। মিশনারীদের শিক্ষা-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের আদিপর্বের সূচনা হ'ল।

॥ বিভিন্ন দেশের মিশনারীদের উদ্যম ॥

পর্তুগীজ :—

ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজদের দলই ভারতে প্রথম পদার্পণ করে। বাণিজ্যের জন্য তারা এসেছিল, কিন্তু তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না একথা বলা যায় না। কথিত আছে তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মৃত্যুকে তুচ্ছ করে কিসের লোভে তোমরা এদেশে এসেছ? তারা বলেছিল "*We have come to seek Christians and spices*" বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার দুই-ই তাদের লক্ষ্য ছিল। কালিকট, গোয়া, দমন, দিউ, বেসিন, বোম্বে, হুগলী প্রভৃতি পর্তুগীজ বাণিজ্য কেন্দ্রে বণিকদের সাথে রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারক এসে উপস্থিত হন ও ভারতের পশ্চিম উপকূলে ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে তাঁদের স্বদেশীয় আদর্শে কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে আধুনিক শিক্ষা ধারার প্রথম প্রবর্তক পর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায়। পর্তুগীজ মিশনারীদের মধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার ও রবার্ট-ডি-নোবিলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এঁরা ভারতে আসেন। সেণ্ট জেভিয়ারের নাম এখনও ভারতে কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছে।

পর্তুগীজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—(১) মিশন ও গীর্জার সাথে যুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। (২) ভারতীয় অনাথদের জন্য আশ্রয় স্থল, এখানে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কৃষিবিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। (৩) উচ্চশিক্ষার জন্য জেসুইট কলেজ, (৪) ধর্মশিক্ষা ও পাদ্রী তৈয়ারীর সেমিনারী।

পর্তুগীজরাই ভারতে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৫৬ খ্রীঃ গোয়াতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। এ ছাড়াও এদের আরও চারিটি ছাপাখানা ছিল। ভারতে পর্তুগীজ শক্তির পতনের ফলে পর্তুগীজ মিশনারীদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এদের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ দেশীয় খৃষ্টানদের প্রচেষ্টায় বহুদিন সক্রিয় ছিল।

ফরাসী :—

মাহে, ইয়ানান, কারিকল, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে ফরাসী মিশনারীগণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসব বিদ্যালয়ে স্থানীয় ভাষায় দেশীয় শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পণ্ডিচেরীতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে শিক্ষার্থীদের ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এই স্কুলগুলি প্রধানতঃ দেশীয় খৃষ্টানদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হলেও অখৃষ্টান বিদ্যার্থীকেও ভর্তি করা হ'ত এবং প্রলুব্ধ করবার জন্য বিনামূল্যে বই, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাবার প্রভৃতি দেওয়া হ'ত।

দিনেমার :—

তাঞ্জোর, ত্রানকুয়েবার ও শ্রীরামপুরে দিনেমার বণিকদের প্রধান আড্ডা ছিল। দিনেমার মিশনারীগণ ছিলেন প্রোটেস্টাণ্ট, তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল ত্রানকুয়েবার ও শ্রীরামপুর। **দিনেমার মিশনারীগণ তাঁদের শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ভারতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের সহায়তা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। দিনেমার মিশনারীদের মধ্যে জিগেনবাল্গ (Zegenbalg) ও প্লুশো (Plutschau) শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।** এঁরা তানকুয়েবারে প্রথম কাজ শুরু করেন, ১৭১৬ খ্রীঃ। এখানে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর আগে ১৭১৩ খ্রীঃ একটি তামিল ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭১৭ খ্রীঃ মাদ্রাজে গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য চাঁদা তুলে দুটি চ্যারিটি স্কুল খোলা হয়। এঁদের কার্যকলাপ শুধু খৃষ্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দক্ষিণ ভারতে অখৃষ্টান ভারতীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বহু

বিদ্যালয় এরা স্থাপন করেন। এসব স্কুলে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হ'ত। শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় ও ধর্মীয় সেমিনারীতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ডেনমার্ক থেকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে ইংলণ্ডের *Society for promoting Christian Knowledge* নামে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে দিনেমার মিশনারীদের আর্থিক সাহায্য করা হয়, এই সাহায্যে তারা কাজ চালিয়ে যান। জিগেনবাল্গ তামিল ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন ও একখানি তামিল ব্যাকরণ রচনা করেন।

১৭১৯ খ্রীঃ জিগেনবাল্গের মৃত্যুর পর স্থলজ (Schultz), স্কোয়াৎস (Schwartz) ও কায়েনাণ্ডার (Kiernader) তাঁর অসমাপ্ত কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এঁরা শুধুমাত্র দিনেমার অঞ্চলে এঁদের কাজকে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে এঁদের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করেন। পূর্বের মত বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে এঁদের সাহায্য করা হতে থাকে।

॥ মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টায় কোম্পানীর সহায়তা ॥

কায়নাণ্ডার ১৭৪২ খ্রীঃ ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের জন্য ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে চ্যারিটি স্কুল খোলেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ১৭৫৮ খ্রীঃ লর্ড ক্লাইভ তাকে বাংলায় আমন্ত্রণ করেন। বাংলা দেশে তিনি কয়েকটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতে শিক্ষা বিস্তারে স্কোর্যাৎসের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি বৃটিশ কোম্পানী ও দেশীয় রাজাদের থেকে সমভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন, তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীতে তিনি প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহীশূরের হায়দর আলী তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে প্রথম মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাঞ্জোরের ইংরেজ রেসিডেণ্ট মিঃ স্থলিভান (Sullivan) ভারতীয়দের জন্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করলে স্কোর্যাৎস তাঁর পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ১৭৮৫ খ্রীঃ তিনি ইংরেজী শিক্ষার জন্য তাঞ্জোর, রামনাদ ও শিবগঞ্জে তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। **ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ১৭৮৭ খ্রীঃ প্রতি স্কুলের জন্য বার্ষিক ২৫০ প্যাগোডা সাহায্য মঞ্জুর করেন। স্থির হয় ইংরেজী শিক্ষার জন্য নতুন স্কুল খোলা হলে সেগুলিতেও এই সাহায্য দেওয়া হবে।** ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের এই প্রচেষ্টায় কোম্পানীর সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে শিক্ষা প্রসারে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে কোম্পানীর মনোভাব এই সাহায্য দানের মধ্যেই পরিস্ফুট। মিঃ স্থলিভান ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে বলেছিলেন এতে ভারতীয়দের সাথে কাজ কর্মের সুবিধা হবে। **ভাষাগত বাধা অপসারণে কোম্পানীর স্বার্থ জড়িত ছিল বলেই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টায় আর্থিক সাহায্য দিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে কোম্পানীর শিক্ষানীতি বিচারে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।**

বাংলায় মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা ও শ্রীরামপুর ত্রয়ী :—

দক্ষিণ ভারতে মিশনারীগণ তাঁদের ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য লাভ করলেও বাংলায় মিশনারী প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য পায় নি। ভারতের অন্যান্য স্থানের মত কলিকাতায়ও স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৭২০ খ্রীঃ রেভারেণ্ড বেলমীর প্রচেষ্টায় একটি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৭১৩ খ্রীঃ *Society for the formation of Indians* একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। কার্য়নাণ্ডারের চেষ্টায় ১৭৫৮ খ্রীঃ পর কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোম্পানীর নীতি-পরিবর্তন :—

অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে মিশনারীদের সম্পর্কে বাংলায় কোম্পানীর কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না। পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ ও কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর রাজনৈতিক কারণে কোম্পানীর নীতির পরিবর্তন হয়। দেশের শাসন সৌকর্য্যের জন্য কোম্পানী শিক্ষা ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন। মিশনারীদের কার্যকলাপে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে এই সম্ভাবনায় কোম্পানী মিশনারীদের ধর্ম প্রচারে বিরোধিতা শুরু করে। কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে কেরী দিনেমার শহর শ্রীরামপুরে চলে যেতে বাধ্য হন।

শ্রীরামপুর ত্রয়ী :—

কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে মিশনারীগণ দিনেমার বাণিজ্যকেন্দ্র শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে তাঁদের প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ উইলিয়ম কেরী কলিকাতায় ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য শুরু করলে কোম্পানী তাঁকে বাধা দেয়। শ্রীরামপুরকে ধর্ম প্রচারের নিরাপদ আশ্রয় মনে করে কেরী এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর আগে ১৭৯৪ খ্রীঃ কেরী তাঁর কর্ম্মস্থল মালদহে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। **১৮০০ খ্রীঃ মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড এসে কেরীর সাথে মিলিত হ'ন। কেরী ছিলেন প্রচার বিশারদ, ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ মুদ্রণ-শিল্পী ও মার্শম্যান স্কুল শিক্ষক। এদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়। এঁরা শ্রীরামপুর ত্রয়ী (Sreerampur Trio) নামে খ্যাত।** এঁদের চেষ্টায় ১৮০১ খ্রীঃ বাংলায় বাইবেল প্রকাশিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে এঁরা ৩১টির বেশী ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে বাইবেলের নিউটেস্টামেণ্ট ছেপে প্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যে এঁদের সাথে কোম্পানীর বিরোধ সৃষ্টি হয়। ধর্মপ্রচারের অতি উৎসাহে এঁরা ১৮০৭ খ্রীঃ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের নিন্দা থাকায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কোম্পানী বিরক্ত হয়ে এদের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে কলকাতায় পাঠাবার নির্দেশ দেন। দিনেমার সরকারের মধ্যস্থতায় এ-যাত্রায় এঁরা নিস্তার পান। দক্ষিণ ভারতে

ভেলোর সিপাহীদের বিদ্রোহের পর ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয়।

সরকারী প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়েও মিশনারীগণ তাদের শিক্ষাবিস্তারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮১০ খ্রীঃ মার্শম্যান দেশীয় খৃষ্টান শিশুদের শিক্ষার জন্য *Calcutta Benevolent Institution* প্রতিষ্ঠা করেন। মার্শম্যান শ্রীরামপুরে একটি আবাসিক স্কুল খুলেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ মধ্যে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় ত্রিশ মাইলের মধ্যে ১১৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করত।

দক্ষিণ ভারতে শিক্ষা বিস্তারে মিশনারী ও কোম্পনীর মধ্যে যে সহযোগিতা দেখা যায় বাংলায় তা সম্ভব হয় নি। **বাংলায় দেওয়ানী লাভের পর রাজনৈতিক কারণে কোম্পানী ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। মিশনারীরা ধর্ম প্রচারে বাধা পেলেও শিক্ষা প্রচারে বাধার সম্মুখীন হয় নি।** মিশনারী ও কোম্পানীর প্রচেষ্টায় কলিকাতায় কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীঃ কলকাতায় ইউরোপীয় অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য 'ফ্রি স্কুল সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ফ্রি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস 'কলিকাতা মাদ্রাসা'র প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে শিক্ষার প্রসার ছাড়া একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধিও ছিল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বেনারসে রেসিডেন্ট মিঃ জোনাথন ডানকান ১৭৯১ খ্রীঃ 'বেনারস সংস্কৃত কলেজে'র প্রতিষ্ঠা করেন।

॥ মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার মূল্যায়ণ ॥

মিশনারীদের দান ঃ—

ভারতে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীদের একটা বিশিষ্ট অবদান রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মিশনারীগণ ধর্ম প্রচার করতে এসে কেন শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হন তাও জানা দরকার। ধর্মান্তরিতদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদের শিক্ষার প্রয়োজন। তাই স্কুল খুলতে হ'ল। খৃষ্টানদের জন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে বাইবেল ছাপান প্রয়োজন তাই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। ভারতীয় ভাষা শিখতে হ'লে ভাষার ব্যাকরণ জানা দরকার। আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ তখনও রচিত হয় নি—দেখা যায় বাংলা ব্যাকরণ ও তামিল ব্যাকরণ মিশনারীরাই প্রথম লিখেছেন। দেশীয় খৃষ্টানগণ যাতে কাজকর্ম পায় সেজন্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থাও মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ ছিল। ফলে কোথাও ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে শিক্ষা বিস্তার শুরু হ'ল, কোথাও শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রচারের চেষ্টা চলতে লাগল। শিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম প্রচার মিশনারী প্রচেষ্টায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

মিশনারীরা যে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কার্য পদ্ধতি গতানুগতিক দেশীয় পাঠশালার অনুরূপ ছিল না। আমরা স্কুল বলতে বর্তমানে যা বুঝি তার প্রথম সূচনা মিশনারী প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির মধ্যে দেখা যায়। যদিও খৃষ্টধর্মে শিক্ষা দেওয়াই

ছিল স্কুলগুলির প্রধান লক্ষ্য, তবুও এখানে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়ান হ'ত। ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও দেশীয় ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কাজকর্মের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। মিশনারীরাই এদেশে ছাপিয়ে স্কুল পাঠ্য প্রকাশ করেন ও স্কুলে তার প্রচলন করেন। স্কুল বসবার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। ছাত্রদের শ্রেণী বিভাগ ছিল। প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও নারী শিক্ষার প্রবর্তনে মিশনারীদের দান স্মরণীয়। শিক্ষকের সংখ্যাও একের অধিক হ'ত। একজন শিক্ষকের অধীনে একটি শ্রেণী পরিচালিত হ'ত। মিশনারী স্কুলগুলিতে যে শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিচালন ব্যবস্থা ছিল পরবর্তীকালে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়। এই মিশনারী স্কুলের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশে নতুন শিক্ষাধারার প্রথম প্রবর্তন হ'ল।

বাংলা গন্থ সাহিত্য রচনায় মিশনারীদের দান :—

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের কোন সুসংবদ্ধ সংহত রূপ ছিল না। গদ্য ছিল দলিল, দস্তাবেজ ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চিঠিপত্র লেখার ভাষা। পর্তুগীজ পাদরীদের আগমনের পর থেকেই বাংলা গদ্যের ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের একটা প্রধান অন্তরায় ছিল ভাষাগত অসুবিধা। দেশীয় ভাষায় ধর্ম প্রচার ও দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের জন্য তাঁরা গদ্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। উদ্দেশ্য যাই থাকুক এর ফলে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে বিশেষ উপকৃত হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয় নেই।

ভূষণার এক জমিদারের পুত্রকে পর্তুগীজ পাদরীরা মগ দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। **তিনি দোম্ আন্তেনিও নাম গ্রহণ করেন। খৃষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ"** নামে একখানা বাংলা বই রচনা করেন। এর প্রায় একশ' বছর বাদে (১৭৪৩ খ্রীঃ) **মনোএলদা আসসুমপসাম একখানি বাংলা ব্যাকরণ ও "কৃপার শাস্ত্রে অর্থভেদ" নামে একখানি বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেন।**

বাংলা গদ্য রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে শ্রীরামপুরের মিশনারীত্রয়ের। ১৮০০ খ্রীঃ মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে প্রেস স্থাপন করেন। **এই প্রেস থেকে কেরী বাইবেলের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।**

এই প্রেস থেকেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল ক্রমে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। **কেরী সাহেব নিজে ইতিহাসমালা ও কথোপকথন রচনা করেন।** অবশ্য বর্তমানে অনেকে মনে করেন এইগুলি তিনি সঙ্কলন করেন, রচনা করেন নি।

কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাচ্য ভাষা বিভাগের প্রধান থাকাকালে তাঁর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ বিভাগের শিক্ষক ও মুন্সীগণ বহু বাংলা পুস্তক রচনা

করেন। রাম রাম বসু 'প্রতাপাদিত্য চরিত, ও 'লিপিমালা' রচনা করে বাংলা গদ্যকে সহজ রূপ দেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলী হিতোপদেশ', 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' রচনা করে ভাষার সাধু রীতি ও কথ্য রীতি প্রবর্তন করেন। রাজীবলোচনের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' এ যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা।

সংবাদপত্রের ইতিহাসে মিশনারীদের দান স্মরণীয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ প্রথমে "দিগদর্শন" নামে মাসিক পত্র বের করেন। **এরপর ১৮১৮ খ্রীঃ "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হয়।** এই পত্রিকায় হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সামালোচনা করা হ'ত। এর প্রতিবাদে রামমোহন "সম্বাদ কৌমুদী" প্রকাশ করেন।

মিশনারীদের খৃষ্টধর্ম প্রচার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

গ্রাণ্টের আন্দোলন :—

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সামান্য কিছু করলেও শিক্ষা বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন দায়িত্ব আছে একথা স্বীকার করে নি। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ও সরকারী সাহায্যের অভাবে দেশীয় বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিশনারীদের কার্যকলাপে কোম্পানীর তরফ থেকে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় এদেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টায়ও শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল না। কোম্পানীর মিশনারী বিদ্বেষের ফলে ইংলণ্ডে মিশনারীগণ প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন। চার্লস গ্রাণ্ট নামক কোম্পানীর এক প্রাক্তন কর্মচারী ইংলণ্ডে মিশনারীদের পক্ষ নিয়ে কোম্পানীর মিশনারী বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। গ্রাণ্ট এদেশে এসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ১৭৯০ খ্রীঃ দেশে ফিরে যান। ১৭৯২ খ্রীঃ তিনি ভারতীয় সমাজের শোচনীয় নৈতিক অবস্থার বর্ণনা করে একখানা প্রচার পুস্তিকা রচনা করেন। সাধারণ ভাবে গ্রাণ্টের এই পুস্তিকাকে "observation" বলা হয়। এই পুস্তিকায় ভারতীদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন বাংলাদেশে সত্যবাদী চরিত্রবান লোক দুর্লভ ; এরা অর্থের জন্য সব অপরাধ করতে পারে। হিন্দুস্থানে দেশপ্রেম বলে কোন বস্তু নেই ; এর কারণ সম্পর্কে গ্রাণ্ট বলেছেন, হিন্দুরা ভুল করে কারণ তারা অজ্ঞ। ভুল বুঝিয়ে দিয়ে অন্ধকার দূর করতে হলে আলোর প্রয়োজন আর জ্ঞানের আলোকেই এই অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা সম্ভব। গ্রাণ্ট প্রস্তাব করলেন ভারতীয়দের উন্নতির জন্য ভারতীয়দের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে হবে, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে হবে। ইরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের কুসংস্কার দূর হবে। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলেও গ্রাণ্টের কোন কোন অভিমতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ১৭৯২ খ্রীঃ তিনি ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা

বিস্তারের যে প্রস্তাব করেছিলেন চল্লিশ বছর বাদে লর্ড বেন্টিংক সরকারীভাবে সেই নীতিই গ্রহণ করেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহশীল, ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হলে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভীড় করবে। **ইংরেজী ভাষাকে সরকারী কাজ কর্মের ভাষারূপে গ্রহণ করবার উপদেশও তিনিই দিয়েছিলন। ভারতের শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্ব সম্পর্কে জনমত গঠনে যে গ্রাণ্টের মতামত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা অনস্বীকার্য।**

॥ প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থনে ॥

মিণ্টোর মন্তব্য :—

১৮০৭ খ্রীঃ লর্ড মিণ্টো ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি ছিলেন প্রাচ্য বিদ্যার অনুরাগী। ১৮১১ খ্রীঃ ৬ই মার্চ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় অবনতি সম্পর্কে এক বিবরণী তিনি কোম্পানীর নিকট পেশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতের সাহিত্য ও বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি নষ্ট হয়ে যাবে। সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলে শিক্ষারই শুধু অবনতি হবে না যারা বহু ত্যাগ স্বীকার করে এই জ্ঞানের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই পণ্ডিত সমাজও লোপ পেয়ে যাবে। বর্তমান অবস্থা সৃষ্টি হ'বার পূর্বে রাজা ও ধনীরা বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ দিতেন এখন তার অভাব ঘটেছে। বিদ্যানুরাগী ইংরেজ জাতি যদি এ বিষয়ে যত্ন না নেয় তাহলে সে অতি লজ্জার কথা হবে।

মিণ্টো তাঁর মন্তব্যের সাথে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের সংস্কারের প্রস্তাব করেন। এই সাথে নদীয়া ও ভোরে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন এবং জৌনপুর ও ভাগলপুরে মাদ্রাসা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়।

॥ মিশনারীদের দ্বারা ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ॥

১৮১৪ খ্রীঃ থেকে পরবর্তী আট বছর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ আইনের নির্দেশমত বাংলা দেশে শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টাই কোম্পানীর পক্ষ থেকে করা হয় নি। সরকারী এই নিশ্চেষ্টতার যুগে মিশনারী ও বেসরকারী উদ্যমে বহু স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষার উন্নতি ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার :—

ব্যাপটিস্ট মিশনারীগণ শ্রীরামপুর অঞ্চলে কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেন। তাঁদের ছাপাখানা থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভাষার স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ-করা হয়। ছাপা বই বাজারে সুলভ হওয়ায় শিক্ষা প্রসারের পথ সুগম হয়। **১৮১৮ খ্রীঃ ২৩শে মে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ"**

প্রকাশিত হয়। এই বছরই ব্যাপটিস্ট মিশনারীগণ ভারতীয় খৃষ্টান অধিষ্ঠিত সব সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দিনেমার সরকারের এক সনদের বলে এই কলেজ থেকে ছাত্রদের তাঁরা ডিগ্রী দিতে শুরু করেন। এই কলেজই বৃটিশ ভারতের প্রথম মিশনারী কলেজ। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রেভারেণ্ড মে ১৮১৪-১৮ খ্রীঃ মধ্যে চুঁচুড়া ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ২৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর প্রায় তিন হাজার ছেলে এখানে পড়াশুনা করত। সরকার থেকে এই স্কুলগুলির জন্য প্রথম মাসিক ৬০০ টাকা ও পরে ১,৮০০ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। রেঃ মে'র মৃত্যুর পর পিয়ার্সন ও হার্লি এই স্কুলগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, বাংলা দেশের কালনা, বহরমপুর, চন্দননগর, শ্যামনগর প্রভৃতি স্থানে ও দক্ষিণ ভারতে ব্যাপকভাবে স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমানে ১০টি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। শিবপুরে ১৮২০ খ্রীঃ বিশপস কলেজ নামে দ্বিতীয় মিশনারী কলেজ স্থাপিত হয়।

ডাফের মতবাদ ঃ—

স্কট মিশনারী চার্চের শিক্ষাবিদ পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮২০ খ্রীঃ এদেশে আসবার পর মিশনারীগণ নবীন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রভাবে মিশনারী শিক্ষা প্রয়াস নীতিগতভাবে এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। ডাফ এদেশের মিশনারীদের কার্য পদ্ধতি দেখে মোটেই খুসী হতে পারেন নি। প্রাথমিক স্কুল সমূহে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। প্রধানতঃ অনাথ বা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, উপাসনায় খুব কম লোক উপস্থিত হ'ত। ডাফের মত গোঁড়া পাদ্রীর এতে খুসী হবার কথা নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বাইবেলের দ্বারাই ভারতীয়দের মুক্তি সম্ভব। তিনি স্থির করলেন সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার করতে হবে এবং মিশনারীদের সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। তাঁর ধারণা ছিল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। তিনি চুঁইয়ে পড়া নীতিতে (*downward filteration theory*) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর মনোভাব গোপন রাখেন নি। এই নীতিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৮৩০ খ্রীঃ তিনি জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে খ্যাত। এখানে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, বাইবেল এখানে ছাত্রদের 'অবশ্য পাঠ্য' তালিকাভুক্ত ছিল। খৃষ্টধর্ম প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এখানে সাধারণ শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত ছিল। বাংলাদেশে এই কলেজেই প্রথমে *political economics* পড়ান শুরু হ'ল। এই বিদ্যালয়ের সুনাম এত বেশী ছিল যে হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ এখানকার শিক্ষারীতির প্রশংসা করতেন, অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা এক হাজার হয়।

বোম্বে ঃ—

মিশনারী প্রচেষ্টা এই সময়ে শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮২২ খ্রীঃ স্কট মিশনারীগণ কাথিয়াড়ে ইংরেজী ও ভার্ণাকুলার স্কুল স্থাপন করেন। ডঃ ডাফ বাংলাদেশে যে পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেছিলেন স্কট মিশনারী ডঃ উইলসন বোম্বে প্রদেশে সেভাবে কাজ শুরু করেন। ১৮২৯ খ্রীঃ তিনি বোম্বে শহরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিন বছর বাদে ডাফের কলেজের আদর্শে তিনি ছেলেদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বোম্বের উইলসন কলেজটি এই স্কুলেরই পরিবর্তিত রূপ।

আমেরিকান মিশনারী সোসাইটি উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই বোম্বে অঞ্চলে কাজ করেছিল। এঁদের উদ্যোগে যথাক্রমে ১৮১৫ খ্রীঃ ও ১৮১৮ খ্রীঃ ছেলে ও মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। চার্চ মিশনারী সোসাইটি নীতি শিক্ষামূলক স্কুলপাঠ্য ছেপে প্রচার করতে থাকে। এই সোসাইটি ১৮২০ খ্রীঃ একটি স্কুল স্থাপন করে। এদের কর্মক্ষেত্র পূণা, খানা, বেসিন প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

মাদ্রাজ ঃ—

সনদ আইনের 'শিক্ষাধারা' গৃহীত হ'বার বহুপূর্ব থেকেই মাদ্রাজে মিশনারীগণ বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিনেমার ও লণ্ডন স্কুল সোসাইটির কাজ খুব ভালভাবে চলছিল। ১৮১৭ খ্রীঃ ডাফ নয়টি স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলগুলির ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৮৩ জন। ১৮১৯ খ্রীঃ ওয়েলস্ মিশনারী সোসাইটি কাজ শুরু করে। এই সোসাইটি মাদ্রাজ শহরে দুটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে। দুটি স্কুলের একটি বর্তমানে মাদ্রাজে রায়পেট কলেজ নামে পরিচিত। ১৮৩৫ খ্রীঃ হিসেবে দেখা যায় চার্চ সোসাইটি মাদ্রাজে ১০৭টি স্কুল পরিচালনা করেছে এবং এই স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ২২,৮৮২ জন।

॥ মিশনারী প্রচেষ্টা (১৮৩৫-৫৪) ॥

১৮৩৩ খ্রীঃ নতুন সনদ আইনের বলে পৃথিবীর সব দেশের মিশনারীগণই ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাই দেখা যায় ১৮৩৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত মিশনারীদের কার্যকলাপ অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করছিল। এই যুগকে মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার 'স্বর্ণ যুগ' বলা যেতে পারে। যেসব মিশনারী সম্প্রদায় ভারতকে কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিল তার মধ্যে অর্থে ও সংগঠনের শক্তিতে জার্মান ও আমেরিকানরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের কর্মক্ষেত্র সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। ইংরেজ মিশনারীদের পক্ষেও এই যুগ সমৃদ্ধির যুগ। এই সময়েই মিশনারী প্রচেষ্টায় ভারতে কয়েকটি প্রসিদ্ধ কলেজ স্থাপিত হ'ল—মাদ্রাজ খৃষ্টান কলেজ (১৮৩৭), নাগপুর হিস্‌লপ কলেজ (১৮৪৪), মসলিপট্টম নোবেল কলেজ (১৮৪১), আগ্রা সেণ্টজোসেফ কলেজ (১৮৫২)। এই সব কলেজে অ-খৃষ্টান ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যাই বেশী ছিল। কলেজ ছাড়াও সারা দেশব্যাপী মিশনারীরা বহু ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় নারী শিক্ষা প্রবর্তন :—

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনও মিশনারীগণ অনুভব করেন। **এদেশে নারীশিক্ষার সূচনা মিশনারীদের প্রচেষ্টায়ই সম্ভব হয়েছিল। রেভারেণ্ড মে চুঁচুড়ায় (১৮১৮) ও কেরীসাহেব শ্রীরামপুরে (১৮১৯) একটি করে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।** চার্চ মিশনারী সোসাইটি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। মিশনারীদের পরিচালনায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে ৭টি মেয়েদের স্কুল ছিল। মিশনারীদের বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকে ভারতীয়দের মধ্যে নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস শিথিল হয়ে যাবে এবং দলে দলে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে। ভারতীয়রা মিশন স্কুলে যোগ দিল, ইংরেজীও শিখল, কিন্তু খৃষ্টান হ'ল না। [একাদশ অধ্যায় দেখুন]

ডাফ ও শিক্ষানীতিতে মিশনারী প্রভাব :—

এই যুগের ইংরেজ মিশনারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন ডাফ। তিনি অকল্যাণ্ডের ধর্মসম্পর্কীয় নিরপেক্ষতাকে মোটেই সুনজরে দেখেন নি। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপে ইংলণ্ডের মিশনারীগণও মোটেই তুষ্ট ছিলেন না। এদিকে ডাফ চাইছিলেন, শিক্ষার জন্য সরকার থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব করবে না। সেই ভার ছেড়ে দেওয়া হবে মিশনারীদের উপর। তিনি আরও চাইলেন সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে বাইবেল অবশ্য পাঠ্য হবে। প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য তিনি অকল্যাণ্ডকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবও মিশনারীগণ মোটেই সুনজরে দেখেন নি। *Bengal Council of Education* থেকে সরকারী পরীক্ষা ও কলেজের পাঠ্য তালিকা থেকে মিশনারীদের প্রকাশিত কিছু বই বাদ দেওয়ায় ডাফ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন লৌকিক শিক্ষার চেয়ে সরকারী চাকরীর জন্য খৃষ্টান শিক্ষাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। শিক্ষানীতির দু' একটি ক্ষেত্রে সামান্য মতবিরোধ থাকলেও এ যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৮২৩ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানী ও মিশনারীদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক থাকলেও এর পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। সরকারী কর্মচারীগণ মিশনারীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। **বেন্টিংকের শিক্ষানীতি ডাফ ও কেরীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল।** টমসন, আউটরাম, এডওয়ার্ড, লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাথে মিশনারীদের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এরা ব্যক্তিগত-ভাবে মিশনারীদের সাহায্য করা "খৃষ্টান কর্তব্য" পালন করা বলেই মনে করতেন।

॥ সরকারী শিক্ষানীতির প্রতিক্রিয়া ॥

সরকারী কর্মচারীদের এই অতিরিক্ত মিশনারী প্রীতির ফলে ভারতীয়দের সাথে মিশনারীদের বিরোধিতা সৃষ্টি হয়। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের বিরুদ্ধে মিশনারীদের প্রচার ও অযৌক্তিক আক্রমণে উভয় সম্প্রদায়ই সরকারী মনোভাব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে

পড়ে। ধর্মসম্পর্কে নিরপেক্ষতা নীতি কার্যকারিতার উপর দেশের লোক আস্থাশূন্য হয়ে উঠে। দেশীয় পত্রিকাগুলি তীব্র ভাষায় মিশনারীদের কার্যের সমালোচনা শুরু করে। **মিশনারীদের সম্পর্কে দেশবাসীর অবিশ্বাস ও সরকারী নীতিতে সন্দেহ আংশিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতে সাহায্য করেছিল।**

সরকার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই ধর্মান্তরিত করতে চাইছে—এই ধারণা সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। এই ধারণার পশ্চাতে মিশনারীদের ধর্ম-প্রচারের অতিরিক্ত আগ্রহ ও সরকারী কর্মীদের মিশনারী প্রীতিই পরোক্ষভাবে দায়ী।

॥ উডের ডেসপ্যাচে মিশনারীদের সুবিধা ॥

॥ ১ ॥ মিশনারী প্রচেষ্টা (১৮৫৪-১৮৮২ খ্রীঃ)

১৮৫৪ খ্রীঃ শিক্ষা ডেসপ্যাচে মিশনারীদের প্রভাব সুস্পষ্ট। সরকার শিক্ষাপরিচালনার ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াবে এবং বেসরকারী পরিচালনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে এতে মিশনারী নীতিরই জয় ঘোষিত হয়েছিল। এই সময়ে দেশে মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। মিশনারীরা মনে করল গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথায় তাঁরা সবচেয়ে লাভবান হবে। সরকার শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় মিশনারীরাই হবে একচ্ছত্র অধিনায়ক—এতে তাঁদের উল্লসিত হবারই কথা। কয়েক বছর মিশনারীরাই পূর্ণোদ্যমে শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হ'ল—শিক্ষা বিভাগ মিশনারীদের মধ্য থেকে স্কুল পরিদর্শক পর্যন্ত নিযুক্ত করলেন। সবদিক থেকেই অবস্থা মিশনারীদের অনুকূলে ছিল। **কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী যুদ্ধের ফলে মিশনারীদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন মিশনারীদের আর উৎসাহ দেওয়া হবে না। ভারত সরকার কঠোরভাবে ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতিকে মেনে চলবে।** মিশনারীরা এই নীতির বিরোধিতা করতে ত্রুটি করে নি। রাজনৈতিক দিক থেকে বাস্তব অবস্থার বিচার করে মহারাণীর ঘোষণায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির কথাই ঘোষণা করা হয়।

সিপাহী যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা ঃ

আলোচ্য যুগে এরপর মিশনারীরা তাঁদের কাজে সরকার থেকে আর তেমন কোন উৎসাহ পায় নি। তবে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী যে চিরদিনই মিশনারী প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। সরকারী শিক্ষা বিভাগের বিরূপ মনোভাব মিশনারীদের সামনেএক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করল। সরকারী সাহায্য পেতে হলে শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকতে হবে অথচ শিক্ষা বিভাগে পরিদর্শকদের সম্পর্কে মিশনারীদের অভিযোগ ছিল হয় এরা ধর্মনিরপেক্ষ ইংরেজ না হয় অখৃষ্টান ব্রাহ্মণ। এদের কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বের আশা করা বাতুলতা। এ ছাড়া শিক্ষাবিভাগ থেকে যে পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছিল তা খৃষ্টান আদর্শ প্রচারের পক্ষে সহায়ক নয়। এ সব বই পাঠ্য করলে বহু শ্রমে ও অর্থ ব্যয়ে মিশনারীরা যে সব

বই প্রকাশ করছিল তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। সরকারী পরিদর্শক পরিচালিত পরীক্ষা ও সরকারী পরিদর্শন এ দুই-ই মিশনারীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু সরকারী অর্থ সাহায্য পেতে হলে এ সবই মেনে নিতে হয়, না হয় শিক্ষা বিভাগ থেকে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন প্রচেষ্টায় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ বেসেল মিশনারী সোসাইটি শিক্ষা বিভাগের সাথে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজে নামল।

সরকারী শিক্ষা নীতির প্রতিবাদ ঃ

কানাড়া ও মালাবার অঞ্চলে এই সোসাইটির ব্যাপক প্রভাব ছিল! মিশনারীরা ভেবেছিল তারাই ধীরে ধীরে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করবে। শিক্ষা বিভাগ মিশনারী প্রতিষ্ঠানের নিকটে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করায় বেসেল সোসাইটির কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। এই অসম প্রতিযোগিতার বিষম ফল বুঝতে পেরে এরা ইংলণ্ডে আন্দোলন শুরু করল যে ১৮৫৪ খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ ভারত সরকার যথাযথরূপে পালন করছে না। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অপসারণ নীতিকে বর্জন করা হয়েছে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় মিশনারীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। সরকারী পরিচালনায় ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় ভগবান নির্বাসিত হয়েছে। এই বিরোধ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে ভারত সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির পর্যালোচনার জন্য ১৮৮২ খ্রীঃ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করতে হয়।

শিক্ষা বিভাগের সাথে বিরোধের মাঝেও মিশনারীগণ ভারতে কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কলিকাতা ও বোম্বের সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ (১৮৬০ ও ১৮৬৯), লাহোর ফোরম্যান কলেজ (১৮৬৪), লক্ষ্মৌ রীড কলেজ (১৮৭৭), সেণ্ট ষ্টিভেনস কলেজ দিল্লী (১৮৮২), এই সময় স্থাপিত হয়। মিশনারীগণ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে তাদের প্রচেষ্টাকে কিছুটা অপসারিত করে স্ত্রীশিক্ষা ও জনশিক্ষা বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করেন। (পল্লীর নিম্নবর্ণের স্ত্রী-পুরুষের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকলেও সরকারী ঔদাসীন্যের জন্য কিছুই করা হয় নি। মিশনারীরা শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের জন্য এই অবহেলিত ক্ষেত্রই বেছে নিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মিশনারীদের প্রভাবের ফলে দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা আশাতীত রূপে বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১-৭৪ খ্রীঃ মধ্যে ধর্মান্তরিতদের হার ২২% বেড়ে যায়। এই সাথে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার জন্য বহু প্রাথমিক স্কুল মিশনারীগণ স্থাপন করেন) ১৮৫২ খ্রীঃ মিশনারী পরিচালিত স্কুলে ১০,০০০ ছাত্র শিক্ষা পেত, এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ছিল মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র। ১৮৮২ খ্রীঃ এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দ্বিগুণ হয়। (এই সময়ে মিশনারী স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যার অর্ধেকই ছিল প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র।)

॥ মিশনারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে হাণ্টার কমিশনের মন্তব্য ॥

মিশনারীদের আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) গঠনের জন্য অনেকাংশে দায়ী। উডের ডেসপ্যাচের নির্দ্দেশসমূহ কার্যকরী করা হচ্ছে না এই

ছিল মিশনারীদের প্রধান অভিযোগ। শিক্ষা কমিশনকে ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচের নির্দেশসমূহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার কথা বলা হয়েছিল। সিপাহী যুদ্ধের পর শিক্ষায় মিশনারীদের স্থান নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হলে মিশনারীরাই শিক্ষাক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিনায়ক হয়ে বসবে মিশনারীগণ এই আশাই করেছিলেন। কারণ, বেসরকারী শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারী স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই সর্বাধিক ছিল। মিশনারীদের সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল যে একমাত্র তাদেরই নিয়ন্ত্রিত ও সচ্ছল সংগঠন রয়েছে যা একটা বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। ভারতীয়দের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল যে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার হলে, মিশনারীরাই সেই স্থান অধিকার করবে। কমিশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপসারণের অর্থ এই নয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ মিশনারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কমিশনের মতে মিশনারী প্রচেষ্টা ঠিক ঠিক বেসরকারী প্রচেষ্টার সংজ্ঞায় পড়ে না। এটা সরকারী ও জাতীয় প্রচেষ্টার মাঝামাঝি একটা অবস্থা। বেসরকারী প্রচেষ্টা বলতে জাতীয় প্রচেষ্টাকেই বোঝায়। ভারতীয়রাই শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রধান স্থান অধিকার করবে কমিশন এই আশাই ব্যক্ত করেছিলেন। "*The Private effort, which it is mainly intended to evoke is that of the people themselves. Natives of India must constitute the most important of all agencies if educational means are even to be co-extensive with educational wants*" কমিশনের এই সিদ্ধান্ত যে মিশনারীদের হতাশ করেছিল তা বলাই বাহুল্য। এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে দেখা দেয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশীয় প্রচেষ্টাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করে।

॥ মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা ও হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে প্রতিক্রিয়া ॥

ভারতীয় শিক্ষায় পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছায় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপসারণের জন্য মিশনারীগণ বহুদিন থেকে আন্দোলন চালাচ্ছিল। উডের ডেসপ্যাচে তাঁদের সে আশা পূর্ণ হ'বার সম্ভাবনা থাকলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতি মিশনারীদের প্রাধান্য স্থাপনের পথে বিঘ্ন হয়ে দেখা দিল। হাণ্টার কমিশন মিশনারীদের আন্দোলনের পরোক্ষ ফল, তাই মিশনারীরা আশা করেছিল হাণ্টার কমিশন তাঁদের স্বপক্ষেই রায় দেবে।

হাণ্টার কমিশনের সিদ্ধান্তে মিশনারীদের শেষ আশাটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। উডের নীতিকে মেনে নিয়ে যোগ্য বেসরকারী ভারতীয় পরিচালনায় শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করবার সিদ্ধান্তে এদেশের শিক্ষায় মিশনারীদের পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনের কোন সম্ভাবনাই আর রইল না।

নতুন পরিস্থিতিতে মিশনারীগণ নতুন করে তাঁদের নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রতি দশ বৎসর অন্তর মিশনারীদের একটি করে সম্মেলন হ'ত। ১৮৭২ খ্রীঃ এলাহাবাদের এরূপ এক সম্মেলনে অভিমত প্রকাশ করা হয়,—স্কুলে পড়ান মিশনারীদের কাজ নয়। ইংরেজী, সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শেখান সম্পর্কে তাঁদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ লৌকিক শিক্ষা দেওয়া মিশনারীদের কাজ নয়। হান্টার কমিশনের রিপোর্টের পর শিক্ষাপ্রসারে কি নীতি গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে নতুন করে চিন্তা শুরু হ'ল। যার ফল স্বরূপ মিশনারী শিক্ষানীতি পরিবর্তিত হয়।

মিশনারী শিক্ষানীতির পরিবর্তন ঃ

হান্টার কমিশনের সিদ্ধান্তের পর মিশনারীগণ স্থির করেন ভারতীয় খৃষ্টানদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি উন্নত ধরনের স্কুল ও কলেজের মধ্যে মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁরা নতুন ক্ষেত্র বেছে নিলেন। আদিবাসী পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ও অন্যান্য অল্পোন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশনারীগণ তাঁদের শিক্ষা প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টা ও শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা দুই-ই সাফল্য লাভ করে। আলোচ্য যুগে ইন্দোরের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, শিয়ালকোটে মারে কলেজ, কানপুর ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ, রাওলপিণ্ডিতে গর্ডন কলেজ প্রতিষ্ঠা মিশনারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান।

মিশনারী প্রচেষ্টা (১৯০৪-১৯২১) ঃ—ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পর ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারীদের একাধিপত্য স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। মিশনারীগণ সরকারী মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁদের কার্যক্ষেত্র অন্যত্র সম্প্রসারিত করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য কিছু আদর্শস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রেখে তাঁরা গণশিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। ধর্ম প্রচারের মাপকাঠিতে যদি মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ণয় করতে হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে মিশনারীদের নতুন প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেছিল।

ফ্রেসার কমিশনের সুপারিশ ঃ

আদিবাসী, পার্বত্য জাতি, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা ও খৃষ্টধর্ম বিস্তার কিভাবে সুষ্ঠুরূপে চালিয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯১৯ খ্রীঃ কাণ্ডিট্রিনিটি কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ফ্রেসারকে সভাপতি করে একটি কমিশন গঠিত হয়।

কমিশন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেখে মোটেই তুষ্ট হতে পারেন নি। শিক্ষা ব্যবস্থায় শোচনীয় অপচয় (wastage) ও বদ্ধতা (stagnation) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় বলে কমিশন নির্দেশ করেছিলেন। কমিশন সুপারিশ করেন যে গ্রামে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয়গুলিকে আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে; যার ফলে গ্রাম্য পরিবেশে বাস করে

ছাত্ররা গ্রামকে চিনতে পারবে ও গ্রামের উন্নতির জন্য সচেতন হবে। কমিশন মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থারও সুপারিশ করেন। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থারও সুপারিশ করা হয়। ফ্রেসার কমিশন যদিও বেসরকারী মিশনারী শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা ও উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, তবুও অপচয় ও বদ্ধতা সম্পর্কে কমিশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা সর্বভারতীয় শিক্ষা সমস্যা। ফ্রেসার কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশগুলি শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

ভারতীয় সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ায় মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অতি সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ১৯১৭ খ্রীঃ মিশনারী পরিচালনাধীনে সারা ভারতে ১০,৪৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে ৪২টি কলেজ, ৮৪৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭৫টি ট্রেনিং স্কুল, ৯২৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৪২টি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিশনারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫,৩৩,৯৫৪ জন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মোট ব্যয় ছিল ১,৩৮,০০,৪৭৫ টাকা।

॥ দ্বৈতশাসনের যুগে মিশনারী প্রচেষ্টা ॥

ফ্রেসার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মিশনারীদের উদ্যোগেকয়েকটি সমাজ শিক্ষা-কেন্দ্র ও শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু অর্থাভাবে এ দিকের কাজ খুব ভালভাবে অগ্রসর হয় নি। এছাড়া মিশনারীদের মধ্যে একদল অভিমত প্রকাশ করেন যে নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা হলে খৃষ্টান সমাজের নীতিগত ও ধর্মগত মানের অবনতি ঘটবে। এই বিতর্কের অবসানের জন্য ১৯২৮ খ্রীঃ আমেরিকান এপিসকোপাল চার্চের (Episcopl Church) কার্যাধ্যক্ষ ডাঃ জে, এম, পিকেটের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠিত হয়। কমিশন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও খৃষ্টধর্ম প্রসার প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। ফলে মিশনারীরা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণের দিকে মিশনারীগণ বিশেষ মনোযোগী হন। পাঞ্জাবে মোগা, দক্ষিণ ভারতে দেরনাকল, ত্রিবাঙ্কুরে মার্তনডাম, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে মোদক, বোম্বের অংক্লেশ্বর; এলাহাবাদে কৃষি-কলেজ এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র।

উচ্চশিক্ষার দিকেও মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ১৯২৯ খ্রীঃ আগ্রায় মিশনারী ও ভারতীয় খৃষ্টানদের এক সম্মেলনে মিশনারী কলেজ সমূহের মধ্যে শিক্ষার সমন্বয় সাধনের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অক্সফোর্ড বেলিয়ল কলেজের 'মাষ্টার' ডাঃ এ, ডি, লিণ্ডসের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশন মিশনারী পরিচালিত কলেজগুলি দেখে খুশী হতে পারেন নি। রিপোর্টে বলা হয় মিশনারী পরিচালিত কলেজগুলিতে খৃষ্টধর্মের পরিবেশ গড়ে ওঠে নি। কলেজে খৃষ্টান অধ্যাপক ও ছাত্রসংখ্যা অতি অল্প। এছাড়া কলেজের মধ্যে ছাত্রদের প্রকৃত বিদ্যানুরাগের অভাব রয়েছে। কোন রকমে পরীক্ষায় পাস করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক

শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষায় কোথাও জীবনের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ দেখা যায় না। কমিশন খৃষ্টান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। কমিশন গবেষণার কাজ, ধর্মশিক্ষা শিক্ষক-শিক্ষণ ও স্বাস্থ্যকর নীতিসম্মত জীবন যাতে শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

আলোচ্য যুগে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা প্রচেষ্টা মিশনারীদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া গ্রাম্যশিক্ষার গবেষণার জন্যও প্রশংসনীয় ভাবে কাজ করেছেন।

ফলশ্রুতি :—

ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক মিশনারীরা। আধুনিক যুগের শুরু থেকে মিশনারীরা যে শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন আজও তা অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে আমরা শিক্ষার দিক থেকে মিশনারীদের কাছে বহুভাবে ঋণী।

ধর্ম প্রচারের অতি উৎসাহের ফলে স্থানে স্থানে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে ; কিন্তু সেই সাময়িক ও স্থানীয় জটিলতার উর্দ্ধে তাঁদের নিরলস শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার ফলে আজও ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান মিশনারী প্রচেষ্টারই শুভফল। মিশনারীগণ তাঁদের কার্যক্ষেত্র পরিবর্তিত করেছেন তবুও দেখা যায়, ১৯৩৭-৩৮ খ্রীঃ মিশনারী পরিচালনায় সারা ভারতে ১৪,৩৪১টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১,১৮,২০০ জন এর জন্য ব্যয় হ'ত মোট ৩,৮২,০১,২৪১ টাকা।

অনুশীলনী

1. Bring out the contributions of the missionaries to the development of education in 19th century in India. [B. T. 1951]
2. Give brief account of the educational activities of the Christian Missionaries and the East India Co. in Bengal and Madras prior to 1814. [B. T. 1957]
3. What has been the contribution of Missionary enterprise in Bengal in the first half of the century in any two of the following fields : (a) The growth of the Vernaculars. (b) The spread of English education. (c) The education of women. [B. T. 1965]
4. Trace the development of education in India between 1818 & 1853 and part played by different agencies. [B. T. 1967]

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দ্বন্দ্ব ও মেকলের মন্তব্য

॥ ১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনে শিক্ষা ধারা (Education Clause) ॥

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নৈতিক দায়িত্বকে তারা কোনদিন স্বীকার করে নি। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থ সাহায্য করেছে, বেনারসে সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে সরকারী উদ্যোগ থাকলেও দেশে শিক্ষা বিস্তারের কোন সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতি ছিল না।

১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ আইন পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হয়। জনমতের চাপে সনদ আইনে ৪৩ ধারায় ভারতে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে একটি শর্ত লিপিবদ্ধ করা হ'ল। এই ধারার (clause) দু'টি অংশ। প্রথম অংশে বলা হ'ল বৃটিশ ভারতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি বিধান, পণ্ডিতদের উৎসাহ দান এবং দ্বিতীয় অংশে বলা হয় এ দেশবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন কল্পে কোম্পানী অন্য সব রকম খরচ মিটিয়ে বছরে এক লক্ষ টাকা খরচ করবেন "—*a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of sciences among the inhabitants of the British territories in India.*"

১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনের শিক্ষা ধারাকে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। এর পূর্বে কোম্পানী শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করলেও শিক্ষা যে সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব একথা স্বীকার করে নি।

শিক্ষা ধারা সম্পর্কে কোম্পানীর মনোভাব ও ভারত সরকারের শিক্ষানীতি :—

১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ আইনে শিক্ষা ধারা (education clause) গৃহীত হবার ফলে আশা করা হয় সরকারী প্রচেষ্টায় দেশে দ্রুত শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটবে এবং সরকার শিক্ষা সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় নীতি স্থির করে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণে কোম্পানীর প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল। তাই সর্বভারতীয় কোন নীতি দ্বারা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোন প্রচেষ্টা উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে হয় নি। শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট এক লক্ষ টাকা ব্যয়

সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার ফলে ভারতের শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক জটিলতারই সৃষ্টি হয়েছিল।

॥ শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে জটিলতা ॥

সনদ আইনের শিক্ষা ধারার সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি (*the revival and improvement of literature*) বলতে ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্যকে বুঝায় তা পরিষ্কার করে বলা হয় নি। সনদে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন (*the introduction and promotion of knowledge of science*) করতে বলা হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞান বলতে প্রাচ্য বিজ্ঞান কি পাশ্চত্য বিজ্ঞান তা কিছুই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় নি। ফলে শিক্ষাধারা ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ যদি সুস্পষ্টভাবে তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন তাহলে কোন জটিলতার সৃষ্টি হ'ত না। শিক্ষা ধারা সম্পর্কে কোম্পানী ১৮১৪ খ্রীঃ ৩রা জুন একটি ডেস্‌প্যাচ পাঠান—এই ডেস্‌প্যাচ থেকে মনে হয় কোম্পনীর কর্তৃপক্ষ প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের জন্যই এই ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে চেয়েছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ত নীতি ঃ—

ডেস্‌প্যাচে গভর্ণর জেনারেলকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলা হয়। ডেস্‌প্যাচে টাকা কিভাবে খরচ হবে সেই সম্পর্কে কিছুটা আভাসও দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য ধরনের ইংরেজী শিক্ষার কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবে তারা বিরোধিতা করেন। তাদের ভয় ছিল এতে হিন্দুরা আপত্তি করবে। প্রাচ্য দর্শন, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, ভেষজ বিদ্যা প্রভৃতির উপযোগিতার কথা উল্লেখ করে প্রাচ্য বিদ্যার জন্য টাকা খরচের কথা বলা হয়। কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারীগণ যাতে দেশীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রাচ্যবিদ্যা শেখেন তাও বলা হয়েছিল। ডেস্‌প্যাচে বলা হয় এতে ভারতীয়দের সাথে যোগসূত্র দৃঢ়তর হবে। পল্লীতে পল্লীতে মাতৃভাষার সাহায্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেগুলি বাঁচিয়ে রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গ্রাম্য শিক্ষকদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে বলা হয়। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের পক্ষে কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশনামায় কোন কথাই বলেন নাই। কিন্তু কিছুদিন বাদেই কোম্পানীর মতিগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেশের শাসন ব্যবস্থা যখন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হ'ল তখন কোম্পানীও সুর বদলাতে আরম্ভ করল। প্রাচ্য বিদ্যার পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও ইংরাজী শিক্ষার প্রসারই যে কোম্পানীর সত্যিকারের অভিপ্রায় পরবর্তী নির্দেশসমূহের মধ্যে তা পরিস্ফুট হতে থাকে।

লর্ড হেষ্টিংসের অভিমত ঃ—

কোম্পানীর এই নির্দেশের পর তৎকালীন বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৫ খ্রীঃ তার অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্য বরাদ্দ অর্থের বৃহৎ অংশ ব্যয় করার নির্দেশ মেনে নিয়ে বললেন গণশিক্ষার প্রসার না হলে কোন দেশে শক্তিশালী

সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। জনগণের অজ্ঞতা অপেক্ষা শিক্ষাই শক্তিশালী সরকার গঠনের উপায়। যে কোন শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনায় গ্রাম্য শিক্ষকদের কথা সবার আগে বিবেচনা করতে হবে। গ্রাম্য শিক্ষক অতি সামান্য পারিশ্রমিকে লেখাপড়া, অঙ্ক, দোকান, জমিদারী, হিসেবের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিখিয়ে থাকেন। তিনি প্রতি জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুটি করে স্কুল ও বিপথগামী ছেলেদের (infant profligates) সংশোধন ও চাকুরী সংস্থানের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পরামর্শ দেন। লর্ড হেষ্টিংসের সাধু উদ্দেশ্য তিনি কাজে পরিণত করতে পারেন নি। তিনি গুর্খা যুদ্ধ, পিণ্ডারী দমন প্রভৃতি কাজে তাঁর শক্তি নিয়োগ করায়, তাঁর পক্ষে পরিকল্পনাকে আর রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ G. C. P. I. গঠন ও প্রাচ্য বিদ্যার পোষকতা :—

বাংলাঃ—১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনে শিক্ষাধারা গৃহীত হবার পর সরকারী তহবিল থেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষার জন্য সরকার থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে কিছু করবার আছে, ১৮১৩ খ্রীঃ পূর্বে সরকার সে বিষয়ে সচেতন হয় নি। এর আগে সামান্য কিছু সাহায্য মঞ্জুর করা ছাড়া সরকারী চেষ্টা বা উদ্যোগে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন করে কিছু গড়ে ওঠে নি। ১৮২১ খ্রীঃ পুনায় একটি সংস্কৃত কলেজ, ১৮২২ খ্রীঃ কলিকাতায় দেশীয় ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য মেডিকেল স্কুল স্থাপন হ'ল উল্লেখযোগ্য সরকারী প্রচেষ্টা। সরকার থেকে নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দুটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তা কার্যকরী হয় নি। ১৮২১ খ্রীঃ উইলসনের পরামর্শে স্থির হয় কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ খোলা হবে। বছরে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা খরচের কথাও স্থির হয়। কিন্তু দেড় বছরের মধ্যে কলেজ খোলা সম্ভব হয় নি। শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা দূর করলেন অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল মিঃ এডাম। **১৮২৩ খ্রীঃ ৩১শে জুলাই সপরিষদ বড়লাট দশজন সভ্য নিয়ে General Committee of Public Institution (G. C. P. I) নামে একটি কমিটি গঠন করেন।** এই শিক্ষাসভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাঁদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষাসভা গঠিত হয়েছে "*with a view to better instruction of the people, to the introduction among them the useful knowledge and to the improvement of their moral character.*" বাংলা দেশের সিভিলিয়ানদের নিয়ে এই সভা গঠিত হয়। সভার সাহায্যের জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন হেরিংটন শিক্ষাসভার প্রথম সভাপতি ও ডাঃ হোরেস উইলসন প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমগ্র উত্তর ভারতে সভার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচলনার দায়িত্ব শিক্ষাসভা (G. C. P. I.) গ্রহণ করে। সভার হাতে

সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও বরাদ্দীকৃত লক্ষ টাকা ব্যয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। **জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরকারের হাতে না থাকায় স্থির হয় 'শিক্ষাসভা' শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করবে।** ১৮২৪ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী গোলদীঘির পাড়ে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হ'ল। ১লা জানুয়ারী থেকেই বৌবাজারে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। আগ্রা ও দিল্লীতে দুটি প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার কলেজ খোলা হয়। সংস্কৃত ও আরবী বই ছেপে প্রচার করা হয়। ইংরেজী বই প্রাচ্য ভাষায় অনুবাদ করে ছেপে প্রচার করবার আয়োজন হয়।

॥ প্রাচ্যবাদীদল ও বিলাতের কর্তৃপক্ষ ॥

শিক্ষাসভার (G. C. P. I.) প্রাচ্যবাদীদল প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থন করলেও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বা useful knowledge-এর প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সংস্কৃত বা আরবীর মাধ্যমেই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্ভব। বিলাতের কর্তৃপক্ষের ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ইচ্ছা থাকলেও দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। কর্তৃপক্ষের শিক্ষাসম্পর্কীয় ডেস্‌প্যাচ থেকে বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে তাদের মনোভাব প্রাচ্যবিদ্যার অনুকূলেই ছিল। ইংরেজ শাসনের ভিত্তি দৃঢ় হবার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষের মতিগতি বদলে যেতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীঃ কোর্ট অব্‌ ডাইরেক্টরস্‌ শিক্ষা সম্পর্কে ভারত সরকারকে এক পত্র দেন; এতে বলা হয় শিক্ষাসভা (G. C. P. I.) শিক্ষার যে আয়োজন করেছে তা বেশীর ভাগই অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর; এর সামান্য অংশেরই মাত্র কিছু প্রয়োজন আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয় বিদ্যা (*useful learning*) সম্পর্কে কোর্ট বললেন, প্রয়োজনীয় বিদ্যা বলতে হিন্দুশিক্ষা (*Hindu learning*) বুঝায় না।

শিক্ষাসভার থেকে বড়লাটকে জানান হ'ল দেশের লোক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিরোধী এবং প্রাচীন ভাষার সাহায্যে প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সভার পক্ষ থেকে যাই বলা হোক না কেন, এ দেশের লোকের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ইংরেজী শিক্ষার দাবীকে শিক্ষা সভাও অস্বীকার করতে পারে নি। সভা ১৮৩৩ খ্রীঃ আগ্রা কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করেন। দিল্লী ও বেনারসে, ইংরেজী শিক্ষার জন্য স্কুল খোলা হয়। শিক্ষা সভার থেকে একটি প্রেস স্থাপন করে ও সংস্কৃত ও আরবী বই ছাপা হয় কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল বইগুলির কোন চাহিদা নেই। শিক্ষা সভা স্বীকার করতে বাধ্য হন দেশে ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে।

॥ শিক্ষাসভার প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিরোধের সূচনা ॥

শিক্ষাসভায় প্রাচ্যবিদ্যানুরাগীদের প্রাধান্য থাকায় প্রথমদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের দিকে সভার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে

থাকে ও সভায় দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। ১৮৩১ খ্রীঃ সভার দশজন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন ছিলেন প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থক এঁদের নেতা ছিলেন প্রিন্সেপ। অপর পাঁচ জন ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষানুরাগী এই নব্য সিভিলিয়ান দলের নেতা ছিলেন 'ট্রেভেলিয়ান'। প্রাচ্যবাদীগণ মনে করতেন ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রাখাই সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হবে; তাহলেই দেশের লোকের মন জয় করা যাবে আর শিক্ষাধারার নির্দেশও তাই। সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন বলতে প্রাচ্যবিদ্যাকেই বোঝান হয়েছে। এবং দেশের লোকও তাই চায়। পাশ্চাত্ত্যবাদীগণ বলেন সাহিত্য বলতে ইংরেজী সাহিত্যই বোঝান হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব অপ্রয়োজনীয়; এর জন্য শিক্ষা সভার অর্থ ব্যয় করা করা উচিত নয়। দেশের লোক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনুরাগী। প্রমাণস্বরূপ তারা বললেন শিক্ষা সভার মুদ্রিত সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থসমূহ গুদামজাত হয়ে আছে কিন্তু ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক ছাপা হবার সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। রামমোহনের নেতৃত্বে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দাবী পাশ্চাত্ত্য-বাদীদের আরও শক্তিশালী করে তোলে। দুই দলের বিবাদের ফলে দেশের সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার বাহন নিয়ে যখন দুই দলের বিতর্ক এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে তখন পার্লামেন্টের সদস্য টমাস বেরিংটন মেকলে বড়লাট পরিষদের আইন সচিব হয়ে ভারতে আসেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ নতুন সনদ আইন পাস হবার সময় তিনি বলেছিলেন ভারতীয়দের নব্যশিক্ষাদান করে গণতান্ত্রিক নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত। মেকলে এদেশে আসার সাথে সাথেই বেন্টিংক তাঁকে শিক্ষা সভার সভাপতি নিযুক্ত করেন। মেকলের ঐতিহাসিক 'মিনিট' প্রকাশিত হবার পর সরকারী শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যদ্বন্দ্বের অবসানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

॥ বাংলায় নবজাগরণ ও রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা ॥

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাদেশের চিন্তাজগতে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা হয়। বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এই সময় এমন এক আলোড়ন সৃষ্টি হয় যার ফলে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব নতুন চেতনার সঞ্চার হয় ও সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম সাধনা ও সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রবল কর্মচাঞ্চল্য দেখা যায়। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এই নবজাগরণের প্রথম নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যুগ স্রষ্টা রাজা রামমোহন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের যা কিছু ভাল তাই তিনি গ্রহণ করতে বলেছেন, এই অমিতবীর্য, সংকল্পে অবিচল বীর যোদ্ধা একই সাথে রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজ ও খৃষ্টীয়ধর্ম যাজকদের সাথে লড়াই করেছেন। জীবনে তিনি ছিলেন সমন্বয় বাদী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন, তাঁর চিন্তায়ই প্রথম সূচিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ করবার যে আন্দোলন তার নেতৃত্ব তিনিই গ্রহণ করেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ দেশের স্বল্প সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁর এই কাজে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন।

দেশের জনসাধারণ যখন ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল এবং শিক্ষিত ভারতীয়গণ পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অনুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে দ্বিধাহীন সেই সময়ে শুধুমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ভারতীয় শিক্ষিত সমাজকে তুষ্ট করতে পারে নি। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর এক পত্রে লর্ড আমহার্স্টকে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার এক প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বলেন, সরকারের আরও প্রগতিশীল ও উন্নত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা করা উচিত। ঐ টাকায় ভারতীয়দের জন্য গণিত, রসায়ন, প্রাকৃত দর্শন, শরীর বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। রামমোহনের স্মারক লিপিতে দেশের প্রগতিশীল শিক্ষিত জনসমাজের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য রাজা রাধাকান্তদেব ও ভবানীচরণ প্রমুখ রক্ষণশীল সমাজ প্রাচ্যবিদ্যার ব্যাপক প্রচার সমর্থন করেছিলেন।

॥ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দ্বন্দ্ব ॥

১৮৩১ খ্রীঃ বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শিক্ষাসভায় (*General Committee of Public Instruction*) শুরুতে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থক।

প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থক দল বলেন, সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন বলতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথাই বলা হয়েছে। শিক্ষিত বলতে প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিতদের বোঝান হয়েছে। নব্য সিভিলিয়ানগণ বললেন, সাহিত্য বলতে ইংরেজী সাহিত্য ও পণ্ডিত বলতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের বোঝান হয়েছে। শিক্ষাসভার আনুকূল্যে দেশের আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তার প্রয়াসকে কমিটির নতুন সিভিলিয়ান সদস্যগণ মোটেই সুনজরে দেখেন নি। **এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে জনমত গঠন করতে থাকেন। শিক্ষাসভার মধ্যেও ধীরে ধীরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবাদী দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে।** উভয় দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। কমিটির হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিছু করা সম্ভব বলে বিবেচিত হয় নি। **দুই দলই উচ্চ শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিল। 'চুঁইয়ে নামা' শিক্ষানীতি সম্পর্কেও কোনও মতভেদ ছিল না।** প্রাচ্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও নীতিগত বিরোধ সামান্য যেটুকু ছিল তা-ও রইল না। **এখন সমস্যা হ'ল শিক্ষার বাহন নিয়ে—প্রাচ্যবাদী দল সংস্কৃত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে চাইল। পাশ্চাত্ত্যবাদীদল এই "অকেজো ও অপ্রয়োজনীয়" ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের দাবী জানাল।** ১৮৩১ খ্রীঃ

কমিটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদী দলের সদস্য সংখ্যা সমান সমান হয়। ফলে বিরোধ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে, এবং কাজ কর্মে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সভাপতির কাষ্টিং ভোটে কাজ কোন ক্রমে চালু রাখা হয়। কিন্তু কোন পক্ষের একজন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে আগের সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে পরের সভায় তা বাতিল হয়ে যেত। এই অস্বাভাবিক অবস্থার কোন রকমেই যখন পরিবর্তন হ'ল না, তখন শিক্ষাসভা বাধ্য হয়ে এই বিরোধের মীমাংসার জন্য সরকারের দ্বারস্থ হ'ল।

এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রেও এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। উদারনৈতিক দলের প্রভাবে পার্লামেণ্ট সংস্কার আইন পাস হয় ও বহু জনহিতকর সংস্কার সাধিত হয়। এই উদারনৈতিক পটভূমিকায় ১৮৩৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ আইন পাস হয়। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ দশ হাজার পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে এক লক্ষ পাউণ্ড করা হয়।

নতুন সনদ আইনের একটি ধারায় বলা হয় যে জাতি বা ধর্মের কারণে কোন ভারতবাসী সরকারী যে কোন পদের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না, আর একটি ধারায় ইউরোপ ও আমেরিকার যে কোন দেশের মিশনারীদের ভারতে এসে কাজ করবার অধিকার স্বীকৃত হয়। এই সনদ বড়লাটের পরিষদে একজন আইন সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৩৪ খ্রীঃ লর্ড মেকলে বড়লাটের পরিষদে আইন সদস্যরূপে যোগ দেন। লর্ড বেণ্টিংক তাঁকে শিক্ষাসভার (G. C. P. I.) সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষাসভার সভাপতিরূপে মেকলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিরোধে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। ১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনের শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা নিয়ে দুই দলই সরকারী মধ্যস্থতা প্রার্থনা জানায়। বিষয়টি বড়লাটের নিকট পাঠান হয়, বড়লাট আইন সদস্যরূপে মেকলের অভিমত চেয়ে পাঠান। প্রাচ্যবাদীরা বলেছিলেন শিক্ষাধারায় নির্দেশমত আইনগত ভাবে সরকারী অর্থ শুধুমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের জন্যই ব্যয় করা যেতে পারে। **মেকলে এই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা উপলক্ষ্য করে ১৮৩৫ খ্রীঃ ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর বিখ্যাত মিনিট বা মন্তব্য পেশ করেন।**

॥ মেকলের মন্তব্য ॥

১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনের শিক্ষা সম্পর্কিত বিখ্যাত ৪৩ ধারায় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মেকলে তাঁর **মন্তব্যে লিখলেন, 'সাহিত্য' কথাটিকে শুধুমাত্র সংস্কৃত বা আরবী সাহিত্যকে বোঝান হয় নিঃ ইংরেজী সাহিত্যকেও বোঝায়। 'শিক্ষিত ভারতীয়' বলতে সংস্কৃতপণ্ডিত আরবী ফার্সীতে পারদর্শী মৌলবীদের বোঝায় না, যারা লকের দর্শন ও মিণ্টনের কবিতায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন তাঁদের বোঝায়। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের কাজে বড়লাট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভাল মনে করেন, তার জন্যই অর্থ ব্যয় করতে পারেন।**

প্রাচ্যবাদীগণ বলেছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে ; কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতীক এবং জনসাধারণও এইগুলি বাঁচিয়ে রাখতে চায়। মেকলে বললেন, এগুলি কোন উপকারেই আসছে না তাই এগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া দরকার। জনমতের দাবীকে অযৌক্তিক হলেও মানতে হবে এমন কোন কথা নেই ? জনমতের দাবীকে এভাবে মেনে নিলে কোনদিন কোন সংস্কারই সম্ভব হবে না। একটি স্থলকে স্বাস্থ্যকর বলে যদি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করা হয় এবং যদি দেখা যায় স্থানটি স্বাস্থ্যকর নয়, তবুও জনমতকে মেনে নিয়ে সেখানে স্বাস্থ্য-নিবাস রাখতে হবে এ দাবীর কোন অর্থ হয় না।

শিক্ষার মাধ্যম তিনি বিভিন্ন দলের মতামত বিচার করে তাঁর অভিমত উপস্থাপন করেন। **শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি মত ছিল—দেশীয়ভাষা বা মাতৃ-ভাষা, সংস্কৃত ও আরবী ভাষা এবং ইংরেজী ভাষা।** দেশীয় ভাষা বা মাতৃ-ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন—দেশীয় ভাষাসমূহ অত্যন্ত দীন ও ঐশ্বর্য্যহীন। এ ভাষার শব্দ সম্পদ ভাব প্রকাশে এত অনুপযুক্ত যে পাশ্চাত্ত্য ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ দেশীয় ভাষাসমূহে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। যে ভাষায় এত দৈন্য সে ভাষা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বাহন হতে পারে না। এ সম্পর্কে পরম বিস্ময়কর বিষয় এই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কোন দলই মাতৃ-ভাষাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন নি। এর পর রইল সংস্কৃত ও আরবী এবং ইংরেজী ভাষা। মেকলে প্রাচীন প্রাচ্য ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, তবু প্রাচ্যবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে বলেন, প্রাচীন প্রাচ্য ভাষা সমূহ ইউরোপীয় ভাষাসমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ও প্রমাদ পূর্ণ। তিনি দম্ভভরে বলেন, সমস্ত ভারত ও আরবের যে সাহিত্য সম্পদ আছে ইউরোপীয় যে কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের একটি মাত্র তাকে যে সম্পদ রয়েছে সেই সাহিত্য সম্পদের সাথে তাকে তুলনা করা যায়" (*"A single self of good European library was worth the whole Native literature of India and Arabia"*) **ইংরেজীর মত সম্পদশালী ভাষায় শিক্ষা দেবার সুযোগ যেখানে রয়েছে সেখানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ভাষা যে ভাষায় ইংরেজী জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজির সম কক্ষ একখানি গ্রন্থও নেই সে ভাষায় শিক্ষা দেবার কোন অর্থ হয় না।** পাশ্চাত্ত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি পড়ানোর সুযোগ থাকতে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র যার বিধি বিধান নিকৃষ্টতায় একটা সাধারণ ইংরেজ গো-বৈদ্যের জ্ঞানের তুল্য নয়, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা যার কথা শুনলে ইংলণ্ডের একটি সাধারণ স্কুলের মেয়েও হেঁসে উঠবে : ভারতীয় ইতিহাস যাতে আছে ত্রিশ ফুট দীর্ঘ রাজার কাহিনী আর ত্রিশ হাজার বছর ব্যাপী রাজত্বকালের নানা বিবরণ : যে দেশের ভূগোলে আছে ক্ষীর সাগর আর মধু সমুদ্রের কথা, সেই ভারতীয় বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য অর্থ ব্যয় করা মানে সরকারী অর্থের অপচয় করা।

মেকলে ইংরেজী ভাষার সমর্থনে লিখলেন—ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান-'বিজ্ঞানের এক অমূল্য অফুরন্ত খনি। ইংরেজী ভাষা ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। এক সময় যেমন গ্রীক ও লাটিন ভাষার মাধ্যমে ইউরোপে নব জাগরনের সূচনা হয়েছিল, যেমন পশ্চিম ইউরোপ রাশিয়াকে সভ্য করেছিল, তেমনি **ইংরাজী ভাষা ভারতের এক নতুন যুগের সৃষ্টি করবে। দেশীয় লোকেরা ইংরেজী শিখতেই চায়।** শিক্ষা সভা সরকারী অর্থে সংস্কৃত ও আরবী যে বই ছেপেছিল তা গুদামে পচছে আর স্কুল বুক সোসাইটি হাজার হাজার বই বিক্রি করে মুনাফা করেছে। ইংরেজী স্কুলগুলিতে লোকে টাকা খরচ করে শিক্ষা গ্রহণ করছে, আর বৃত্তি দিয়েও আরবী ও সংস্কৃত শেখার জন্য ছাত্র জোগাড় করা কঠিন। বৃত্তিকে তিনি প্রকারান্তে ঘুষ (*bounty money*) আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি বললেন ভারতে ইংরেজী শাসক শ্রেণীর ভাষা কিছুদিনের মধ্যেই প্রাচ্য সমুদ্রের তীরবর্তী দেশ সমূহের বানিজ্যের ভাষারূপে গৃহীত হবে। ভারতীয়দের সম্পূর্ণ ভাবে ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত করে তোলা সম্ভব এবং সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার সেই লক্ষ্যই থাকবে। **ইংরেজী শিক্ষার ফলে এ দেশে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্ট হবে যারা বর্ণে ও রক্তেই শুধু ভারতীয় থাকবে কিন্তু রুচি, মতামত নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ** (*"a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions and intellect."*) এদের মধ্যে থেকেই শিক্ষা নীচের দিকে নেমে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

প্রীন্সেপের মন্তব্য :—

মেকলের মন্তব্য প্রাচ্যবাদী দলের নেতা প্রীন্সেপের নিকট তাঁর অভিমতের জন্য পাঠান হ'লে তিনি দৃঢ়রূপে বলেন "শিক্ষাধারায় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন বলতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথাই বলা হয়েছে, এবং শিক্ষিত বলতে শুধুমাত্র প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিতদের বোঝায়"। তিনি বলেন, প্রাচ্যবিদ্যার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে। দেশের জনমতের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখান সরকারের কর্তব্য এবং প্রাচ্যবিদ্যাকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় বলার পিছনে কোন যুক্তি নেই। এ ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে একটা সামান্য অংশই ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী। মুসলিম সমাজ এর বিরোধিতা করছে।

বেন্টিংকের সিদ্ধান্ত :—

লর্ড বেন্টিংকপ্রথম থেকেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। মেকলের সুপারিশসমূহ তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করে ১৮৩৫ খ্রীঃ ৭ই মার্চ কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবই ভারত সরকারের নতুন শিক্ষানীতি রূপে গৃহীত হয়।

(ক) প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করাই সরকারী শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য হবে, এবং শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

(খ) দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যতদিন এ দেশের লোক প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি অনুরক্ত থাকবে ততদিন প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে না। তবে

ঐ সব প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন কোন অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে না। এই প্রস্তাবে ভারতীয়দের কিছুটা শান্ত করবার চেষ্টা করা হয়।

(গ) তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, শিক্ষা সভা (G. C. P. I.) প্রাচ্য ভাষায় বই ছাপাতে যে বিপুল ব্যয় ভার বহন করেছে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

(ঘ) চতুর্থ প্রস্তাবে আছে, এই সংস্কারের ফলে শিক্ষাসভার হাতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হবে সেই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার জন্যই বিনিয়োগ করা হবে।

লর্ড বেন্টিংক ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসবার পর থেকেই ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি ১৮২৯ খ্রীঃ এক চিঠিতে শিক্ষা সভাকে জানান, সরকারী নীতিই হচ্ছে ধীরে ধীরে সর্বক্ষেত্রে ইংরেজীকে চালু করা। এজন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সব রকমের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে হবে। কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ বেন্টিংকের শিক্ষা নীতিকে সমর্থন জানান। প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যদলের বিরোধের ফলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বেন্টিংক বিঘোষিত ভারত সরকারের প্রস্তাব-সমূহের মধ্য দিয়ে সেই অচল অবস্থার অবসান হয়ে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই যে সরকারী শিক্ষা নীতির লক্ষ্য এই প্রস্তাবগুলির মাধ্যমে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই প্রথম ঘোষণা করা হ'ল। মেকলের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ না করতেন তা হলে হয়ত ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বিলম্বিত হ'ত। সেদিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার ইতিহাসে বেন্টিংকের প্রস্তাবসমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

॥ মেকলের সমালোচনা ॥

ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যের জন্য মেকলে সমভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। উচ্ছ্বাসবশে অনেকে তাঁকে নতুন যুগের আলোকবর্তিকাবাহী বলে অভিনন্দিত করেছেন। আবার অনেক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে তাকে নিন্দা করেছেন। ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস সম্পর্কে মেকলে বহু অবজ্ঞাসূচক উক্তি করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা এবং ধৃষ্টতা-পূর্ণ উক্তির জন্য তিনি ভারতীয়দের নিকট চিরদিনই নিন্দনীয় থাকবেন। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের অসন্তোষ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ইংরেজী শিক্ষাকে দায়ী করে অনেকে অন্যায় ভাবে মেকলেকে নিন্দা করেছেন।

একটু ধীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে অতি নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয়। নতুন যুগের উন্নতির আলোকবর্তিকাবাহী (*Torch bearer in the path of progress*) বলে তাঁকে অভিনন্দিত করলে অতিশয়োক্তিই করা হবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানীতি গ্রহণের দায়িত্ব তাঁর একার নয়, তাই নিন্দা বা প্রশংসাও তাঁর একার প্রাপ্য নয়। **মেকলে এদেশে আসবার আগে থেকেই এ দেশের জনসাধারণ ইংরেজী শিক্ষার পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিল। রাজা রামমোহন রায় বহু পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের দাবী**

জানিয়ে ছিলেন। অর্থ ও মান দুয়ের জন্যই যে ইংরেজী শিক্ষার উপযোগিতা রয়েছে একথা এ দেশের লোক বুঝতে পেরেছিল। শিক্ষা সভায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ মেকলে এদেশে আসবার পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল। লর্ড বেণ্টিংক এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন—বোর্ডের কাছে চিঠিতে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, বোর্ডও তাঁকে সমর্থন জানিয়ে ছিল। এসব বিবেচনা করে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মেকলেকে কি করে দায়ী করা যায়? তারপর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছিল বড়লাটের উপর। বড়লাট পরিষদের আইন সদস্যরূপে তিনি আইনগত পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র। লর্ড বেণ্টিংক যদি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ না করতেন তাহলে তাঁর মতামত সরকারী নীতিরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত হবার প্রশ্ন উঠত না। মেকলে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে বেণ্টিংকের কাজের সহায়তা করেছিলেন মাত্র। **কালের অনিবার্য গতিতে দেশ যে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের অনুকূলেই যাচ্ছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। কালচক্রের আবর্তনে যা কিছুদিন পরে সংঘটিত হতে পারত মেকলের মন্তব্যে তা শুধুমাত্র ত্বরান্বিত হয়েছিল।**

শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজীকে গ্রহণ করে তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন বলে তাঁকে দায়ী করা হয়। একথা সত্য, তিনি দেশীয় ভাষাগুলি '*poor and rude*' বলেছিলেন। কিন্তু, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন দলই দেশীয় ভাষাগুলি যে শিক্ষার বাহন হ'তে পারে একথা মনে করে নি। এদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও দেশীয় ভাষাগুলিকে সুনজরে দেখতেন না। আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষা যে শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে শিক্ষিত ভারতীয়রা সেকথা ভাবতেই পারতেন না। বরং মেকলে আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত পোষণ করতেন বলেই বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে। শিক্ষাসভার সভাপতিরূপে তিনি মন্তব্য করেন, "দেশীয় ভাষাগুলির চর্চায় উৎসাহদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে সচেতন আছি। দেশীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য এবং এ জন্যই আমাদের সকল শক্তি নিয়োগ করতে হবে" (*"We are deeply sensible of the importance of encouraging the cultivation of vernacular language. We conceive the formation of vernacular literature to be ultimate object to which all our efforts must be directed."*)

একথা স্বীকার করতেই হবে, **মাতৃভাষাকে নিজ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার কথা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই দেশীয় ভাষার উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের কথা বলেছিলেন**। যে সময়ে ভারতীয়রাই দেশীয় ভাষার সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, যদি সেই সময়ে মেকলে দেশীয় ভাষা সম্পর্কে 'poor and rude' এই মন্তব্য করেছেন বলে নিন্দা করা যায় না।

মেকলের সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ হচ্ছে ভারতীয় সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত অশ্রদ্ধেয় উক্তি। যে ভাষা বা সাহিত্যকে তিনি জানেন না, যে ধর্মের সাথে তাঁর পরিচয় নেই সে সম্পর্কে ব্যঙ্গ বা দম্ভোক্তি কোনটাই

দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীর পক্ষে শোভন বা সঙ্গত নয়। অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে তাঁকে ক্ষমা করা যায় না। তিনি প্রাচ্য বিদ্যায় যারা পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে সত্য জেনে নিতে পারতেন। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছু জানবার চেষ্টা না করেই তিনি অর্ধ সত্য বিবরণ দিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করতে চেয়েছেন, এটাই হয়েছে তাঁর ধৃষ্টতা।

দেশের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও আন্দোলনের জন্য অনেকে তাঁকে দায়ী করেন—এ অত্যন্ত অযৌক্তিক। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার না হলে কি দেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্নতি হ'ত না? এশিয়ার নব-জাগরণ কি শুধু ইংরেজী শিক্ষার ফলেই হয়েছে? আর যদি ভারতের জাতীয় চেতনা ইংরেজী শিক্ষার দানই হয়ে থাকে সেজন্য ইংরেজ জাতির গৌরব বোধ করা উচিত।

মেকলে বোধ হয় ভেবেছিলেন ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতীয়রা তাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে গ্রহণ করে ভারতের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতের বুক থেকে মুছে ফেলবে। মেকলের এই মনোভাব তাঁর পিতার নিকট লিখিত এক পত্রে জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে এদেশে একজনও মূর্তিপূজক থাকবে না। ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে বাঙ্গালীরা স্বাভাবিক ভাবেই খৃষ্টধর্মভাবাপন্ন হয়ে উঠবে, ধর্ম প্রচারের আবশ্যকই হবে না" (*"It is my firm belief that if our plans of education are followed up there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty year since. And this will be effected without any efforts to proselytize."*

মেকলের 'মন্তব্যের ফল ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী হয়েছিল। কিন্তু তিনি ভারতীয় সভ্যতার অসাধারণ সমন্বয়ী শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না বলেই এরূপ অসম্ভব আশা পোষণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা উপকৃত হয়েছি সন্দেহ নেই। কিন্তু মেকলে যদি ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হতেন তাহলে প্রাচী ও প্রতীচির সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে কি করে জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলা যায় সে দিকে চিন্তা করে তাঁর নীতি নির্দ্ধারণ করতেন, তাহলে এদেশের অসীম কল্যাণ হ'ত। এডাম যে সহানুভূতি ও উদার দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর শিক্ষাসৌধ গড়ে তোলবার কথা চিন্তা করেছিলেন, এ দেশ ও এ দেশবাসী সম্পর্কে মেকলের সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব ছিল না। তিনি গণশিক্ষার কথা চিন্তা করেন নি। অগণিত জনসাধারণকে অশিক্ষিত রেখে দেশের একটা সামান্য অংশের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তিনি দেশের ক্ষতিও করে গেছেন। শতাধিক বছর অতীত হয়েছে মেকলে তাঁর বহু বিতর্কিত মন্তব্যে লিখেছিলেন এই সুদীর্ঘ সময়ে দেশে বহু স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবু আজও অগণিত ভারত সন্তান শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা এখনও মুষ্টিমেয়ের সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে আছে।

মেকলের সততায় সন্দেহ না করেও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় ইংরাজী শিক্ষার বিষামৃত সমভাবে আমাদের দেশের কল্যাণ অকল্যাণ দুই-ই করেছে।

প্রশ্নাবলী

1. Is there any justification for regarding Macaulay's Minute as in famous ? Examine his ideas critically. [B. T. 1951]
2. The Government of India put a stop .to the orientalist versus occidentalist controversy in Education by issuing a resolution in 1835, What important decisions were embodied·in that resolution ? [B. T. 1955]
3. Give critical account of the oriental occidentalist controversy in the field of Indian education during the 19th century. What was its outcome ? [B. T. 1959]
4. Narrate in brief the development of Western education in India. What were the obstacles in the way of its spread and how were they overcome ? [B. T. 1964]
5. Examine critically Macaulay's Minute and trace the subsequent development of English schools in India. [B. T. 1961]
6. Comment on the oriental versus occidental controversy in education during the first half of the last century and discuss critically the Resolution issued in this eduation by the Government of India. [B. T. 1962]
7. "During the rule of the East India Company in India opinion was divided as to whether occidental or oriental learning should be fostered by the Govt." Discuss with special reference to Macaulay's contribution to the question. [C. U. 71]

চতুর্থ অধ্যায়

উডের ডেসপ্যাচ

॥ উডের ডেসপ্যাচের পটভূমি ॥

আধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম আয়োজন হয়েছিল বেসরকারী প্রচেষ্টায়। **সাধারণের শিক্ষায় রাষ্ট্রের যে কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তা অষ্টাদশ শতকে স্বীকার করে নি।** মিশনারী শিক্ষা বিস্তার প্রয়াস কোথাও কোম্পানীর সহায়তা লাভ করেছে, কোথাও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ আইনে শিক্ষাসম্পর্কিত ধারাটি গৃহীত হবার পর কোর্ট অব ডাই-রেক্টরস অতি অনিচ্ছার সাথে শিক্ষাবিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্বের কথা মেনে নেয়। শিক্ষাধারা গৃহীত হবার পর দশ বছর পর্যন্ত কোম্পানী বা সরকারের পক্ষ থেকে কিছু করা হয় নি। এ সময়কে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিষ্ক্রিয়তার যুগ বলা হয়। ১৮২৩ খ্রীঃ সরকারী নিষ্ক্রিয়তার অবসান হয়, এই সময় থেকেই শুরু হয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের যুগ। এই বিরোধের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি সরকারীভাবে গৃহীত হয় নি। **মেকলের মন্তব্য ও বেণ্টিংকের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।** এর পর থেকে কুড়ি বছর শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বাদ-বিতর্ক, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। সরকারী ও বেসরকারীভাবে এই যুগে বিচ্ছিন্নরূপে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ স্বাধীনভাবে এক একটি নীতি অনুসরণ করেছে। **'চুঁইয়ে নামা নীতি'র (Downward filtration) ব্যর্থতা ও মাতৃ-ভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ অবহিত হয়েছেন। জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সরকার দিন দিন বুঝতে পেরেছে।** ঠিক এই পটভূমিকায় ১৮৫৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ নতুন করে নেওয়ার সময় আসে। এই উপলক্ষে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা হয়। বিভিন্ন নীতির পরিবর্তে সমগ্র বৃটিশ ভারতের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। হাউস অব কমন্সের একটি নির্বাচিত কমিটি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধান করেন। এই কমিটির সামনে ডাঃ ডাফ, স্যার চার্লস ট্রেভোলিয়ন, মিঃ উইলসন তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এতদিন কর্তৃপক্ষের মনে ভারতে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে একটা সংশয়ের ভাব ছিল। এঁরা সবাই এক বাক্যে বলেন, ভারতে শিক্ষা বিস্তার হলে সরকারের আশঙ্কার কোন কারণ নেই, বরং শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ইংরেজ রাজত্ব স্থায়িত্বের সহায়ক হবে। এই তদন্তের উপর ভিত্তি করে **বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের নির্দেশে এক মূল্যবান শিক্ষা দলিল রচিত হয়। উডের নির্দেশে রচিত হয়েছিল বলে একে 'উডের ডেসপ্যাচ' বলা হয়।**

অনেকের ধারণা এই দলিলটি বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক স্টুয়ার্ট মিল রচনা করেছেন। কেহ কেহ বলেন এটি লর্ড নর্থ ব্রুকের রচনা। **রচনা যে-ই করে থাকুক না কেন, এই দলিলটিতে মিশনারী ডাফের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষণীয়।**

॥ শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য ॥

উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪ খ্রীঃ রচিত হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথমেই কোম্পানী কি উদ্দেশ্যে দেশে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেই সম্পর্কে মুখবন্ধে বলা হয়েছে, ভারতে শিক্ষাবিস্তার আমাদের পবিত্রতম কর্তব্য। এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতবাসীরা যাতে ইংলণ্ডের সাথে সম্পর্কের মধ্যদিয়ে কার্যকরী শিক্ষার বিপুল নৈতিক ও পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। *"It is one of our sacred duties to be the means, as far as in us lies of confering upon the natives of India those vast moral and material blessings which flow from the general diffusion of useful knowledge and which India may, under providence derive from her connection with England."*

(*Wood's Despatch*)

এই শিক্ষায় শুধুমাত্র উন্নততর বুদ্ধি ও চরিত্রের বিকাশ হবে না, শিক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্য নৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন, বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারী সৃষ্টি হবে। *"Not only produce a higher degree of intellectual fitness but to raise moral character of those who partake of its advances and supply you with servants to whose probity you may with increased confidence commit offices of trust.* (*Wood's Despatch*)

এর পর বলা হয়েছে **ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের সচেতন করে তুলে ইংলণ্ডের কারখানাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় কাঁচা মালের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ও বৃটেনে উৎপন্ন পণ্যের যাতে ভারতের বাজারে অফুরন্ত চাহিদার সৃষ্টি হয় সেই ব্যবস্থা করা—** *"at the same time ; secure to us large and more certain supply of many articles necessary for our manufactures and exclusively consume by all classes of our population as well as an almost inexhaustable demand for the produce of British labour."*

॥ প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ॥

ডেস্প্যাচে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মেকলের মত নিন্দনীয় ভাষায় প্রাচ্য বিদ্যার নিন্দা নেই। প্রাচ্য বিদ্যার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব হিন্দু-মুসলিম আইনের ব্যাখ্যায় প্রাচ্যভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে মেকলের মন্তব্যের মতই ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে প্রাচ্যবিজ্ঞান ও দর্শন অজস্র ভুলে

পরিপূর্ণ—"*The system of science and philosophy which forms the learning of the East bounds with grave errors.*" (*Wood's Despatch*).

এই ত্রুটিপূর্ণ ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিবর্তে উন্নততর পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্য, এক কথায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারই সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্যে ; এই কথাই ডেসপ্যাচে বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে—

"*The education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved art, science, philosophy literature of Europe, in short European knowledge.*"

(*Wood's Despatch*)

ভাষা সম্পর্কে নির্দেশ ঃ

শিক্ষার মাধ্যম কি ভাষা হবে সে সম্পর্কে ডেসপ্যাচে মন্তব্য করা হয়েছে। এতদিন ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ দেশীয় ভাষায় ইউরোপীয় গ্রন্থসমূহের ভাল অনুবাদ নেই। ডেস্‌প্যাচে স্বীকার করা হয়েছে এর কুফল স্বরূপ মাতৃভাষা অবহেলিত হয়েছে। সরকার মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করতে চায় একথা অস্বীকার করা হয়েছে। দেশীয় ভাষা ও ইংরেজীকে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের জন্য ডেস্‌প্যাচে নিদেশ দেওয়া হয়েছে—"*we look therefore, to English language and to the vernacular language of India together as the media for the diffusion of European knowledge, and it is our desire to see them cultivated together in all schools in India of a sufficiently high class to maintain a school master possessing the requisite qualifications.*" (*Wood's Despatch*)

এই তিনটি বিতর্ক মূলক দিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমগ্র দেশের শিক্ষার আয়োজনকে সুষ্ঠুরূপ দেবার জন্য ডেসপ্যাচে একটি সুচিন্তিত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাবিভাগ ঃ—

ডেসপ্যাচে কোম্পানীর অধিকারভুক্ত বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজ, উঃ প্রদেশ, পাঞ্জাব এই পাঁচটি প্রদেশে একটি করে শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বিভাগের প্রধান হবেন ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকসন (*Director of Public Instruction*)। তাঁর অধীনে থাকবে একদল পরিদর্শক (*Inspecting Officer*)। এই বিভাগ প্রতি প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণী পেশ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—

দ্বিতীয় সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৪৫ খ্রীঃ কাউন্সিল অব এডুকেশন কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপনের উপযুক্ত সময় হয়নি বলে এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা হয়। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহের কথা বিবেচনা করে কলিকাতা ও বোম্বে সহরে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। মাদ্রাজ বা ভারতের অপর যে কোন অংশে যদি উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ডিগ্রী লাভের উপযুক্ত ছাত্র থাকে তাহলে সেখানেও বিশ্ববিদ্যায় স্থাপন করা হবে বলে স্থির হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গঠিত হবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে; এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মতই পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি সিনেট থাকবে, এতে একজন চ্যান্সেলার, একজন ভাইস চ্যান্সেল্যর ও কয়েকজন সরকার মনোনীত সদস্য থাকবেন। যদিও পরীক্ষা গ্রহণই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য তবু অন্যান্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে যেসব বিষয়ে উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা নেই সেই সব বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করবার সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন, চিকিৎসাবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কথা বলা হয়।

জন শিক্ষাব্যবস্থা :—

ডেসপাচে স্বীকার করা হয়েছে দেশের জন শিক্ষা এতকাল সরকার অবহেলা করেছে। **'চুঁইয়ে নামা নীতির নিন্দা করে বলা হয়েছে মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার জন্য এতদিন সরকার সর্বশক্তি ও অর্থ নিয়োগ করায় দেশের শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হয়েছে।** এই বিশাল গণশিক্ষার ব্যবস্থা সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত শুধুমাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। দেশের জনশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রতি জেলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। **উঃ প্রদেশের মিঃ টমসনের অনুসৃত পন্থায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবার নির্দেশ ডেসপ্যাচে দেওয়া হয়।** আরও বলা হয় ছাত্রদের উৎসাহিত করবার জন্য বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে ও দেশীয় স্কুলগুলির শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শিক্ষামানের পার্থক্য ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে।

গ্রান্ট-ইন্-এড্ প্রথা (Grand-in-aid) :—

ডেস্প্যাচে বলা হয়েছে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এককভাবে সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। **শিক্ষাবিস্তারের বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবে,** যাতে দেশের জনসাধারণ শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগী হয়ে অধিক সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার দ্রুত প্রসারে সাহায্য করতে পারে। এজন্য সরকার থেকে সাহায্য পাবার কতকগুলি শর্ত আরোপ করা হয়। (১) **ধর্মনিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।** (২) **স্থানীয় পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে।** (৩) **সরকারী পরিদর্শনের অধিকার স্বীকার**

করতে হবে, ও পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। (৪) ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য বেতন নেওয়া হবে।

আশা করা গিয়েছিল যে সরকার এই সাহায্যদান চালু করে ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে জনসাধারণের হাতে এর দায়িত্ব ন্যস্ত করবে। ইংলণ্ডের সাহায্যদান রীতির অনুকরণে শিক্ষকদের বেতন, ছাত্রবৃত্তি, বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি খাতে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাণ্ট-ইন্-এড প্রথায় দেশের সর্বশ্রেণীর স্কুলই কমবেশী উপকৃত হয়েছিল, তবে মিশনারী স্কুলগুলিই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়। **ধর্মনিরপেক্ষতা সাহায্য পাবার একটি শর্ত হলেও মিশনারী স্কুল গুলির ক্ষেত্রে পরিদর্শকদের চোখ বুজে থাকার পরোক্ষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।**

শিক্ষক-শিক্ষণ :—

শিক্ষকদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ধরনের নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের বৃত্তির ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষকতাকে সরকারী অন্যান্য চাকুরীর মত আকর্ষণযোগ্য করে তোলবার সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়।

বৃত্তি শিক্ষা :—

শুধু মাত্র সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে ডেসপ্যাচে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করবার সুপারিশ করা হয়েছে।

॥ অন্যান্য সুপারিশ ॥

ডেসপ্যাচে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষায় অনগ্রসর; তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নির্দেশ আছে। **সরকারী শিক্ষানীতি ধর্মনিরপেক্ষ হবে একথা নতুন করে ঘোষণা করা হয়েছে।** তবে মিশনারীদের প্রভাবে প্রতি স্কুলের গ্রন্থাগারে একখানা করে বাইবেল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উচ্চতর চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার ও নিম্নতম চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিয়োগ করবার পূর্ব ঘোষিত সরকারী নীতিকে ডেসপ্যাচে সমর্থন জানান হয়।

সমালোচনা :—

উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একখানি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরূপ সামগ্রিভাবে বিচার করে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা এর আগে আর কখনও হয় নি। লর্ড ডালহৌসী বলেছেন, ভারতে শিক্ষার জন্য এরূপ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে করা সম্ভব হয় নি। ঐতিহাসিক জেমস বলেছেন, **ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এর**

আগে যা ঘটেছে উডের ডেসপ্যাচে তা পরিণতি লাভ করেছে, পরে যা হয়েছে তার উৎসও এখানে *"What goes before leads upto it, what follows flows from it."*

॥ সামগ্রিক দৃষ্টি ॥

শিক্ষার সর্ব নিম্ন ক্ষেত্র থেকে সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত। ভারতীয় শিক্ষার বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে এই দলিলেই মীমাংসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ডেসপ্যাচেই প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সেই সাথে বৃত্তিশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষণ-শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব ত্যাগ করে সহযোগিতামূলক নীতি অনুসরণের নির্দেশ এই ডেসপ্যাচের উল্লেখযোগ্য অবদান। ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করায় গণশিক্ষা প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত হয়। গ্রাণ্টের আন্দোলনের সময় থেকে ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল উডের ডেসপ্যাচে তার সমন্বয় করে সর্ব দলের গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে।

॥ কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা ॥

উডের নির্দেশ যদি যথাযথরূপে পালন করা হ'ত তাহলে ভারতে শিক্ষার বিস্তার আরও দ্রুততর হ'ত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উডের অনেক মূল্যবান নির্দেশই বহুদিন পর্যন্ত কার্যকরী করা প্রয়োজন বোধ করে নি। মাতৃভাষার মর্যাদা দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ছিল। ডেসপ্যাচে গণশিক্ষার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা হলেও উচ্চশিক্ষার স্বার্থে বহুদিন পর্যন্ত ভারত সরকার গণশিক্ষার বিষয় চিন্তা করবার অবকাশ পায় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ, অনার্স কোর্সের প্রবর্তন বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি নির্দেশসমূহ বহুদিন অবহেলিত ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে বাহনরূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কার্যকরী করা হয় নি। সাহায্য দান নীতি গ্রহণ করবার পর সরকার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াবে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীতই হয়েছিল। শিক্ষাব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীন হওয়ার ফলে বহু প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরের অধীন হওয়ার ফলে শিক্ষাবিভাগের লাল ফিতার (*Red tapism*) দৌরাত্ম্যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নমনীয়তা (*Flexibility*) লুপ্ত হয়।

॥ জাতীয় ঐতিহ্য অবহেলিত ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে ডেসপ্যাচরচয়িতারা জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। প্রাচীন ভারতে

শিক্ষাকে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হ'ত এবং ভারতীয়দের জীবনে শিক্ষার কি স্থান সে সম্পর্কে ডেসপ্যাচে কোন বিচার করা হয় নি। প্রাচ্যভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় চিন্তাধারা ও অগ্রগতির ধারক ও বাহক হতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় কোন বেসরকারী সদস্যই স্থান পায় নি। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় মনোভাব প্রতিফলিত হ'বার প্রয়োজনকে এভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয়দের পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে স্থান দিয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করাই কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। প্রাচী ও প্রতীচির মিলনের পথকে শিক্ষার মাধ্যমে সহজ করবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা বিলাতের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করে নি।

॥ বণিকসুলভ মনোভাব ॥

ভারতের শিক্ষাসম্পর্কিত একখানা মূল্যবান দলিল রচনা করতে বসে ডেসপ্যাচ রচয়িতারা এমন বণিক সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন যা অতি নিন্দনীয়। ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করেও ভারতীয়দের সরকারী দপ্তরের সুলভ কর্মচারী সৃষ্টি করবার প্রয়োজনকে কোন আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন ভারতবাসী সদয় ভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। বণিক মনোবৃত্তির জন্যই মূল্যবান দলিলটির সততা সম্পর্কে তৎকালীন ভারতীয়দের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

শিক্ষা জগতের ম্যাগ্‌না কার্টা (Magna Charta) :—

ঐতিহাসিক জেম্‌স্ এই ডেস্‌প্যাচকে *Magna Charta of English Education in India*বলে অভিনন্দিত করেছেন। ভারতের শিক্ষার অগ্রগতিতে উডের ডেসপ্যাচের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। *আধুনিক শিক্ষার যে রূপটির সাথে আমরা পরিচিত* সেই শিক্ষাধারা ও শিক্ষাধারা পরিচালনার কাঠামো এই ডেসপ্যাচেই আমরা পেয়েছি। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে ইহাকে ম্যাগনাকার্টা বলা বাড়াবাড়ি। ডেসপ্যাচ রচয়িতাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেও আমরা বলতে পারি ডেসপ্যাচ এতখানি প্রশংসার যোগ্য নয়। ডেসপ্যাচে শিক্ষানীতি সম্পর্কে নির্দেশ আছে। কিন্তু Education Charter বললে জনসাধারণের কতকগুলি অধিকারের সরকারী স্বীকৃতি বোঝায়। উডের ডেসপ্যাচে তা পাই না। ডেসপ্যাচে শিক্ষা প্রসারের সদিচ্ছা আছে কিন্তু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হয় নি।

Mr. M. R. Parnjpe বলেছেন, "*But inspite of all these good features it would be incorrect to describe the educational Despatch of 1854 as an Educational charter, i e., an official paper bestowing or guaranteeing certain rights and privileges.*

(Progress of Education, poona, July 1941 p. p. 51—52)

॥ ভারতের শিক্ষায় উডের প্রভাব ॥

১৮৫৪ খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। ইংরেজ শাসনকালে বহু কমিশন ও রিপোর্টে শিক্ষানীতি নির্ধারণের নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সর্বস্তরের শিক্ষার এরূপ দলিল কমই আছে, আর এরূপ সর্বব্যাপক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কোন দলিলেরই নেই। ভারতীয় শিক্ষা কাঠামো উডের ঘোষণার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে লর্ড কার্জন নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত উডের শিক্ষানীতিই ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ ও হাণ্টার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ উডের ডেসপ্যাচের ভিত্তিতেই রচিত। তাঁদের সুপারিশে প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়েছে কিন্তু উড ঘোষিত মূল নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি।

উডের ডেসপ্যাচ শিক্ষা ক্ষেত্রের বহু বাদ প্রতিবাদের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শিক্ষাকে একটা বলিষ্ঠ শিক্ষানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। এই নীতিই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ভারতের শিক্ষার উপর অবাধ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কার্জন শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনলেও উডের মূল কাঠামোর পরিবর্তন তিনি আনতে পারেন নি। উডের নির্দেশ অনুসারেই প্রতি প্রদেশে একটি করে শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ভার এই দপ্তর গ্রহণ করে। পরিদর্শন ব্যবস্থা সম্পর্কেও উডের নির্দেশই প্রতিপালিত হচ্ছে। গ্রাণ্ট-ইন্-এড প্রথা প্রবর্তন করে বেসরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার নীতি উডের নির্দেশেই হয়েছিল। ভারতে প্রথম পরীক্ষা গ্রহণকারী ও উপাধি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন উডের ডেসপ্যাচের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জাতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী হয় নি, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো তৈরী হয়েছিল সে জন্যও উড দায়ী। জন শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষা, নারী শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে উডের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় নি তবু তাঁর নির্দেশের ফলে শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে একটা নতুন উদ্যমের সৃষ্টি হয়েছিল। মাতৃভাষা সম্পর্কে উডের নির্দেশ অবহেলিত হয়েছে কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উডের পরবর্তীকালে ভারতে শিক্ষার উন্নতির জন্য যা করেছে তার উৎসের সন্ধান করলে আমরা উডের ডেসপ্যাচের মধ্যেই তাকে খুঁজে পাব।

॥ স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচ ও সমালোচনা ॥

১৮৫৭ খ্রীঃ ভারতের তিনটি প্রদেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করবার প্রথম যুদ্ধ এই সময়েই শুরু হয়। বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করবার সিপাহীদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সাথে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বের অবসান হয়। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। বৃটিশ মন্ত্রী সভায় একটি নতুন মন্ত্রীপদের সৃষ্টি হয়। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের স্থানে *Secretary of State for India* মন্ত্রী সভার পক্ষে ভারতের শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সিপাহী যুদ্ধের অবসানের সাথে সাথেই ১৮৫৮ খ্রীঃ ২৮শে এপ্রিল বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি এলেন ব্রুক শিক্ষানীতি সংক্রান্ত এক ডেসপ্যাচে উডের নীতিকে

বাতিল করে দিয়ে শিক্ষা ব্যাপারে পূর্বতন অবস্থায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে বলা হয় উডের ডেসপ্যাচেই সিপাহী যুদ্ধের কারণ নিহিত ছিল। সৌভাগ্যের বিষয় বৃটিশ সরকার এই যুক্তি গ্রহণ করেন নি। দেশের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কোন নীতি অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কে প্রথম ভারত সচিব লর্ড স্ট্যানলি একটি ডেস্‌প্যাচ রচনা করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ থেকে শিক্ষার কতটুকু প্রসার হয়েছে এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী অভ্যুত্থানের সাথে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে কি না প্রধানতঃ এ সম্পর্কে ডেসপ্যাচে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

স্ট্যানলী ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতি অনুসরণ করবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন শাসক পরিবর্তন হলেও দেশে নব প্রবর্তিত এই শিক্ষা ধারার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে শিক্ষা-সংক্রান্ত কোন নতুন নীতি ঘোষিত হয় নি, শিক্ষা সংস্কারের জন্য কোন বিশেষ প্রস্তাবও তিনি উপস্থিত করেন নি। অতীতে যা ঘটেছে তার পর্যালোচনা করে শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। স্ট্যানলী বলেন, গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা ইংরেজী ও মিশ্র স্কুলগুলির উন্নতির সহায়ক হলেও এই দেশে গণশিক্ষা প্রসারের পক্ষে এই নীতি সহায়ক নয়। তাই সরকারকে এই নীতি পরিহার করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বাধ্যতামূলক শিক্ষাকর ধার্যের নির্দেশ দেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে ভারত সরকারকে নিষেধ করা হয়।

সমালোচনা :—

স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে শিক্ষানীতি বিষয়ক কোনও নতুন প্রস্তাব নেই; তবুও উডের নীতিকে সমর্থন জানিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করবার সহায়তা করেছিল, স্ট্যানলীর সমর্থন না থাকলে উডের নীতিকে বাতিল করার প্রস্তাবই হয়ত কার্যকরী হ'ত। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যানলীর প্রস্তাব তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় বিতর্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ চলছিল। স্ট্যানলী, বেসরকারী পরিচালনায় আস্থাবান ছিলেন না বলেই বোধ হয় উডের নির্দেশিত গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সরকারী পরিচালনার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এই প্রথায় স্থানীয় জনসাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহী হবে না। মিঃ টমসন উঃ পঃ প্রদেশে গণশিক্ষা বিস্তারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেই নীতি অনুসরণ করেই তিনি সর্বত্র শিক্ষাকর ধার্যের নির্দেশ দেন **প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে অর্থের অভাব দূর করবার জন্য শিক্ষাকর (সেস্) ধার্য ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।** গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা সবেমাত্র চালু হয়েছিল, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই সাহায্যদান নীতি কতটা শিক্ষা বিস্তারের

সহায়ক হবে বা কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করবে তার বিচারের সময় তখনও আসে নি। উপযুক্ত সময় না দিয়ে হঠাৎ এই প্রথাকে বাতিল করে দেওয়া খুব যুক্তিসঙ্গত হয় নি। উডের ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল এতবড় দেশের শিক্ষার সকল দায়িত্ব একা সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষা প্রসার দ্রুততর করবার জন্যই বেসরকারী প্রচেষ্টাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই নীতির সারবত্তা স্ট্যানলী উপলব্ধি করতে পারেন নি। শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী প্রচেষ্টার একটি বিশিষ্ট অবদান আছে—ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন বেসরকারী প্রচেষ্টায়ই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। সরকারী ও বেসরকারী এই প্রচেষ্টার মধ্যে কোন বিরোধ না রেখে এই দুয়ের সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। যে সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানুরাগী বিত্তবান ব্যক্তি গণশিক্ষার প্রসারে এগিয়ে এসে-ছিলেন তাদের উৎসাহ দিয়ে গণশিক্ষার ব্যাপক আয়োজনকে সার্থক করে তোলবার মধ্যেই সরকারী নীতির সার্থকতা একথা স্ট্যানলী বুঝতে পারেন নি। ভারতের একটা নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ দু'য়েরই প্রয়োজন ছিল। ইংলণ্ডের অবস্থার সাথে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে; ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করেই প্রাথমিক শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ করা স্ট্যানলীর উচিত ছিল। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তির ও বিতর্কের সৃষ্টি করে তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষানীতি নিয়ে বিভ্রান্তি ও জটিলতার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্নাবলী

1. "Despatch of 1854 is a landmark in the history of Indian Education". Comment on the statement and give a summary of the main recommendations contained in the Despatch. [B. T. 1953]
2. Give an account of Wood's Despatch of 1854 showing clearly how it tried to solve the educational problems of the day. [B. T. 1957]
3. "Wood's Education Despatch is a document of immense historical importance" Explain. [B. T. 1959]
4. Summarise the main recommendations in the Wood's Despatch of 1854 and state to what extent these were effective in establishing a comprehensive and co-ordinated system of education in India. [B. T. 1960]
5. Wood's Despatch has been described as the Magna Charta of Indian Education. Discuss and add your own comments. [B. T. 1964]
6. The Education Despatch of 1854 laid the foundation of a State Education System.—Discuss. In what way did the Despatch of 1859 supplement the former? [B. T. 1966]
7. "The Despatch of 1854 laid the foundation of a sound and effective system of educational administration in India".
   Citically examine the statement. [C.U. 71]

পঞ্চম অধ্যায়

হাণ্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩)

॥ অবহেলিত জনশিক্ষা ॥

১৮৫৪ খ্রী: পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সরকারী উদাসীনতায় দেশের জনশিক্ষার প্রসার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশীয় শিক্ষাধারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এই মৃত্যুপথযাত্রী শিক্ষাধারাকে বাঁচিয়ে রাখা, বা তার জায়গায় নতুন কোন জনশিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা এই দুই প্রশ্নেই সরকার সমান উদাসীন। প্রাথমিক শিক্ষা যেরূপ উপেক্ষিত হয়েছিল সেরূপ বেসরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা ও সরকারী অর্থানুকূল্য থেকে বঞ্চিত ছিল। দেশের শিক্ষা প্রসারে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবার গুরুত্ব সম্পর্কে ভারত সরকার মোটেই সচেতন ছিল না। উডের ডেসপ্যাচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একটি প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ, দ্বিতীয়টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য দান নীতি গ্রহণ ও ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উডের নির্দেশ :—

সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রথমযুগে উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত হচ্ছিল। 'চুঁইয়ে নামা নীতি' (*Downward filtration theory*) ছিল সরকারী শিক্ষানীতি। এডাম প্রভৃতি শিক্ষাবিদ এই নীতির তীব্র সমালোচনা করলেও ভারত সরকার এই নীতিকে ত্যাগ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি। উডের ডেসপ্যাচে এই চুঁইয়ে নামা শিক্ষানীতিকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা হয়, এবং দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ডেসপ্যাচে স্পষ্টভাবে বলা হয়—সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে যাদের পক্ষে নিজেদের চেষ্টায় প্রয়োজনীয় শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভব নয় তাদের জন্য সরকার শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ এজন্য অধিক অর্থব্যয় করতেও প্রস্তুত—"*who are utterly incapable of obtaining any education worthy of the name by their own unaided efforts, and we desire to see the active measures of Government more especially directed, for the future, to this object, for the attainment of which we are ready to sanction a considerable increase of expenditure*".

[*Wood's Despatch*, 1954]

॥ 'চুঁইয়ে নামা নীতির মোহ ॥

আশা করা গিয়েছিল উডের নির্দেশে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু চুঁইয়ে নামা নীতির মোহ ভারত সরকার সহজে ত্যাগ করতে পারে নি। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নেশায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনকে পূর্বের মত অবহেলা না করলেও যে ছিটেফোঁটা কৃপা বর্ষণ করেছিল তা জনশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় নি। ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯,০০,০০০। এই সংখ্যা ১৮৮১ খ্রীঃ বেড়ে হয় ২৬,৫০,০০০ অর্থাৎ বছরে ৭০,০০০ করে বেড়েছিল। শিক্ষার খাতে মোট যে অর্থ ব্যয় হ'ত সেই তুলনায় এই বৃদ্ধি আনুপাতিক দিক থেকে বিচার করলে খুবই কম। বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছিল। অর্থাৎ উডের ডেসপ্যাচের পঁচিশ বছর পার হয়ে যাবার পরেও সরকারী উপেক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

সাহায্যদান নীতি (Grant-in-aid) প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে শিক্ষা বিস্তার তরান্বিত করা। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে "সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার" এই নীতির চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তৎকালীন মিশনারীগণ শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন, এই নীতিতে তাঁদের দাবীই প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নীতিকে অনুসরণ করে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের কোন মনোভাবই ভারত সরকারের দেখা যায় নি। সাহায্যদান নীতি প্রবর্তিত হবার পরও সরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বেশী ছিল। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের বেশীর ভাগই সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহের পরিপোষণে ব্যয় হয়ে যাবার পর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্য করবার মত অর্থ সরকারী তহবিলে সামান্যই অবশিষ্ট থাকত। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য যে অর্থ ব্যয় হ'ত সেই তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়গুলি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি।

দেশবাসীর মনে অসন্তোষ :—

যে সব জায়গায় অল্প ব্যয়ে সরকারী সাহায্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারার সম্ভাবনা ছিল সে জায়গায়ও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায়, সাধারণের মধ্যে সরকারী নীতির সমালোচনা শুরু হয়। সাধারণের মনে ধারণা হ'ল সরকার যেন বেসরকারী উদ্যমকে ধ্বংস করতে চায়। এ ছাড়া বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারী চাকুরীতেও সুবিচার পাচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠে। মিশনারী অথবা বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চাইতে সরকারী বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগক্ষেত্রে অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখান হচ্ছিল বলে দেশবাসীর মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

মিশনারীদের আন্দোলন :—

মিশানারীগণ আশা করেছিল উডের নির্দেশ কার্যকরী হলে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পথে আর কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু সরকারী মতিগতি তাদের পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক হ'ল না। সিপাহী যুদ্ধের পর সরকারী শিক্ষানীতি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ রূপ গ্রহণ করায় পাদ্রীরা ধর্মহীন লৌকিক শিক্ষাকে "*Godless and irreligious*" আখ্যা দিতে শুরু করল। শিক্ষাবিভাগের বিমাতৃসুলভ আচরণে মিশনারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। এদেশের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যখন কোন সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রইল না তখন মিশনারী সম্প্রদায় বিলাতে ভারত সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তুলল। এই উদ্দেশ্যে "*General council of education in Idian (1878)* নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'ল। আর্ল অব সাফটেসবেরী, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, (১৮৫৪খ্রীঃ ডেসপ্যাচে খ্যাত পূর্বতন স্যার চার্লস উড) লর্ড লরেন্স প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যভুক্ত হলেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল ভারত সচিব লর্ড হ্যারিংটনের সাথে ও ভারত যাত্রার প্রাক্কালে ভারতের ভাবী বড়লাট লর্ড রিপনের সাথে সাক্ষাৎকারে প্রতিনিধি দল ভারতের বুক থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে ভারত সরকারকে অধিকতর শক্তি ও অর্থ নিয়োগের অনুরোধ জানায়। লর্ড রিপন প্রতিশ্রুতি দেন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮৫৪ খ্রীঃ ১৮৫৯ খ্রীঃ নির্দেশ কতটা কার্যকরী হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে তদন্ত করবেন।

॥ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২-৮৩) বা হান্টার কমিশন ॥

ভারতে এসেই লর্ড রিপন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের সদস্য স্যার উইলিয়ম হাণ্টার এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। কুড়িজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, জাষ্টিস তেলাং, সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয়গণ সদস্যরূপে গৃহীত হন। সভাপতি হাণ্টারের নামে এই কমিশন সাধারণের নিকট হাণ্টার কমিশন নামেই সমধিক পরিচিত।

॥ কমিশনের বিচার্য বিষয় ॥

১৮৫৪ খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতিকে যথার্থরূপে কার্যকরী করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য এবং উডের নির্দেশিত নীতির ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য কমিশনকে বলা হ'ল—"*to enquire particularly into the manner in which effect had been given to the principles of despatch of 1854 and to suggest such*

measures as it think desirable with a view to the further carrying out of policy there in laid down."

কমিশনকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে বলা হয়েছিল। এ সময়ে গণশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল, কমিশনকে এ দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া মাত্র দু'বছর আগে বিলেতে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিলেতের কর্তৃপক্ষের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যকলাপ, কারিগরী শিক্ষা ও ইউরোপীয়দের শিক্ষা কমিশনের তদন্তের আওতার বাহিরে রাখা হ'ল। কমিশনকে Grant-in-aid প্রথার সম্প্রসারণের উপায় নির্ধারণ ও প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কেও অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল।

কমিশনের সামনে যে সব বিষয় প্রধান বিচার্য হয়ে দাঁড়াল তা হচ্ছে, সরকার কি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করে উচ্চশিক্ষার জন্য অত্যধিক শক্তি ও অর্থ ব্যয় করছে? জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কি স্থান গ্রহণ করবে? বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও প্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কিরূপ হবে? সরকার কি ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার নীতিকে গ্রহণ করবে? ধর্মশিক্ষায় সরকারী মনোভাব কিরূপ হবে?

১৮৮৩ খ্রীঃ কমিশন ২২২টি প্রস্তাব সহ ৬০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ রিপোর্ট পেশ করেন। দেশের অতীত শিক্ষা ব্যবস্থা, কোম্পানীও ইংরেজ শাসনে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেন।

॥ কমিশনের রিপোর্ট ॥

সরকারী শিক্ষানীতির সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা করে কমিশন অভিমত প্রকাশ করলেন যে মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাচে নির্দেশিত শিক্ষানীতির বিপরীত কাজই করেছে। বোম্বে, কুর্গ, পাঞ্জাব এবং বেরার এই নীতিকে কার্যকরী করবার কোন আন্তরিক চেষ্টাই হয় নি।

বাংলা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশ এই নীতিকে কার্যকরী করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয় নি। স্থানীয় সরকার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। কমিশন ১৮৫৪ খ্রীঃ শিক্ষানীতি অনুসরণের উপযোগিতাকে স্বীকার করে নিয়ে বলেন, উন্নত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে রাখা প্রয়োজন সেগুলিকে রেখে বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে উন্নতি লাভ করতে পারে ও বেসরকারী উদ্যোগে যাতে আরও বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সেদিকে সরকারী মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া দরকার। নতুন নীতিকে কার্যকরী করে তুলবার জন্য কমিশন প্রস্তাব করেন যে সরকার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিরত

থাকবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যাতে বিস্তার লাভ করতে পারে Grant-in-aid প্রথাকে সেজন্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে দিতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার দায়িত্বশীল পরিচালকমণ্ডলীর হাতে তুলে দিয়ে সরকার ধীরে ধীরে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ সঙ্কোচিত করে আনবে। ভবিষ্যতে কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উদারভাবে সরকারী সাহায্য বিতরণ করা হবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় সমান মর্যাদা ও সুবিধার অধিকারী থাকবে।

এই সময়ে সরকারী সাহায্যদানের কোন সর্ব ভারতীয় নীতি ছিল না। বিভিন্ন প্রদেশে সাহায্য দান সম্পর্কে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করত। মাদ্রাজে *Salary grant* মধ্য প্রদেশ *fixed period system* ; বোম্বে ও বাংলায় *payment by result system* অনুসারে সরকারী সাহায্য বিতরণ করা হ'ত। কমিশন বিভিন্ন প্রকার Grant-in-aid প্রথা সম্পর্কে বিচার করে সিদ্ধান্ত করেন যে স্থানীয় অবস্থার উপযোগী যে রীতি শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতির সর্বাধিক সহায়ক বলে বিবেচিত হবে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগ নিজ নিজ প্রদেশে সেই ভাবেই সাহায্য বণ্টন করবেন।

দেশীয় শিক্ষা :—

কমিশন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এই শিক্ষা-ধারাকে উৎসাহিত করবার সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন যে যদিও এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে তবুও এর জীবনীশক্তি ও জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করা যায় না—"*Admitting however the comparative inferiority of indigeneous institution we consider the efforts should now be made to encourage them they have survived competition, and thus have proved that they possess both vitality and popularity.*" কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়কে দেশীয় বিদ্যালয়ের পর্যায়ভুক্ত করা হবে সে সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য দেশীয় লোকদের দ্বারা স্থাপিত বা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা হবে—"*as one established and conducted by natives of India on native method.*" কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, এদেশের শিক্ষা প্রসার করতে হলে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই বিদ্যালয়-গুলিকে উপেক্ষা না করে যতদূর সম্ভব সংস্কার সাধন করে শিক্ষা প্রসারের কাজে লাগাতে হবে। কমিশন এই বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। যে সব বিদ্যালয় ধর্মনিরপেক্ষভাবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা দেয় সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে।

পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্য দান রীতির (payment by result system) প্রবর্তন করে দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে।

পরিদর্শন ব্যবস্থা, পরীক্ষার মান, সাহায্য দানের নিয়মকানুন প্রভৃতি স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে স্থির করতে হবে।

যে সব জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটি বা লোকাল বোর্ড আছে সেখানে দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই বোর্ডই দেশীয় বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবে। দেশীয় বিদ্যালয়-সমূহের বিশেষ যত্ন নেবার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির একটি তালিকা রক্ষা করবে এবং বোর্ডগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান করবে বলে স্থির হয়।

কমিশন একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এই মৃত প্রায় দেশীয় শিক্ষায়তন-গুলির উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই এই বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে তুলে গণশিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগ যদি কমিশনের সুপারিশ-সমূহ কার্যকরী করত তাহলে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে অজ্ঞানতার অন্ধকার এইরূপভাবে পরিব্যাপ্ত হ'ত না।

প্রাথমিক শিক্ষা :—

কমিশন বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির সংস্কারে সর্বাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেও দেশের শিক্ষার প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই বিদ্যালয়গুলিই যথেষ্ট নয়। দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে হলে সর্বশ্রেণীর লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৩৬টি সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন **প্রাথমিক শিক্ষা হবে জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা।** জীবনের পক্ষে যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সেই সব বিষয়ই শেখান হবে। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব বলে বিবেচ্য হবে না। "*Primary education be regarded as the instruction of the masses through the vernacular in such subjects as will best fit them for their position in life and be not necessarily regarded as a portion of instruction leading up to University.*" **কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে সাধারণের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ** (self-sufficient) **শিক্ষা রূপেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।** কমিশনের দৃঢ় অভিমত ছিল যে, সব রকম শিক্ষারই রাষ্ট্রের সহায়তা দাবীর অধিকার রয়েছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার ও উন্নয়নই সর্বাগ্রাধিকার দাবী করতে পারে। জনসাধারণ যাতে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী হয় সেজন্য হার্ডিঞ্জের ঘোষিত নীতি অনুসারে সরকারী নিম্নতম কর্মচারী নিয়োগ ক্ষেত্রে নিরক্ষর অপেক্ষা সামান্য শিক্ষিতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অনগ্রসর জেলাগুলিতে প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮৭০ খ্রীঃ ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে দেওয়া হয়। কমিশন ইংলণ্ডের শিক্ষানীতির অনুকরণে এই দেশের প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার ও পরিচালনার দায়িত্ব জেলাবোর্ড বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেন। সুপারিশ করা হয় যে, এই আঞ্চলিক

স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ এলাকার জন্য একটি শিক্ষাবোর্ড (Education Board) গঠন করবে। এই শিক্ষাবোর্ড নিজ এলাকার প্রয়োজন বিবেচনা করে নতুন স্কুল স্থাপন করবে। যেখানে সম্ভব পুরাতন স্কুলগুলিকে সাহায্য করে সর্বশ্রেণীর শিক্ষার দ্বার মুক্ত করে দেবে। শিক্ষা বিভাগের পরিচালনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এই বোর্ডের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। দেশের লোকের উপর প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে কমিশন সদিচ্ছার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। কিন্তু কমিশন যে আশা নিয়ে এই সুপারিশ করেছিলেন তা সফল হয় নি। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির এমন অভিজ্ঞতা বা শক্তি ছিল না যা দিয়ে এই বিরাট দায়িত্বের বোঝা বহন করতে পারে। শিক্ষাবোর্ড-গুলির ব্যর্থতার জন্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অর্থের অভাব। প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক সংস্থানের জন্য কমিশন কতকগুলি সুপারিশ করেন।

প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট তহবিল থাকবে।

শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের উপর প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রাদেশিক রাজস্ব থেকেও একটা অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যয় ও নর্মাল স্কুল পরিচালনার ব্যয় প্রাদেশিক সরকার বহন করবে।

প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয় নি; তবে মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক সরকার বহন করবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এই টাকাটা কোথা থেকে ও কিভাবে আসবে সে সম্পর্কে কমিশন নীরব। দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন প্রাদেশিক সরকার সে অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করবে সে সম্পর্কে কমিশন কোনরূপ নির্দেশ দিতে না পারায় প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলির কার্যকারিতা অনেকটা কমে গিয়েছিল। তারপর **পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে সাহায্যদানের নির্দেশ দেওয়া ও কমিশনের পক্ষে ভুল হয়েছিল। এতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রীক হয়ে ওঠে।** শিক্ষকের লক্ষ্যই থাকত যে কোন প্রকারে পাশের সংখ্যা বাড়িয়ে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা। এর অশুভ ফল সমগ্র শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর জেলাগুলিকে পরীক্ষা নির্ভর সাহায্যদানের রীতি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কমিশন স্কুল পরিচালনা সম্পর্কে যেমন ইংলণ্ডের অনুসরণ করেছিল, তেমনি পরীক্ষা ফলের ভিত্তিতে সাহায্যদান ব্যবস্থাও ইংলণ্ডের Low's code থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কিছু সংখ্যক দরিদ্র ছাত্রের জন্য বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা রেখে বাদবাকীর জন্য বেতন গ্রহণ করবার সুপারিশ করা হয়েছিল।

তৎকালীন সমাজে জাতি ভেদের প্রভাব ও শিক্ষায় তার কুফল দেখে কমিশন শিক্ষাবোর্ড পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বার সর্বশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত রাখবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশ ছিল পাঠক্রম যথাসম্ভব সহজ ও স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করতে হবে। দেশীয় গণিত, হিসাব, জমির জরীপ, প্রাথমিক জড় বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও কৃষিতে তার প্রয়োগ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং শিল্পকলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়রূপে গৃহীত হবে। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে স্থানীয় পরিচালকদের স্বাধীনতা থাকবে।

দৈহিক স্বাস্থের উন্নতির জন্য ছাত্রদের ব্যায়াম, স্কুলড্রিল ও দেশীয় খেলাধূলায় উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষা যাতে শৃঙ্খলা রক্ষা ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করে পরিদর্শকগণ সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। স্কুল বসবার ও ছুটির কোন সাধারণ নিয়ম থাকবে না। স্থানীয় প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী এগুলি স্থির করা হবে।

পরিদর্শকগণ যতদূর সম্ভব নিজেরাই পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। দেশীয় শিক্ষা-রীতির দিকে দৃষ্টি রেখেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চ বা নিম্ন প্রাইমারী শিক্ষা কোন প্রদেশেই বাধ্যতামূলক হবে না।

শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য প্রতি মহকুমা পরিদর্শকের এলাকায় একটি করে নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার বাহন হবে সেই অঞ্চলের মাতৃভাষা। কোন অঞ্চলে ভিন্নভাষা-ভাষী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা দাবী করলে শিক্ষাবোর্ড তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা :—

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী আয়োজন ব্যাপকভাবে থাকায় **কমিশন মধ্য-শিক্ষা থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের নীতি অনুসরণ করবার সুপারিশ করেন।** রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয় যে স্থায়িত্বের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলে বেসরকারী পরিচালনায় স্কুলগুলি ছেড়ে দেওয়া হবে। অনগ্রসর ও দরিদ্র অঞ্চলে স্কুলগুলিকে বিভাগীয় পরিচালনাধীনেই রাখা হবে। এ ছাড়া প্রতি জেলায় একটি উন্নতমানের আদর্শ স্কুল বিভাগীয় পরিচালনায় রাখবার সুপারিশ করা হয়। বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় পরিচালক সভাকে নিজ নিজ স্কুলের বেতনের হার নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

মধ্যমিক শিক্ষা ছিল নিতান্ত পুঁথিগত শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্তুতি ক্ষেত্ররূপেই এ শিক্ষার পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয়েছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার কোন স্থানই ছিল না। এর কুফল সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অনাথ নাথ বসু বলেছেন—

"বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আরম্ভ হইতেই ইহাতে আর একটি ত্রুটি ছিল। এই

শিক্ষা নেহাতই পুঁথিগত শিক্ষা; তাহাতে ব্যবহারিক শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। .. ...উডের ডেসপ্যাচে বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল; কিন্তু সে বৃত্তি উচ্চবর্ণের—আইন, চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ভদ্রলোকের বৃত্তি।......১৮৩৫ খ্রীঃ কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ খোলা হইয়াছিল। আইন শিক্ষার ব্যবস্থাও ক্রমে হইল। গভর্ণমেণ্টের পূর্ত বিভাগের জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু একে তো ইহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আইন ছাড়া অন্য আর দুই রকমের বৃত্তিশিক্ষা লোকে চাকুরীর জন্যই গ্রহণ করিল, অল্পকয়েকজন স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিতে গেল বটে কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্র মেডিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাকুরীর সন্ধান করিতে লাগিল এবং প্রথম প্রথম কাহারও চাকুরির অভাব ঘটিল না। এদেশে তখনও স্বাধীনভাবে ইঞ্জিনীয়ারের ব্যবসা চালাইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই।

সুতরাং আমাদের প্রায় সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য হইল চাকুরী; স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের পথ তখন আমাদের পক্ষে রুদ্ধ; দেশের বাণিজ্য বিদেশের করতলগত, পুরাতন শিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, নূতন কোন শিল্পেরও সৃষ্টি হইল না। আমাদের শোনানো হইল শিল্পচর্চা আমাদের জন্য নয়, চিরকাল আমরা নাকি ভূমিকে আশ্রয় করিয়াই আছি, সেই ভূমিলক্ষ্মীর সেবা আমাদের জাতীয় জীবনের সাধনা। সুতরাং যখন ইংলণ্ডে ও ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চার ফলে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতে লাগিল তখন আমরা হয় সরকারী চাকুরী করিবার, না হয় বিলাতের বাজারের কাঁচামাল জোগাইবার ও এদেশে বিলাতী মাল কাটাইবার জন্য যে বড় বড় হাউস ছিল তাহাতে কেরানীগিরি করিবার চেষ্টায় ফিরিলাম। বড় জোর এই সব হাউসে দালালি করিয়া "ব্যবসা করিতেছি" এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম, উচ্চশিক্ষা লাভের সাক্ষাৎ ফল ইহার চেয়ে আর বেশী হইল না।" [আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা—অনাথ নাথ বসু]

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বার মুক্ত করবার জন্য কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রবেশিকা পরীক্ষা 'এ' কোর্স। আর একটি তরুণদের বাণিজ্য ও সাহিত্য বহির্ভূত প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য 'বি' কোর্স। "*We therefore recommend that in the upper classes of high schools there be two divisions. One leading to Entrance Examination of the Universities the other of more practical character, intended to fit youths for Commercial or non literary pursuits [Report of Indian Education Commission]*" স্থির হ'ল যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষালাভের পর নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ছাত্ররা 'এ' অথবা 'বি' কোর্স বেছে নেবে। কমিশন আশা করেছিল কলেজের পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে বৃত্তি শিক্ষাই বেশী পছন্দ করবে।

" 'বি' কোর্সের ব্যবস্থা হইল বটে কিন্তু তাহাতে কোন দিনই বেশী ছাত্র জুটিল না। তাহার কারণ, লোকের মনে এণ্ট্রান্স্ তুলনায় 'বি' কোর্স জাত্যাংশে ছোট ছিল। সেখানে ছুতোর আর কামারের কাজ শিখিবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে তাই বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ব্যবহারিক করিয়া তোলার একটা চেষ্টা বিফল হইল।

কিন্তু এই সময়েই ড্রয়িং, বিজ্ঞান প্রভৃতি নতুন কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে স্থান পাইল। তাহাতে পাঠক্রমের ভার বাড়িল বটে কিন্তু তাহার মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিল না।

যন্ত্রশিক্ষার কথাটা কমিশন এড়াইয়া গেলেন। ব্যবহারিক শিক্ষাই যথেষ্ট, যান্ত্রিক শিক্ষার এখনও আবশ্যকতা নাই কমিশন কতকটা এই ভাবে মত দিলেন।"

[আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা—অনাথ নাথ বসু]

বর্তমান মধ্য শিক্ষায় মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশক্রমে বহুমুখী পাঠক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আজ থেকে ৯০ বছর আগে হাণ্টার কমিশন ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং 'এ' ও 'বি' কোর্সের প্রবর্তন করেছিলেন, সেদিক থেকে কমিশনের দূরদর্শিতাকে প্রশংসা করতে হবে।

মাধ্যমিকশিক্ষার বাহন সম্পর্কে কমিশন কোন আলোচনা করেন নি। তাই ধরে নিতে হবে কমিশন ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম রূপে রাখতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার বাহন সম্পর্কীয় এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া কমিশনের পক্ষে মোটেই সঙ্গত হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষায় নিম্নস্তরে শিক্ষার বাহন বেছে নেওয়া সম্পর্কে প্রদেশগুলিকে নিজ নিজ অবস্থা বিচার করে প্রয়োজন উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

উচ্চ শিক্ষা :—

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনকে কোন অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হয় নি। তবুও কমিশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন।

কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করবার উপদেশ দেওয়া হয়। দেশের শিক্ষার উন্নত মান বজায় রাখবার প্রয়োজনে যে সব কলেজ সরকারী পরিচালনায় রাখা প্রয়োজন সেখানেই বিভাগীয় পরিচালনাকে রাখতে বলা হয়েছে। বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে আরও উদারভাবে আর্থিক সাহায্য করতে বলা হয়, কলেজগুলির অধ্যাপক, পরিচালনার ব্যয়, কলেজের শিক্ষার মান, স্থানীয় উপযোগিতা, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার প্রভৃতির জন্য ব্যয়—এই সব দিক বিচার করে সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারিত করতে বলা হয়। সরকারী কলেজের বেতনের হারের নিম্ন হারে বেতন স্থির করবার স্বাধীনতা বেসরকারী কলেজগুলিকে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রের জন্য অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ দেবার সুপারিশ করা হয়। মেধাবী ছাত্ররা যাতে বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা

লাভ করতে পারে সে সুযোগের ব্যবস্থার কথা কমিশন বলেন। এছাড়া বড় কলেজে ছাত্রদের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয় প্রবর্তন ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশও করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষণ ঃ—

উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হলেও প্রায় ত্রিশ বছর কাল পর্যন্ত এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তনই হয় নি। শিক্ষা কমিশন গঠনের পূর্বে ভারতে মাত্র দুটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ ট্রেনিং এর কোন প্রয়োজন আছে কি না এ বিতর্কের অবসান হয় নি। তাই কমিশন বিতর্কমূলক বিষয়টি সম্পর্কে অতি সাধারণভাবে দু'একটি সুপারিশ করেন। শিক্ষকদের শিক্ষানীতি জানার প্রয়োজনীয়তার সাথে শিক্ষানীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ শেখবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ট্রেনিং সমাপ্ত করে যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে সরকারী স্কুলে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে বলা হয়। গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই শিক্ষণকাল সংক্ষিপ্ততর করবার সুপারিশ করা হয়।

বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ—

কমিশন দেশীয় রাজন্যবর্গের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষায় অনগ্রসর ছিল এজন্য তাদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে বিশেষ সুবিধা দেবার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় সরকার থেকে মুসলিম স্কুলগুলিকে সাহায্য, ছাত্রদের বৃত্তি ও বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হবে। যে সব জায়গায় মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা অধিক সেখানে তাদের জন্য নিম্ন ও মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান পরিদর্শক নিযুক্ত করবার সুপারিশও করা হয়। মুসলমান বা অন্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেও একথা আমরা বলতে বাধ্য যে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা পরবর্তী কালে আরও ব্যাপকভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে জাতীয় জীবনকে অভিশাপগ্রস্ত করে তুলেছিল।

কমিশনের বিশেষ শিক্ষা প্রস্তাবসমূহের মধ্যে বয়স্কদের জন্য নাইট স্কুল স্থাপনের সুপারিশ আমাদের প্রশংসার দাবী করতে পারে।

ধর্মীয় শিক্ষা ঃ—

মিশনারীগণ ধর্মকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করবার দাবী করেছিলেন। কমিশন ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষতা নীতির সারবস্তুকে মেনে নিয়ে যে কোন বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। কোন বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও ধর্ম শিক্ষার ক্লাসে যোগদান হবে সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। নীতি শিক্ষামূলক পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা থাকবে। এই জাতীয় পুস্তকে সকল ধর্মের মূল নীতি নিয়েই আলোচনা হবে। প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা একজন অধ্যাপক প্রতি বছর মানবিক কর্ত্তব্য

ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন। কমিশনের এই স্থপারিশ কার্যকরী করা হয় নি।

স্ত্রী-শিক্ষা ঃ—

কমিশন দেশের নারী শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে পান যে স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের মেয়েদের মধ্যে ৯৯·৫ জন লিখতে পড়তে জানে না। দেশের নারী শিক্ষাপ্রসারের জন্য কমিশন স্থপারিশ করেন যে বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয়সমূহে উদারভাবে সাহায্য দেওয়া হবে। এবং এজন্য বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম কানুন কিছু শিথিল করতে হবে। মেয়েদের শিক্ষায় আকর্ষণ করবার জন্য বেতন সম্পর্কে স্থবিধা দেওয়া হবে। বার বছরের পর যে কোন মেয়ে স্কুলে যেতে রাজী হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্য বিশেষ সাহায্য দেওয়া হবে। মেয়েদের শিক্ষণের জন্য অধিক সংখ্যায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিধবাদেরও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্ত্রীদের শিক্ষিকার কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে। আবাসিক বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শনের জন্য নারী পরিদর্শিকা নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষিকাদের এদের অধীনে কাজ করতে স্থবিধা হবে। মেয়েদের পাঠক্রম ছেলেদের চেয়ে সহজতর করা হবে। মেয়েদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসতে পারে এমন শিক্ষা যাতে তারা পায় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই পাঠক্রম তৈরী করতে হবে। মেয়েদের জন্য ভিন্ন ধরনের পাঠ্য পুস্তক রচনা করা হবে।

ফলশ্রুতি ঃ—

ভারত সরকার ধর্ম সম্পর্কীয় নির্দেশ ছাড়া কমিশনের সব স্থপারিশই গ্রহণ করেছিল। কমিশনের নির্দেশ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার আংশিকভাবে কার্যকরী করা হয়। শিক্ষাবিভাগ নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত হলেও সরকার পরিচালিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারী পরিচালনায় হস্তান্তরিত করে নি। জাতীয় শিক্ষায় ভারতীয় প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হয়।

॥ সমালোচনা ॥

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের স্থপারিশ সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কমিশন উড ও স্ট্যানলীর শিক্ষানীতিকেই সমর্থন করেছেন। কমিশন নীতিগত দিক থেকে কোনরূপ স্থপারিশ বা নির্দেশ দেন নি। মিশনারীদের স্থান নির্দেশ করে যে মন্তব্য রিপোর্টে করা হয়েছে নীতির দিক থেকে সমস্ত রিপোর্টে এই একটি সিদ্ধান্তই বিশেষ মূল্যবান। এ ছাড়া সমস্ত রিপোর্টে উডের রিপোর্টকে কার্যকরী করার প্রসঙ্গই

আলোচিত হয়েছে। অবশ্য এই কমিশন নীতি নির্দেশক কমিশন ছিল না। তাই কার্যকরী (Execution) দিক থেকেই কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহকে বিচার করতে হবে।

শিক্ষায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে কমিশন নানা সুপারিশ করলেও শিক্ষাবিভাগের উপর একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক অঞ্চলে শিক্ষার অবস্থার অনুসন্ধান; প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন, জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন, শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রভৃতি দেখবার ভার শিক্ষাবিভাগের উপর দেওয়া হয়। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষার অগ্রগতির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার পথ নির্দেশ করেন। বেসরকারী বিদ্যালয়ে সরকারী অর্থ ও পরিদর্শকদের সুচিন্তিত অভিমতের সাহায্যে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের পথকে কমিশন প্রশস্ত করেন।

দ্বিমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা দ্বারা কমিশন এক বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টির সূচনা করেছিল। **এই দ্বিমুখী শিক্ষার পরিকল্পনা ('এ' ও 'বি' কোর্স) ত্রুটিহীন করে যদি সেই সময় থেকে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হ'ত তাহলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাস অন্যরূপ হতে পারত।** বৃত্তি শিক্ষার পরবর্তী উচ্চ স্তরে যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ যদি কমিশন করত তাহলে হয়ত ব্যবহারিক শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা এরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'ত না।

বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করে কমিশন অতি প্রয়োজনীয় একটি দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষার এই দিকটিতে আজ পর্যন্ত যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। সমাজসেবীদের প্রচেষ্টায় যে অগ্রগতি হয়েছে তা অতি অকিঞ্চিৎকর।

কমিশন রিপোর্ট রচনাকালে তৎকালীন ইংলণ্ডের শিক্ষানীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা তখনও এমন অবস্থায় আসে নি যে ইংলণ্ডে অনুসৃত শিক্ষানীতি এখানে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা তখন মাত্র প্রবর্তিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে কমিশন নীতিগতভাবে কোন ভুল করে নি। বরং সদিচ্ছার পরিচয়ই দিয়েছিল। কিন্তু এই সদ্যজাত প্রতিষ্ঠানগুলি এত বড় একটা দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম কি না সে কথাও কমিশনের চিন্তা করা উচিত ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও এই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বা অবৈতনিক করবার কথা কমিশন চিন্তা করতে পারেন নি। তারপর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কোথা থেকে হবে সে সম্পর্কে কোন আলোকপাত না করায় কমিশনের মূল্যবান সুপারিশগুলির কার্যকরী দিক হতে গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছিল। সাহায্য দানের নীতি হিসাবে Payment by results প্রথাকে গ্রহণ করার ফলও দেশের পক্ষে কল্যাণের হয় নি।

মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কমিশনের পক্ষে অন্যায় হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য যে অনেকখানি ভাষার প্রশ্নের সাথে জড়িত সে কথা বিচার করে কমিশনের একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারিত করা উচিত ছিল।

মিশনারীদের স্থান নির্দেশ ও শিক্ষায় ধর্মের স্থান সম্পর্কে কমিশন যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা প্রশংসনীয়। কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের জন্য শিক্ষার বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করবার সুপারিশ করে কমিশন শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতাকে সম্প্রসারিত করবার পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

জাতীয় শিক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়রাই গ্রহণ করবে এই স্বীকৃতির মধ্যে কমিশন দেশীয় শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি রচনার সহায়তা করেছিলেন। সরকার ও সাধারণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দূর করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রসারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে কমিশনের সুপারিশগুলি যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অনেকে অভিযোগ করেছেন কমিশনের রিপোর্ট সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কমিশনকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে পরামর্শ দিতে বলা হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। তবুও কমিশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন।

প্রশ্নাবলী

1. Trace the development of elementary education in India before 1882. What were the chief recommendations of the Indian Education Commission of 1882 concerning elementary education and how did they influence its subsequent development. [B. T. 1966]
2. What were the main recommendations of the Indian Education Commission of 1882 concerning Secondary Education and their effect upon subsequent educational development. [B. T. 1968]
3. Write critical notes on the Hunter Commission of 1882. [B. T. 1961]
4. Briefly state the main recommendations contained in the Report of the Indian Education Commission (1882-83) and indicate their effects on subsequent educational development. [C. U. 70]

ষষ্ঠ অধ্যায়

লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি

১৮৯৯ খ্রীঃ লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের শাসনকাল নানাভাবে স্মরণীয়। গভর্ণর জেনারেলদের মধ্যে তিনি একজন জবরদস্ত শাসক বলে পরিচিত। গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীরূপে তিনি যে কুখ্যাতি ভারতীয়দের নিকট অর্জন করেছিলেন আজ বহুদিন বাদে কার্জনের বিভিন্ন সংস্কারের পর্যালোচনা করে মনে হয় তিনি যতটা কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ততটা কুখ্যাতি তাঁর প্রাপ্য নয়। যদি তিনি ভারতীয়দের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সংস্কারকার্যে ব্রতী হতেন তাহলে তিনি তাঁর কার্যের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসার দাবীই করতে পারতেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধিরূপে তিনি ভারতে এসেছিলেন ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা অবিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে। তাঁর সমস্ত সংস্কারের পিছনে যে মনোবৃত্তি সক্রিয় ছিল তা হচ্ছে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে ধ্বংস করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করা। ফলে তিনি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা, কি বিশ্বাস, কিছুই অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর সদিচ্ছা প্রণোদিত সংস্কার সমূহের তীব্র সমালোচনা হয়েছে, এবং কার্জনের প্রতিটি কাজ দেশের জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখেছে।

॥ জাতীয় শিক্ষা ও কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব ॥

উনবিংশ শতকের ভারতের জাতীয় জাগরণকে ইংরেজ খুব সুনজরে দেখে নি। ইলবার্ট বিল, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রভৃতির মধ্যেই যে ভবিষ্যৎ ঝড়ের ইংগিত রয়েছে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় তা বুঝতে পেরে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন সিভিলিয়ান মিঃ হিউম চেয়েছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সংহত করে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব যাতে দেশের মধ্যে গড়ে না ওঠে সেভাবে জনমতকে চালিত করতে। ভারত সরকার প্রথমে কংগ্রেস সম্পর্কে উদার ভাব অবলম্বন করলেও কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদীদের প্রাধান্য স্থাপিত হলে বিরূপ মনোভাব দেখাতে শুরু করে। জাতীয়তার এই সুসংহত রূপটিকে শাসক সম্প্রদায় সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে। কংগ্রেস প্রথম থেকেই শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতির সমালোচনা শুরু করে। বিদেশী সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা জাতীয় ভাবধারা বিকাশের পরিপন্থি এ সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার জন্য এর পূর্বেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শিক্ষাকে জাতীয় ভাবাপন্ন করে তুলতে হবে, যন্ত্র শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষিত সমাজের এই দাবিকে কংগ্রেসের প্রস্তাব সমূহের মধ্যে স্বীকার করে নেওয়ায় জাতীয় কংগ্রেস ধীরে ধীরে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদীদের মুখপাত্রের স্থান গ্রহণ করে। জাতীয়তার প্রকাশ শুধুমাত্র রাজনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে নতুন আদর্শে জাতীয় ভাবধারা পুষ্ট কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। লাহোরে দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত এ্যাংলো বেদিক

কলেজ ও কাশীর শ্রীমতী বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সাথে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। এছাড়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীন ও প্রাচীনের সমন্বয়ে নতুন ধরনের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হয়। এভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং এ দেশীয় ধর্মকে আসন দেবার ও শিক্ষা প্রকৃতিকে দেশীয় ভাবাপন্ন করবার একটা চেষ্টা এ সময়ে দেখা গেল। কার্জন বড়লাট হয়ে এসেই জাতীয় মনোভাব যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী প্রভাব বাড়িয়ে জাতীয়তাবাদকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবার চেষ্টায় ব্রতী হন।

শিক্ষা সম্মেলন :—

শিক্ষা হতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার নীতিকে কার্জন ত্যাগ করে সেখানে সরকারী প্রভাব বেশী করে বিস্তার করতে চাইলেন। কার্জনের শিক্ষা সংস্কার সমূহ বিচার করলে দেখা যাবে শিক্ষাক্ষেত্রে কি ভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়ান যায় সেটাই ছিল শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। কার্জন নীতিগত বিশেষ পরিবর্তন করেন নাই। তার সংস্কার প্রধানতঃ প্রশাসনিক। এ জন্যই কার্জনের প্রতিটি সংস্কার এদেশবাসীর সন্দেহের সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কার্জন ভারতে এসেই এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে মনোযোগী হন। তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু শিক্ষা সংস্কারের কাজে তিনি যে ভাবে ভারতীয়দের বর্জন করবার নীতি অবলম্বন করেছিলেন তার ফলে শিক্ষিত সমাজের মনে কার্জনের সদিচ্ছা সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহের উদয় হয়। ১৯০১ খ্রীঃ তিনি সিমলায় ভারতের শিক্ষাসমস্যা আলোচনার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে প্রাদেশিক শিক্ষা অধিকর্তা (D. P. I) ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভিন্ন মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মিলার উপস্থিত ছিলেন। কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌কে এই সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানান হয় নি। এই সম্মেলনে কার্জন ভারতের শিক্ষাসমস্যা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে শিক্ষার উন্নতির উপায় সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এক পক্ষকাল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পর সম্মেলনে ১৫০টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবগুলি মুসাবিদায় কার্জন অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কার্জনের সময়ের বিভিন্ন শিক্ষাসংস্কার ও ১৯০৪ খ্রীঃ ভারত সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ এই সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়।

॥ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২) ॥

কমিশনের পটভূমি :—

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে ১৮৫৭ খ্রীঃ প্রথম তিনটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গঠিত হবার পর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলির আর কোন সংস্কার হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমস্যা প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের তদন্তের আওতার বাইরে রাখা হয়। কমিশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উন্নতিকল্পে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রায় দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। উনবিংশ শতকের শেষভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার গলদ দূর করবার প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হয়। প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সেনেটর সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকায় ও সভ্যগণ আজীবন কালের জন্য মনোনীত হওয়ায় সদস্য সংখ্যা বেড়ে একটা বিরাট সংখ্যায় পরিণত হয়। ১৯০৪ খ্রীঃ দেখা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য সংখ্যা ১৮১ জন, বোম্বাইয়ের ২৯৬ জন, মাদ্রাজের ১৯৮ জন, পাঞ্জাবের ১৩২ জন ও এলাহাবাদের ১১২ জন। এছাড়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের গঠন ও প্রকৃতির মধ্যে যে ত্রুটি ছিল তার সংস্কারও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। উড সুপারিশ করেছিলেন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে হবে। তার ফলে দেশের প্রধান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু মাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও কলেজ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনের মধ্যে তাদের কার্যক্ষেত্র সীমায়িত রেখেছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'বার সংস্কার হয়। ১৮৯৮ খ্রীঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় সংস্করণগুলিরও পুনর্গঠন প্রয়োজন এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সচেতন হন। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে আমরা দেখেছি ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে কোন সংস্কার হলেই ভারত সরকার এ দেশের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে অবহিত হতেন। তার পূর্বে দেশের লোকের কোন আবেদন নিবেদনই তাদের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হ'ত না।

পরিবর্তিত শিক্ষা পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যায়গুলির সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ায় **১৯০২ খ্রীঃ ২৭ জানুয়ারী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়।** এই কমিশনে প্রথমে কোন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয় নি। পরে স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ও সৈয়দ হাসান বিলগ্রামীকে ভারতীয় সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

কমিশনকে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে তদন্ত করে শিক্ষায় তাঁদের অভিমত জানাতে বলা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন সুপারিশ করবার অধিকার কমিশনকে দেওয়া হয় নি। এর ফলে কমিশন কলেজীয় শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষাকে সমগ্রভাবে বিচার করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করতে পারে নি। কমিশনের সামনে প্রশ্ন ছিল কোন্ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের পক্ষে উপযোগী এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরিবর্তিত করে বাঞ্ছিত রূপ দেওয়া যায়।

কমিশন অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদের কাজ শেষ করে সুপারিশসহ বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন। স্যার গুরুদাস অন্য সদস্যদের সাথে একমত হতে না পারায় ভিন্ন রিপোর্ট পেশ করেন।

॥ কমিশনের সুপারিশ ॥

কমিশন নিয়োগকালে আলিগড়, নাগপুর, বাঙ্গালোর, ত্রিচিনাপল্লী, ত্রিবান্দ্রম রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন চলছিল। **কমিশন মন্তব্য করেন দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন প্রয়োজন নেই।** দেশ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী হয় নি বলেই তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণ-ধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা সম্পর্কে কমিশন বলেন ; অনুমোদিত কলেজগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে অবিলম্বে শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গঠন করা সম্ভব নয়। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিজস্ব অধ্যাপক নিযুক্ত করে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানরূপে পুনর্গঠন করা যায়।

কমিশন সুপারিশ করেন স্নাতক নিম্নস্তরের শিক্ষার দায়িত্ব অনুমোদিত কলেজগুলি গ্রহণ করবে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতির ব্যবস্থা করবে।

কমিশন প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা নির্দিষ্ট করে দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে পুরাতন প্রতিষ্ঠান-গুলির পুনর্গঠনের ফলে কাজের কিরূপ উন্নতি হয় তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। অর্থাৎ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কমিশনের সুপারিশের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয় যে, সেনেটের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে সেনেটের আয়তন হ্রাস করা হবে। কোন সদস্য পাঁচ বছরের বেশী সেনেটের সভ্য থাকতে পারবেন না। প্রতিবছর সেনেটের এক পঞ্চমাংশ সদস্যের পদত্যাগ করতে হবে। সেনেটে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সিণ্ডিকেটকে আইনগত মর্যাদা দিতে হবে এবং সদস্য সংখ্যা নয় থেকে পনেরো জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এঁরা সেনেটের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

কমিশন কলেজের অনুমোদনের জন্য কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেবার সুপারিশ করেন। কলেজের অনুমোদনের পূর্বে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। একবার অনুমোদন লাভের পর যাতে কলেজের শিক্ষার মানের অবনতি না হয় বিশ্ববিদ্যালয় সে সম্পর্কে মাঝে মাঝে অনুসন্ধান করবে। প্রতি কলেজের বিধি সঙ্গতভাবে গঠিত পরিচালকমণ্ডলী থাকবে ও কলেজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে। ছাত্রদের বাসের জন্য ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্থানীয় অবস্থা, উচ্চশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজন ও ছাত্রদের আর্থিক অবস্থার কথা বিচার করে সিণ্ডিকেট অনুমোদিত কলেজগুলির জন্য একটা নিম্নতম বেতনের হার নির্ধারণ করে দেবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ সম্পর্কে বলা হয়, ভবিষ্যতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন কলেজের আর অনুমোদন দেওয়া হবে না। পূর্ব অনুমোদিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলিকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করতে হবে, না হয় এদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পর্যায়ভুক্ত করা হবে।

পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করে শিক্ষার মনোন্নয়নের জন্য কমিশন কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইংরেজী সম্পর্কে এই সুপারিশ করা হয় যে প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তরে কোন নির্দিষ্ট বই থাকবে না। ইংরেজী ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার্থীকে মাতৃভাষা অথবা কোন একটি প্রাচীন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য ভাষা পাঠ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করতে হবে। ভারতীয় ভাষা শিক্ষার উপযোগিতাকে স্বীকার করলেও কমিশন ডিগ্রী পরীক্ষায় ভারতীয় ভাষা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না।

পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশন বলেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার মান উন্নত করতে হবে। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার বিলুপ্তি ঘটিয়ে বি, এ. পরীক্ষার পাঠকাল বাড়িয়ে তিন বছর করা হবে। বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে নিয়মকানুন কঠোরতর করতে হবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও ডিগ্রী একইরূপ নামকরণ করতে হবে।

॥ সমালোচনা ॥

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট রচনায় কমিশনের সভ্যগণ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংস্কার আইনের (১৮৯৮ খ্রীঃ) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। **আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গঠন ও পরবর্তী সংস্কারের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকায় দেশের প্রয়োজন ও বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কথা কারও মনে ওঠে নি।** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এজন্য মন্তব্য করেন—"*In 1902 as in 1857 the policy of London seemed to be the latest word of educational statesmanship. There were four features of the London changes whose influence is directly perceptile in the Indian discussion······Thus once again, as so often before, educational controversy in England had its echo in India.*"

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশসমূহ সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। সমগ্রভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার সম্বন্ধে সরকার চিন্তা করে দেখেন নি। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ কমিশনের রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করেন। সিমলা বৈঠকের সময় থেকেই কার্জনের সদিচ্ছার সাথে একমত হতে না পারায় স্যার গুরুদাস পৃথক রিপোর্ট পেশ করেন। ফলে দেশবাসীর মনে কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

দেশে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে জনসাধারণ যখন বিশেষ আগ্রহশীল ঠিক সেই সময়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র পরীক্ষা ও পরিচালনা ব্যবস্থা সংস্কারের মধ্যে কমিশনের সুপারিশসমূহ প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকায়

দেশবাসী সন্তুষ্ট হয় নি। এছাড়া **কলেজের অনুমোদন ব্যবস্থায় কড়াকড়ি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের বিলোপ সাধন, বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে কঠোরতর বিধি প্রণয়ন প্রভৃতিকে সাম্রাজ্যবাদীচক্রের শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টার নামান্তর বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল,** প্রকৃতপক্ষে কমিশন কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এর উন্নতি সাধন করতে চান নি। প্রচলিত ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায় সে কথাই চিন্তা করেছিলেন।

কমিশনের সুপারিশ সমূহের মধ্যে কয়েকটি প্রশংসনীয় নির্দেশও ছিল একথা স্বীকার না করলে কমিশনের উপর অবিচার করা হবে। **উপযুক্ত অধ্যাপকমণ্ডলী; বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতির ব্যবস্থার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করে কমিশন যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।** অর্ধশতাব্দী পূর্বে কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন আমরা মাত্র কয়েক বছর হ'ল তা কার্যকরী করেছি।

॥ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪ খ্রীঃ) ॥

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ ও ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে ঘোষিত নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে ১৯০৪ খ্রীঃ ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি উপস্থাপিত করা হয়। বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কাউন্সিলে লর্ড কার্জন বলেন—

Its main principle is……to raise the standard of education all round, and particularly to higher education. What we want to do is to apply better and less fallacious tests than at present exist, to stop the sacrifice of everything in the colleges which constitute our University system to cramming to bring about better teaching by a superior class of teachers, to provide for closer inspection of Colleges and Institutions which are now left practically alone to place the Government of the Universities in competent expert and enthusiastic hands to reconstitute the Senates to define and regulate the powers of the Syndicates, to give Statutory recognition to the elected fellows, who are now only appointed to sufference..... to show the way by which our Universities which are now merely examining boards can ultimately be converted into teaching institutions ; in fact, to convert higher education in India into reality instead of Sham. These are the principles underlying the Bill.

ভারতীয় জনসাধারণের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯০৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে

ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এই বিলটি পাস করা হয় এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪ খ্রীঃ) নামে পরিচিত হয়।

এই আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই জন্য অধ্যাপক নিয়োগ, শিক্ষার উন্নতির জন্য দান গ্রহণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, গবেষণাগার গড়ে তোলা, ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস স্থাপন, ছাত্রদের অধ্যয়ন, আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া হ'ল।

আইনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে সেটাকে অধিকতর কার্যকর করে তোলবার জন্য সেনেটের সদস্যসংখ্যা হ্রাস করা। এর পূর্বে সেনেটের সদস্যগণ চিরজীবনের জন্য নির্বাচিত হতেন এবং সদস্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না এর ফলে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সেনেটে স্থান পেয়েছিলেন এবং ক্রমবর্দ্ধমান এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের কাজ সেনেটের দ্বারা চালান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই আইনে স্থির হয় সেনেটের ফেলোর সংখ্যা পঞ্চাশ জনের কম ও একশ' জনের বেশী হবে না। আজীবন সদস্যের পরিবর্তে সদস্যদের কার্যকাল পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারিত হয়।

১৮৯০ খ্রীঃ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হতেন, এই আইনে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য গ্রহণে আংশিকভাবে নির্বাচনের নীতিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, স্থির হয় যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ২০ জন ও নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ জন করে ফেলো নির্বাচনের ভিত্তিতে গৃহীত হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য সিণ্ডিকেট থাকলেও আইনের চক্ষে এর কোন স্বীকৃতি ছিল না। **এই আইনে সিণ্ডিকেটকে আইনগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়।** সিণ্ডিকেটে যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপক প্রতিনিধির স্থান পাবার সুযোগ দেওয়া হয়।

এই আইনে অনুমোদিত কলেজসমূহের মান পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আরও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা করা হয়। কলেজের অনুমোদন দান ও বাতিল করা সরকারী অনুমতি সাপেক্ষে করা হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেনেট এই আইনকে কার্যকরী করতে না পারলে প্রয়োজনীয় সংযোজনে, সংশোধন বা নতুন নিয়ম প্রণয়নের জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। পূর্ণ আইনের বিধি প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল সেনেটের ; যে সব বিধান সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল, সরকার দরকার হলে সেনেট প্রণীত বিধান বাতিল করে দিতে পারত, কিন্তু নিয়ম কানুন প্রণয়ন করতে পারত না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এলাকা সুনির্দিষ্ট না থাকায় কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে একটি কলেজ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে। কোন ক্ষেত্রে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার কলেজ অন্য বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এই আইনে সপরিষদ বড়লাটের উপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

॥ সমালোচনা ॥

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে দেখা দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আর কোন সংস্কার হয় নি। হান্টার কমিশনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের কোন সুযোগ ছিল না, দেশের ক্রমবর্ধমান উচ্চ শিক্ষার দাবীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমান তালে এগিয়ে যেতে পারছে না। লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করে শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অভাব মেটাতে চেয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আইনে এমন কয়েকটি ধারা সন্নিবদ্ধ হয়েছিল যার ফলে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। ভারতীয় সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। বরং তাঁরা প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে প্রসারিত করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকারের শিক্ষানীতিতে সর্বভাবে ভারতীয়দের বর্জন করবার মনোভাব অত্যন্ত নগ্নরূপে প্রকাশ পাওয়ায় সরকারী সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভারতীয়দের মনে এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে আইনের মধ্যে সরকারী দুরভিসন্ধির সন্ধানই তারা পেয়েছিল। **দেশবাসীর মনে ধারণা হ'ল যে সরকার শিক্ষা সংস্কারের নামে দেশীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা ধ্বংস করতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার ইউরোপীয়দের হাতে তুলে দিতে চান।**

সিমলা শিক্ষাসম্মেলনে ভারতীয়দের সহযোগিতা পরিহার করবার পর থেকেই কার্জনের শিক্ষানীতি সম্পর্কে এদেশে বিরাট একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে দেশব্যাপী যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সেই পটভূমিকায় কার্জনের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আজ অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল অতীত হয়েছে বঙ্গভঙ্গের উত্তাপ আর নেই, আজকের পরিস্থিতিতে কার্জনের শিক্ষানীতি নিরপেক্ষ সমালোচনা যতটা সম্ভব সে সময়ে ততটা সম্ভব ছিল না। তার ফলে কার্জনের উপর অবিচার কিছুটা আমরা করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলবার প্রস্তাবে শিক্ষিত সমাজের পূর্ণ সমর্থন ছিল, কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্পর্কে তাঁদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন আইনে সে অর্থের কোন সংস্থান করা হয় নি।

সেনেটের ফেলো আংশিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে নেওয়া হবে এই নীতিতে দেশবাসী সন্তোষ প্রকাশ করলেও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা এত অল্প নির্ধারিত হয় যে এই আইনের দ্বারা সেনেটের ইউরোপীয় দলের সংখ্যা গরিষ্ঠ লাভ হবে বলে অনেকে ভীত হয়ে ওঠেন। এটা কার্জনের চক্রান্ত বলেই তাদের মনে ধারণা হয়। এছাড়া অধ্যাপক সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে করা হয় নি বলে অসন্তোষ দেখা দেয়।

শিক্ষক সম্প্রদায় বা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এই আইনে ছিল না।

কলেজ অনুমোদন সংক্রান্ত নিয়মকানুনের কঠোরতাকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়। ভারতীয় প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করে সরকার শিক্ষা সংকোচন নীতিকে কার্যকরী করতে ইচ্ছুক এই ধারণা সাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি জনগণের বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কলেজের অনুমোদন, সদস্য মনোনয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনার জন্য বিধান প্রণয়ন প্রভৃতি বহু ক্ষমতা সরকারের কুক্ষিগত হবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী শিক্ষা দপ্তরের একটি শাখায় পরিণত হবে বলেই অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

এই আইনের নিন্দার **দিক ছাড়াও গঠনমূলক একটা দিক ছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না।** প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া দরকার এই আইনের রচয়িতারা প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার উন্নতি বিধানের জন্য অধিক মনোযোগী ছিলেন।

এই আইনের বিরুদ্ধে "সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত" বলে যে অভিযোগ করা হয় তার কারণ হচ্ছে শিক্ষা বিষয়ক একটা আইনে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য যতটা মনোযোগ দেওয়া হবে আশা করা গিয়েছিল সেদিক থেকে সবাইকে হতাশ হতে হয়েছে। তবু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থায় এ সময়ে যে গলদ দেখা দেয়েছিল তার সংস্কারের জন্য যে এ রকম একটি আইনের দরকার ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। দেশবাসীর মনে কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক মনোভাবের জন্য এরূপ একটা অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল যে এই আইনের গঠনমূলক দিকের সঠিক বিচার করে এর মূল্যায়ণ তাঁরা করতে পারেন নি। তৎকালীন বহু আশঙ্কাই শুধু যে অমূলক তা পরে প্রমাণিত হয়েছিল।

এই আইনে সেনেট পুনর্গঠিত হলে সেনেটের কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেনেটে ইউরোপীয় দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের হাতে চলে যাবে বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার অনেক উন্নতি হয়েছে, একথা বিশিষ্ট ভারতীয়গণ স্বীকার করেন। ঘন ঘন সেনেট ও সিণ্ডিকেটের অধিবেশনের ফলে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা সুষ্ঠু সমাধানের সম্ভাবনা সেনেটের কার্যকরী শক্তি বৃদ্ধির ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

আইনে কলেজের অনুমোদন ব্যবস্থায় অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছিল বলে এই ধারার তীব্র সমালোচনা হয়। কিন্তু এতে যে শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল একথা সবাই স্বীকার করেছেন। অনুমোদন ব্যবস্থায় কড়াকড়ির ফলে এই সময় কিছু কলেজ উঠে যায়। ১৯০২ খ্রীঃ অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ছিল ১৭৭টি, ১৯০৭ খ্রীঃ কলেজের সংখ্যা কমে গিয়ে হয় ১৭৪টি। এতে নিকৃষ্ট স্তরের অবাঞ্ছনীয় ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্র কলুষিত হবার সম্ভাবনা অনেকটা দূর হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরিদর্শন ও অনুমোদন ব্যবস্থার কঠোরতায় ভারতীয় প্রচেষ্টা

ব্যাহত হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই বেসরকারী প্রচেষ্টায় অধিকতর কলেজ স্থাপিত হয়েছিল তাই দেশবাসীর মনে যে অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়।

অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণধর্মী করে তোলার প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাও অমূলক প্রমাণিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এর পূর্বে পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য দেওয়া হ'ত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কার্য পরিচালনার জন্য কোন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হ'ত না। পরীক্ষা গ্রহণ ও নিজস্ব দপ্তরের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তা পরীক্ষার ফি বাবদ যে অর্থ পাওয়া যেত সেই অর্থ ব্যয় কুলিয়ে আরও কিছু টাকা বেঁচে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী করে তোলা যেমন এই আইনের একটি বিশিষ্ট অবদান তেমনি এই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সরকারী তহবিল থেকে অর্থ ব্যবস্থা করা আইনের কৃতিত্বের পরিচায়ক। ১৯০৪-০৫ খ্রীঃ উচ্চ শিক্ষার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। এর মধ্যে সাড়ে এগার লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শাসন কার্য পরিচালনা, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি ও গৃহ নির্মাণ, জমি ক্রয় প্রভৃতির জন্য দেওয়া হয়। সাড়ে তের লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকার সমূহকে কলেজীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য দেওয়া হয়। প্রথমে এই সাহায্য পাঁচ বছরের জন্য করা হবে স্থির হলেও এ সাহায্য স্থায়ীভাবে দেওয়া হতে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে এই আইন ভারতীয়দের মনে যে আশঙ্কা ও সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল তার অধিকাংশই অমূলক। বেসরকারী প্রচেষ্টার অবসান, শিক্ষাসংকোচন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ইউরোপীয় প্রাধান্য, অর্থের অনটনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা প্রভৃতি কোন অঘটনই এই আইনের ফলে ঘটে নি। লর্ড কার্জন যেভাবে তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি তবে **বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারী হস্ত বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল** একথা **অস্বীকার করা যায় না**। এ সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের ভাষায় আমরা বলতে পারি—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ :—**The most completely Governmental Universities in the world.**

॥ ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব (১৯০৪) ॥

১৯০৪ খ্রীঃ ১১ মার্চ লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতি এক সরকারী প্রস্তাবে প্রকাশ করেন। সিমলা সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। এই প্রস্তাবসমূহের উপর ভিত্তি করেই সরকারী শিক্ষা বিষয়ক এক পত্র প্রকাশিত হয়। এই শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে ভারতের শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে দেশের তৎকালীন শিক্ষার প্রকৃত চিত্রটি উদ্ঘাটিত করা হয়। একদিক থেকে এই শিক্ষা চিত্রটি অভিনব। সরকারের তরফ থেকে দেশের শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ আর এভাবে কোনদিন প্রকাশ করা হয় নি। এতে বলা হয়েছে

ভারতের প্রতি পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারিটিতেই কোন বিদ্যালয় নেই। চারিটি ছেলের মধ্যে তিনটি ছেলে কোনরূপ শিক্ষা পায় না এবং চল্লিশটি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে সামান্য লেখাপড়া শেখে।

প্রস্তাবে স্বীকার করা হয় বিগত কুড়ি বছরে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এর বিস্তার আশানুরূপ হয় নি। উচ্চ শিক্ষালাভের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে কোন রকমে সরকারী চাকুরী লাভ। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় প্রকৃত শিক্ষা অবহেলিত হচ্ছিল। শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরীক্ষা কেন্দ্রীক। ব্যবহারিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষা নিতান্তই পুঁথিগত হয়ে পড়েছিল। স্কুল কলেজে বুদ্ধির উৎকর্ষ অপেক্ষা স্মৃতি শক্তির অনুশীলনই হচ্ছিল। ইংরেজী শিক্ষার অতিরিক্ত আগ্রহে মাতৃভাষার চর্চায় যথোচিত উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রস্তাবে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করে কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারত সরকার উডের ডেসপ্যাচে ও হাণ্টার কমিশনের নির্দেশিত নীতি অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার নীতিকে গ্রহণ করেও কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠান শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শরূপে রাখবার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া উপযুক্ত সরকারী পরিদর্শনের মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবার ব্যবস্থা হয়। পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁরা শুধু শিক্ষার ফলাফলেরই বিচার করবেন না, শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কেও উপদেশ দেবেন।

‖ প্রাথমিক শিক্ষা ‖

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হলেও তাতে সন্তুষ্টির কোন কারণ থাকা উচিত নয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি যে হারে হচ্ছিল শিক্ষারপ্রসার সে অনুপাতে হয় নি। ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ দেশে ১৬,৪৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬,০৭,৩২০ জন ছাত্র ছিল। ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ এই সংখ্যা বেড়ে সংখ্যা হয় ৮২,৯১৬টি ও ছাত্র সংখ্যা হয় ২০,৬১,৫৪১ জন। কিন্তু দশ বছর বাদে ১৮৯১-৯২ খ্রীঃ স্কুলের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭,১০৯টি হয় এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ২৮,৩৭,৬০৭ জন। ১৯০১-০২ খ্রীঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৯০,৫৩৮টি হয়, বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমলেও ছাত্র সংখ্যা কমে নি, এই সময় ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২,৬৮,৭২৬ জন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সমান তালে এগিয়ে চলতে পারছিল না। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৩,০২০টি থেকে ৫,৪৩৯টি হয়, ছাত্র সংখ্যাও সে অনুপাতে ২,০৪,২৯৪ জন থেকে দ্বিগুণের কিছু বেশী ৫,৫৮,৩৭৮ জন হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় বিগত পঁচিশ বছর কালের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় ছিল ১৬,০০,২৩৯৲ টাকা, ১৯০১-০২ খ্রীঃ দেখা যায় এই খাতে ব্যয় হচ্ছে ১৬,৯১,৫১৪৲ টাকা অর্থাৎ পঁচিশ বছরে এক লক্ষ টাকাও

ব্যয় বাড়ে নি। এই প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়েছিল, যদিও প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে কিন্তু সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কোন উল্লেখযোগ্য আয়োজন হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে সে মনোযোগ দেওয়া অথবা প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা কোনটাই হয় নি। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সাথে একমত হয়ে প্রস্তাবে বলা হয় **প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকরীরূপে প্রসার রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য**—"*The active extention of primary education is one of the most important duties of the State.*"

অর্থের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আশানুরূপ প্রসার হচ্ছে না, তাই **স্থির হয় প্রাদেশিক রাজস্বের একটা অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে। স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোনরূপ শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থ ব্যয় করবে না।** এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতি বছর শিক্ষা বাজেট তাদের এলাকার পরিদর্শকের মারফৎ শিক্ষা অধিকর্তার (D. P. I.) নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাবে।

গ্রামের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পল্লী অঞ্চলের জন্য পাঠক্রম রচিত হলে শিক্ষার উপযোগিতা বাড়বে। শিক্ষা পদ্ধতি সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবার মত করে সহজতর করতে হবে। এই প্রস্তাব অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে কৃষিবিদ্যার প্রবর্তন হয়। পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে সাহায্যদান নীতি (Payment by results) পরিহার করতে ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থার কথা প্রস্তাবে বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে কার্জন ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দেওয়ায় সেখানে শিক্ষা সংকোচনের দায়িত্ব নিয়ে মনোন্নয়ন করবার কথা বলেছেন। **কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষার বিস্তার।** ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রথম স্বীকার করা হয়—**প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তার রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।** গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ও শহরের শিক্ষাধারা একই রকম হবে এমন কোন কথা নেই। পল্লীর প্রয়োজনের দিকে চেয়ে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দেশও বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক। প্রস্তাবে পল্লীর শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়—"*The aim of the rural school should be, not to impart definite agricultural training but to give the children preliminary training which will make them intelligent cultivators, will train them to be observers, thinkers and experimenters however humble a manner, and will protect them in their business transactions with the land lords to whom they pay rent and with the grain dealers to whom they dispose their crops. The reading books prescribed should be written in simple language,*

not in unfamiliar literary style, and should deal with topics associated with rural life. The grammar taught should be elementary, and only natvie system of arithmetic should be used. The village map should be thoroughly understood, and most useful course of instruction may be given in the accountant's papers, enabling every boy before leaving school to master the intricacies of the village accounts and to understand the demands that may be made on the cultivator."

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

বিগত ত্রিশ বছর মাধ্যমিক শিক্ষার অভাবনীয় প্রসারকে প্রস্তাবে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা" বলা হয়েছে। এই শিক্ষা প্রসারের স্বীকৃতির সাথে এই সংখ্যাগত বৃদ্ধির কুফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবাধ বিস্তারের ফলে শিক্ষার মান যাতে নেমে যেতে না পারে সেজন্য **প্রস্তাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন সম্পর্কে কড়াকড়ি করতে বলা হয়**। অনুমোদন দেবার আগে দেখতে হবে—

That it is actually wanted, that financial stability is assured that its managing body, where there is one, is properly constituated, that it teaches the proper subjects upto a proper standard, that due provision has been made for the instruction, health, recreation and discipline of pupils, that teachers are suitable as regards character number and qualification, and that the fees to be paid will not involve such competition with any existing school as will be unfair and injurious to the interest of education (Govt. Resolution on Education 1904).

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অনড় হওয়ায় শিক্ষা-ব্যবস্থা যান্ত্রিক (mechanical) হয়ে যাচ্ছিল। পাঠক্রমে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করতে বলা হয়।

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়—প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজীর কোন স্থান নেই ও স্থান থাকবে না। মাতৃভাষার স্থান ইংরেজী গ্রহণ করবে এই নীতি সরকার গ্রহণ করতে চায় নি। একথা সত্য যে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ পরীক্ষা ইংরেজীতে গ্রহণ করবার ফলে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর উপর স্কুলে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়—এতে আঞ্চলিক ভাষাসমূহ অবহেলিত হচ্ছে। শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় কিছুটা অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত ও মাতৃভাষার ভিত্তি দৃঢ় না হলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হবে না। ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া শুরু হবার পর যেন এ ভাষায় অন্য বিষয় শিক্ষা দেবার চেষ্টা না হয়। এর ফলে ছেলেরা না বুঝে মুখস্থ করতে শিখবে কিন্তু যে বিষয় তাদের শেখান

হ'ল তা সঠিকভাবে আয়ত্ত করা সহজ হবে না। **শিক্ষার্থীর কম পক্ষে তের বছর পার হবার পর ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে।** কোন অবস্থায়ই মাধ্যমিক শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষাকে ত্যাগ করতে দেওয়া হবে না—"*English has no place, and should have no place in scheme of primary education. It has never been part of the policy of Government to substitute English language for the vernacular dialect of the country. As a general rule, a child should not be allowed to learn English as a language until he has made some progress in the primary stages of instructions and has received a thorough grounding in its mother tongue. It is equally important that when the teaching of English has begun, it should not be Prematurely employed as the medium of instruction in other subjects. Much of the practice too prevalent in Indian schools of committing to memory ill understood phrases and extracts from text books or notes, may be traced to the scholars having received instruction through the medium of English before their knowledge of the language was sufficient to enable them to understand what they were taught. The line of division between the use of vernacular and of English as medium of instruction should broadly speaking be drawn at a minimum age of 13. No scholar in a secondary school should even then be allowed to abandon the study of his vernacular, which should be kept up until the end of the school course*" (*Govt. Resolution of 1904*) এই প্রস্তাবে **মাতৃভাষার গুরুত্বকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করে বলা হয়েছে যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের মাতৃভাষাকে অবহেলা করে তাহলে ভাষা কথ্য ভাষার স্তরে নেমে যাবে। কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য তাতে সৃষ্টি করা হবে না।** দেশীয় ভাষা সম্পর্কে এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঃ—

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয়—কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো ও গঠন পদ্ধতি ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপের শিক্ষাদর্শের অনেক পরিবর্তন হয়েছে ; শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ ত্রুটি দূর করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করে তাকে শিক্ষণধর্মী রূপ দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার অত্যাবশ্যক বলেই মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ও সংস্কারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের

উপর দেওয়া হয়েছিল বলে শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নি। অত্যাবশ্যক সংস্কার শুধুমাত্র ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনিবার্য কারণে সেনেটের আয়তন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈনন্দিন কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তাই সেনেটের পুনর্গঠন করে তাকে কাজ চালানোর উপযোগী করে তুলতে হবে। সিণ্ডিকেটের আইনগত মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। অনুমোদিত কলেজগুলির পরিদর্শনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন কলেজের অনুমোদনের পূর্বে শিক্ষার উন্নতমান সেখানে রক্ষিত হবে কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে অনুমোদন দেওয়া হবে। বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ ও শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন রচিত হয়েছিল।

॥ অন্যান্য সংস্কার ॥

লর্ড কার্জন এদেশের শিক্ষার অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করেছিলেন। শিক্ষার সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত এমন সব বিষয়েও তার মনোযোগ ছিল। কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়, কারিগরী শিক্ষা প্রধানতঃ সরকারী প্রয়োজন মেটাতে উচ্চতর বৃত্তি শিক্ষার দিকেই চালিত হয়েছে। দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ প্রস্তাব পত্রে করা হয়। কৃষি প্রধান দেশে যেখানে এক তৃতীয়াংশ লোকের উপজীবিকা কৃষি সেখানে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার যে সামান্য ব্যবস্থা ছিল তা দিয়ে দেশের কোন প্রয়োজন মেটানই সম্ভব নয়। কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করবার নির্দেশ ও ভারতীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে শিক্ষা-পত্রে সুপারিশ করা হয়েছিল।

শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও **অধিক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সরকারী পত্রে করা হয়।** দেশের স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাবে মোটেই সন্তোষজনক কিছু করা হয় নি। **স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারকে আরও অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।** মেয়েদের জন্য অধিক সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অধিক সংখ্যক পরিদর্শিকা নিয়োগের কথা প্রস্তাবে বলা হয়।

লর্ড কার্জনের এই শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব তথ্য ও নীতি সমৃদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতীয় শিক্ষার প্রসার ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে বহু মূল্যবান পরামর্শ প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা শুধু নীতিগতভাবেই স্বীকার করে কর্তব্য শেষ করা হয় নি, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থেরও ব্যবস্থা করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কীয় বিশেষ মূল্যবান প্রস্তাবসমূহ আজও অবহেলিত রয়েছে। **ইংরেজীকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার ও প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে অর্থপূর্ণ নীরবতা এই মূল্যবান শিক্ষা পত্রের প্রধান ত্রুটি।**

চারুকলার স্কুলগুলির সংস্কার কার্জনের আর একটি বিশিষ্ট অবদান। এই স্কুলগুলি ভারতীয় চারুকলা ও শিল্পের কোন উন্নতির সাধন করতে পারে নি বলে অনেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে উঠিয়ে দেবার দাবী জানান। কার্জন এই বিদ্যালয়গুলির সংস্কার করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। কৃষির সংস্কারের জন্য শুধু নীতি নির্ধারণের মধ্যেই কার্জনের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সময় দেশে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য কয়েকটি কলেজ ছিল। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই বিদ্যার প্রয়োগে কলেজীয় শিক্ষা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। কার্জন কৃষি বিভাগ সংগঠন করেন, কৃষি বিদ্যার সর্বোচ্চ শিক্ষার জন্য পুনায় কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার স্থাপন করেন। প্রাদেশিক সরকারকে কৃষি-বিদ্যার জন্য কলেজ স্থাপনের ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে কৃষিবিদ্যা চর্চার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। **কার্জন উচ্চতর কারিগরী শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে যাওয়ার সুবিধার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।**

'শিক্ষায় ধর্মের স্থান' এই আলোচনা সিমলা শিক্ষা সম্মেলনে হয়েছিল। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হয় সরকার লৌকিক শিক্ষাদানের মধ্যেই শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখবে। শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবেও এই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়। তবে পাঠক্রমে নীতি শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা রাখবার নির্দেশও দেওয়া হয়। কার্জন ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষাদানের পক্ষপাতি ছিলেন—কিন্তু বহু ঘোষিত ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হন নি।

কার্জনের শিক্ষানীতির বহু নিন্দা করা হলেও একটি কাজের জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। দেশের অতীত গৌরব বিজড়িত স্মৃতি স্তম্ভগুলি অবহেলা ও অযত্নে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। কার্জন এই স্মৃতি সৌধ, স্তম্ভ ও প্রাচীন চিত্রকলার নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৃষ্টি করেন এবং স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণ আইন (Ancient Monuments Preservation Act of 1904) প্রণয়ন করেন।

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক শিক্ষা দপ্তরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষা দপ্তরের মধ্যে সংযোগ ও কার্যের সমন্বয় সাধনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই অভাব দূর করবার জন্য কার্জন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডাইরেক্টর জেনারেল অব এডুকেশন (Director General of Education) পদ সৃষ্টি করেন।

॥ শিক্ষাক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের দান ॥

ইংরেজ শাসকদের মধ্যে লর্ড কার্জনের কার্যের যে পরিমাণ সমালোচনা হয়েছে ও ভারতীয় সমাজ যেভাবে তাঁর তীব্র নিন্দা করেছেন কার্জনের পূর্ববর্তী কোন ইংরেজ শাসকের এরূপ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় নি। ভারতীয় জনমত তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য তিনিই অনেকখানি দায়ী। সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক মনোভাবে তিনি এমন আচ্ছন্ন ছিলেন যে এ দেশের লোকের মতামতের কোন মূল্য দেবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। কার্জনের শিক্ষানীতি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে এদেশের শিক্ষিত সমাজ তাঁর প্রতিটি সংস্কার গূঢ় অভিসন্ধিমূলক বলে

সন্দেহ করেছেন। তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য মহামতি গোখলে কার্জনকে 'ভারতের শিক্ষা জগতের' ঔরঙ্গজেব বলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখেছি তার সম্পর্কে সন্দেহ ও ভীতি অনেকাংশেই অমূলক ছিল। তবু তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিক্ষুব্ধ আকার ধারণ করেছিল যে কার্জনের সংস্কারের সঠিক মূল্য নিরূপণ সে যুগে সম্ভব হয় নি। কার্জনের মনোভাব যাই থাকুক যদি কার্যের ফলাফল দেখে বিচার করতে হয় তাহলে কার্জন আমাদের নিকট কিছুটা প্রশংসার দাবী করতে পারেন। বঙ্গ বিভাগের যুগ আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসেছি, এর চেয়ে অনেক বড় ক্ষতিকে আমরা মেনে নিয়েছি; তাই ইতিহাসের কষ্টিপাথরের বিচার করে কার্জনকে আর খুব বড় অপরাধী বলে মনে হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি যে পরিশ্রম করেছেন তাতে আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শিক্ষার প্রতিটি বিভাগে তার সমান মনোযোগ ছিল। যে মনোভাব নিয়েই তিনি শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হন না কেন তার ফল দেশের পক্ষে কল্যাণকরই হয়েছিল। আমরা দেখেছি **প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সদিচ্ছা মাত্র প্রকাশ করে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি—প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও তিনি করেছিলেন।** মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিদর্শন ব্যবস্থা ও অনুমোদন বিধানের কঠোরতা শিক্ষার মান উন্নয়নের সহায়কই হয়েছিল। বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা, কৃষি বিভাগের পুনর্গঠন ও কৃষি-বিদ্যার সংস্কার এবং গবেষণার উন্নতি. মাতৃভাষা অনুশীলনে উৎসাহদান প্রভৃতির জন্য তিনি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। দেশবাসীর ভয় ছিল শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে কার্জন শিক্ষা সংকোচন করতে চায়, কার্যতঃ তা হয় নি। বরং বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সেনেটের ও সিণ্ডিকেটের পুনর্গঠনে প্রশাসনিক দিকে উন্নতির সহায়কই হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী করে তোলার চেষ্টা তাঁর সময় থেকেই শুরু হয়। শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব তিনি স্বীকার করে নেন, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনায় কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা কার্জনের ছিল—জাতীয়তাবাদকে তিনি অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তার সংস্কার পরবর্তীকালে কল্যাণকরই হয়েছিল। **জাতীয় স্মৃতি সৌধ রক্ষার আইন প্রণয়ন করে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন।** সব দিক থেকে বিচার করলে শাসক লর্ড কার্জনকে আমরা যতই নিন্দা করি না কেন শিক্ষা সংস্কারকরূপে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। অধ্যাপক অমরনাথ ঝা কার্জন সম্পর্কে বলেছেন—"*Now that the ashes of the numerous strifes are cold, all Indians are grateful to the wise statesman-ship of the Great Victory who did so much to preserve our ancient monuments and raise our educational standards. By these achievements he still lives, and generations of Indians will bless him for them.*

[*As quoted by Syed Nurullah and J. P. Naik*]

প্রশ্নাবলী

1. Writ notes on Curzon's Educational Policy. [B.T. 1954]
2. Discuss the main features of the educational Policy of Lord Curzon. [B.A. 1960]
3. Who had Lord Curzon to give new orientation to the Goverment's Educational policy. Narrate a few important features of the policy laid down in the resolution of 1904. [B A. 1955]
4. Discuss the recommendations of the Indian Universities Commission of 1902 and give your comments on them.

সপ্তম অধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯)

॥ স্যাডলার কমিশন গঠন ॥

লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার দশ বছর পার না হতেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পরিচালনার দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনেক উন্নতি হলেও শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার সাফল্যজনক প্রচেষ্টা তখনও হয় নি। এ ছাড়া নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে ১৯১৩ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য যে সব সুপারিশ করা হয় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হবে না বলে স্থির হয়। এদিকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের পর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কার আরও তীব্রভাবে দেখা দেয় ১৯১০ খ্রীঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য যে রয়েল কমিশন গঠিত হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন লর্ড হলডেন। ১৯১৪ খ্রীঃ লর্ড হলডেনের নেতৃত্বে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। লর্ড হলডেন ভারতে আসতে রাজী না হওয়ায় ও ইউরোপে মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় শিক্ষা সংস্কারের সব চেষ্টা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়।

১৯১৭ খ্রীঃ মহাযুদ্ধের অবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত হওয়ায় শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নের দিকে সরকারের দৃষ্টি দেবার সুযোগ ঘটল। এই বছরই ভারত সরকার লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলারকে সভাপতি করে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন" নিয়োগ করে। এই কমিশন স্যাডলার কমিশন নামে সমধিক পরিচিত। কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার জিয়াউদ্দীন আহমদ, ডাঃ গ্রেগরী, স্যার ফিলিপ হার্টগ, অধ্যাপক র‍্যামজেমুর। অনেকে মনে করেন এই কমিশন স্যার আশুতোষের মতামতের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল।

কমিশনের বিচার্য বিষয় :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা এবং গঠনমূলক দিকের প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে পুনর্গঠনের পরামর্শের ভার কমিশনকে দেওয়া হয়—(*"To enquire into the condition and prospects of the University of Calcutta and to consider the question of a constructive policy in relation to the questions it presents"*) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার উপলক্ষ করে কমিশন গঠিত হলেও সমগ্র ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কি ভাবে সংস্কার করা যায় সেই সমস্যাটির কমিশন আলোচনা করেন। কমিশনের সভ্যরা

মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থী মধ্যবর্তী স্তরে নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করবে। (মুদালিয়র কমিশনের আলোচনায় মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য—অংশ দেখুন)—

এডুকেশন কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনায় মুদালিয়র কমিশন নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুদালিয়র কমিশন বলেছিলেন "*As political, social and economic condition change and new problems a ise, it becomes necessary to re-examine carefully and study clearly the objectives which education of each stage should keep in view.*" দশ বার বছরে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরাট কোন পরিবর্তন হয় নি যার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্তন আবশ্যক। কিন্তু মুদালিয়র কমিশন কয়েকটি বিষয় চিন্তা করেন নি বা শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে যে সব তাদের মনে উদয় হয় নি এমন কতকগুলি বিষয় শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে গ্রহণ করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

(ক) **জাতীয় ভাবসংহতি** (*Emotional integration*) :—সাম্প্রতিককালে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাবোধ, ভাষাবিরোধ, সাম্প্রদায়িকতাবোধ প্রভৃতি সময় সময় এমন হিংস্র ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে সন্দেহ জেগেছে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ কোন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না? একজাতি, একমন, একতা—এ বোধ শিক্ষার মধ্যেই জাতীয় সংহতি গড়ে উঠবে। দেশ থেকে ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ও বিভেদবুদ্ধিকে দূর করতে হলে জাতীয় ভাব সংহতি গড়ে তোলা শিক্ষার লক্ষ্য বলে স্থির করতে হবে।

(খ) **বৃত্তিশিক্ষা, শিল্প ও প্রয়োগবিদ্যাকে** শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে স্থির করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষায় এর স্থান কতটা হওয়া উচিত তা নির্ধারিত হয় নি। দেশব্যাপী বৃত্তি শিক্ষার জন্য একটা অস্বাভাবিক ঝোঁক (*craze*) দেখা দিয়েছে। সরকারও সাময়িক প্রয়োজনে বৃত্তিশিক্ষায় অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলে সে দিকেই উৎসাহী। অনগ্রসর দেশের শিল্পোন্নতির সাথে আর্থিক উন্নতির প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, শিল্প বিপ্লবের মুখে সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে 'শিক্ষা কমিশন' চেয়েছেন, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার" প্রসার শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু ভোগবাদকেই জীবনের পরম ও চরম কাম্য বলে আমরা যেন গ্রহণ না করি। ঐহিক সুখ সম্পদ আহরণ যেন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য না হয়ে ওঠে। বৃত্তিশিক্ষা কি প্রযুক্তি বিদ্যার সাথে যেন এমন ব্যবস্থা থাকে যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহত্ব বিকাশের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়।

(গ) বর্তমান জগতে প্রতিটি উন্নত ও উন্নতিশীল দেশে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় জীবনের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ও বিদ্যালয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার

অভাবে মাধ্যমিক স্তরে তরুণ ও তরুণীরা জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে জীবনের গভীর মূল্য (*deeper values*) সম্পর্কে কোন শিক্ষাই পায় না। মাধ্যমিক শিক্ষাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে যেখানে গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের সমন্বয় সাধন করে ছাত্রদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে হবে। "(*Seecondary education should be reoriented as to give the students a proper sense of direction by a kind of synthesis between democratic ideals and moral and spiritual values.*)"

মুদালিয়র কমিশন শিক্ষার লক্ষ্যরূপে গণতান্ত্রিক সমাজে "*broad national and secular out look*" সৃষ্টির দিকেই জোর দিয়েছেন। *Secularism*-এর ভূত যেদিন শিক্ষাবিদ্‌দের ঘাড়ে চেপেছিল সেদিন থেকেই তাঁরা দেশের ও জাতির একটা বিরাট ক্ষতি করেছেন। শিক্ষার থেকে নীতিবাদ ও আধ্যাত্মবাদ দিয়ে কি করে চরিত্র গঠন করা যায় সে কথা তাঁরা ভাবেন নি। রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, "ভারতীয় চিন্তাধারায় শুধু প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যরূপে গণ্য হয় না। উচ্চতর জীবনের ক্ষেত্রে পরমপিতা কর্তৃক সঞ্জীবিত ও পৃথিবীর দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে যে চিন্তার রাজ্য বিস্তৃত ও সংরক্ষিত এই চিন্তার রাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনই ভারতীয় ভাবধারা অনুসারে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

"জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের উপর জোর দিয়ে গীতায় বলা হয়েছে—জ্ঞানম্ বিজ্ঞান সহিতম্। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আধ্যাত্মিক শূন্যতাগ্রস্ত। সুষম শিক্ষার জন্য আমাদের নৈতিক আদর্শ ও আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিকাশ সাধন করতে হবে।" (ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ। প্রকাশক—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ)।

সেকুলার রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান প্রবক্তা জওহরলাল নেহেরুও শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। জাতীয় সংহতি সম্মেলনে বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু কোন প্রস্তাবে নৈতিক শিক্ষার সম্পর্কে কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। জওহরলাল বলেছেন—শিক্ষাকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে হলে কোন নির্দিষ্ট ধর্মমত শিক্ষা না দিলেও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত আলোচনা একান্ত কাম্য। এই সব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা থেকে জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, অন্যথায় শিক্ষা সামঞ্জস্যবিহীন হয়ে পড়বে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভূত উন্নতি আমরা লক্ষ্য করেছি। একথা বলা যেতে পারে যে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে ছত্রাকার মেঘের সৃষ্টি হয়ে থাকে তা আধুনিক জগতের প্রতীক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই অগ্রগতি ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা না গেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কারণ পৃথিবী ইতিমধ্যেই ধ্বংসের সম্মুখীন।

তবু বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আমাদের চলবে না, কারণ বিজ্ঞান সত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

১৭ মাস ধরে সারা ভারত ঘুরে ছোট বড় নানারূপ প্রতিষ্ঠান দেখলেন, শিক্ষাবিদদের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা রচনা করেন।

॥ কমিশনের সুপারিশ ॥

১৯১৯ খ্রীঃ স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট বের হয়। ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে এক প্রয়োজনীয় ও সুদীর্ঘ রিপোর্ট এর আগে কখনও তৈরী হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর সবরকম শিক্ষারই বিস্তৃত আলোচনা এই রিপোর্টে ছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা :—

কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্নটি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। কমিশনের অভিমত ছিল যে, **বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার সার্থক হবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাফল্য মাধ্যমিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল**—*"No satisfactory reorganisation af University system of Bengal will be possible unless and until a radical reorganisation of the system to Secondary Education upon which University work depends, is carried into effect"—Calcutta University Report*, (*vol.* V. *P.* 297)।

কমিশনের রিপোর্টে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কষ্ট সহিষ্ণুতা ত্যাগ ও জ্ঞান পিপাসার প্রশংসা করা হয়। অর্থের অভাবে বহু ছাত্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে না সে কথার উল্লেখও করা হয়। **মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটির মূলে প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা বলা হয়।** মাধ্যমিক শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হ'ত সেই বেতনে যোগ্য লোক পাবার সম্ভাবনা খুব কম। তারপর শিক্ষকদের অনেকেরই কোন ট্রেনিং নেই। রিপোর্টে আরও বলা হয় **বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত শাসনের কবলে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।**

শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অর্থের। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা সরকার না করলে কোন সংস্কারই কার্যকরী হবে না। এজন্য সরকারী তহবিল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্যের সুপারিশ করা হয়।

সেকেণ্ডারী ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড :—

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু কলেজের প্রথম দু'বছরের পাঠ অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষারই অনুরূপ তাই এই অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে জুড়ে দিতে হবে। এই দুই বছরের শিক্ষার নাম হবে "ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা"।

মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট্‌ শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বোর্ড গঠিত হবে (*Board of Secondary and Intermediate Education*)—বোর্ডের হাতে এই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও সাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে বোর্ড গঠিত হবে। বোর্ড যাতে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য সুপারিশ করা হয়। বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হবে বেসরকারী। কমিশন বোর্ডে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কমিশন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতিকে গ্রহণ করবার ফলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীকে ডিগ্রী কলেজ থেকে পৃথক করে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হবে। এই কলেজে কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব, কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখবার সুপারিশ করা হয়।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করে বিশ্বস্থালয়ে প্রবেশের অধিকারের স্থলে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মাপকাঠি বলে গণ্য করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন সম্পর্কে কমিশন স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন যে ইংরেজী ও গণিত ব্যতীত মাধ্যমিক স্তরে অন্য সব বিষয়ে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করা হবে। কলেজীয় শিক্ষার বাহন অবশ্য ইংরেজীই থাকবে।

কমিশন আশা করেছিলেন এই বোর্ড গঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপ অনেক কমে যাবে তার ফলে বিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার জন্য অধিকতর মনোযোগ দিতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা :

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে কমিশন প্রস্তাব করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ ডিগ্রী কোর্স দু'বছরের স্থলে তিন বছরের করা হবে এর কম সময়ে ঠিকমত পড়ানো সম্ভব নয় এবং ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবার সম্ভাবনা কমে যায়। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স বিলেতে প্রচলিত ছিল সেখানকার আদর্শেই কমিশন অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

বাংলায় কলেজের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা এত বেশী যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কলেজীয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব নয়। মাধ্যমিক ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অব্যাহতি দিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব হবে। **কমিশন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঢাকায় একটি শিক্ষণধর্মী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সুপারিশ করা হয়।**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এরূপভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে এটি একটি প্রকৃত শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মফঃস্বলের কলেজগুলিকে এমন ভাবে উন্নত করতে হবে যাতে এগুলি ক্রমে এক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে উঠতে পারে।

এবং আধুনিক পৃথিবীর প্রতীক। সেই সঙ্গে আমাদের শিক্ষায় ও মানসিক গঠনে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধনই একমাত্র উপায়।

"বহুবিধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে কি ভাবে এই কার্যের সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব তা আমি জানি না। কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এইটিই একমাত্র পথ।" (ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ)।

বিজ্ঞানবাদী জওহরলাল, আধ্যাত্মবাদী রাধাকৃষ্ণণ দু'জনেই বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। গীতায় একেই বলা হয়েছে 'জ্ঞানম্ বিজ্ঞান সহিতম্।' এডুকেশন কমিশন মুদালিয়র কমিশনের ভুল সংশোধন করে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যরূপে গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ের যে কথা বলেছেন তাকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

শিক্ষার সাথে সমাজ জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাই সমাজ মানসের প্রতিফলন শিক্ষায় হতে বাধ্য, এ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমাদের শিক্ষার মান কি ভাবে উন্নয়ন সম্ভব তা চিন্তা করতে হবে। সমাজ-মনের শ্রেষ্ঠ উপাদান ও সমাজ আদর্শের উন্নততম রূপ কি করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ॥

মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যান্য সমস্যা সমাধানের বিষয় চিন্তা না করে প্রথমেই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশক্রমে পর্যায়ক্রমে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা শুরু হয়। ছাত্রদের রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে একটি কোর্স বেছে নেবার সুযোগ দেবার জন্য বহু উচ্চতর বিদ্যালয়ে একাধিক শাখা (*stream*) খোলা হয়। ১৯৬২—৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতে সমগ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০.৬% বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে—পঃ বাংলায় এ সংখ্যা ৫০%এর অধিক। ফলে বর্তমানে দেশে তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় পাশাপাশি রয়েছে—অষ্টম শ্রেণীযুক্ত জুনিয়র হাই, দশম শ্রেণী যুক্ত হাই ও একাদশ শ্রেণী যুক্ত হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।

সরকারী শিক্ষাবিভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতরে রূপান্তর করতে বহু অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেছে। কিন্তু ১৯৬৩ খ্রীঃ জুন মাসে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা সচিবগণ এক সম্মেলনে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। সন্দেহজনক উপোযোগিতা সম্পন্ন (*Prcved of doubtful utility*) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনে *low pricrity* দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ এর পরেই এক প্রেস নোটে জানায়—একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পরিণত করাই সরকারী শিক্ষা নীতির লক্ষ্য। শিক্ষা সচিবদের এই অভিমত একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক

সমীক্ষায় যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার ফলেও সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার রূপান্তরের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তার একটা বিরাট অংশ শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যয় না হয়ে সুরম্য বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ভাবেই ব্যয়িত হয়েছে। অধিকাংশ বহু-সাধক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক নেই। পল্লী অঞ্চলের উচ্চতর বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার নিম্নতম মান রক্ষা করবার উপযোগী শিক্ষক সংগ্রহ করা অসম্ভব। তারপর ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রমের জন্য শিক্ষার্থীর উপর যে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সে চাপ সইবার শক্তি কিশোর শিক্ষার্থীর আছে কি না সে বিচার কেউ করা প্রয়োজন বোধ করে না। সুপরিকল্পনার অভাব, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম, উপযুক্ত শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা বাস্তব সত্য।

মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটিগুলির মধ্যেই সমস্যার বীজ নিহিত আছে। উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলি হচ্ছে (১) সংগঠনমূলক সমস্যা (*Organisation Pattern*) (২) পাঠক্রম মূলক সমস্যা (৩) শিক্ষক সমস্যা, (৪) পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ সমস্যা (৫) অর্থ নৈতিক সমস্যা (৬) প্রশাসনিক সমস্যা। এই প্রধান সমস্যা ছাড়াও আরও বহু সমস্যা আছে যা মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা আলোচনা কালে স্বাভাবিকভাবেই আলোচিত হবে, যেমন অপচয়—বিষয়টি পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সমস্যার সঙ্গে জড়িত কিন্তু সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষা অপচয় এমনভাবে রূপ ধরেছে যা শুধুমাত্র পরীক্ষার সাথে জড়িত নয়, সংগঠনের সাথেও এই প্রশ্নটি জড়িত। এ ছাড়া ভর্তির সমস্যা ও শিক্ষাপদ্ধতি সমস্যা প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষা সমস্যার আলোচনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

॥ ১ ॥ সংগঠনমূলক সমস্যা

মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা আলোচনায় প্রথমেই স্থির করে নেওয়া দরকার মাধ্যমিক শিক্ষাকাল কত দিন স্থায়ী হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার সীমারেখা কোথায় টানা হবে তা ঠিক করে না নিলে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল কতদিন স্থায়ী হবে ঠিক করা সম্ভব নয়। মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন রূপ (*New Pattern of Secondary Education*) নির্ধারণে দুটি দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাকাল নির্ধারণ করেছিলেন। প্রথমতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষার্থীর রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্নমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয়তঃ উচ্চ শিক্ষার জন্য যারা যাবে তাদের প্রস্তুতি যেন এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার উপযোগী হয়। কত বছর শিক্ষালাভের পর একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপযোগী হয় ও কত বছর শিক্ষার পর প্রথম ডিগ্রী দেওয়া যায় এসব দিক থেকেও বিচার করে তাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষাকাল একাদশ বর্ষব্যাপী হবে বলে স্থির করেছেন। তাঁদের আলোচনায় অবশ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান বিষয়ে দোষ ত্রুটি দূর করবার জন্য কমিশন সুপারিশ করেন। শিক্ষাকে কেবলমাত্র বক্তৃতা ভিত্তিক না রেখে টিউটোরিয়াল প্রভৃতির ব্যবস্থা করে ছাত্র অধ্যাপক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। এই ব্যবস্থায় পড়াশোনার উন্নততর আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। বি, এ, পরীক্ষায় অনার্স কোর্সের ব্যবস্থা রাখতে হবে, বিবিধ কারিগরী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। ভারতীয় ভাষার চর্চাকে উৎসাহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে হবে। ডিগ্রী পরীক্ষায় অনার্স কোর্সে দেশীয় ভাষাকে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে একটি সরকারী বিভাগে রূপান্তরিত না হয় সেজন্য কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ যাতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে সেজন্য পরিচালনা সমিতিগুলিতে তাঁদের প্রতিনিধি বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নিয়মকানুনে অতিরিক্ত কড়াকড়ি থাকা উচিত নয় বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন। সেনেট ও সিণ্ডিকেটের পরিবর্তে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক কোর্ট (court) ও ক্ষুদ্র কার্যকরী সমিতি (Executive council) গঠন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

অধ্যাপক নিয়োগ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, পাঠক্রম নির্ধারণ, ডিগ্রী বিতরণ প্রভৃতি বিশুদ্ধ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী একাডেমিক কাউন্সিল (*Academic Council*) গঠন ও বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ফ্যাকালটি ও বোর্ড অব স্ট্যাডিজ (*Faculty and Board of Studies*) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের জন্য একজন বেতনভুক উপাচার্য নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়। কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও কতকগুলি সুপারিশ ছিল।

প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য শিক্ষা বিভাগ (*Department of Education*) স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়। বি. এ. ও আই. এ. পরীক্ষায় শিক্ষা (*Education*) একটি বিষয়রূপে গ্রহণ করবার সুপারিশ করা হয়।

স্ত্রী-শিক্ষা :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ বোর্ড স্থাপনের কথা বলা হয়। ১৫।১৬ বছরের মেয়েদের জন্য পর্দা স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য কমিশন ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের পাঠক্রমে স্থান দেবার নির্দেশ দেন। ছাত্রদের শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একজন শারীরিক শিক্ষার পরিচালক (*Director of Physical Education*) ও স্বাস্থ্য কল্যাণ পরিষদ (*Board of Students Welfare*) স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করবার জন্য একটি আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড (*Inter University Board*) গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

॥ সমালোচনা ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট-সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অনাথ বসু বলেন, "এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মূল্যবান আর কোন রিপোর্ট ইতিপূর্বে লেখা হয় নাই। পরবর্তীকালে শিক্ষাধারার গতি বহুল পরিমাণে ইহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আজও ইহার প্রভাব একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।" বাস্তবিক আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার এমন কোন প্রয়োজনীয় দিক নেই যে সেই সম্পর্কে কমিশন আলোচনা করেন নি ও যথাযোগ্য পরামর্শ দেন নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ করে কমিশন গঠন করা হলেও ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে উপকৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গঠনে কমিশন নির্দেশিত আদর্শ ই অনেকাংশে গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনের রিপোর্ট লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য নিযুক্ত হলডেন কমিশনের রিপোর্টের দ্বারা প্রভাবিত হলেও ভারতীয় উচ্চ শিক্ষার সংস্কারের জন্য এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ভারতীয় ভাষার স্থান নির্ধারণে, বৃত্তিশিক্ষা গবেষণার ব্যবস্থা, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বোর্ড গঠন, তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন, ইণ্টারমিডিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে পৃথকীকরণ প্রভৃতি সুপারিশ কমিশনের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। কোন কোন সুপারিশ সময়োচিত না হলেও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহীত হয়ে কমিশনের দূরদৃষ্টির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কমিশন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের; হিসেব করে দেখা গিয়েছে এরূপ একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হলে ৫০ লক্ষ টাকা (সেই সময়কার হিসাবে) দরকার। এ ছাড়া আমাদের মত দরিদ্র দেশের অভিভাবকদের পক্ষে আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখে ছেলে পড়াতে হলে যে খরচ লাগে তা বহন করা সম্ভব নয়। এতবড় বিরাট দেশের চারদিকে ছড়িয়ে অনেক কলেজ রয়েছে ও থাকবে তার প্রতিটিকে সংহত করে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা সম্ভব নয়। তাই এদেশে অনুমোদনধর্মী (Affiliating) বিশ্ববিদ্যালয় থাকবেই।

ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড গঠনে সদস্য নির্বাচনে বাটোয়ারা নীতিকে মেনে নিয়ে বোর্ড সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের সুপারিশ করে ভ্রান্ত নীতিকেই সমর্থন করেছেন। রাজনৈতিক জীবনের যে বিষ আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু করে তুলেছিল শিক্ষাক্ষেত্রে সেই সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ছেড়ে দিয়ে কমিশনের সুপারিশগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় পরবর্তী ত্রিশ বছরের উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে স্যাডলার কমিশনের প্রভাব অপরিসীম। এ সম্পর্কে মেহিউ (Mayhew) বলেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কমিশনের রিপোর্ট তথ্য ও পরামর্শের এক অফুরন্ত খনি। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এর তাৎপর্য অপরিমেয়—"*The Report of the Calcutta University Commissions has been a constant source of suggestion and information. Its significance in the history of Indian Education is incalculable.*

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the main recommendations of the Calcutta University Commission of 1917 in the light of subsequent expansion of education in the country. [B. T. 1957]
2. Examine critically the main suggestion of Calcutta University Commission for the re-organisation of High School Collegiate and University education in India. [B. T. 1960]
3. What were the main recommendation of the Calcutta University Commission. Give a brief account of the organisation administration and problems of Calcutta University. [B. T. 1962]

অষ্টম অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

পটভূমি ঃ—

ভারতের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে ইংরেজ বণিক কোম্পানী ও পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন করেছিল তার সাথে দেশের নাড়ীর কোন যোগ ছিল না। আমাদের দেশের প্রাচীন টোল পাঠশালার মধ্য দিয়ে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাকে ভিত্তি করে প্রয়োজনমত যুগোপযোগী সংস্কার করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা ভারতের বৈদেশিক শাসনকর্তাদের ছিল না। **এডাম সাহেব বলেছিলেন প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার কোন আয়োজন সার্থক করতে হলে তাকে জাতীয় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে।** তৎকালীন শাসক সম্প্রদায় বিশেষ করে মেকলে দেশীয় শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রস্তাবকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে নাকচ করে দেন। দেশে পাশ্চাত্ত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে রাজা রামমোহন রায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ উদ্যোগী হয়ে সরকারকে সমর্থন করেছিলেন। যুগের দাবীকে উপেক্ষা না করে তাঁরা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করবার জন্য আগ্রহশীল হয়েছিলেন কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের উন্নতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করবার প্রয়োজনে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা উৎসাহী হয়েছিলেন। জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইংরেজী শিক্ষিত একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠুক যাদের সাথে অধিকাংশ লোকের কোন যোগ থাকবে না এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা তাঁরা চান নি। কিন্তু দেশের শাসকবর্গের মনোভাব ছিল অন্যরূপ। দেশ শাসনের প্রয়োজনেই তারা দেশে ইংরেজী শিক্ষিত একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় শুধুমাত্র কোম্পানীর কর্মচারীর অভাবই পূরণ করবে না, কোম্পানীর শাসনের তারা হবে অন্ধ সমর্থক এই ছিল কোম্পানীর মনোভাব। **উডের ডেসপ্যাচে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্য, নৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারী সৃষ্টি করা সরকারী শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য।** সেই সাথে বণিক কোম্পানী তাদের বাণিজ্যের স্বার্থের কথা ভুলতে পারে নি, তাই এর পরেই বলা হয়েছে, ইংলণ্ডের কারখানায় কাঁচা মালের যোগান দেওয়া ও বৃটেনে উৎপন্ন পণ্যের জন্য বাজার সৃষ্টি করা সরকারী শিক্ষানীতির আর একটি উদ্দেশ্য।

বণিক মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে ইংরেজ এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। দেশের শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষার উন্নতির জন্য বহু কমিশন ও কমিটি বসেছে কিন্তু উড কথিত মূলনীতি থেকে ইংরেজ শাসিত ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষাকাল স্থায়ী হবার যৌক্তিকতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার পর ৩ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থী প্রথম ডিগ্রী পাবার যোগ্যতা অর্জন করবে। *CABE*-র সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম ৮ বছরের একটানা শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং এর নতুন নাম হবে *Primary*-র স্থলে *Elementary* শিক্ষা। শিক্ষা কমিশনও প্রাথমিক শিক্ষকে *Lower primary* ও *Higher primary* দু'ভাগ করে আট বছরের করতে সুপারিশ করেছেন।

বর্তমান প্রচলিত ৪।৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করবার পর যদি আর্থিক সংগতিতে কুলায় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষাকে আট বছর পর্যন্ত টেনে নেওয়া যেতে পারে কি না সে প্রশ্ন বিচার করা যায়। বর্তমানে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা যেরূপ ৫ বছর স্থির করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বত্র সেরূপ করা সম্ভব কি না সে চেষ্টা করা চলতে পারে। যদি পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত হঠাৎ প্রাথমিক শিক্ষাকে আট বছর ব্যাপী করা হয় তাহলে বিপর্যয় দেখা দেবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কতদিন স্থায়ী হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সীমা নির্দেশক স্তর বিভাগ রাজ্যগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত হবে। রাজ্যগুলি স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন বিচার করে সংগঠনমূলক সমস্যার সমাধান করবেন। মিডল স্কুলের স্তরটি মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া এখনও সময় হয় নি। শিক্ষার সংগঠনমূলক পরিবর্তন করবার জন্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন আমাদের দেশে তা হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষাকে বর্তমান সীমায় রাখলে মাধ্যমিক শিক্ষার পক্ষে খুব অসুবিধার কারণ হবে এ কথা কেউ মনে করেন না। বরং অর্থের যোগাড় ছাড়াও আরও যে সব অসুবিধা আছে তা দূর না করে প্রাথমিক শিক্ষাকে আট বছর পর্যন্ত বাড়াবার চেষ্টা করলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। প্রাথমিক শিক্ষাকাল বর্দ্ধিত করা অপেক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষাকালকে বর্তমান সীমার মধ্যে রাখা হবে, না শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ মত দ্বাদশ বছর ব্যাপী করা হবে সে প্রশ্নই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থির করতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির এক সভায় (১৯৭২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর) দ্বাদশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পঃ বাংলায় ১৯৭৪ খ্রীঃ থেকে ১০+২ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল দশ বছরের ও দক্ষিণ ভারতে এগার বছরের। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল এক বছর বাড়ান হ'লো। কিন্তু তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেননি শিক্ষাকাল ১১ কি ১২ বছর হবে। কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠিত হয়েছে, কিন্তু আজও ভারতের সর্বত্র মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ এক নয়। সাতটি রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১০ বছর, ছয়টি রাজ্যে ১১ বছর। একমাত্র মধ্য

প্রদেশে দশম শ্রেণী যুক্ত হাই স্কুল নেই, আর সব রাজ্যে যারা একাদশ শ্রেণীকে গ্রহণ করেছে সেখানে দশম শ্রেণীও আছে। আসামে মাধ্যমিক শিক্ষা বার বছর কাল ব্যাপী। ১৯৬২-৬৩ খ্রীঃ মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০.৬% উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক পরিকল্পনা গুজরাট, কেরালা, মাদ্রাজ গ্রহণ করেন নি। মহারাষ্ট্র সামান্য কয়েকটি বিদ্যালয় উচ্চস্তরে রূপান্তরিত করেছে। উড়িষ্যা দশম শ্রেণীতে ফিরে গিয়েছে। যুক্তপ্রদেশ দাবী করে তাদের দু'বছরের ইন্টারমিডিয়েট কোর্স হচ্ছে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু ডিগ্রী কোর্স দু'বছরই রয়েছে তাই যুক্তপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন রূপ (*Re-organised pattern*) মেনে নিয়েছে একথা স্বীকার করা যায় না।

এতগুলি রাজ্যে যখন মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন হয় নি ও যেখানে একে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানেও ভাল কাজ হচ্ছে না বলে কথা উঠেছে, তাহলে এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সংক্ষিপ্তভাবে কারণগুলি এখানে বলা হ'ল :—

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের ফলে শিক্ষার মান উন্নত হয় নি।

(খ) পুনর্বিন্যাসের সাথে যে অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে তা ভাল করে বিচার করে দেখা হয় নি। কেন্দ্রীয় সাহায্য সত্ত্বেও যারা নতুনরূপে গ্রহণ করেছে তারা সামান্য পরিমাণ স্কুলকে উচ্চতর করতে সমর্থ হয়েছে।

(গ) যে সব স্কুল প্রতিষ্ঠান উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে সে সব বিদ্যালয়ের স্থান, সাজসরঞ্জাম, শিক্ষার যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে নির্ধারিত মানের নিম্নতম বিন্দুতেও পৌঁছাতে পারে নি।

(ঘ) যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের ব্যবস্থা না করেই বিদ্যালয়সমূহ উন্নীত করা হয়েছে —উন্নীত স্কুলের জন্য গ্রামাঞ্চলে যোগ্য শিক্ষক যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ (*core subjects*) পড়ানোর ব্যাপারে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

(ঙ) অন্তঃবর্তীকালীন প্রি-ইউনিভারসিটি কোর্স কোথাও ভালভাবে কার্যকরী হয়নি। এক বছরের শিক্ষাকে ৭।৮ মাস করা হয়েছে এর মধ্যে পুরো তিন মাস ক্লাস হয় না।

একথা সবাই বলে থাকেন শিক্ষায় অগ্রসর দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষার মান খুব নীচু। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা মানোন্নয়নের জন্য কোন কার্যকরী পরিকল্পনা আমাদের নেই। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য যায় তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের মত খুব কম যোগ্যতাই থাকে। তাই ভারতের প্রায় সব শিক্ষাবিদই একথা বলে থাকেন মাধ্যমিক শিক্ষাকালকে বাড়িয়ে বার বছর করা দরকার। বিশেষ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা কমিশনও সেই সুপারিশ করেছেন।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে ১৫ বছরের শিক্ষা শেষ না হলে প্রথম ডিগ্রী দেওয়া হয় না। স্যাডলার কমিশন (১৯১৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য

কোন দিন বিচ্যুত হয়েছে একথা বলা চলে না। **উনবিংশ শতকে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হ'ল তা নেহাৎ পুঁথিগত শিক্ষা।** ব্যবহারিক শিক্ষার কোন স্থান উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল না বলাই চলে। আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কয়েকটি ভদ্রলোকের বৃত্তি শিক্ষার যে সামান্য আয়োজন ছিল তার সুযোগ মুষ্টিমেয় লোকে পেত। মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কলেজ থেকে শিক্ষা শেষ করে সরকারী চাকুরীর চেষ্টাই তারা প্রথমে করত, আর সে সময়ে সরকারী চাকুরীর অভাব ছিল না। যখন ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চার ফলে নিত্য নতুন আবিষ্কার হচ্ছিল ও শিল্প জগতে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছিল তখন আমরা ইংরেজের গোলামখানায় নাম লিখিয়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সাক্ষাৎ ফল লাভ থেকে বঞ্চিত ছিলাম।

॥ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা ॥

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় গণশিক্ষার অতি সামান্য আয়োজনই ছিল। ভ্রান্ত "চুঁইয়ে পড়া শিক্ষানীতি" দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে গণশিক্ষাকে অবহেলা করে উচ্চশিক্ষার জন্য সমগ্র শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করাই ছিল সরকারী শিক্ষানীতি। এর ফলে শহরাঞ্চলের মুষ্টিমেয় অধিবাসী পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিল। দেশের আপামর জনসাধারণ যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের সাথে সাথে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কহীন ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। গণশিক্ষার ব্যবস্থা, কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দাবী তোলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষা প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। অনেকে এগিয়ে এসে বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলিতে উন্নত ধরনের পরিচালনায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে শিক্ষা দেবার চেষ্টা চলতে থাকে। বিজাতীয় প্রভাব মুক্ত এইসব কলেজ শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের চরিত্র ও জাতীয়তা উন্মেষের চেষ্টায় এরা ব্রতী হন।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব :—

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্য করে ব্যাপক রূপ ধারণ করে। কিন্তু এর পূর্ব থেকেই ধীরে ধীরে এর প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে আগ্রহ দেখা গিয়েছিল তা কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া, এই আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ১৯০১ খ্রীঃ বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে ছেলেদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষাদর্শে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার কথা প্রচার করেন। তাঁরই প্রভাবে

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হরিদ্বারে কাংড়ী গুরুকুলের (১৯০৩ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবন গুরুকুল (১৯০২ খ্রীঃ) প্রথমে সেকেন্দ্রাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয় পরে ১৯১১ খ্রীঃ বৃন্দাবনে স্থানান্তরিত হয়। বৈদিক ভারতে গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, আধুনিক যুগে নাগরিক জীবনের কলকোলাহলের বাইরে তপোবনের শান্ত পরিবেশে সেভাবে বিদ্যাচর্চাই ছিল গুরুকুলের আদর্শ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশের শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুরু করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ আহমেদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ সরকারী শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯০২ খ্রীঃ লর্ড কার্জন সিমলায় ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের নিয়ে গোপন বৈঠকের পর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনে প্রথমে কোন ভারতীয় সদস্য নেওয়া হয় নি। পরে এ নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হলে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ বিলগ্রামীকে ভারতীয় সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী স্থূলভ প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের সাথে শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রই পরিচিত ছিল। তাই কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাধারণের মনে আশঙ্কা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট বের হলে দেখা গেল উচ্চ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাতের যে উদ্দেশ্য কার্জনের ছিল তা সিদ্ধ হয়েছে। স্যার গুরুদাস কমিশনের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হ'তে পারলেন না কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধ মন্তব্যের কোন গুরুত্বই দেওয়া হ'ল না। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে তাঁর ভাষণে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন **উচ্চ শিক্ষার সংকোচ সাধনই লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য**। কমিশন সিদ্ধান্ত করেছিল বেসরকারী আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দেওয়া হবে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু হলে ভারত সরকার বেসরকারী আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

রাজনৈতিক নেতাদের আন্দোলন, বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও সমাজ সেবীদের প্রচেষ্টা ছাড়াও একজন আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ ছাত্রদের জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বিংশ শতাব্দী শুরু হবার পূর্ব থেকেই নিরলসভাবে কাজ করতে থাকেন। এই অক্লান্ত কর্মী নিরলস শিক্ষা সাধকের নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের নাম ডন সোসাইটি।

ডন সোসাইটি :—

সতীশচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা প্রচেষ্টা ভাগবত চতুষ্পাঠী। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে ও সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৯৫ খ্রীঃ সতীশচন্দ্র ভাগবত চতুষ্পাঠী নামে ভবানীপুর অঞ্চলে একটি টোল খোলেন। ডন প্রথমে এই চতুষ্পাঠীর মুখপত্র ছিল (১৮৯৭ খ্রীঃ থেকে ১৯০৪ খ্রীঃ)। **সতীশচন্দ্র ১৯০২ খ্রীঃ ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, ডন পত্রিকার নামানুসারে**। ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুকাল

পরে চতুষ্পাঠী উঠে গেলে ১৯০৪ খ্রীঃ ডন পত্রিকা সোসাইটির মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার নাম হয় "দি ডন এণ্ড ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিন"। ভারতবাসীকে ভারত সম্পর্কে সচেতন ও পরিচিত করবার জন্য বিদেশীদের ভারত বিষয়ে অবহিত করবার জন্য ডন পত্রিকায় কয়েকটি নতুন বিভাগ এই সময় সংযোজিত হয়। ডন পত্রিকায় ভারততত্ত্ব (*Indology*) ও ভারতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ-সমূহ প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রথমে রাজনৈতিক আলোচনা হ'ত না, পরে রাজনীতি বিষয় নিয়ে লেখা বের হ'ত।

ডন সোসাইটির উদ্দেশ্য হয় যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষাদান। ছাত্রদের পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে উন্নত ধরনের শিক্ষাদান ও শিক্ষার অব্যবস্থা দূর করা সম্পর্কে সতীশচন্দ্র সচেষ্ট ছিলেন। ছাত্রদের চরিত্র গঠন করা, নৈতিক শিক্ষাদান, স্বার্থ ত্যাগ, কারিগরী শিক্ষা, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্র সমাজকে একমাত্র মানুষ করতে পারবে বলে সোসাইটি সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। সোসাইটিতে নিয়মিত ক্লাস হ'ত। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করত। এতে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ ও সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ত। বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্লাস নিতেন ও তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ছাত্রদের সাথে আলোচনা করতেন।

কারিগরী শিক্ষা সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতায় শিল্প প্রদর্শনী হয়, স্বদেশী দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে ইতিহাস, দর্শন, শিল্প সম্পর্কে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়, সতীশচন্দ্র ছিলেন তার অন্যতম পথ প্রদর্শক। শিক্ষা আন্দোলন ও শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কেও ডন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যে আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয় সতীশচন্দ্র যুক্তি দিয়ে দেশবাসীকে সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন।

১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর ডন সোসাইটি ক্রমে পরিষদের মধ্যে বিলুপ্ত হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ বেঙ্গল ন্যাশানাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর অধ্যক্ষ হন অরবিন্দ ও তত্ত্বাবধায়ক হলেন সতীশচন্দ্র, অরবিন্দ পদত্যাগ করলে সতীশচন্দ্র অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

ডন সোসাইটির প্রভাব তৎকালীন যুব সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে ডন সোসাইটির সদস্যরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে দেশ প্রেমের বাণী প্রচার ও যুব সম্প্রদায়কে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, বিদেশী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেছিল। জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টায় ডন সোসাইটির উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ডন সোসাইটির এক সভায় সোসাইটির সদস্যদের লক্ষ্য করে বলেন, "আপনারা যেভাবে দীক্ষিত ও অভ্যস্ত হইয়াছেন তাহাতে বাহিরের কোন উত্তেজনার প্রয়োজন আপনাদের নাই। সতীশ বাবু যে সময় ডন সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না। শিক্ষা সম্পর্কীয় এই ন্যাশনাল মুভমেণ্টও তখন সূত্রপাত হয় নাই এমন দিনে সতীশ বাবু দূরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

বাহিরের উত্তেজনার অপেক্ষায় না থাকিয়া মহৎ লক্ষ্য মাত্র সম্বল করিয়া এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। যে সভা সাময়িক কোন বৃহৎ উত্তেজনা, উদ্দীপনার মুখে তৈয়ার হয় নাই, আপনারা সেই সভার আকর্ষণে এখানে মিলিয়াছেন। এতদিন ধীরে ধীরে উহার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, এখন তাহা পল্লবিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।" ডন সোসাইটি স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা অতুলনীয়।

॥ বঙ্গ ভঙ্গ ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ॥

শাসন কার্যের সুবিধার অজুহাতে বঙ্গ বিভাগ লর্ড কার্জনের অন্যতম স্মরণীয় কীর্তি। কার্জনের প্রতিক্রয়াশীল জাতীয়তা বিরোধী মনোভাবের ফলে দেশে তীব্র অশান্তির সৃষ্টি হয়। তার শিক্ষানীতি যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত দেশের শিক্ষিত সমাজ তা বুঝতে পেরে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু করার জন্য প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থল বঙ্গভূমিকে দ্বিধা বিভক্ত করে এই আন্দোলনকে দুর্বল করবার এক পরিকল্পনা তিনি করেন। বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনার ফলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বহুদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশব্যাপী তুমুল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ এই সুনিশ্চিত ঘটনাকে অনিশ্চিত 'করবার জন্য যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় সেই আন্দোলনে দেশের ছাত্ররা দলে দলে যোগ দেয়। স্কুল কলেজের ছাত্রদের আন্দোলনে যোগ দেওয়া সরকার কোনরূপেই সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাংলা সরকার ছাত্রদের দমন করবার জন্য প্রথম নিয়মজারী ও আইন পাস করলেন। সরকারী চণ্ডনীতি ছাত্র দলনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করলে নানা জায়গায় বিশেষ করে রংপুর, ঢাকা, মাদারীপুরে ছাত্রদলন অত্যন্ত হিংস্ররূপ ধারণ করে। জাতীয় আন্দোলন থেকে ছাত্রদের সরিয়ে রাখবার জন্য রিজলী সার্কুলার, কার্লাইল সার্কুলার ও লায়ন সার্কুলার জারী করা হয়। শুধু মাত্র সার্কুলার জারী করে, যখন ছাত্র সমাজকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হ'ল না তখন সরকার পাইকারীভাবে ছাত্র নির্যাতন শুরু করল। রংপুরে ও ঢাকায় বহু ছাত্রকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কোন কোন ছেলেকে বেত্রদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। রংপুরে অভিভাবকগণ জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকার করল। রংপুরে ছাত্র নির্যাতনের প্রতিক্রিয়ায় সরকারী স্কুল ত্যাগকারী ছাত্রদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় (৯ই নভেম্বর ১৯০৫ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রংপুরে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় নেতাদের সামনে এক নতুন পথের সন্ধান ছিল।)

কার্লাইল সার্কুলারে (২২ অক্টোবর ১৯০৫ খ্রীঃ) স্কুল কলেজের অধ্যক্ষদের বলা হয়েছিল ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া বা সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এই সার্কুলার জারীর দু'দিন বাদে কলকাতার ফীল্ড এণ্ড একাডেমিক ভবনে জাতীয় শিক্ষার কথা আলোচনা করা হয়। এর কয়েকদিন বাদে এক সভায়

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন তবে একদিন ঠকিতেই হইবে।...(বিদেশী) গভর্নমেন্ট এদেশের অনুকূল শিক্ষা কখনও দিতে পারে না। বিদেশী অধ্যাপক অশ্রদ্ধার সাথে শিক্ষা দেন। শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিকট হইতে আমরা এমন একটি জিনিস পাই যাহা আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়।

কলকাতায় যখন সার্কুলারের ছড়াছড়ি তখন কলকাতার যুব সম্প্রদায় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এন্টি সার্কুলার সোসাইটি স্থাপন করেন। সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। ইনি ছিলেন সোসাইটির প্রাণস্বরূপ। তাঁর নেতৃত্বে সোসাইটির সভ্যগণ বিলাতী বর্জন আন্দোলন প্রবলভাবে চালাতে থাকে। কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে নির্যাতীত ও বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ ৯ই নভেম্বর তারিখে পান্তির মাঠে (এখন যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল) এক বিরাট জনসভায় সুবোধ চন্দ্র বসু মল্লিক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। এই বিরাট দানের জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জাতির পক্ষ থেকে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মৈমনসিংহ জিলার গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী পাঁচ লক্ষ ও মুক্তগাছার জমিদার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেন।

(রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েক মাস বাদে কলকাতায় National Council of Education বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়। সুবোধ চন্দ্র বসু মল্লিক তাঁর প্রতিশ্রুত এক লক্ষ টাকা পরিষদের হাতে দেন। ব্রজেন্দ্র কিশোর ও সূর্যকান্ত ছাড়া এই উপলক্ষে স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকেও প্রচুর টাকা পাওয়া যায়। এই টাকায় জাতীয়তার আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু হ'ল। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিদেশী সরকারের প্রভাব মুক্ত করে পুরোপুরি জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দেবার জন্য ৯২ জন সদস্য নিয়ে ১৯০৬ খ্রীঃ ১২ই মার্চ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীগণ জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেন। এঁদের চেষ্টায় রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে ১৯০৬ খ্রীঃ ১৪ই আগষ্ট কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়।) স্যার গুরুদাস সভায় উপস্থিত জনসাধারণের সামনে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন তাঁরা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি থেকে দোষমুক্ত জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা তাঁরা করবেন না। এই সভার পরদিন অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট বৌবাজার ষ্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়ীতে জাতীয় স্কুল কলেজের কাজ শুরু হ'ল। (জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ ও প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন সতীশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়। কলেজ তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল। কলা, বিজ্ঞান, ও কারিগরী শাখায় ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। স্কুল থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার অতি ব্যাপক বিবিধ শিক্ষার পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ শিক্ষাদান ও বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে অভিনব আয়োজন করেছিল। পাঠশালা থেকে হাতের কাজ ছিল আবশ্যিক। স্কুল বা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনা ও পঠন পাঠনের জন্য সংস্কৃত, পালি, মারাঠি ও হিন্দী শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। কলেজে উচ্চতর বিজ্ঞান শেখাবার ব্যাপক আয়োজন করা হয়। বৃত্তিমূলক কাজ শেখাবার জন্য কারিগরী বিভাগের ব্যবস্থা হয়। বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় তত্ত্ব (Theory) ছাড়া প্রয়োগ ও উৎপাদন সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োগমূলক কাজের মধ্যে কাঠের কাজ, লোহার কাজ, ঢালাইয়ের কাজ ও যন্ত্রপাতি চালানোর কাজ শিখতে হ'ত। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বহু ছাত্রকে পরিষদ থেকে আমেরিকা পাঠান হয়।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হলে নেতাদের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। তারকনাথ পালিত ও নীলরতন সরকার কেবল মাত্র কারিগরী ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করছে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রসারের উপর। নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কারিগরী শিক্ষার ও উন্নয়নের জন্য তাঁরা ১৯০৬ খ্রীঃ বর্তমানে আপার সার্কুলার রোডের উপর যেখানে বিজ্ঞান কলেজ সেখানে বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুধু মাত্র কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কলকাতার বাইরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় জাতীয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার দশটি শহরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অর্থ সাহায্যে পরিষদ অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অর্থ সাহায্য ও অনুমোদন ছাড়াও শিক্ষা পরিষদের আদর্শে মফঃস্বলের বহু শহরে স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহে ও উদ্যোগে অর্থসংগৃহীত হয়ে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। **এ প্রস্তাবে বলা হয়, কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বালক-বালিকাদের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের সচেষ্ট হ'বার সময় উপস্থিত হয়েছে।** জাতীয় আদর্শ স্বদেশবাসীর কর্তৃত্বাধীনে দেশের প্রয়োজন অনুরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক এই প্রস্তাব যে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবে গৃহীত হয়েছিল এ বুঝতে বেগ পেতে হয় না। বাংলার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের সমর্থন লাভ করেছিল। তাঁর প্রভাবে বোম্বাই প্রদেশে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে ও সেখানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়া মাদ্রাজ প্রদেশে জাতীয় বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯০৯ খ্রীঃ অন্ধ্রে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়।

সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে থেকে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমান শতাব্দীর শুরুতেই স্থাপিত হয়েছিল একথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু ব্যাপকভাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পথ বাংলা দেশেই 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে প্রদর্শিত হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি বেশি দিন টিকে থাকে নি। স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে ন্যাশন্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের অভাবে ও অর্থাভাবে কিছু কিছু জাতীয় বিদ্যালয়ও উঠে যেতে বাধ্য হয়। নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখে।

অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বঃ— মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার রিপোর্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দিলে সরকার দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধ শেষে ভারত রক্ষা আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় দমননীতি চালু রাখার উদ্দেশ্যে কুখ্যাত রাওলাট আইন পাস হয় ও জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালিয়ে ইংরেজ সেনানায়ক ডায়ার শত শত নিরপরাধ নরনারীকে হত্যা করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী এক বিরাট গণ-আন্দোলন শুরু হয়। সরকারী অফিস ও স্কুল কলেজ বর্জনের মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সহস্র সহস্র ছাত্র স্কুল কলেজ ছেড়ে মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। নতুন করে ইংরেজ প্রভাব মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি হয়। ফলে একদিকে যেমন স্কুল কলেজ পরিত্যক্ত হ'ল অপরদিকে তেমনি ছাত্রদের জন্য জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই সময় কলকাতার গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন ও জাতীয় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। পাটনায় বিহার বিদ্যাপীঠ, বারাণসীধামে কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাটে গুজরাট বিদ্যাপীঠ মহারাষ্ট্রে তিলক বিদ্যাপীঠ, অন্ধ্রে জাতীয় বিদ্যায়তন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে প্রতি জেলায়, মহকুমায় এমনকি বড় বড় গ্রামে বিভিন্ন স্তরের জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আলিগড়ে "জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া" অর্থাৎ জাতীয় মুসলিম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে, জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশপ্রেমিক শিক্ষাব্রতীগণ জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথম অবস্থায় সরকার পরিচালিত ও অনুমোদিত স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা হঠাৎ খুব কমে যায়। ১৯২১-২২ খ্রীঃ শিক্ষা সমীক্ষায় দেখা যায় সেই সময়ে সমগ্র ভারতে ১২২৭টি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৮,৫৭১ জন।

জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পুরান স্কুলগুলিকে অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯২০-২১ খ্রীঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৩৭,০০০ জন ও কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৬০০০ জন কমে যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফিস বাবদ ২,৬৩,০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। **জাতীয় আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হবার সাথে সাথে কর্মীর অভাবে ও অর্থাভাবে বহু স্কুল উঠে যায়। এছাড়া সরকার অনুমোদিত ডিগ্রী ডিপ্লোমার জন্য ছাত্র সাধারণ স্বাভাবিক ভাবেই পুরাতন বিদ্যায়তনসমূহে ফিরে যায়।** কলকাতার জাতীয় মেডিকেল স্কুল, যাদবপুরের টেকনিক্যাল স্কুল, দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর টিকে থাকে নি।

॥ শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব ॥

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে জাতীয় বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ভাবনা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দেখা গিয়েছে ও নানাস্থানে বেসরকারীভাবে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসবার সাথে সাথে উত্তেজনা প্রশমিত হ'ল বা আপনার মধ্যে জীবন রসের অভাবে উৎসাহ গুটিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে এ কথাই স্পষ্ট হয়েছে শুধুমাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় সারা ভারতব্যাপী একটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। তবু বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেঁচে আছে ও জাতীয় সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতীয় বিদ্যায়তনগুলি অধিকাংশই টিকে থাকে নি বলেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে একথা মনে করলে ভুল করা হবে। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা বিচার করেই এই আন্দোলনের সার্থকতা নিরূপিত হবে।

রাজনৈতিক নেতারা যখন দেশে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন তখন জাতীয় শিক্ষা বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা খুব পরিষ্কার ছিল বলে মনে হয় না। **জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যখন স্থাপিত হ'ল তখন তার কর্মকর্তারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি দূর করতে চেয়েছেন কিন্তু প্রচলিত শিক্ষার বিরোধিতার কথা তাঁরা বলেন নি। সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত শিক্ষাকেই হয়ত তাঁরা জাতীয় শিক্ষা বলতে চেয়েছেন।** কারণ ১৯০৬ খ্রীঃ কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষা প্রস্তাবে স্বদেশবাসীর কর্তৃত্বাধীনে প্রয়োজনীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার কথাই তাঁরা বলেছেন। দেশের সর্বক্ষেত্রে বিজাতীয় সরকারের প্রভাব মুক্ত হবার যে প্রয়াস শিক্ষাক্ষেত্রকেও সেই প্রভাব থেকে মুক্ত করাই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকারীদের প্রথম লক্ষ্য ছিল। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবার সুযোগ বা সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের জাতীয়

ভাবধারার সাথে পরিচিত করা ও দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করা। ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে অতীত গৌরব সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলাও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। ডন সোসাইটির কার্য কলাপের মধ্যে আমরা দেখেছি ভারতবাসীকে ভারত সম্পর্কে সচেতন ও পরিচিত করবার জন্য ও বিদেশীদের ভারত সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য ভারততত্ত্ব বিষয়ক বহু প্রবন্ধ ডন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে যা কিছু ভারতীয় সেই সম্পর্কেই একটা অবজ্ঞার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে শিক্ষিত সমাজ থেকে এই মনোভাব দূর হয়।

আমরা পূর্ব আলোচনায় দেখেছি জাতীয় আন্দোলনের একটি তরঙ্গ যখনই এসেছে তখনই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে। আবার আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে আসবার সাথে সাথে বিদ্যালয়গুলি টিকিয়ে রাখা একটা সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তাই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল খুব গভীর না হলেও পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটা বড় দাবী ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা।** শিক্ষার বাহন ইংরেজী হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের পথে এক বিরাট অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদ উন্মেষের সাথে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার আন্দোলন ও মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯০১ খ্রীঃ বিচারপতি রাণাডের চেষ্টায় বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধীরে ধীরে অন্য প্রদেশে ও ভারতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার দাবী নীতিগত ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ধীরে ধীরে মাতৃভাষার সাহায্যে মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা চালু হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ভাষাচর্চা নতুন প্রেরণা লাভ করে। জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। **ইংরেজীর স্থানে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষা সম্পর্কে গণচেতনা দেখা দেয়।**

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ নেবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিয়েছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শে হরিদ্বার ও বৃন্দাবনে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দু'টি প্রতিষ্ঠানই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম-মর্যাদাসম্পন্ন।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি দাবী ছিল কারিগরী ও যান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত যাদবপুরে যন্ত্র শিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে যাদবপুরের টেকনিক্যাল স্কুলটিকে কেন্দ্র করে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া আজ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় আন্দোলনের ফলেই সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী প্রবল হয়ে উঠে। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে গণশিক্ষার বিস্তার না হলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত, এ সত্য টি জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করবার পর থেকেই তাঁরা গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য চাপ দিতে থাকেন। ১৯০৩ খ্রীঃ গোখেল বলেন, অশিক্ষিত জাতি কোন দিনই কোন উন্নতি করতে পারে না, জীবন যুদ্ধে তাকে পিছিয়ে পড়তেই হবে। মাতৃভূমির উন্নতির জন্য চাই সার্বজনীন শিক্ষা। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১০ ও ১৯১১ খ্রীঃ দু'টি বিল রাজকীয় পরিষদে উত্থাপন করেন। বিল দু'টি গৃহীত হয় নি কিন্তু সরকার নীতির দিক থেকে বিলের উদ্দেশ্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে জাতীয় আন্দোলন সংহতরূপ লাভ করে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেরই পরিণত রূপ। জাতীয় কংগ্রেস ক্রমাগত দাবী করে এসেছে দেশে সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হোক, কংগ্রেস মন্ত্রী সভাগুলি যখন দেশে সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্নে বিভ্রান্ত সেই সময়ে গান্ধীজি এগিয়ে এলেন তাঁর নিজস্ব শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে তাই আজ বুনিয়াদি শিক্ষা নামে পরিচিত।

সাময়িক লাভের কথা চিন্তা না করে যদি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় তা হলে স্বীকার করতেই হবে দেশের শিক্ষাকে জাতীয় ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত করবার যে প্রচেষ্টা একদিন শিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল তাই আজ বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে।

প্রশ্নাবলী

1. Trace the lines of National Educational Movement in India. [B. T. '64]
2. Briefly trace the growth of National Education Movement in India. [C. U. '71]

নবম অধ্যায়

সার্বজনীন অবৈতনিক বুনিয়াদী শিক্ষা

॥ শিক্ষা ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমস্যা ॥

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) প্রবর্তিত হবার ফলে ১৯৩৭ খ্রীঃ ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার পূর্বে কংগ্রেস ক্রমাগত দাবী করে এসেছে দেশে সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার ফলে এই দাবীকে বাস্তবে রূপ দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হ'ল। কিন্তু সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে সে পরিমাণ অর্থ ছিল না। কংগ্রেসের আর একটি সদিচ্ছা ছিল মদ্যপান নিবারণ করা, মদ্যপান নিরোধ আইন করা হলে আবগারী বিভাগ থেকে প্রাদেশিক সরকার যে রাজস্ব পেত তা বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। মদ্যপান নিরোধ অথবা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন—এ দু'য়ের একটি বেছে নিয়ে অপরটি ত্যাগ করতে হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসনে দেখা দিল বিরাট সমস্যা। আদর্শের দিক থেকে কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না। অথচ বাস্তব অবস্থা বাধ্য করছে একটিকে বাদ দিতে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যখন এই জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না তখন মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন তাঁর নিজস্ব জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনা নিয়ে। ১৯৩৭ খ্রীঃ হরিজন পত্রিকায় তিনি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষাকে অর্থের অভাবে পিছিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই, শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রীক স্বনির্ভর।

॥ সমস্যা সমাধানে গান্ধীজির নতুন শিক্ষাদর্শ ॥

গান্ধীজি বলেন, বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কোনদিক থেকেই দেশের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী নয়। ইংরেজীকে উচ্চ শিক্ষার সর্বস্তরের বাহন করবার ফলে স্বল্প সংখ্যক উচ্চশিক্ষিতের সাথে বিরাট সংখ্যক অশিক্ষিতের চিরদিনের জন্য একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ার একটা অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করবার ফলে উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় মানসিক দিক থেকে নিজের দেশের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। বৃত্তি শিক্ষার অভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় কোন কিছুই উৎপাদনে অক্ষম, আর এতে শারীরিক দিক থেকে তাদের ক্ষতি হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাকে অপব্যয় বলা চলে, কারণ শিশুরা যা শিখল তা কিছুদিন বাদেই ভুলে যায়। আর এ শিক্ষা জীবনে তাদের কোন কাজেই আসে না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের

করভারের প্রধান অংশ যারা বহন করছে তাদের কোন উপকারই হচ্ছে না। তাদের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে কম শিক্ষা পাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সাত বছর কালব্যাপী স্থায়ী করতে হবে। এই স্তরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা ও জীবনের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। **এ শিক্ষায় ইংরেজের কোন স্থান থাকবে না।**

ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য যে সব শিক্ষা দেওয়া হবে তা যতটা সম্ভব কোন একটি লাভজনক বৃত্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। বৃত্তি শিক্ষায় দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন বৃত্তির মধ্য দিয়ে নিজের বেতন দিতে পারবে; সাথে সাথে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে বৃত্তি শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে।

॥ গান্ধী পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ॥

গান্ধীজির পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি থেকে নতুনতরভাবে তিনি শিক্ষা পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এ শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রীক; এ ব্যবস্থায় একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। **শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা, শিক্ষা হবে স্বনির্ভর (Selfsupporting)। শিল্প থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে।** শিক্ষাকে গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে গ্রাম্য জীবনের উপযোগী করে তুলতে হবে।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা (ওয়ার্ধা পরিকল্পনা) ॥

১৯৩৭খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করা হয়। নতুন শিক্ষা পরিকল্পনাকে একটি কার্যকরী রূপ দেবার জন্য সম্মেলনে নিম্ন প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।

(১) এই সম্মেলন মনে করে যে সমগ্র জাতির জন্য সাত বছরব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(২) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(৩) এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা হাতের কাজ শেখান হবে। শিশুর পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেই কোন একটা শিল্পকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা হবে। অন্য সব বিষয় যথাসম্ভব এই কেন্দ্রীয় শিল্পের সাথে যুক্ত করে পড়ান হবে। এই পদ্ধতিতে পড়ানোকে অনুবন্ধ পদ্ধতি বলা হয়।

(৪) সম্মেলন আশা করে যে, ধীরে ধীরে এ শিক্ষা থেকে শিক্ষার ব্যয় উঠে আসবে।

এই প্রস্তাবগুলিকে সামনে রেখে একটি পাঠক্রম রচনা করে মহাত্মা গান্ধীর নিকট পেশ করবার জন্য জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিভিন্ন দিক বিচার করে তাদের

রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে জাকির হোসেন কমিটির পরিকল্পনার প্রস্তাবসমূহ আলোচিত ও গৃহীত হয়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের জন্য ওয়ার্ধার শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য বিত্থামন্দির ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ধার সাথে যুক্ত ছিল বলে এই পরিকল্পনা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্য ১৯৩৯ খ্রীঃ 'হিন্দুস্থান তালিম সজ্ঘ' গঠিত হয়। সজ্ঘের তত্ত্বাবধানে এই নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেবাগ্রামে একটি বিত্থালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন বিত্থালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তালিমি সজ্ঘের সম্পাদক শ্রীআর্য্য নায়কম ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী আশাদেবী। এই শিক্ষা সম্পকে ওয়ার্ধায় তিন সপ্তাহব্যাপী শিক্ষাবিদ্‌দের এক আলোচনা বৈঠক হয়। এই বৈঠক শেষ হবার পর বিভিন্ন প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ শুরু হয়।

বুনিয়াদী নাম হ'ল কেন?—

জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা পেশ করেন, তার শুরুতে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। কমিটি বলেন, এই শিক্ষাকে বুনিয়াদী (*Basic*) বলা হয়েছে, কারণ এই শিক্ষাই হবে ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ভিত্তিভূমি, যার বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠবে পূর্ণ বিকশিত সার্থক জীবনের সফলতার ইমারত। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা, "কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ"। দেশের মাটি আর দেশের জীবনধারার সঙ্গে যে প্রাণের যোগসূত্র গড়ে উঠবে তাই হবে তার ভাবী জীবনের মূলধন আর জাতির অমূল্য সম্পদ।

বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শনের গোড়ার কথা জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। গান্ধীজির পরিকল্পিত এই শিক্ষা সংগঠন একদিন শ্রেণীহীন, শোষণহীন, সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে সেই আশা ও আশ্বাসের কথাই রয়েছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মর্মমূলে। গান্ধীজি তাই বলেছেন—*My plan···is thus conceived as the spear head of a social revolution. It will provide a healthy and normal basis of relationship between the city and the village, and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatural division between haves and have nots."*

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে জাকির হোসেন কমিটি বলেছেন; *"The scheme envisages the idea of co-operative community, in which the motives of social service will dominate all the activities of children"*

গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে, এই শিক্ষা হবে স্বাবলম্বী। গান্ধীজি বলেছেন, *"I have therefore made bold, even at the risk of losing a reputation for constructive ability, to suggest that education should be self supporting."*

গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের লুপ্ত গ্রাম্য গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে হলে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধে গান্ধীজি বলেছেন, "*The scheme is a revolution in the education of the village children.*"

জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য :—

(১) শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রীক, একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় পড়ানো হবে।

(২) শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে স্বনির্ভর। ছাত্রদের অর্থনীতিক স্বাধীনতার ভিত্তি এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই গড়ে তোলা হবে।

(৩) দৈহিক শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে যাতে শিক্ষাশেষে ছাত্ররা নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জন করতে পারে।

(৪) শিশুর শিক্ষার সাথে তার গ্রাম্য পরিবেশ, গ্রামের শিল্প ও তার ভবিষ্যৎ বৃত্তির একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে।

(৫) সাত বছর থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

(৬) শিক্ষা দেওয়া হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে।

(৭) বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম :—

(ক) মূল শিল্প সুতাকাটা, বয়ন, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, কৃষি বা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে কোন একটি শিল্প।

(খ) মাতৃভাষা।

(গ) গণিত।

(ঘ) সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, গ্রাম্য অর্থনীতি ইত্যাদি।

(ঙ) সাধারণ বিজ্ঞান—প্রকৃতি পাঠ, জীববিদ্যা, শরীর বিদ্যা, স্বাস্থ্য।

(চ) সঙ্গীত।

(ছ) চারু-শিল্প।

(জ) হিন্দুস্থানী ভাষা।

বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দুস্থানীকে সর্ব ভারতীয় জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়।

রিপোর্টে বহিঃপরীক্ষা বর্জনের সুপারিশ করা হয়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সহ শিক্ষার ব্যবস্থাকে কমিটি সমর্থন করেন।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা প্রস্তাবের সমালোচনা ॥

এই রিপোর্ট বের হবার সাথে সাথে রিপোর্টের কয়েকটি সুপারিশের তীব্র সমালোচনা হয়। সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয় শিক্ষাকে স্বনির্ভর (*self-supporting*) করবার প্রস্তাব সম্পর্কে। একে অনেকেই অবাস্তব বলে বর্ণনা করেছেন। শিল্পের উৎপাদন থেকে স্কুলের ব্যয় বা শিক্ষকের বেতন সংগ্রহ করতে হলে স্কুলকে কারখানায়

পরিণত করতে হবে। সাধারণ শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিই হয়ে উঠবে বিদ্যালয়গুলির একমাত্র লক্ষ্য। একটি শিল্পের ভিত্তিতে সব বিষয় শেখানো সম্ভবপর নয়। *Project method*-এ দেখা গিয়েছে একটি পরিকল্পনা শেষ করে অন্য আর একটি পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে একটা ফাঁক (*gap*) থেকে যায়। তারপর সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় শিল্পকে কেন্দ্র করে শেখানো যায় না।

শিল্পের জন্য অত্যন্ত বেশী সময় নির্ধারিত হয়। দিনে স্কুলের কাজের সময় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট শিল্প শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে বলা হয়। এর ফলে মাত্র দু'ঘণ্টায় অন্যান্য বিষয়গুলি ভালভাবে পড়ানোর কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনাকালে শুধুমাত্র পল্লী অঞ্চলের কথাই চিন্তা করা হয়েছে। শহরের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্প নির্ধারণের কথা বলা হয় নি।

বুনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হলে যে ধরনের শিক্ষকের প্রয়োজন সেই ধরনের শিক্ষক পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। ফলে শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা-পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

সাত বছর ব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজীকে সম্পূর্ণ বর্জন করার প্রস্তাব বুদ্ধির পরিচায়ক নয় বলে কেহ কেহ মন্তব্য করেন। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের ইংরেজীকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কোন শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হলে তা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তোলাও সম্ভব ছিল না। শিক্ষার্থীর ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজীকে বাদ দিয়ে পরে শেখানোর চেষ্টা সহজ সাধ্য নয়।

Project Method-এর সাথে তুলনা :—

বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির সাথে প্রোজেক্ট পদ্ধতির তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যায় উভয় পদ্ধতিই কর্মকেন্দ্রীক কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতিকে বলা যেতে পারে কর্মকেন্দ্রীক আর বুনিয়াদী পদ্ধতি হ'ল শিল্প কেন্দ্রীক (*not activity centred, but craft centred.*)

প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও ইচ্ছানুসারে কাজটি ঠিক করে নেয় বুনিয়াদী পদ্ধতিতে মূল শিল্পটি পূর্ব নির্দিষ্ট। বুনিয়াদী শিক্ষায় জ্ঞানের সাথে সমাজ গঠনের শিক্ষাও দেওয়া হয়—সামাজিক বোধ সৃষ্টি করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য এখানেই বুনিয়াদী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

॥ খের কমিটি গঠন ॥

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটি সম্পর্কে পরিকল্পনা রচয়িতারা সচেতন ছিলেন তাই এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি (*C.A.B.E.*) পরিকল্পনার মূলনীতি প্রায় পুরোপুরি সমর্থন করেন। জাকির হোসেন কমিটি ও উড-এবট কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি বোম্বে প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী শ্রী বি. জি. খেরের সভাপতিত্বে দু'টি

কমিটি গঠন করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ সহ কমিটি যথাক্রমে ১৯৩৮ খ্রীঃ ও ১৯৪০ খ্রীঃ দু'টি রিপোর্ট পেশ করেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি :—

জাকির হোসেন পরিকল্পনা চালু করবার জন্য কংগ্রেস থেকে নির্দেশ দেওয়া হলে বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বে ও যুক্ত প্রদেশে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের পর কোন কোন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সরকারীভাবে পরিত্যাগ করা হলে কংগ্রেস কর্মীগণ এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যেতে থাকেন। সৌভাগ্য বশতঃ বিহার সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সবরকম সুযোগ দিয়েছিলেন। সেখানে বুনিয়াদী শিক্ষার সাফল্য সরকারী রিপোর্টে পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা সাধারণ বিদ্যালয়ের সমান তো শেখেই বরং বেশী শেখে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের প্রশ্নটি বিতর্কের প্রশ্ন। মধ্য প্রদেশে এ সমস্যা সমাধানের জন্য 'বিদ্যামন্দির' বা 'বয়েত-ই-ইলম' পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। যে গ্রামে ৪০ জন স্কুলে যাবার বয়সী ছেলেমেয়ে রয়েছে সেখানেই একটি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। বার্ষিক ২০০ টাকা আয় হতে পারে এমন জমি বিদ্যামন্দিরের সাথে যুক্ত থাকবে। জমির আয় থেকে শিক্ষকের বেতন ও অন্য খরচ চালানো হবে। একশ' বছর আগে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য এডাম যে প্রস্তাব করেছিলেন বিদ্যামন্দির পরিকল্পনায় সে প্রস্তাবের বাস্তব রূপটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে গিয়ে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৩৯ খ্রীঃ পুনায় ও ১৯৪১ খ্রীঃ দিল্লীর জামিয়া নগরে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পকে শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছিল, পুনা সম্মেলনে শিক্ষার সাথে সমগ্র সমাজ জীবনের যোগাযোগের কথা আলোচিত হয়। শিক্ষার ভিত্তিরূপে শিল্পের সাথে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেও গ্রহণ করা হয়।

॥ খের কমিটির রিপোর্ট ॥

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (*C.A.B.E.*) উড-এবট রিপোর্ট ও জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করবার জন্য দুটি কমিটি গঠন করেন। বোম্বে প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি জি. খের কমিটি দু'টির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৮ খ্রীঃ কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়:—

১। বুনিয়াদী পরিকল্পনা প্রথমে পল্লী অঞ্চলে কার্যকরী করা হবে।

২। বুনিয়াদী শিক্ষার বাধ্যতামূলক বয়স ছয় থেকে চৌদ্দ হলেও পাঁচ বছরের শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়।

STATE INSTITUTE OF EDUCATION Govt. of West Bengal.

৩ বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে অন্য কোনরূপ শিক্ষার জন্য পঞ্চম শ্রেণীর পর অর্থাৎ এগার বছর ও তার পরবর্তী বয়স থেকে যাওয়া যাবে।

৪। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। নিম্নশ্রেণীর কাজ হবে বৈচিত্র্য বহুল। শিক্ষার্থী যতই উপরের দিকে উঠবে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ততই উন্নততর হবে। উৎপন্ন শিল্প দ্রব্য বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা স্কুলের ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচ করা হবে। শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন।

৫। বুনিয়াদী শিক্ষায় কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। শিক্ষা শেষে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে স্কুল ত্যাগের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

৬। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ সঙ্গে করে কোন ছাত্র যদি অন্যরূপ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাকে বদলীর সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

৭। মূল শিল্পের সাথে অনুবন্ধ (*correlation*) প্রণালীতে যে সব বিষয় শেখান সম্ভব নয় তা ভিন্নভাবে শেখান হবে।

৮। উপযুক্ত ব্যক্তিদের ও মেয়েদের শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হবে। উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া গেলেই বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৯। শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা শিক্ষকদের শিক্ষার মানের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। কোন শিক্ষকেরই বেতন কুড়ি টাকার কম হবে না।

১৯৪০ খ্রীঃ খের কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্টে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়:

বুনিয়াদী শিক্ষা আট বছর কাল স্থায়ী হবে। ছয় বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষাকালকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথমভাগে পাঁচবছর কাল স্থায়ী নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা (*Junior Basic*), পরের তিন বছর হবে উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা (*Senior Basic*)।

নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে ছাত্ররা যে কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবে। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে আরও পাঁচ বছর ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হবে। এই পর্যায়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজন রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থী এর পর কোন উচ্চতর বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। মেয়েদের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পাঠক্রমে স্থান দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাকে মেয়েদের উপযোগী করে তুলতে হবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই গ্রহণ করেন। সমিতির যুদ্ধোত্তরকালীন শিক্ষা পরিকল্পনা বা সার্জেণ্ট রিপোর্টে খের কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই গৃহীত হয়।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষার স্তর বিভাগ ॥

১৯৪৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষার্থীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কিছু সংস্কার সাধন করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা ছিল সাত থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়ের জন্য। তার কম বয়সী বা বেশী

বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয় নি। গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় এই ত্রুটি দূর করবার জন্য "নয়াতালিম" পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষা হবে "মানুষের জীবনের সর্ব স্তরের শিক্ষা"। নয়াতালিম বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ মাত্র। এতে চারটি স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

১। প্রাক-বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা।

২। বুনিয়াদী শিক্ষা :—৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

৩। উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা :—১৫ বছরের উর্দ্ধ বয়স্কদের শিক্ষা।

৪। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা।

প্রতিস্তরেই কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্ বুনিয়াদী স্তরে খেলাকে কাজের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, শিশুর কাছে খেলা আর কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হিন্দুস্থানী তালিম সঙ্ঘ বিভিন্ন স্তরের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করেন। সেবাগ্রাম সম্মেলনের সভাপতি শ্রীমশরুওয়ালা মন্তব্য করেন, এই নয়া তালিমের মধ্য দিয়েই সমাজ বিপ্লব সাধিত হবে।

১৯৪৬ খ্রীঃ বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর নতুন উদ্দীপনার সাথে বুনিয়াদী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু হয়। দেশীয় রাজ্যে বিশেষ করে কাশ্মীরে বুনিয়াদী শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করে। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের পরীক্ষামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধোত্তর শিক্ষার জন্য সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাদের শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকালে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। [বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যা ও প্রসার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা চতুর্থ পর্বে প্রথম অধ্যায় দেখুন।]

প্রশ্নাবলী

1. Trace briefly the growth and development of Basic Education in India [B. T. 1963]
2. Discuss the problems of Indian education and state how it is being tackled through Basic Education. [B. T. 1966]
3. The Basic Education scheme is considered as the most important national educational experiment through out India, Discuss its merits and show how it can be linked up with on improved type of education recommended by the Mudaliar Commission. [B.T. 1955]
4. Explain the main characteristics of the scheme of national education put forward by Gandhiji in 1937. In what respect was this scheme modified afterwards. [C.U. 70]

দশম অধ্যায়

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কয়েকটি সংস্কার প্রচেষ্টা
মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ও শিক্ষা

॥ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত বৃটিশ সরকারকে সর্বভাবে সাহায্য করেছিল, এই সাহায্যের বিনিময়ে বৃটিশ সরকার ভারতে দায়িত্বশীল স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। যুদ্ধের অবস্থা ইংরেজদের অনুকূলে আসবার পর থেকে ভারত সরকার জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য কঠোরতর মনোভাব অবলম্বন করে। ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ শান্ত করবার জন্য ভারত সচিব মণ্টেগু ভারতে আসেন। তিনি ভারতের বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডের সাথে একযোগে এক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত শাসন সংস্কার আইন পাস হয়। এই আইনের বলে ভারতে এক শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়। এই সংস্কার মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই আইন অনুসারে বড়লাটের শাসন পরিষদে তিনজন ভারতীয় সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং সমগ্র ভারতের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে দুই পরিষদ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইন সভার সৃষ্টি হয়।

প্রাদেশিক ব্যাপারে এই সংস্কারে যে অভিনব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল তা দ্বৈত শাসন বা ডায়ার্কী (*dyarchy*) নামে খ্যাত। এই আইনের বলে প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন বিষয়গুলি দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগের নাম হ'ল সংরক্ষিত বিভাগ (*Reserved*) অপর ভাগের নাম হ'ল হস্তান্তরিত (*Transfered*) বিভাগ। শিক্ষা হ'ল এই হস্তান্তরিত বিভাগের অঙ্গীভূত। সংরক্ষিত বিভাগগুলি রইল গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্যদের অধীনে, আর হস্তান্তরিত বিভাগগুলির পরিচালনার ভার দেওয়া হ'ল দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের হাতে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মধ্য হতে গভর্ণর মন্ত্রী নিযুক্ত করতেন। মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্য দায়ী রইলেন ব্যবস্থাপক সভার নিকট।

এই শাসন সংস্কারের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এই সংস্কারের যে প্রতিক্রিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল আমরা সেটুকু আলোচনা করব। শিক্ষাবিভাগের হস্তান্তর বিনা বাধায় সম্পাদিত হয় নি। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইউরোপীয় সম্প্রদায় প্রথমেই আপত্তি তুলল ভারতীয়দের হাতে তাদের শিক্ষা ব্যাহত হবে, প্রাদেশিক সরকারগুলি এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। সংযুক্ত প্রদেশ (ইউ. পি) বাদে কোন প্রাদেশিক সরকারই শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরিত করবার পক্ষপাতী ছিল না। ভারতশাসন

আইনে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়দের শিক্ষা ও কোন কোন অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা (যেমন বাংলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দার্জিলিং) প্রাদেশিক কিন্তু সংরক্ষিত রেখে বাদ বাকী শিক্ষা ব্যবস্থা হস্তান্তরিত বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বেনারস আলিগড় এই জাতীয় সর্ব ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, দেশীয় রাজন্যবর্গের সন্তানদের নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন অঞ্চলের শিক্ষা নিজের ব্যবস্থাধীনে রাখে। এর ফলে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা সংরক্ষিত, কিছুটা হস্তান্তরিত ; আবার কিছুটা কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হয়ে এক প্রশাসনিক বিভ্রাটের সৃষ্টি করে।

॥ দ্বৈতশাসনের শিক্ষা সমস্যা ॥

নির্বাচিত মন্ত্রীগণ শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেই প্রথমে যে বাধার সম্মুখীন হ'ল তা হচ্ছে অর্থনৈতিক বাধা। অর্থ ছিল সংরক্ষিত বিভাগের অন্তর্গত। শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য মন্ত্রীদের ধর্ণা দিতে হ'ত অর্থ বিভাগের দরজায়। প্রয়োজনীয় অর্থ কোন সময় এখান থেকে সহজলভ্য ছিল না। ফলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা দূরের কথা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাই সময় সময় কষ্টকর হয়ে উঠত।

অর্থের অভাব ও প্রশাসনিক জটিলতা :—

শিক্ষাবিভাগ পরিচালনায় মন্ত্রীদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষাবিভাগের প্রধান প্রধান পদে *I. E. S.* অফিসারেরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরা কালো চামড়ার মন্ত্রীদের মোটে আমলই দিতে চাইতেন না। শিক্ষা সংক্রান্ত সাধারণ নীতি নির্ধারণ করতেন মন্ত্রীরা, আর এই নীতিকে কাজে রূপ দেবার ভার ছিল শিক্ষা বিভাগের হাতে। এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় না হলে শাসন বিভ্রাট হতে বাধ্য। আর কার্যক্ষেত্রে হয়েছিলও তাই। শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মীদের অসহযোগিতা ও বিরূপ মনোভাবের ফলে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা দূর করবার জন্য লী কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২৪ খ্রীঃ থেকে শিক্ষা বিভাগের জন্য *I. E. S.* কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত শিক্ষাবিভাগে পূর্বতন *I. E S.* অফিসারেরা ছিলেন ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রীরা এদের উপর বিশেষ কর্তৃত্ব করতে পারেন নি। ফলে এই সমস্যা আর এক নতুন দ্বৈত শাসন রূপে শিক্ষা পরিচালনাকে জটিলতর করে তোলে।

কেন্দ্রের উদাসীনতা :—

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রাদেশিক বিষয়রূপে স্থির হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিক্ষা সম্পর্কীয় দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে শিক্ষার জন্য যে অর্থ পাওয়া যেত তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষা প্রসারের পথে অর্থের অভাব বড় অন্তরায় হয়ে দেখা দিল। দেশের শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদাসীনতাকে 'হার্টগ কমিটি' অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বলে বর্ণনা করেন—

হার্টগ কমিটি সুপারিশ করেন যে অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, এবং সর্বভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সাহায্য করা উচিত।

বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষা প্রচেষ্টায় একটা সমন্বয় সাধনের জন্য ১৯২১ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি (*Central Advisory Board of Education*) স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক শিক্ষা সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। সত্যিকারের প্রয়োজনীয় এই প্রতিষ্ঠানকে দু'বছর বাদেই হঠাৎ ব্যয় সংকোচের অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রাদেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হতে থাকে। সর্বভারতীয় শিক্ষা সমস্যাগুলি সমাধানের সম্ভাবনা এর পর আর রইল না। ভারত সরকার এখানেই ক্ষান্ত হন নি, শিক্ষা বিভাগকে রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের সাথে জুড়ে দেওয়ায় এই বিভাগের পূর্বগুরুত্ব আর রইল না। এরপর ব্যুরো অব এডুকেশন (*Bureau of Education*) বন্ধ করে দিয়ে চরম উদাসীনতার পরিচয় দেওয়া হয়। হার্টগ কমিটির পরামর্শে ১৯৩৫ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (*C. A. B. E.*) কে পুনর্গঠন করা হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ ব্যুরো অব এডুকেশনকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

শিক্ষা প্রসারের অন্তরায় :—

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা সমূহ গঠিত হবার পর নতুন উদ্যমে শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হয়। আলোচ্য যুগে উদ্যমের অভাব না থাকলেও প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার কার্যে নানা বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হয় যার ফলে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নি। দেশব্যাপী মহামারী, অর্থনৈতিক সংকট, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, সব কিছুই শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

ব্যয় সংকোচের অজুহাতে সরকার শিক্ষার জন্য পূর্বের তুলনায় আনুপাতিক হারে কম অর্থ ব্যয় করতে শুরু করে। ১৯২২ খ্রীঃ শিক্ষার জন্য মোট যে ব্যয় হয় সরকার সেই ব্যয়ের ৪০·৬০% বহন করে; কিন্তু ১৯৩৭ খ্রীঃ এই মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে গিয়ে হয় ৩১%। সরকারী ব্যয় সংকোচ সত্ত্বেও শিক্ষার যেটুকু প্রসার এই যুগে হয়েছে তার ব্যয়ভার এদেশের দরিদ্রসাধারণ স্বেচ্ছায় বহন করেছে। দেশের লোক শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ব থেকে বেশী সচেতন হওয়ায় সরকারী সাহায্য ব্যতীতই বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলোচ্য যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি গঠনে শিক্ষার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পেরেই নবজাগ্রত শিক্ষিত সমাজ জনশিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টাকে একটি মহান জাতীয় কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিল। এই সময়কার জাতীয় মনোভাব তৎকালীন শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।—*A burst of enthusiaism swept children into school with unparalleled rapidity and almost child-like faith in the value of education was implanted in the minds of people, parents, were*

prepare to make almost any sacrifice for the education of their children, the seed of tolerance towards the less fortunate in life was begotten, ambitious and comprehensive programmes of development were formulated, which were calculated, to fulfil the dreams of literate India, (Review of progress of Education in India 1927-32 vi p. 3).

॥ হার্টগ কমিটির রিপোর্ট ॥

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার বিধিবদ্ধ হবার সময় স্থির হয়েছিল এই সংস্কার কতটা সফল হ'ল তা তদন্তের দশ বছর বাদে একটি রয়েল কমিশন বসবে। কিন্তু দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিক্ষোভের ফলে ১৯২৭ খ্রীঃ স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির সম্পর্কে তদন্তের জন্য এক কমিশন নিয়োগ করা হয়। ভারতে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও এ সময়ে দেশে এক বিরাট অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। বৃটিশ ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবার জন্য সাইমন কমিশন ১৯২৮ খ্রীঃ স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে এক উপসমিতি নিয়োগ করেন। এই উপসমিতি (*Auxilary Committee of the Indian Statutory Commission*) ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তদন্ত করে ১৯২৯ খ্রীঃ এক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে হার্টগ রিপোর্ট নামে পরিচিত।

হার্টগ কমিটির রিপোর্টে ১৯১৭ খ্রীঃ হতে ১৯২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত গণশিক্ষা ব্যতীত শিক্ষার সবদিকে দ্রুত প্রসারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এ সময়ে সমাজের প্রতি স্তরেই শিক্ষা সম্পর্কে একটা অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে দেওয়ায় জনসাধারণের দাবী মেটাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের চেষ্টা এ সময়ে শুরু হয়েছিল। শিক্ষা শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণী বা বিত্তবানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অনুন্নত সম্প্রদায় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নারী সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা দেখা দেওয়ার ফলে অতীতের সামাজিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায় ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কে নারী সমাজ আগ্রহশীল হয়ে ওঠে।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে শোচনীয় সরকারী ব্যর্থতা :—

শিক্ষা সম্পর্কে দেশব্যাপী এই ব্যাপক আগ্রহ সত্ত্বেও কমিটি গণশিক্ষার অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যে হারে বেড়েছিল গণশিক্ষার প্রসার সে হারে হয় নি। উচ্চশিক্ষার বিস্তারে অতীতে যতটা

উৎসাহ দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকার থেকে সে পরিমাণ উদাসীনতাই দেখান হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পথে যে সব অন্তরায় রয়েছে সে সম্পর্কে কমিটি বলেন, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা প্রধানতঃ গ্রামীণ ভারতের সমস্যা। এদেশে শতকরা ৮৭ জন লোক গ্রামে বাস করে তার মধ্যে ৭৪ জন লোকই কৃষিজীবী, গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারাই এই বিরাট দেশের নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব। কিন্তু পথ ঘাটের অভাব, যাতায়াতের অসুবিধা প্রভৃতির জন্য জনবসতি বিরল অঞ্চলে এক জায়গায় ছাত্র যোগাড় করে স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য, এছাড়া অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অজ্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার ও গোড়ামি, জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রভৃতি গণশিক্ষা বিস্তারের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। প্রাদেশিক সরকারের ত্রুটিপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাও গণশিক্ষা প্রসারের পথে অন্যতম বাধা।

কমিটি বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষায় নিরক্ষরতা দূর হয় না সে শিক্ষা শ্রম ও অর্থের অপচয় মাত্র। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শোচনীয় অর্থ ও শ্রমের অপচয় এঁরা লক্ষ্য করেছিলেন। একজন শিক্ষার্থী যদি চার বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করে তাহলে শিক্ষার্থীকে সাক্ষর প্রাপ্ত (*literate*) বলে স্বীকার করা যায় না। গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই চার বছর স্কুলে পড়ত। মেয়েদের ক্ষেত্রে এ অপচয় আরও শোচনীয়। তাই কমিটি মন্তব্য করেছেন—"*Throughout the whole educational system there is waste and ineffectiveness. In the primary system which from our point of view should be designed to produce literacy and capacity to exercise an intelligent Vote, the waste is appling. So far we can judge the vast increase in the numbers in primary schools produce no commensurate increase in literacy, for only a small portion of those who are at primary stage reach class IV, in which the attainment of literacy may be expected. The wastage in the case of girls is even more serious than in case of boys.*"

(*Hartog Report*)

কমিটির তদন্তে জানা যায় বৃটিশ ভারতে ১৯২২-২৩ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীর মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯২৫-২৬ খ্রীঃ মোট শতকরা মাত্র ১৯ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে ছাত্রসংখ্যা এমনি করে কমে যাওয়ার দুটি কারণ কমিটি নির্দেশ করেছেন।

(১) অনুন্নয়ন (*Stagnation*) পরীক্ষায়-ফেল করবার জন্য একই শ্রেণীতে একাধিক বছর থেকে যাওয়া।

(২) অপচয় (*Wastage*) সাক্ষরতা লাভ করবার পূর্বেই শিক্ষার্থীকে স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়া।

এই দেশে অনুন্নয়নের জন্য প্রতি বছর ৩০% থেকে ৫০% শিশু একই শ্রেণীতে থেকে যায়। যার ফলে সময়, শ্রম ও অর্থের বিপুল অপচয় ঘটে।

চতুর্থ শ্রেণীতে উঠবার আগেই স্কুল ছেড়ে যাওয়ায় সাক্ষরতা লাভ করতে পারে না বা যেটুকু শিক্ষা পেয়েছিল তাও চর্চার অভাবে ভুলে গিয়ে আবার নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, কমিটি একে বলেছেন—*Relapse into illiteracy*. কমিটির মতে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থার অভাবের ফলে সামান্য শিক্ষিতেরা নিরক্ষরতায় প্রত্যাবর্তন করে।

প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটি ঃ—

শিক্ষা প্রসারের অসুবিধার কথা উল্লেখ করে কমিটি বলেছেন ৫০০ অথবা এর চেয়ে কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে স্কুল স্থাপন করলে তা অর্থনৈতিক কারণে সফল হতে পারে না। ছাত্রের অভাবে বিদ্যালয় অচল হয়ে যায়।

জনাকীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যালয়গুলিতে অধিক সংখ্যক ছাত্র ভিড় করায় স্থান সংকুলান হয় না। ফলে ইচ্ছা থাকলেও ছেলেরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

স্কুলের সদ্ব্যবহারের অভাব, অর্থাৎ কোন কোন অঞ্চলে স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়ে রয়েছে, স্কুলও রয়েছে কিন্তু সেখানকার ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় না। এতেও অর্থের অপচয় হয়।

সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক স্কুলের দাবী ও ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুলের দাবীকেও অপচয়ের কারণ বলে ধরা যায়।

শিক্ষক বিদ্যালয়ে নিম্নমানের শিক্ষা, ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, ও পরিদর্শনের অভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ৪৪% ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে বাংলার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র ২৫% শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। শিক্ষকদের অতি সামান্য বেতন ও বিদ্যালয়ে পরিচালনা ব্যবস্থার দোষ ত্রুটির জন্য অনেক সময় বিদ্যালয়গুলি টিকে থাকত না। পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকলেও এক একজন পরিদর্শককে এত বেশী স্কুল পরিদর্শন করতে হ'ত যার ফলে দুর্গম অঞ্চলে ২।৩ বছরের মধ্যে একবারও পরিদর্শন হ'ত না।

পাঠক্রমের সাথে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তার কোন সম্পর্ক না থাকায় বহু অভিভাবক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য কোনরূপ উৎসাহ বোধ করতেন না।

শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে জীবনে যে কোন ক্ষতি হতে পারে একথা বিশ্বাস করবার কোন কারণ অভিভাবকগণ খুঁজে পেতেন না।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। এ ছাড়া স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথ রূপে পালন না করায় শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সুপারিশ ঃ—

প্রাথমিক শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা দূর করবার জন্য কমিটি বলেন, স্কুলগুলির পুনর্বণ্টন করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় স্কুলগুলি তুলে দিয়ে প্রয়োজনীয় অঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। উন্নত সংগঠন করে স্কুলগুলির মান উন্নত করতে হবে।

শিক্ষকদের শিক্ষার মানের উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা (*refresher course*) করতে হবে। বেতন বৃদ্ধি ও চাকরীর অবস্থার উন্নতি করে উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা গ্রহণে আকৃষ্ট করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার কাল কমপক্ষে চার বছর ধার্য করতে হবে। স্থানীয় অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে স্কুল বসবার সময় নির্ধারণ ও ছুটির দিনগুলি ধার্য করতে হবে। নীচের ক্লাসগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে সেখানে অনুন্নয়ন (*stagnation*) ও অপচয়ের (*wastage*) ফলে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস না পায়।

স্কুল পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করেই পল্লী উন্নয়নের কাজ শুরু করতে হবে। উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হবার আগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা চলবে না। ধীরে ধীরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এক একটি অঞ্চল ধরে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করলেও কতকগুলি ত্রুটির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেও সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবেশিকা পরীক্ষাদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান অসাফল্যকে বিরাট অপচয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নীচু শ্রেণীতে প্রমোশন দেবার ব্যাপারে অতিরিক্ত উদারতা এই অপচয়ের অন্যতম কারণ বলে নির্দেশ করা হয়। অযোগ্য ছাত্রকে পরীক্ষার ফলাফল বিচার না করে ক্লাসে উঠিয়ে দেবার ফলে বহু অবাঞ্ছিত ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য ভীড় করছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার এই দুর্বলতাকে দূর করবার জন্য কমিটি সুপারিশ করে যে (১) মধ্য ভার্নাকুলার স্কুলে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে, এবং অধিক সংখ্যক ছাত্রকে মাধ্যমিক স্তর পার হবার পর শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষায় উৎসাহিত করতে হবে। (২) উচ্চ বিদ্যালয়ে বহু বিকল্প শাখার ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) নিম্নস্তরের শ্রেণী উন্নয়নের ব্যবস্থায় কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।

॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য কমিটি বলেন, ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের শিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানো শুধুমাত্র ঐকিক (*unitary*) বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নীচু হওয়া সম্পর্কে বলা হয়, প্রতি বছর বহু অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত ছাত্র এসে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভীড় করায় উচ্চ শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। কমিটি বলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় কঠোরতা অবলম্বন করে অযোগ্য ছেলেদের কলেজে প্রবেশের পথ বন্ধ করতে হবে। কলেজের গ্রন্থাগারের উন্নতি

করতে হবে। গবেষণার উন্নততর ব্যবস্থা করতে হবে। টিউটরিয়াল ক্লাস সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

স্ত্রীশিক্ষা :—

কমিটি প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের সংখ্যানুপাতের বিরাট পার্থক্য তুলে ধরে স্ত্রীশিক্ষার শোচনীয় অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নারী শিক্ষায় অপচয় সম্পর্কে বলা হয়, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন ও অপচয়ের অবস্থা আরও শোচনীয়, এছাড়া বহু গ্রামে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। শহরে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং শিক্ষিকার অভাবে মেয়েদের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। কমিটি মেয়েদের পরবর্তী জীবনে কাজে লাগতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রম রচনার পরামর্শ দেন। উপযুক্ত বেতনে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিকা পরিদর্শিকা নিয়োগের সুপারিশও করা হয়। ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার কথা কমিটি বিবেচনা করে দেখতে বলেন। প্রতি প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য একজন করে ডেপুটি ডাইরেক্টর নিয়োগ করবার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কমিটি মন্তব্য করেন যে কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর আকস্মিক হয়েছে। দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ রাখবার উপর কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিটির মতে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। শিক্ষা বিভাগের কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষা কমিশনারের হাত থেকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের শিক্ষার দায়িত্ব তুলে নিতে হবে। সর্বভারতীয় শিক্ষা সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শিক্ষা অধিকর্তা (*D. P. I.*) ও শিক্ষা বিভাগের সচিবদের নিয়মিত সম্মেলনের ব্যবস্থা করবেন।

ফলশ্রুতি :—

হার্টগ কমিটির রিপোর্টে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কমিটির রিপোর্টের কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী অর্থ সংকট ও ভারতে নতুন করে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হবার ফলে কমিটির বহু সুপারিশই কার্যকরী করা হয় নি। কমিটি মন্তব্য করেছিল শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে শিক্ষার মান নেমে গিয়েছে ও অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগসমূহ শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে শিক্ষাকে সংগঠনের নামে শিক্ষা সংকোচনে ব্রতী হ'ল। সরকারী শিক্ষা সংস্কার নীতিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয় ও জনসাধারণ সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। দেশের জনমত প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের স্বপক্ষে থাকায় ১৯৩৭ খ্রীঃ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সরকারের সাথে জনমতের বিরোধ চলতে থাকে। শিক্ষা বিভাগে আই, ই, এস, (*I. E. S.*) কর্তা

ব্যক্তিরা শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রশ্নে শিক্ষা সংকোচনে যে পরিমাণ উৎসাহী ছিল হার্টগ কমিটির কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় সুপারিশ কার্যকরী করতে সেরূপ উৎসাহ দেখানো প্রয়োজন বোধ করে নি। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরিদর্শকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বাস্তবধর্মী পাঠক্রমের প্রবর্তন, বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি অতি মূল্যবান সুপারিশসমূহ কার্যকরী করবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে শিক্ষা বিভাগ মনে করে নি।

॥ উড-এবট রিপোর্ট ঃ Wood-Abbot Report ॥

দেশের তৎকালীন শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন স্বীকৃত হওয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (*C. A. B. E.*) শিক্ষা সংস্কারের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের অভিমত সংগ্রহের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার ইংলণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশনের কারিগরী বিদ্যালয়সমূহের প্রধান পরিদর্শক মিঃ এবট এবং ডিরেক্টর অব ইন্‌টেলিজেন্‌স মিঃ এস. এইচ. উডকে ভারতে বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তাঁরা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ১৯৩৭ খ্রীঃ তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সাধারণ শিক্ষা ও পরিচালন ব্যবস্থা, এই অংশের রিপোর্ট তৈরী করেন মিঃ উড। দ্বিতীয় ভাগে আছে বৃত্তিশিক্ষা ব্যবস্থা, এই অংশের রিপোর্ট তৈরী করেন মিঃ এবট।

সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কীয় রিপোর্ট ঃ—

(১) বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণীর শিক্ষার ভার যতদূর সম্ভব বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এজন্য স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করতে হবে।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষা তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রবণতার উপর নির্ভরশীল হবে। শিক্ষার জন্য বইয়ের উপর নির্ভরশীল না হয়ে শিশুদের উপযোগিতা ভিত্তিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচলিত সংকীর্ণ পাঠক্রম-ভিত্তিক শিক্ষা শিশুদের মানসিক গঠনের অন্তরায়।

(৩) গ্রাম্য মধ্যশিক্ষার পাঠক্রম গ্রাম্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হবে। ইংরেজী এই স্তরে শেখান হলেও দেখতে হবে ভাষার ভারে যেন শিক্ষার্থী পিষ্ট না হয়।

(৪) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন, কিন্তু এই স্তরে ইংরেজী বাধ্যতামূলক হবে। সাধারণ ছাত্রদের যতদূর সম্ভব ব্যবহারিকভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হবে। উপযুক্ত ও আগ্রহশীল ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্য অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী সাহিত্যের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সংগ্রহ করতে হবে।

(৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে সাথে সাথে তিন বছরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(৬) শিক্ষক-শিক্ষণ দুটি স্তরে বিভক্ত থাকবে। শিক্ষকতা গ্রহণের পূর্বে নর্মাল স্কুল বা ট্রেনিংস্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কিছুদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর স্বল্পকাল ট্রেনিং নিতে হবে এজন্য রিফ্রেসার ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কীয় সুপারিশ :—

বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কে ভূমিকায় বলা হয় বৃত্তি শিক্ষা দিয়েই শুধু দেশের বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন শিল্পের প্রসার। বৃত্তি শিক্ষায় উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি হবে, তাদের কর্মে নিয়োগের প্রশ্ন শিল্পের প্রসারের সাথে জড়িত। বৃত্তি শিক্ষাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কারণ এ শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার মতই সুরুচি সম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক সৃষ্টি হবে।

১। বৃত্তি শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা নিম্নস্তরের শিক্ষা নয়। সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেহ ও মনের শক্তিকে উদ্বোধিত করা, যার ফলে শিক্ষার্থী সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে।

২। সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির নয়, কারণ বৃত্তি-শিক্ষার ভিত্তি সাধারণ শিক্ষায় নিহিত।

৩। সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষা একই বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে না, কারণ এতে ভিন্ন রকমের কাজ করতে হবে।

৪। বৃত্তি-শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু বৃত্তি লাভের জন্যই এ শিক্ষার প্রয়োজন তাই শিল্প ও বাণিজ্যের সাথে সহযোগিতায় এ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকদের সহযোগিতার জন্য শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ও দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে বৃত্তি-শিক্ষার জন্য উপদেষ্টা সমিতি গঠন করতে হবে।

৬। বৃত্তি শিক্ষার স্কুলগুলি জুনিয়র ও সিনিয়র এই দুইভাগে বিভক্ত থাকবে।

৭। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে জুনিয়র বৃত্তি শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থী সিনিয়র বৃত্তি শিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৮। জুনিয়র বৃত্তি শিক্ষা তিন বছর কাল স্থায়ী হবে এবং সিনিয়র বৃত্তি শিক্ষার কাল দু'বছর স্থায়ী হবে। এই শিক্ষাকে যথাক্রমে উচ্চ মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের সমান বলে গণ্য করা হবে।

৯। কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য অবসরকালীন (*part time*) শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। সরকারী ব্যবস্থাপনায় বৃত্তি শিক্ষার কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১১। শিক্ষার্থী অল্প বয়সে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী বৃত্তি নির্বাচনে যাতে ভুল না করে সেজন্য তাকে পরামর্শ দেবার জন্য অন্যান্য দেশের মত ভারতেও *Vocational Guidance*-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সুপারিশগুলি ভারতের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেই করা হয়েছিল। মিঃ এবট বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে সব মূল্যবান সুপারিশ করেছিলেন তার অধিকাংশই কাজে পরিণত করা হয় নি। বৃত্তি শিক্ষার সুপারিশসমূহ কার্যকরী করবার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে দিল্লী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দিল্লী "পলিটেকনিক" স্কুলে পরিণত করা হয়। এটিই বৃত্তি শিক্ষামূলক জাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান। এ বিদ্যালয়ে ৪টি বিভাগ ছিল। (১) পলিটেকনিক হাইস্কুল ; এখানে ১০।১১ বছর থেকে ১৬।১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (২) ১৭ বছরের অধিক বয়স্কদের জন্য সিনিয়র বৃত্তি শিক্ষা বিভাগ খোলা হয়। (৩) পল্লী শিল্প বিভাগ—এখানে পল্লীর বিভিন্ন বৃত্তিজীবিদের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (৪) বয়স্কদের বহুমুখী শিক্ষার জন্য একটি বিভাগ খোলা হয় ; দেশের বিভিন্ন স্থানে এই বিদ্যালয়ের অনুকরণে আরও কয়েকটি কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের যুগ (১৯৩৭-৪৭) :—

১৯৩৫ খ্রী: ভারত শাসন আইনের বলে ১৯৩৭ খ্রী: ভারতের এগারটি প্রদেশে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। নতুন শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় মন্ত্রীরা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের অবসান হওয়ায় শিক্ষার ব্যয় সংকোচের নীতির কিছু পরিবর্তন হয়। ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়ার ফলে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবার পথ সুগম হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের স্বল্পকালীন শাসনকালের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে আলোচ্য যুগে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। ভারতের জনমতকে উপেক্ষা করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানের ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করায় বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির আশানুরূপ প্রসার না হলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের যুগেই এই শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, "ভারত ছাড়" আন্দোলন, বাংলার মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব মিলিয়ে এই যুগকে বিক্ষোভ বিক্ষুব্ধ যুগ বলা যায়। এই যুগের ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই জাতীয় জীবনে আসে বন্ধন মুক্তি। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত নতুন ভারতের জয়যাত্রা শুরু হবার পূর্বে স্বায়ত্ত শাসনের যুগে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিক্ষোভের ফলে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে উৎসাহ কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ইংরেজ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিভেদ বিতর্কে রাজনৈতিক জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা উচিত ছিল, এই যুগে সেই পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয় নি। শিক্ষায় সরকারী উৎসাহে ভাটা পড়লেও রাজনৈতিক আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের উৎসাহ ও আগ্রহের ফলে এই যুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। কংগ্রেস সরকার

প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য নিযুক্ত সার্জেণ্ট কমিশনের রিপোর্ট এই যুগের শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় অবদান।

॥ ভারত শাসন আইনে শিক্ষার দায়িত্ব ॥

দ্বৈত শাসন কালে শিক্ষার দায়িত্ব কিছুটা কেন্দ্রীয়, কিছুটা রক্ষিত, কিছুটা হস্তান্তরিত এই ভাবে ত্রিধা-বিভক্ত করে প্রশাসনিক দিক থেকে এক জটিলতার সৃষ্টি করা হয়। বাংলা প্রবাদ বাক্যের 'ভাগের মা'-এর অবস্থা হওয়ায় শিক্ষার নীতি নির্ধারণ পরিচালনায় নানা অসুবিধা দেখা দেয়। দ্বৈত শাসনের পূর্ব যুগে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করত। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের শিক্ষার জন্যই শুধুমাত্র অর্থ ব্যয় করতে থাকে। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অর্থ সাহায্যের অভাবের ফল যে ভাল হয় নি হার্টগ কমিটির রিপোর্টে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে :—

"*We are of the opinion that the divorce of the Government of India from education has been unfortunate and holding as we do, that education is essentially a national service we are of the opinion that steps should be taken to consider a new relation of the central with the subject.*"

১৯৩৫ খ্রী: ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক শাসন ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আর হস্তান্তরিত বলে কোন ভেদ রইল না। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা নিজ নিজ প্রদেশের শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার নিম্ন বিষয় সমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করল।

কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, এছাড়া ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম ও এই জাতীয় অন্যান্য কেন্দ্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। সামরিক বিভাগের শিক্ষা আলিগড় ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধসমূহের সংরক্ষণ, প্রাচীন নথিপত্র, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের শিক্ষা।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিষয়গুলি ছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত অন্য সব বিষয়ের ভার প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করল। ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষা সংরক্ষিত বিভাগের অধীন রইল না। ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হবার পর প্রাদেশিক মন্ত্রীরা শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কংগ্রেস মন্ত্রী মণ্ডলী শাসিত প্রদেশসমূহে বুনিয়াদী শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্কদের শিক্ষা, হরিজনদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির (C. A. B. E.) সুপারিশে কেন্দ্রে ১৯৪৫ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর থেকে 'শিক্ষা' একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়।

॥ সপ্রু কমিটির রিপোর্ট ॥

দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় এক নতুন সমস্যার স্থষ্টি হয়। জাতীয় জীবনে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা একটি জটিল সমস্যা। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে এই শিক্ষিত বেকার সমস্যা। দেশের শিক্ষিত বেকার সমস্যা কি করে সমাধান করা যায় যুক্ত প্রদেশের সরকার এই সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবার জন্য ১৯৩৪ খ্রীঃ স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে এক কমিটি নিয়োগ করে।

কমিটি এই সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য ও ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত করা হয়। জীবনের প্রয়োজনীয় বৃত্তি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা এতে নেই। কমিটি স্থপারিশ করেন—

১। মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

২। ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা বলে কিছু থাকবে না। এর দু'টি বছরের একটি স্কুলের শিক্ষার সাথে জুড়ে দিতে হবে, এগার বছরের স্কুল শিক্ষাকে দু'ভাগ করে প্রথম পাঁচ বছর হবে প্রাথমিক শিক্ষা, পরের ছ'বছর হবে মাধ্যমিক শিক্ষা কাল।

৩। ডিগ্রী (বি, এ,) তিন বছর কাল ব্যাপী হবে।

৪। নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পার হলে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যন্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার আয়োজন করা হবে।

শিক্ষার প্রসার
১৯২১-২২—১৯৩৬-৩৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		ছাত্রসংখ্যা	
	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭	১৯২১-২২	১৯৩৬-৩৭
বিশ্ববিদ্যালয়	১০	১৫	×	৯,৬৯৭
আর্ট কলেজ	১৫৬	২৭১	৪৫,৪১৮	৮৬,২৭৩
বৃত্তিশিক্ষা কলেজ	৬৪	৭৫	১৩,৬৬২	২০,৬৪৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭,৫৩০	১৩,০৫৬	১১,০৬,৮০৩	২২,৮৭,৮৭২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৫,০১৭	১,৯২,২৪৪	৬১,০৯,৭৫২	১,০২,২৪,২৮৮
বিশেষ বিদ্যালয়	৩,৩৪৪	৫,৬৪৭	১,২০,৯২৫	২,৫৯,২৬৯
অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান	১৬,৩২২	১৬,৬৪৭	৪,২২,১৬৫	৫,০১,৫৩০

* এই হিসেবে দেশীয়রাজ্য ও বর্মার হিসেব ধরা হয় নি।

॥ সার্জেন্ট পরিকল্পনা ॥

পটভূমি :—

ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় বড় সংস্কারগুলি যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হয়েছে। যুদ্ধের সময় জাতীয় চরিত্রের সংগঠনের ত্রুটিগুলি যেভাবে ধরা পড়ে অন্য সময় তা হয় না বলেই সেখানে যুদ্ধকালে বা যুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষা সংস্কার হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ যখন জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে সেই সময় দেশের শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাব আলোচনা হতে থাকে। ১৯৪৪ খ্রীঃ বাটলার আইন ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। যুদ্ধকালেই ভারত সরকার যুদ্ধোত্তর কালের জন্য পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। কেন্দ্রীয় সরকার বড়লাট পরিষদের বিবেচনার জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতিকে একটি পরিকল্পনা রচনার কথা বলেন। এই সময়ে স্যার জন সার্জেণ্ট ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা। বড়লাটের অনুরোধে স্যার জন সার্জেণ্ট যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি ১৯৪৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে এই খসড়া পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে 'সার্জেণ্ট রিপোর্ট' নামে খ্যাত।

॥ বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশের সমন্বয় ॥

'সার্জেণ্ট রিপোর্ট' সার্জেণ্ট রচিত নতুন কোন শিক্ষা পরিকল্পনা নয়। কারণ তিনি নিজে কোন নতুন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন নি। ১৯৩৫ খ্রীঃ থেকে শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি তাঁদের বৈঠকে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে দেশের শিক্ষা সংস্কারের বহু প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া জাকির হোসেন কমিটির বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা, খের কমিটির শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ, উড-এব্‌ট কমিটির রিপোর্ট প্রভৃতি সব কিছু মিলিয়ে তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে স্যার জন সর্জেণ্ট জাতীয় শিক্ষার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা করেন। সার্জেণ্ট কোন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেন নি, কিন্তু এই পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যই তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম, তিনি এই শ্রমসাধ্য সম্পাদনার দায়িত্ব না নিলে এরকম একটা পরিকল্পনা রচিত হ'ত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনা :—

সার্জেণ্টের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রচনা করেছেন। এর আগে এত তথ্যপূর্ণ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হয় নি। দেশের সর্ব শ্রেণীর ও সর্বস্তরের উপযোগী শিক্ষার কথা এতে বলা হয়েছে। নার্সারী শিক্ষা থেকে বয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনা কারও কথাই বাদ যায় নি। শিশু শিক্ষা, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা, বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা, তিন বছরের কলেজের শিক্ষা, যন্ত্রশিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি নানা বিষয়ক শিক্ষার পরিকল্পনা এতে আছে। এ

ছাড়া শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, অবসর বিনোদন, অল্পবয়স্ক শ্রমজীবীদের জন্য কাজের সাথে শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষক শিক্ষণ ও তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ এই পরিকল্পনায় আছে। সার্জেণ্ট রিপোর্ট জাতীয় শিক্ষার একটি মূল্যবান দলিল।

প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তর :—

পরিকল্পনায় তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। শহর অঞ্চলে শিশুর সংখ্যাধিক্য থাকায় শহরে স্বতন্ত্র শিশু বিদ্যালয় (*Nursery School*) স্থাপিত হবে। গ্রামাঞ্চলে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থাকবে এই ব্যবস্থা পূর্ণ হ'লে বছরে দশ লক্ষ শিশুর নার্সারী স্কুলে শিক্ষার জন্য তিনকোটি আঠার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হ'বে বলে ধরা হয়েছে।

পরবর্তী স্তরে ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই শিক্ষা হবে অনেকটা বুনিয়াদী শিক্ষার অনুরূপ। এর প্রথম ভাগে থাকবে ছয় বছর থেকে এগার বছর নিম্ন বুনিয়াদী, এগার থেকে চৌদ্দ বছর উচ্চ বুনিয়াদী। খের কমিটির নির্ধারিত পাঠক্রমকেই এই স্তরের পাঠক্রমরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতিকে স্বীকার করা হ'লেও শিক্ষার ব্যয় শিশুর শিল্প কর্ম থেকে নির্বাহ হতে পারে এ নীতি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজন বিচার করে শিক্ষার জন্য শিল্প নির্বাচন করতে হবে।

নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঁচ কোটি পনেরো লক্ষ ছাত্রের জন্য আঠার লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। এদের বেতন ধার্য হবে ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকার মধ্যে।

মাধ্যমিক শিক্ষা :—

এগার থেকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে কোন ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের প্রস্তুতি পর্ব বলে মনে করা চলবে না। এই শিক্ষা হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে যোগ্যতর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে সোজাসুজিভাবে জীবন-ধারণের উপযুক্ত কোন বৃত্তি গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে। এর মধ্যে অবশ্য একটা অংশ অধিকতর দক্ষতা অর্জনের জন্য দু'তিন বছর বৃত্তি শিক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষা নেবে।

নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত শিক্ষার্থী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবে। নিম্ন বুনিয়াদীর শতকরা ২০ জন ছাত্র এই শিক্ষায় স্থান পাবে। যারা নির্বাচিত হ'তে পারবে তাদের নিজ ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ দেওয়া হবে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বেতন লাগবে। কিন্তু উপযুক্ত দরিদ্র শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য শতকরা ৫০ জন ছাত্রের জন্য বিনা বেতনে পড়বার সুবিধা থাকবে।

অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির দু'টি শ্রেণী থাকবে, বিশুদ্ধ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একাডেমিক হাইস্কুল এবং ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল হাই স্কুল।

মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (*Domestic Science*) শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে।

পাঠক্রম :—

পাঠক্রমে যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেই যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে থাকবে মাতৃভাষা, ইংরেজী অন্য একটি আধুনিক ভাষা, ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি, চারুশিল্প, সঙ্গীত, দেহচর্চা। এ ছাড়া প্রাচীন ভাষা ও পৌরবিজ্ঞান একাডেমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সব ছাত্রকেই অবশ্য সব বিষয় পড়তে হবে না—বিকল্পের ব্যবস্থা থাকবে।

টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞান বিষয়সমূহের উপর বেশী জোর দিয়ে পড়তে হবে। টেকনিক্যাল স্কুলের, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, প্রাথমিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শেখান হবে। বাণিজ্য বিষয়সমূহের মধ্যে বুক কিপিং, সর্টহাণ্ড, টাইপিং প্রভৃতি শেখান হবে। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বৈকল্পিক বিষয়রূপে রাখা হবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা, সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠে নি। বৃহত্তর জীবনের কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় সাধন করে এ শিক্ষার সংস্কারও হয় নি। যে পরিমাণ ছাত্র বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা পাচ্ছে চাকুরীর ক্ষেত্রে সে পরিমাণ লোকের প্রয়োজন আছে কি না সে কথাও বিবেচনা করা হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শিক্ষা হয়েছে পরীক্ষাকেন্দ্রীক। পরীক্ষা পাশের জন্য সংকীর্ণ পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনে সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হওয়ায় চিন্তা শক্তির বিকাশ বা প্রকৃত জ্ঞান আহরণ কোনটাই হয় না।

উচ্চশিক্ষা :—

প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের একমাত্র মাপকাঠি হওয়ায় বহু অবাঞ্ছিত ও অনুপযুক্ত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রাঙ্গণে ভীড় জমাবার সুযোগ পায়। অথচ আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য যে সব দরিদ্র মেধাবী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নেই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে বিরাট সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তার তুলনা দুনিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনেক প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও একে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলা চলে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক মানোন্নয়নের জন্য এই ভর্তি ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। শুধু মাত্র বাঞ্ছিত যোগ্য প্রার্থীই যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষ

গ্রহণের সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে শতকরা ১০।১৫ জন শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় সংস্কারের ফলে একাজ সহজতর হবে। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে। ইণ্টারমিডিয়েট ব'লে কিছু থাকবে না, এর এক বছর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে জুড়ে দেওয়া হবে, আর এক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাথে যুক্ত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিম্নতম কাল হবে তিন বছর ; প্রয়োজনে আরও দীর্ঘতর করা হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য টিউটোরিয়াল ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করতে হবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রে মান উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

অধ্যাপকদের চাকুরীর অবস্থা উন্নততর করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা না হলে যোগ্য ব্যক্তিরা অধ্যাপনা বৃত্তি গ্রহণ করবেন না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যেও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ইংলণ্ডের ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস কমিটির অনুকরণে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা :—

বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে উড-এব্‌ট রিপোর্টের পর্যালোচনা করে বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধোত্তর ভারতের শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন বিচার করে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষাকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

প্রধান কর্মকর্তা ও গবেষণার কাজ (*Chief Executive & Research Works*) ভবিষ্যতে যাঁরা একাজ করবেন তাঁদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে টেক্‌নিক্যাল হাইস্কুল থেকে। প্রাথমিক শিক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোন জাতীয় শিল্প শিক্ষালয়ে উচ্চতম শিক্ষালাভ করে, বাছাই করা সবচেয়ে ভাল ছেলেদেরই একাজের জন্য নেওয়া হবে।

ফোরম্যান, চার্জহাণ্ড প্রভৃতি কাজ টেকনিক্যাল হাইস্কুলে শেখানো হবে, কর্মে নিয়োগের পূর্বে শিক্ষাশেষ করে বিশেষ যোগ্যতার ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট নিতে হবে।

টেকনিক্যাল হাইস্কুলের মধ্য থেকে বা উচ্চ বুনিয়াদীর পরবর্তী শিল্প বিদ্যালয় থেকে পাস করা ছাত্রদের মধ্য থেকে নিপুণ শিল্পীদের (*skilled workers*) নিয়োগ করা হবে।

উচ্চবুনিয়াদী স্তরে যারা কিছু কারিগরী শিক্ষা পেয়েছে তাদের মধ্য থেকে অর্দ্ধ নিপুণ (*Semi-skilled*) কর্মী নিয়োগ করা হবে। এরা যাতে অবসর সময় সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মদক্ষতা বাড়াতে পারে সে সুযোগ দিতে হবে, যার ফলে এরা সুনিপুণ (*Skilled*) কর্মীর স্তরে উন্নত হবে।

বিভিন্ন শিল্প কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য আংশিক সময় শিক্ষার (*Part-system*) ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে কর্মীরা তাদের দক্ষতা বাড়াবার সুযোগ পাবে।

চার শ্রেণীর শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাকাল নিম্নরূপ হবে—

(১) নিম্ন কারিগরী বা শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চবুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে দু'বছর শিক্ষা নিতে হবে।

(২) টেকনিক্যাল হাইস্কুলে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে দু'বছর শিক্ষা নিতে হবে।

(৩) উচ্চ শিল্প শিক্ষালয়ের শিক্ষাকাল স্থির করবে কর্মে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ এক কারিগরী শিক্ষাবিভাগে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা থাকবে। শিল্প ও কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আট কোটি টাকা খরচ করা হবে। এই ব্যবস্থাকে চালু রাখতে বছরে দশ কোটি টাকা খরচ হবে।

সামাজিক শিক্ষা :—

দেশের প্রতিটি নরনারীকে সুনাগরিক হবার সুযোগ দেবার জন্য ১০-৪০ বছর বয়স্ক প্রতিটি মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ১০-১৬ বছর পর্যন্ত বয়স্কদের জন্য যথাসম্ভব দিবাভাগে পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বয়সের মেয়েদের জন্যও সম্ভব হলে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। কোন শ্রেণীতেই ১৫ জনের বেশী শিক্ষার্থী থাকবে না। বয়স্কদের শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলার জন্য ছবি, চার্ট, ম্যাজিক লণ্ঠন, গ্রামোফোন, রেডিও, সিনেমা লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের সাহায্য নিতে হবে।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা :—

সারাদেশব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করলে অল্প খরচে বিরাট দেশের চাহিদা কিছুটা পূরণ সম্ভব হবে। সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বয়স্কদের শিক্ষাদানের কাজে এগিয়ে আসে সে ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে প্রধানতঃ রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ কথা ভুললে চলবে না।

স্বাস্থ্য কমিটি :—

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দৃষ্টি রাখবার জন্য বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করা হবে। কোন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে কোন ত্রুটি বের হলে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। সামান্য অসুখের চিকিৎসার জন্য ক্লিনিকের ব্যবস্থা করতে হবে।

মানসিক শারীরিক ত্রুটি সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য মূক-বধির বিদ্যালয়, অন্ধ-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করতে হবে। এদের নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে।

সামান্য মানসিক দুর্বলতা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের থেকে পৃথক করা হবে না। এদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যতিক্রম খুব বেশী হ'লে শিক্ষার ভিন্ন ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের জন্য কর্মসংস্থান কেন্দ্র গঠন করতে হবে।

সহ পাঠক্রমিক ব্যবস্থা :—

অবসর বিনোদনমূলক আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক কাজের ব্যাপক আয়োজন করা হবে। দেশে সমস্ত তরুণ তরুণীদের নিয়ে যুব'আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, তরুণ

তরুণীদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণে শিক্ষা দিতে হবে। খেলাধূলা আন্তঃ বিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, বিতর্ক সভা, দলবদ্ধ ভ্রমণ, নাটক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি শিক্ষা বহির্ভূত বিষয়গুলি (*Extra Curricular Activities*) যুব আন্দোলনের অঙ্গীভূত হবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ :—

সর্বভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী শিক্ষা বিভাগ থাকবে। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার-সমূহের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা ও উচ্চতম কারিগরী শিক্ষা ব্যতীত অন্য শিক্ষা প্রাদেশিক বিভাগের পরিচালনাধীন থাকবে। যে সব অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারছে না তাদের হাত থেকে শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষাবিভাগ গ্রহণ করবে।

শিক্ষকদের বেতন :—

সমগ্র পরিকল্পনায় সার্থক রূপায়ণের জন্য শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। বর্তমানে যে বেতন দেওয়া হয় এই বেতনে উপযুক্ত লোক শিক্ষকতাকে জীবনের উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী হবে না। শিক্ষকতাকে আকর্ষণযোগ্য করতে হলে শিক্ষকদের আরও বেশি বেতন দিতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শোচনীয় অবস্থা অবিলম্বে পরিবর্তন আবশ্যক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা হওয়া প্রয়োজন, এর কমে কোন উপযুক্ত লোক এ কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না।

পরিকল্পনা রূপায়ণ :—

সমগ্র ভারতে ৮ বছরের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে কত টাকা খরচ হবে তার হিসেব সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দু'শ কোটি টাকার দরকার হবে। শুধুমাত্র বৃটিশ ভারতেই এজন্য প্রয়োজন হবে আঠার লক্ষ শিক্ষক। একদিনে এ কাজ সম্ভব নয় বলে ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে নিতে হবে। সে জন্য সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ৪০ বছর সময় ধরা হয়েছে। এর প্রথম পাঁচ বছর যাবে আয়োজন করতে। ততদিনে একদল শিক্ষক তৈরী করে নেওয়া হবে। তারপর প্রতি বছর যখন যেমন শিক্ষক তৈরী হবে কাজ সেভাবে এগিয়ে যাবে। চল্লিশ বছর শিক্ষা পরিকল্পনা যখন পূর্ণ রূপায়িত হবে তখন সমগ্র ব্যবস্থার জন্য বছরে তিনশ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

সার্জেণ্টের হিসেবে বাংলা দেশে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে বছরে প্রায় পঞ্চান্ন কোটি টাকা লাগবে। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের জন্য ২২ কোটি, উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের জন্য ১৮ কোটি ও হাইস্কুলের জন্য ১৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ ৪০ কোটি টাকা শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে। এই ৪০ কোটি টাকার মধ্যে ২৮ কোটি শুধু ব্যয় হবে শিক্ষকদের বেতন দিতে। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান

না হ'লে আংশিকভাবে কাজ শুরু করতে হবে। টাকার যোগাড় হ'লে বাকী অংশের কাজ শুরু হবে।

পরিকল্পনা অনুসারে যখন পুরোপুরি কাজ শুরু হবে তখন শুধু বৃটিশ ভারতে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হবে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ১ কোটি ৬০ লক্ষ। এই সোয়া পাঁচ কোটি ছেলেমেয়ের জন্য ১৮ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। হাইস্কুলের স্তরে প্রায় ৭২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করবে, তাদের শিক্ষার জন্য ৩ লক্ষ ৬০ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। এর সাথে যদি দেশীয় রাজ্য যোগ করা যায় তাহলে শুধু মাত্র উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ; আর হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রী হবে ৯৩ লক্ষ। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষক লাগবে ২৩ লক্ষ আর মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রয়োজন হবে সাড়ে চার লক্ষ শিক্ষকের।

বাংলাদেশে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে ৭০ লক্ষ। তাদের জন্য ২ লক্ষ ৩৩ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হবে ৩০ লক্ষ; শিক্ষক দরকার হবে ১ লক্ষ ২১ হাজার। বাংলা দেশের হাইস্কুলের ছাত্র হবে মোট ১৪ লক্ষ ১৮ হাজার। এজন্য শিক্ষক দরকার হবে ৭১ হাজার।

॥ সমালোচনা ॥

১৯৪৪ খ্রীঃ সার্জেণ্ট পরিকল্পনা বের হবার সাথে সাথে এর বহু সমালোচনা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয়েছে খরচের বিরাট অঙ্কটি সম্পর্কে। এত টাকা আমরা কোথায় পাব? উত্তরে সার্জেণ্ট বলেছেন, যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে প্রয়োজন হ'লে অর্থের যোগাড় করা যায়। যদি দেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা মনে প্রাণে উপলব্ধি করি তা হ'লে অর্থের অভাবে শিক্ষার অগ্রগতি রোধ হবে না। আর একটি বড় আপত্তি এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে ৪০ বছর সময় লাগবে। সময়টা অত্যন্ত দীর্ঘ। এতদিন অপেক্ষা করা কি সম্ভব? সময়ের ব্যাপ্তি এত দীর্ঘ যে এতে অধৈর্য্য হওয়া স্বাভাবিক। সার্জেণ্ট বলেছেন; বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ শিক্ষকতা গ্রহণ করতে পারবে না এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যতদিন পর্যন্ত আমরা যোগ্য শিক্ষক সৃষ্টি করতে না পারি, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সার্জেণ্ট সাহেবের কথাটা খুব যুক্তিপূর্ণ ব'লে মনে করবার কোন কারণ নেই। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষা দিয়ে তারপর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে এটা কোন দেশেই হয় নি। এমন কি ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক গণশিক্ষা শুরু হবার যুগেও হয় নি। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারে নি (১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থা বিচার করে) তাদের মধ্য থেকেই বাছাই করে ও যারা শিক্ষকতা করেছেন তাদের নিয়েই কাজ শুরু করে পরে যোগ্য ব্যক্তিদের ধীরে ধীরে কাজে লাগানো সম্ভব ছিল। শিক্ষকদের ট্রেনিং ব্যবস্থার অজুহাতে কোনরূপেই শিক্ষা পরিচালনাকে বন্ধ করে রাখা চলে না। সার্জেণ্ট সাহেবের পক্ষে বলার কথা হচ্ছে, এতবড় একটা কাজ রাতারাতি

হবার নয়। এজন্য তু'দশ বছর সময় অবশ্যই লাগবে। স্বাধীনতার পূর্বে বিদেশী সরকারের সততায় আমরা সন্দেহ করে এর তীব্র সমালোচনা করেছি; আশা করা গিয়েছিল স্বাধীন ভারতে শিক্ষা তরান্বিত হবে। কিন্তু শিক্ষা প্রসারের কাজ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে আজ পঁচিশ বছর বাদে মনে হয় সার্জেন্ট চল্লিশ বছরের পরিকল্পনা করে খুব বেশী সময়ের কথা বলেন নি। যাঁরা সেদিন ছিলেন সবচেয়ে বেশী সমালোচনামুখর তাঁদের পরিচালনায়ও প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হয় নি।

পূর্বেই বলেছি উডের ডেসপ্যাচের পর এমন একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যপূর্ণ শিক্ষা-পরিকল্পনা আর রচিত হয় নি। এর আগের পরিকল্পনাগুলিতে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবই ছিল প্রধান ত্রুটি। শাসক সম্প্রদায়ের শিক্ষা সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার পক্ষে অন্তরায় ছিল। স্যার জন সার্জেণ্টের পরিকল্পনা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট নয়। একটা বিরাট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ভারতের জাতীয় শিক্ষা কাঠামো তৈরী করতে পেরেছেন—এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। ইংরেজ আমলে রচিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনায় তিনি যে সাহসিকতা ও সংকীর্ণতামুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে ছিলেন সে যুগে তা দুর্লভ, তাঁর খসড়া পরিকল্পনাকেই অদল-বদল ক'রে পরবর্তী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাসমূহে গৃহীত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় অনাথনাথ বসু বলেছেন, "এই পরিকল্পনায় আমরা প্রথম শিক্ষা সংস্কারের একটা সর্বাঙ্গীণ ছক পাইয়াছি। স্বাধীন ও উন্নত ভারতবর্ষে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোটা যে অনেকাংশে এই ছকের অনুরূপ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা *Shri Saiydain* বলেছেন, "*It is the first Comprehensive scheme of national education, it does not start with the assumption, implicit in all previous Government schemes that India is destined to occupy a position of educational inferiority in the committee of nations.*"

প্রশ্নাবলী

1. State the difficulties which according to the Hartog Committee hampered the progress of primary education and mention the recommendations it made for their removal. [B. T. 1968 Spl. paper]
2. What were the views of the Hartog Committee in regard the manner of expansion of Primary education, its quality and quantity? How far have these affected the course of development of Primary education till now? [B. T. 1966 Spl. paper]
3. Write critical notes on The Wood-Abbot Report. [B. T. 1961 & 1957]
4. "It is the first comprehensive scheme of national education" Discuss critically this remark on Sargent's scheme of educational reconstruction.

———

একাদশ অধ্যায়

স্ত্রী-শিক্ষা ঃ আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা

॥ মিশনারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা ॥

উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে দেশে স্ত্রী-শিক্ষার কোন আয়োজনই ছিল না। মেয়েরা সামান্য যেটুকু লেখাপড়া শিখত তা ঘরোয়া ভাবেই শিখত। মেয়েদের জন্য প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে স্কুল মিশনারীরা স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য ১৮১৮ খ্রীঃ রেভারেণ্ড মে চুচুঁড়ায় একটি স্কুল খোলেন কিন্তু স্কুলটি বেশী দিন চলে নি। ১৮১৯ খ্রীঃ কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থায় মেয়েরাই যাতে এগিয়ে আসে সে জন্য ব্যাপটিষ্ট মিশনের অনুরোধে মিসেস্ পিয়ার্স ও মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮২০ খ্রীঃ ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এর নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে—"*The Female Juvenile society for the establishment and support of Bengali female School.*"

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরই সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম জুভেনাইল স্কুল স্থাপিত হয় এবং ক্রমে আরও স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রীঃ এই সোসাইটির পরিচালনায় ২০টি স্কুল ছিল। ১৮৩২ খ্রীঃ এই সোসাইটি "*The Calcutta Baptist Female School Society*" এই নতুন নাম গ্রহন করে। ১৮৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সমিতি সক্রিয় ছিল।

এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য লণ্ডনের *British and Foreign School Society*"র পক্ষ থেকে কুমারী এন্ কুককে ভারতে পাঠান হয়। তিনি ১৮২১ খ্রীঃ এদেশে আসেন এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটির আর্থিক সহায়তায় এক বছরের মধ্যে ৮টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক। ভাল ছাত্রীদের শাড়ী, পয়সা ইত্যাদি দেওয়া হ'ত। এ ছাড়া পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। এ সব স্কুলে লেখা, পড়া, বানান, ভূগোল, হাতের কাজ প্রভৃতি শেখান হ'ত। ১৮২৪ খ্রীঃ মিস্ কুকের পরিচালনাধীনে ২৪টি স্কুল ছিল। মিঃ উইলসনের সাথে মিস্ কুকের বিবাহ হয়ে যাওয়ায় "*Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity*" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে এই স্কুলগুলির পরিচালনার ভার সেই সমিতিকে দেওয়া হয়। ১৮২৪ খ্রীঃ বড়লাট পত্নী লেডী আমহার্ষ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতার কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা *Ladies Society for Native Female Education* নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। সমিতি জানবাজার ও ইণ্টালী অঞ্চলে ৬টি মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ২০ হাজার

টাকার সাহায্যে কলিকাতায় সেণ্ট্রাল স্কুল নামে মেয়েদের একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই স্কুলে শিক্ষিকাদের শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই স্কুল গৃহেই স্কটিশচার্চ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রের যে কোন দায়িত্ব আছে উডের ডেসপ্যাচের আগে তার কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না। সরকারী তহবিল থেকে তার পূর্বে একটি কপর্দকও এজন্য ব্যয় করা হয় নি। দেশে স্ত্রী-শিক্ষার সামান্য যেটুকু অগ্রগতি হয়েছিল তা মিশনারী ও বেসরকারী শিক্ষাব্রতীদের দান। বাংলা দেশের মত মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশে মিশনারী মহিলাদের উদ্যোগে ও উৎসাহে কিছু কিছু মেয়ে স্কুল বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা হয়। মাদ্রাজে 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি ১৮২১ খ্রীঃ প্রথম মেয়েদের স্কুল স্থাপন করে। ১৮৫০ খ্রীঃ মধ্যে বিভিন্ন মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজের নানা স্থানে মেয়েদের জন্য ৭টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমেরিকান মিশনারী সম্প্রদায় বোম্বে প্রদেশে ১৮২৪ খ্রীঃ প্রথম মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। দশ বছরের মধ্যে এই প্রদেশে আরও দশটি স্কুল খোলা হয়। ডাঃ ও. মিসেস্ উইলসনের (পূর্ববর্তী জীবনে মিস কুক) প্রচেষ্টায় স্কট মিশনারী সোসাইটির পক্ষ থেকে ৬টি মেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। ১৮৪০ খ্রীঃ পুণার উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য ৫টি স্কুল খোলা হয়। ১৮৫১ খ্রীঃ আমেদাবাদের রাও বাহাদুর মগনভাই করমচাঁদ মেয়েদের জন্য ২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন, পুণায় মহাত্মা ফুলে একটি মেয়ে স্কুল পরিচালনা করতেন। এছাড়া *Bombay Students Library and Scientific Society*র পরিচালানায় ৯টি মেয়ে স্কুলে ৬৫০ জন ছাত্রী ছিল।

॥ দেশীয় প্রচেষ্টা ও বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠা ॥

বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে মিশনারীরাই পথ প্রদর্শন করেন। এদেশের স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে মিস্ কুকের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষাব্রতী বাঙ্গালী সমাজও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। উত্তরপাড়া, বারাসত, যশোর, সুখসাগর, নেবাদিয়া প্রভৃতি স্থানে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে। ১৮৪৮ খ্রীঃ বেথুন সাহেব বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্য হয়ে এদেশে আসেন, এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ খ্রীঃ ৭ই মে তাঁর প্রচেষ্টায় ২১ জন ছাত্রী নিয়ে *Calcutta Female School* বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্কুলের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকেই বাংলার স্ত্রী-শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। এই স্কুলের বাড়ি করবার জন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দশ হাজার টাকা ও পাঁচ বিঘা জমি দান করেন। বেথুন সাহেব এই স্কুলের জন্য ১০ হাজার পাউণ্ড দান করেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার স্মৃতির সম্মানে এই স্কুলের নাম হয় 'বেথুন নারী বিদ্যালয়'। ১৮৮৭ খ্রীঃ এই স্কুল বেথুন কলেজে

রূপান্তরিত হয়। বেথুন কলেজই মেয়েদের প্রথম কলেজ। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন বাদে রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজারে একটি মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহী দেশীয় সমাজ হিতৈষীদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেও দেশের লোকের অর্থ সাহায্যে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

সরকারী উদাসীনতা ঃ—

স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সরকারের উৎসাহ চিরদিনই ছিল একটু শিথিল। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮৫৪ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত সরকারী তহবিল থেকে নিয়মিত কোন সাহায্যের ব্যবস্থাই ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিল। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের কোন চেষ্টাই তারা সুনজরে দেখত না, এই কারণে সামাজিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সরকারের নিরপেক্ষতা নীতির অজুহাতে সরকার স্ত্রী-শিক্ষার জন্য কোন সাহায্য দেওয়া থেকে বিরত ছিল। মিশনারীদের ও কিছু সহৃদয় ইংরেজ ও ভারতীয়দের উদ্যোগে দেশে নারী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সরকার থেকে কোন সাহায্য বা উৎসাহ না পেলেও স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের প্রাথমিক চেষ্টা মোটামুটি উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়েছিল। সমাজের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। তবুও ১৮৫৪ খ্রীঃ দেখা যায় মাদ্রাজে ২৫টি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮,০০০ জন ছাত্রী রয়েছে। এর মধ্যে ১,১১০ জন রয়েছে আবাসিক বিদ্যালয়ে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল মিশনারীদের শ্রম ও অর্থে। বোম্বে প্রদেশে এ সময় ৬৫টি মেয়ে স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬,৫০০ জন। বাংলা দেশে মেয়ে স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৮৮টি এবং এতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬,৮৬৯ জন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মিশনারী পরিচালিত ১৭টি স্কুলে ৩৮৬ জন ছাত্রী ছিল। সমগ্র ভারতের কথা চিন্তা করলে এই চিত্রটি খুব উজ্জ্বল বলে মনে হবে না। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে মাদ্রাজ, বোম্বে ও বাংলার নারী শিক্ষার যে চিত্র আমরা পেয়েছি সেই তুলনায় এই প্রারম্ভিক সাফল্য খুব হতাশা ব্যঞ্জক নয়।

উডের ডেসপ্যাচে নারী শিক্ষা ঃ—

১৮৫৪ খ্রীঃ উডের ডেসপ্যাচের পর ভারতের স্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়। সরকারী নিষ্ক্রিয়তার অবসানে বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্য ও সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা দুইই উডের নির্দেশের পর শুরু হয়। ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের অর্ধাংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে শিক্ষার কোন আয়োজনই যে সার্থক হতে পারে না উডের ডেসপ্যাচেই প্রথম ভারত সরকারের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হ'ল। ভারতীয়রা নারী শিক্ষায় উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এসেছে এজন্য ডেসপ্যাচে তাঁদের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করা হয়েছে। নারী শিক্ষায় বেসরকারী সকল আয়োজনের প্রতি

আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে ডেসপ্যাচে রাও বাহাদুর মগন ভাই করমচাঁদ আহমেদাবাদে দু'টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন সে কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়।

সিপাহী যুদ্ধের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষিত নিরপেক্ষ নীতি সরকারী কর্মচারীরা সামাজিক রীতিনীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে নারী শিক্ষা প্রচেষ্টাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছিল। তবুও উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে সব প্রদেশেই কম বেশী কাজ শুরু হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম থেকেই নারীশিক্ষা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি সম্পাদক ছিলেন। ছোটলাট হ্যালিডের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৫-৫৮ খ্রীঃ মধ্যে তিনি ৪০টি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার থেকে এই বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার গ্রহণ না করায় বহুদিন চাঁদা তুলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখেন।

ব্রাহ্ম সমাজের অবদান :—

বেথুন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের ব্যয় ও পরিচালনার ভার ১৮৫৬ খ্রীঃ থেকে শিক্ষাবিভাগ গ্রহণ করে। এই সময়ে বাংলার ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে এঁদের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের মহিলারাই সামাজিক বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে প্রথম উৎসাহে এগিয়ে আসেন। বাংলা দেশে যেরূপ ব্রাহ্ম সমাজ, বোম্বে প্রদেশে সেরূপ পার্শী সমাজ স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ পূর্বেই আগ্রা, মথুরা, মৈনপুরী প্রভৃতি অঞ্চলে স্কুল পরিদর্শকদের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ বেথুন স্কুলে মেয়েদের কলেজের কাজ প্রথম শুরু হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা বিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে আরও তিন বছর লেগেছিল। ১৮৭৯ খ্রীঃ পালামকোঠায় সারাটুকার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনায় ১৮৮০ খ্রীঃ মহারাষ্ট্র ফিমেল এডুকেশন সোসাইটি গড়ে ওঠে।

শিক্ষিকা শিক্ষণ :—

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সমাজে বিরূপ মনোভাব থাকলেও উৎসাহী সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় দেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিকার অভাব মেটানোর জন্য কোন ট্রেনিং স্কুলের বন্দোবস্ত করা হ'ল না। মিশনারীদের পরিচালিত ট্রেনিং স্কুল ছিল। কিন্তু হিন্দু কি মুসলিম শিক্ষিকারা সেখানে যেতে চাইতেন না। নারী শিক্ষার এই ত্রুটির প্রতি সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বৃস্টলের বিখ্যাত সমাজ সেবিকা মিস মেরী কার্পেণ্টার। এই মহিলা ইংলণ্ডে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত হন। রাজা রামমোহন মিস কার্পেণ্টারকে এদেশের স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলেন। তিনি এদেশে এসে

স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। শিক্ষিকাদের উপযুক্ত ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করবার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। এদেশে স্ত্রী-শিক্ষাকে তরান্বিত করতে হলে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার প্রয়োজন একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁর উদ্যোগে ১৮৭০ খ্রীঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের জন্য ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। মিস্ কার্পেণ্টারের চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের একটি প্রধান বাধাই অপসারিত হয়েছিল এর সাথে মেয়েদের জীবিকা অর্জনের একটি দ্বার উন্মোচন হয়েছিল। মিস্ কার্পেণ্টার ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই পরবর্তীকালে সরকার শিক্ষিকা শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই অভাব মোচনে সচেষ্ট হন। মিস কার্পেণ্টারকে আমরা শিক্ষিকা-শিক্ষণ ব্যবস্থার অগ্রদূতী বলতে পারি।

॥ উচ্চশিক্ষার বাধা অপসারণ ॥

সরকার যখন স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ব উদাসীনতা ত্যাগ করে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে উৎসাহদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ঠিক সেই সময় ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কীয় মনোভাব কৌতূহল উদ্দীপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের ধারণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষার দ্বার শুধুমাত্র পুরুষ পরীক্ষার্থীদের জন্যই মুক্ত, এখানে নারীর প্রবেশাধিকার নেই। ১৮৫৭ খ্রীঃ বেলগাঁয়ের পোস্টমাস্টার তাঁর মেয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুমতি চেয়ে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের নিকট দরখাস্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কোডে প্রার্থীদের সম্পর্কে *He, His, Him* প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—অর্থাৎ স্ত্রী-বাচক কোন শব্দ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নি—তাই সিণ্ডিকেট জবাব দিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে মেয়েদের পরীক্ষার অনুমতি দেবার ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হয় নি। এই ব্যাপারে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল, তখন কলিকাতার সিণ্ডিকেট বলল, মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের অধিকার দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না, কারণ আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে দরখাস্ত করে নি, আর অদূর ভবিষ্যতে এরূপ কোন দরখাস্ত কেউ করবে সে সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু কয়েক মাস না যেতেই চন্দ্রমুখী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি চেয়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বিপদে ফেলল। বলা বাহুল্য চন্দ্রমুখীর দরখাস্তও না-মঞ্জুর করা হয়। ১৮৭৭ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম মেয়েদের প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুমতি দেয়। একবছর বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষা ক্ষেত্র থেকেও মেয়েদের পরীক্ষা দেবার বাধা তুলে দেওয়া হয়। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮৩ খ্রীঃ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বাধা প্রত্যাহার করে। চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু প্রথম ভারতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট।

উডের ডেসপ্যাচের পর থেকে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের তদন্ত শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত দেশের নারী শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে যে তথ্য আমরা পেয়েছি সেই তালিকা দেখলেই ঊনবিংশ শতকের স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা

হবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা ১৮৫৭ খ্রীঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০।২৫ বছর লেগেছিল মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষায় অধিকার লাভ করতে।

ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা

(৩১শে মার্চ, ১৮৮২ খ্রীঃ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
কলেজ	১	৬
মাধ্যমিক স্কুল	৮১	২,০৫৪
প্রাথমিক স্কুল (শুধু মাত্র মেয়েদের)	২,৬০০	৮২,৪২০
মিশ্র প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা	×	৪২,০৭১
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৫	৫১৫
মোট	২,৬৯৭	১,২৭,০৬৬

(Report of the National Committee on Women's Education)—

বেথুন প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি কলেজে পরিণত হয়েছিল, সেখানে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬জন। মধ্যশিক্ষার ৮১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারী পরিচালনাধীনে ছিল ৬টি মাত্র স্কুল। মাদ্রাজে ৪৬টি স্কুলে ৩৮৬ জন ছাত্রী, বাংলায় ২২টি স্কুলে ১,০৫১ জন ছাত্রী ও বোম্বে প্রদেশে ৯টি স্কুলে ৮৩৮ জন ছাত্রী, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৩টি স্কুলে ৬৮ জন ছাত্রী ও পাঞ্জাবে ১টি স্কুলে ৮ জন ছাত্রী মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করেছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য ছিল ২৬০০টি, এর মধ্যে ৬৫০টি ছিল শিক্ষাবিভাগের পরিচালনাধীন, ১,৫৯১টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও বাদ-বাকী ৪০৪টি কোন সাহায্য পেত না। ছাত্রী সংখ্যা বোম্বে প্রদেশে ২১,৮৫৬ জন, মাদ্রাজে ২০,৩৬৫ জন, বাংলাদেশে ৭,৪৬২ জন। এ ছাড়া মিশ্র বিদ্যালয়ে ৪২,০৭১ জন ছাত্রী শিক্ষা পেত। উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান দায়িত্ব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই বহন করেছিল। যেখানে মোট ৬১৬টি সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৪,২৯১ জন ছাত্রী ছিল সেখানে ২,০৮১টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,১২,৭৭৫ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করেছিল। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মিশ্র বিদ্যালয়ের ৪২ হাজার ছাত্রীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। পল্লীর শিক্ষা-ব্যবস্থায় মিশ্র বিদ্যালয়গুলি স্ত্রী শিক্ষা-প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ অর্থাভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। তার ফলে আলোচ্য যুগে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয় নি। বিংশ শতকের শুরুতে স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান থেকে এই যুগের স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হবে।

স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতি

	(১৮৮১—৮২ খ্রীঃ)		(১৯০১—০২ খ্রীঃ)	
প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
আর্টস সায়েন্স কলেজ		৬	১২	১৬৯
মাধ্যমিক স্কুল	৮১	২,০৫৪	৪৪২	৯,০৭৫
প্রাথমিক স্কুল	২৬০০	৮২,৪২০	৫,৬০৫	৩,৪৪,৭১২
মিশ্র প্রাথমিক স্কুল	×	৪২,০৭১	×	×
প্রাথমিক শিক্ষিকা শিক্ষণ ও অন্যান্য ট্রেনিং স্কুল	১৫	১১৫	৪৫	১,২৫৩
বৃত্তি শিক্ষার কলেজ	×	×	×	৮৭
অন্যান্য স্কুল	×	×	১৭	১,১১৭
মোট·	২,৬৮৭	১,২৬,৬৬৬	৬,১২১	৩,৫৬,৪১৩

এই সময় নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। ১২টি কলেজের মধ্যে মাত্র ১টি—বেথুন কলেজ—সরকারী পরিচালানাধীন ছিল। মাধ্যমিক ৪২২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৫৬টি বেসরকারী পরিচালনাধীন ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৯৮২টি ও ট্রেনিং স্কুলের ৩২টি ছিল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করত। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলায় ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা শহরের কিছু সংখ্যক মেয়ে ও বোম্বে প্রদেশে পার্শী সামাজের মেয়েদের প্রাধান্য দেখা যেত। ১৯০১ খ্রীঃ পরিসংখ্যানে দেখা যায় মেয়েদের মধ্যে প্রতি একলক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের ৪ জন ও হিন্দু ১০ জন মেয়ে ইংরেজী শিক্ষা পাচ্ছে।

নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রী সংখ্যা (১৯২১-২২ খ্রীঃ) :—

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
কলেজ	১৯	৯০৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৭৫	২৬,১৬৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১,৯৫৫	১১,৮৬,২২৪
অন্যান্য নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১,১২৮	১০,৮৩৬

(*Report of the National Committee on Women's Education*)

কুড়ি বছরে কলেজের সংখ্যা ১২টি থেকে ১৯টি হয়। এই কলেজগুলির মধ্যে ৪টি ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৭৫টির মধ্যে ১১৫টি ছিল সরকার

পরিচালিত। এমন কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল, ১৬,৮১০টি। এই হিসেব থেকে নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারী অবদানের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

আলোচ্য যুগে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যে ১৯০৪ খ্রীঃ শ্রীমতী এ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত বেনারসের সেণ্ট্রাল হিন্দু গার্লস কলেজ বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯১৬ খ্রীঃ মেয়েদের চিকিৎসা বিদ্যা শেখাবার জন্য দিল্লীতে লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পুণায় অধ্যাপক কার্ভে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান উইমেন্স্ ইউনিভার্সিটি (১৯১৬ খ্রীঃ)। নারীদের উপযোগী পাঠক্রমের ভিত্তিতে এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথমে সরকারী অনুমোদন ছিল না—বর্তমানে এটি একটি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়।

এই যুগের নারী শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। এর আগে শুধুমাত্র ডাক্তারী ও স্কুল শিক্ষিকা ভিন্ন মেয়েদের উপযোগী বিশেষ কোন বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না। নীচের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ এই যুগের মেয়েরা কিভাবে গ্রহণ করেছে :—

বৃত্তি শিক্ষায় নারী (১৯২১-২২ খ্রীঃ)

উচ্চতর শিক্ষা (কলেজ)	ছাত্রী সংখ্যা
চিকিৎসা	১৯৭
শিক্ষাবৃত্তি (টিচার্স ট্রেনিং)	৬৭
বাণিজ্য	২
নিম্নতর শিক্ষা স্কুল শিক্ষা বৃত্তি	৩,৯০৩
চারুকলা (আর্ট)	৩২
চিকিৎসা	৩৩৪
কারিগরী ও শিল্প বিদ্যা	২,৭৪৪
বাণিজ্য	৩০৮
কৃষি	৭৯
অন্যান্য বৃত্তি	৩,১৭০
মোট—	১০,৮৩৬

(*Report of the National Committee on Women's Education*)

॥ স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে হার্টগ কমিটির অভিমত ॥

কমিটি প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের সংখ্যানুপাতের বিরাট পার্থক্য তুলে ধরে স্ত্রী-শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নারী শিক্ষায়

অপচয় সম্পর্কে বলা হয় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন ও অপচয়ের অবস্থা আরও শোচনীয়, এছাড়া বহু গ্রামে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। শহরে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং শিক্ষিকার অভাবে মেয়েদের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। কমিটি মেয়েদের পরবর্তী জীবনে কাজে লাগতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রম রচনার পরামর্শ দেন। উপযুক্ত বেতনে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিকা ও পরিদর্শিকা নিয়োগের সুপারিশও করা হয়। ধীরে ধীরে স্ত্রী-শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার কথা কমিটি বিবেচনা করে দেখতে বললেন। প্রতি প্রদেশে স্ত্রী-শিক্ষার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য একজন করে ডেপুটি ডাইরেক্টর নিয়োগ করবার পরামর্শ দেওয়া হয়।

নারী শিক্ষা (১৯২১-৪৭) :—

নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন থাকলেও বৈদেশিক সরকার নারী শিক্ষা সম্পর্কে কোন বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করতে প্রথম থেকেই দ্বিধা করে আসছে। নারী প্রগতি সনাতন পন্থীরা সুনজরে দেখবে না, দেশে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে এই আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার প্রাচীন রীতিনীতি রক্ষার অজুহাতে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। দ্বৈত শাসন ও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকালে ভারতীয় মন্ত্রীরা শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবার ফলে দেশের নারী শিক্ষার দ্রুত প্রসার শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী রাজনীতিক ও সামাজিক শৃঙ্খল মুক্তির আন্দোলনের ফলে যে গণচেতনা দেখা দেয় তার প্রতিক্রিয়ায় নারী সমাজেও এক অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও দেশের লোক নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়। তাই অর্থসংকট, রাজনৈতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ—এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ হয়।

॥ স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ॥

প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগের সামগ্রিক চিত্র :—

ভারতের নারী জাগরণের ইতিহাস অতি আধুনিক কালের ঘটনা! জাতীয় আন্দোলনের সাথে আমাদের দেশের নারী সমাজের যে অভূতপূর্ব চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তারই ফলে নারী সমাজের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির সূচনা হয় যার ফলে তারা আজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

এডামের রিপোর্টে দেখা যায় তাঁর সময়ে (১৮৩৫-৩৭ খ্রীঃ) নারী শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যেটুকু শিক্ষা তারা পেত তা পিতৃগৃহে অভিভাবকদের কাছ থেকে বা নিজের চেষ্টায় লাভ করত। উডের ডেসপ্যাচে নির্দেশ দেওয়া হ'ল মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে সরকারকে তৎপর হতে হবে। সমাজের অর্ধেক অংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে কোনরূপ শিক্ষার আয়োজন সার্থক হতে পারে না এই ছিল উডের ডেসপ্যাচে

নারী শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য। কার্যতঃ দেখা গেল কোম্পানীর যুগ অবসানের পরে বহুদিন পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা বিভাগ নারী শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন রয়েছে। এদেশের নারী শিক্ষার ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখেছি শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত মিশনারীরাই নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রথম এগিয়ে আসেন। উদারচেতা ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে দেশ ধীরে ধীরে নারী শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। বেসরকারী প্রচেষ্টা ও কয়েকজন সহৃদয় ইংরেজ সরকারী কর্মচারীর চেষ্টায় এদেশে প্রথম নারী শিক্ষার প্রসার হতে থাকে। তবু উনবিংশ শতকে নারী শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। ১৯০১—০২ খ্রীঃ দেখা যায় সারা ভারতে মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১২টি কলেজ, ৪৬৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫,৬২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪,৪৭,৪৭০ জন মেয়ে শিক্ষা পাচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষা প্রসারের কিছুটা সরকারী প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় যার ফলে অবস্থার উন্নতি হয়। পূর্বে নারী শিক্ষা সম্পর্কে যে সামাজিক বাধা ছিল, বিংশ শতকে সনাতন পন্থী গোঁড়া হিন্দু সমাজের নারী শিক্ষা সম্পর্কে সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। সরকার থেকে বেসরকারী নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। এ জন্য সরকারী তহবিল থেকে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা হয়। অর্ধ শতাব্দী বাদে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ দেখা যায় ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩২,১৪,৮৬০ জন নারী শিক্ষার্থী শিক্ষা পাচ্ছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী অগ্রগতি :—

১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়। বিগত দেড়শ' বছরের নারী শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় বর্তমান শতকে সংখ্যা ও গুণগত দু'দিক থেকেই নারী শিক্ষার উন্নতি হয়েছে। এই যুগের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। বিগত শতকেও নারীর যে সামাজিক মর্যাদা ছিল আজকের দিনে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নারী আজ পুরুষের সাথে সমান অধিকার ভোগ করছে। বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেয়েরা আর পিছিয়ে নেই। বিগত শতকের সাথে তুলনামূলক বিচার করে দেখলে নারী সমাজের অগ্রগতি বিস্ময়কর বলে মনে হবে। কিন্তু সারা ভারতের নারী সমাজের সামগ্রিক অবস্থার কথা বিচার করে দেখলে দেখা যাবে আমরা পিছিয়ে আছি। নারী শিক্ষায় যতটুকু প্রসার স্বাধীনতার পূর্বে হয়েছিল তা প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ ভারতের অগণিত নারী তখনও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। শহরে মেয়েদের জন্য বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্কুল যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গ্রামে তা হয় নি। সরকারও নারী শিক্ষার জন্য পল্লী অঞ্চলে বিশেষ কিছু করে নি। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেদের সাথে মেয়েরাও শিক্ষা পেত তাই গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সামান্য প্রসার ঘটেছিল কিন্তু মাধ্যমিক কি উচ্চ শিক্ষার কোন সুবিধা গ্রামে ছিল না। একে অর্থের অভাব তারপর সরকারী উদাসীনতা দুই

মিলিয়ে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের নারী শিক্ষার চিত্রটি খুবই হতাশাজনক। দেশ স্বাধীন হবার পর নারীশিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়। ভারতের শাসনতন্ত্রে পুরুষের সাথে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র নারীর অবাধ অধিকার বিস্তার লাভের পথে আর কোন বাধা রইল না। নারী শিক্ষার অবস্থা সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখা যায় ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ১৬,০৫১টি প্রতিষ্ঠানে ৩৫,৫০,৫০৩ জন ছাত্রী নানারূপ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীঃ দেখা যায় ২৬,৪৫২টি নারী প্রতিষ্ঠানে ৯৯,৯৭,৩৩৯ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে।

১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আনুমানিক ৭৫ লক্ষ মেয়ে শিক্ষা পেত। স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের মেয়েদের মধ্যে প্রতি ৪ জনে ১ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ দেখা যায় ৫৫,২৩,৭১৯ জন অর্থাৎ মোট মেয়ে শিক্ষার্থীর ৭৯·২% মেয়ে ছেলেদের সাথে একই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। মেয়েদের শিক্ষার আর একটি দিক হচ্ছে শোচনীয় অপচয়। মেয়েদের মধ্যে দেখা গিয়েছে শতকরা ৬০ জন তাদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে না। যারা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৪০ জন ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া চালিয়ে যায়। এর ফলে বাকী ৬০ জনের জন্য যে সময়, শ্রম ও অর্থ নিয়োগ করা হয়, তার সবটাই ব্যর্থ হয়।

পল্লী অঞ্চলের অবস্থা :—

পল্লী অঞ্চলে অভিভাবকগণ এখনও মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে ততটা সজাগ নয়। লেখাপড়ার জন্য মেয়েদের পাঠশালায় পাঠাবার চেয়ে ঘরের কাজে সাহায্যের জন্য মেয়েদের প্রয়োজন এখনও পল্লী অঞ্চলে বেশী। মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করে বা পল্লী অঞ্চলে প্রচার করে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার আয়োজন আজ পর্যন্ত এদেশে সামান্যই হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ খ্রীঃ শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য ২৮৪টি শহরে ও ৭৯৯টি শহরে ছেলে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। এই সময় গ্রামাঞ্চলে ৮,৯৫৯টি গ্রামে শুধু মাত্র ছেলেদের জন্য এবং ৩০,৩১৭টি গ্রামে ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করা হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন না হলে মেয়েদের শিক্ষায় যে বিরাট অপচয় হচ্ছে তা রোধ করা সম্ভব হবে না। এই অপচয় রোধ করতে না পারলে নারী শিক্ষা প্রসারের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ৬-১১ বছরের মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে এ অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। অবশ্য শিক্ষাকে বাধ্যতা-মূলক করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পল্লীর অভিভাবকদের মনোভাবের পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। তাহলে শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা মেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে আনবে না। এর সাথে শিক্ষার পাঠক্রমেরও কিছুটা পরিবর্তন করে বৈচিত্র্য সাধন করতে হবে। সাংসারিক

প্রয়োজনের সাথে শিক্ষার একটা নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে অভিভাবকগণ শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বিলাস বলে মনে করবেন না। বাস্তব জীবনের সাথে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে একথা বুঝতে পারলে তারা উপযাচক হয়ে স্কুলে পাঠাবেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ শহরে প্রতিষ্ঠিত। গ্রাম অপেক্ষা শহরে মেয়েদের সুযোগ সুবিধা বেশী ; অভিভাবকেরাও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত। তাই দেখা যায় দেশ স্বাধীন হবার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হলে স্বাভাবিকভাবেই অধিক সংখ্যক ছাত্রীর মধ্যে পরবর্তী স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় সুযোগ না থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এ বৃদ্ধি ভারতের বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় অতি সামান্য।

মধ্যশিক্ষায় নারী

খ্রীষ্টাব্দ	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	মিশ্রবিদ্যালয়ে ছাত্রীর হার	প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা
১৯৫১-৫২	২৮৬৩	৯,০৪,৭৫৫	২৯'৫	৩৬,২৯৫
১৯৫২-৫৩	৩০০৭	৯,৮৭,৬৪৫	২৯'৭	৪৫,৫০৯
১৯৫৩-৫৪	৩২৬৮	১০,৯২,৬২১	৩০'৭	৫৯,৮৮৮
১৯৫৪-৫৫	৩৪০২	১১,৯৭,৭০০	৩২'১	৬৫,৪৮১
১৯৫৫-৫৬	৩৯২০	১৩,৪০,০৭১	৪০'২	৭২,৩২৮

[*Education in India To-day and To-morrow—By S. N. Mukherjee.*]

মধ্যশিক্ষায় নারী :

মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের অন্যতম অন্তরায় পল্লী অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব। বিদ্যালয় না থাকায় মেয়েদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এ অসুবিধা দূর করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। পল্লী অঞ্চলে প্রয়োজন হলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সুপারিশ অনুসারে গ্রামে যেখানে মেয়েদের জন্য আলাদা করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব নয় সেখানে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। *National Committtee on Women's)Education* মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসকে দ্রুততর করবার জন্য প্রস্তাব করেছেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির নিয়ম শিথিল করতে হবে। অবৈতনিক শিক্ষার সুবিধা সম্প্রসারিত করতে হবে। ছাত্রীনিবাসের ব্যাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে ও ছাত্রীনিবাস তৈরীর জন্য বিদ্যালয়গুলির আর্থিকসাহায্য দিতে হবে। যাতায়াতের সুবিধা ও বিনা মূল্যে বিদ্যালয়ে টিফিন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

মেয়েদের পাঠক্রম :—

মেয়েদের পাঠক্রম সম্পর্কে একটি দীর্ঘস্থায়ী অভিযোগ রয়েছে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের প্রায় একই পাঠক্রম অনুসরণ করতে হয়। এখন মেয়েদের জন্য কয়েকটি বিশেষ ঐচ্ছিক বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েদের জন্য Stream রয়েছে—যাতে মেয়েরা নিজেদের রুচিমত বিষয় বেছে নিয়ে পড়তে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে দু একটি স্কুলেই *Home Science* বা *Fine Arts Group* এর বিষয় পড়ার ব্যবস্থা আছে। মানবিক শাখার প্রাথমিক গার্হস্থ্য বিজ্ঞানই মেয়েদের একমাত্র নেবার মত বিষয়।

মেয়েদের পাঠক্রম রচনায় আরও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। ছেলেদের সাথে একই পাঠ্যপুস্তক পড়ে পরীক্ষায় পাস করা আর অধীত বিদ্যাকে পরবর্তী জীবনে কাজে লাগান এক কথা নয়। সংসারের যে ক্ষেত্রটিতে মেয়েরা অবাধ আধিপত্য করবে সেই দিকের কথা ভুলে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় তারা বাস্তব ক্ষেত্রে খুব বেশী উপকৃত হবে না। সাধারণ শিক্ষার সাথে সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের প্রয়োজন বিচার করে মেয়েদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রম রচনা করতে হবে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমতী হংসরাজ মেটার সভানেত্রীত্বে মেয়েদের জন্য পাঠক্রম রচনা সম্পর্কে জাতীয় নারী শিক্ষা সমিতি সুপারিশ করেছেন যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বালক-বালিকাদের শিক্ষাক্রম ও শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ সম্পূর্ণ এক করতে হবে। তাঁদের মতে রান্না ও সেলাইয়ের কাজ ও অন্যান্য গার্হস্থ্যবিদ্যা স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়। তাঁরা বলতে চান শুধু মেয়েরাই ঘরের কাজ আর সন্তান পালনের দায়িত্ব বহন করবে কেন? মেয়েপুরুষের দৈহিক গঠন ও জৈবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রকৃতি নির্ধারিত যে যে পার্থক্য রয়েছে তা শ্রীমতী মেটার দল অস্বীকার করলেও শত চেষ্টায়ও এ পার্থক্যটা ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রীমতী মেটার সভানেত্রীত্বে কমিটি যে সুপারিশ করেছেন তা ভারতের অগণিত নারী সম্পর্কে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়। সোসাইটি গার্লস বলে, যে নারী সমাজ আমাদের দেশে গড়ে উঠছে তারা ভারতের নারী সমাজের প্রতিনিধি নয়। যে সমাজে সন্তান পালনের দায়িত্ব আয়া, গভর্ণেসের উপর ন্যস্ত, পারিবারিক দায় সামলাবার জন্য বয়, বাবুর্চি, বেয়ারা রয়েছে তাদের নিয়ে পল্লীময় ভারতের নারী-সমাজের প্রয়োজনের কথা বিচার করলে ভুল করা হবে। পাশ্চাত্য মনোভাব সম্পন্ন নারীদের প্রয়োজন, আর ভারতীয় নারী সমাজের প্রয়োজন এক নয়। নারীর সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা বিচার করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠক্রম রচনা করতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ভারতের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কনভেণ্টে শিক্ষিতা যে সমাজের সাথে নারী সমাজের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই তারাই ভারতীয় নারী সমাজের প্রতিনিধিরূপে আমাদের দেশের নারী শিক্ষার পাঠক্রম রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

॥ মুদালিয়র কমিশনের অভিমত ॥

আমাদের দেশে নারী-পুরুষের সমান অধিকার আজ সর্বত্র স্বীকৃত। কর্মক্ষেত্রে সে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। নারীর কর্মক্ষেত্র পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা আজ কোন শিক্ষিত মানুষ চিন্তা করে না। তবু গৃহকর্ত্রীরূপে, জননীরূপে তাঁর কতকগুলি দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব যাতে সুষ্ঠুরূপে সে পালন করতে পারে তার শিক্ষায় সে ব্যবস্থাও থাকবে। মুদালিয়র কমিশন বর্তমান যুগের দাবীকে মেনে নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাই নারী-শিক্ষায় পাঠক্রম নির্ধারণের মূলনীতি হওয়া উচিত। কমিশন বলেছেন—

"If greater attention is given on Home Science with special emphasis on practical work of every day needs and problems, it will help to bridge the gulf between the school and the life of home and the community, and be a better preparation for a girl's life after school, in which home making will necessarilly play an important part. An educated girl who cannot run her home smoothly and efficiently, within her resources can make no worth-while contribution to the happiness and well being of her family or to raising the social standards in her country."

॥ উচ্চশিক্ষা ॥

মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সাথে মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষারও প্রসার হয়েছে। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ মেয়েদের জন্য কলা বিজ্ঞান কলেজের সংখ্যা ছিল ১০৪টি, বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ২৮টি ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ছিল ১৪টি। কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষারত শিক্ষার্থী ৮৩,৪২৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪৪,২৮৫ জন্য ছাত্রী অর্থাৎ ৫৩·১% ছেলেদের কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করত। বৃত্তি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষারত ছাত্রীদের মধ্যে ৬৪ ৩% ছাত্রী ছেলেদের কলেজে শিক্ষালাভ করত।

উচ্চশিক্ষার জন্য সর্বত্র মেয়েদের জন্য কলেজ না থাকায় সহশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন আপত্তি উঠে নি। উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে।

উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠক্রমের ব্যবস্থা নেই। মেয়েদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন মেটাবার জন্য কয়েকটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তা দিয়ে সীমাবদ্ধ ভাবে মেয়েদের প্রয়োজন মেটান সম্ভব। ভারতে শুধুমাত্র *S N.D.T.* নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী জীবনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯২২ খ্রীঃ এলাহাবাদের নারীদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়াগে মহিলা বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়। বিদ্যাপীঠ পরিচালিত বিদ্যাবিনোদিনী, সুগৃহিনী, বিদুষী, সরস্বতী ভারতী

পরীক্ষা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভারতের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষায় মেয়েরা আজ পিছিয়ে নেই। বৃত্তিশিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা ছেলেদের সাথে একই শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষিকাবৃত্তি মেয়েরা সর্বাধিক গ্রহণ করছে। সেবাব্রতে নারীদের অধিকার একচেটিয়া। সরকার থেকে পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় বহু মেয়েকে গ্রাম সেবিকার কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষায় নারী—১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ

বৃত্তি	ছেলেদের কলেজে ছাত্রী সংখ্যা	মেয়েদের কলেজে ছাত্রী সংখ্যা	ছেলেদের স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা	মেয়েদের স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা
কৃষি	৩৩	×	×	১৪
ব্যবহারিক শিল্পকলা	২২৩	×	×	×
বাণিজ্য	৩১০	×	×	×
শিক্ষা	১৬৯২	১৬৫৩	৪২১২	১৯,১১২
ইঞ্জিনীয়ারিং	৪০	×	৫১	×
আইন	৩৭৩	×	×	×
চিকিৎসা	৩৩৭৪	৪৯৭	২৫৪	২০২৭
দেহচর্চা	১০৮	×	২৯৩	×
কারিগরীশিক্ষা	৫৮	×	১৬৩	×
পশুচিকিৎসা	১৩	×	×	×
সঙ্গীত	১২২০	১০৭৭	২১৬৩	৩০৯০
নৃত্য	৪১	×	৯৪	১৮৬
অন্যান্য চারুকলা	১৮১	৭০২	৪০৩	৯৮
হস্তশিল্প	×	×	১৯৮৯	১২,৯৯৬
অন্যান্য শিল্প	×	×	৯৯৩	৯৭৭৬

[*Education in India* (1955-56)]

জাতীয় নারীশিক্ষা কমিটি (*National Committee on Women's Education*) :—

দেশ স্বাধীন হবার পর স্ত্রীশিক্ষার জন্য আগ্রহ বেড়ে যাবার ফলে স্ত্রীশিক্ষার কিছুটা প্রসার হয়েছে। নারীশিক্ষার এই প্রসার প্রধানতঃ শহর ও শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। নারীশিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নারীদের বৃত্তি শিক্ষা, বয়স্কা নারীদের শিক্ষা, নারী শিক্ষার অপচয় নিবারণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তদন্ত ও প্রয়োজনীয়

সুপারিশ করবার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৮ খ্রীঃ ১৯শে মে, শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখকে সভানেত্রী করে একটি কমিটি গঠন করেন। নারীশিক্ষার অতীত ইতিহাস ও বর্তমান সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করে নারী শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহু সুপারিশ করে কমিটি ১৯৫১ খ্রীঃ সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। বিভিন্ন সুপারিশের মধ্যে প্রধান কয়েকটি সুপারিশ এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

জাতীয় নারী শিক্ষা কমিটির সুপারিশ :—

১। কমিটি বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীশিক্ষাকে একটি প্রধান সমস্যা বলে গণ্য করতে হবে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কর্মনীতি গ্রহণ করতে হবে।

২। যথা সম্ভব শীঘ্র কেন্দ্রে *National Council for the Education of Girls and Women* গঠন করতে হবে। প্রতিরাজ্যেও নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য *State Council* গঠন করতে হবে।

৩। নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসারের দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য একজন *Joint Educational Adviser* নিযুক্ত করতে হবে।

৪। নারী শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি ভিন্ন বিভাগ (*unit*) সৃষ্টি করতে হবে।

৫। প্রতিরাজ্যে নারী শিক্ষার দায়িত্ব একজন মহিলার উপর ন্যস্ত করতে হবে। এজন্য একটি *Joint Director* এর পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৬। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীশিক্ষার জন্য অতিরিক্ত দশকোটি টাকা ও তৃতীয় পরিকল্পনায় উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে শিক্ষিকা নেই সেখানে 'গুরুমা' (*School Mother*) নিয়োগ করতে হবে।

৮। মিডল স্কুল স্তরে অধিক সংখ্যায় সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে পৃথক স্কুল স্থাপন করতে হবে। কমিটি সহশিক্ষার জন্য সুপারিশ না করলেও প্রয়োজন হলে এ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিরোধিতা করে নি। দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষায় উৎসাহ দেবার জন্য যথারীতি সুযোগ দেবার সুপারিশ করা হয়েছে। এজন্য বই দিয়ে ও উপস্থিতির জন্য বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

৯। প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের জন্য একই পাঠক্রম হবে। এই স্তরেও মেয়েদের জন্য সূচী কার্য, শিল্প, অংকন, হস্তশিল্প প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০। মিডল ও মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়েদের ভিন্ন পাঠক্রম রচনা করতে হবে, তবে সম্পূর্ণ পৃথক পাঠক্রম রচনা করা হবে না।

১১। রাজ্য সরকারসমূহ শিক্ষিকাদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন ও যে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের সংখ্যা কম সেখানে শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন।

১২। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে বৃত্তি শিক্ষার জন্য সাধারণ শিক্ষার সাথে সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। এজন্য বৃত্তি শিক্ষার ভিন্ন ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হলে বৃত্তি শিক্ষার জন্য ভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩। বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে।

১৪। শিক্ষিকাদের চাকুরীর উন্নতির জন্য কমিটি, অধিকতর বেতন ও ট্রিপিল বেনিফিট স্কীম চালু করবার সুপারিশ করেন।

কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রে *National Council For Women's Education* গঠন করেছেন। একজন চেয়ারম্যান ও ২৪ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে কমিটির সুপারিশ অনুসারে মেয়েদের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম নির্ধারণ করবার জন্য শ্রীমতী হংসরাজ মেটার সভানেত্রীত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সে কথার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ছেলেদের ও মেয়েদের একইরূপ পাঠক্রমের সুপারিশসহ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান অবস্থা ঃ—

শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক পিছনে রয়েছে। শ্রীমতী দেশমুখ কমিটির সুপারিশসমূহ কার্যকরী করা হয়েছে। প্রায় রাজ্যেই পল্লী ও শহর অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে। নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তবুও অবস্থার খুব উন্নতি হয় নি। ১৯৬১ খ্রীঃ *National Council for Women's Education* এক সাব-কমিটি গঠন করে অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে বলেন। কমিটি মিড্‌ল স্কুলের উত্তীর্ণ মেয়েদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলেছেন ও পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। ভারত সরকার নিয়োজিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৫) এ সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তা উদ্বেগজনক।

মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের আনুপাতিক হার

বছর	ছেলে	মেয়ে	মোট
১৯৫০-৫১	৮৩·৬	১৬·৪	১০০·০
১৯৫৫-৫৬	৮৪ ০	১৬·০	১০০·০
১৯৬০-৬১	৮১·৫	১৮·৫	১০০·০
১৯৬১-৬২	৮১ ২	১৮ ৮	১০০·০
১৯৬২-৬৩	৮০·৯	১৯·১	১০০ ০
১৯৬৩-৬৪	৮০·১	১৯·৯	১০০·০
১৯৬৪-৬৬ (আনুমানিক)	৭৮·৭	২১·৩	১০০·০

॥ ভক্তবৎসলম কমিটি ॥

অবস্থার কি করে উন্নতি করা যায় সেজন্য মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম্‌কে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠিত হয়। শিক্ষায় অনগ্রসর রাজ্যগুলির সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করে সমগ্র দেশের নারী-শিক্ষার উন্নতিকল্পে কমিটি যে সব সুপারিশ করেছেন তা কি করে কার্যকরী করা যায় 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা কমিশন' সেই সম্পর্কে বিচার করে তাঁদের অভিমত জানাবেন আশা করা যায়।

কমিটি সুপারিশ করেছেন, নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য নিম্নক্ষেত্রে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করতে হবে। বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা, সাধারণের সাহায্য ও শ্রমে স্কুল গৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিকাদের জন্য গৃহের ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষায় সহ-শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলা, শিক্ষিকা বৃত্তির মর্যাদা বাড়ান ও বৃত্তি গ্রহণে মেয়েদের উৎসাহিত করা, আংশিক কাজরূপে শিক্ষিকার পদ গ্রহণে বা গুরুমার (*school mother*) পদ গ্রহণে মেয়েদের উৎসাহিত করা, স্কুলে দিনে খাবার দেওয়া, গরীব মেয়েদের স্কুল পোষাক ও বই দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

মেয়েদের শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য, জনমত গঠন করবার জন্য সেমিনার, সম্মেলন, রেডিও, প্রচারপত্র, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতি পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকবে যাতে যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করল তারা পরবর্তী স্তরের শিক্ষার সুযোগ পায়।

স্কুলের কাজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। যথাসম্ভব অধিক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। বিবাহিতাদের স্কুলের চাকুরী গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য মাইনা বাড়িয়ে ও অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করে মেয়েদের আকৃষ্ট করতে হবে, যাতে অন্য বৃত্তি ছেড়ে তারা শিক্ষিকার বৃত্তি গ্রহণ করে।

গ্রামে হোস্টেলের সুবিধাযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করলে স্থানীয় মেয়েরা সেদিকে আকৃষ্ট হবে।

পরিদর্শিকা নিয়োগ করা হবে যারা অপচয় (*Wastage*) রোধ করবার চেষ্টা করবে।

মাধ্যমিক স্তরে সমস্ত মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে, না হলে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় অভিভাবকদের পক্ষে মেয়েদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়।

পঃ বঙ্গে নারীশিক্ষার অবস্থা ঃ—

পঃ বঙ্গে নারীশিক্ষার উন্নতি ও প্রসার কল্পে (*State Council For Women's Education*) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীশিক্ষা সম্পর্কীয় পরিকল্পনা ও কাজের সংহতি বিধানের জন্য একজন মহিলা অফিসার নিয়োজিত হয়েছেন। মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব একজন প্রধান পরিদর্শিকার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি

প্রদেশের তুলনায় পঃ বাংলার নারী শিক্ষার অবস্থা কিছুটা ভাল হলেও সামগ্রিকভাবে বিচার করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার থেকে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গ্রামে শিক্ষিকার অভাব দূর করবার জন্য শিক্ষিকাদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই প্রথা প্রবর্তনের এক বছর বাদে ১৯৫৯-৬০ খ্রীঃ দেখা যায় প্রায় ৪৬,০০০ ছাত্রী এই ব্যবস্থায় উপকৃত হয়েছে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অভাবগ্রস্ত বালিকাদের বই কেনার জন্য সাহায্য করা হয়। যারা শিক্ষিকাবৃত্তি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের সাহায্যের জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে উপস্থিতির জন্য ছাত্রীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুলে গুরুমা (*School mother*) নিয়োগ ও তাদের শিক্ষণের একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে মেয়েদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য গ্রামে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সরকারী তৎপরতার অভাবে কাজ খুব ভাল হয় নি।

উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের সর্ববিধ সুযোগ দেবার চেষ্টা হচ্ছে। সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহে তাদের সবরকম সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মেয়েদের কয়েকটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সর্বক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় যোগ দিচ্ছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী পরিকল্পনা পঃ বাংলা গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাকে রূপ দিতে গিয়ে যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সেজন্য পঃ বাংলার নারী শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা অত্যন্ত হতাশজনক। একসময়ে বাংলা দেশ ছিল শিক্ষায় সবচেয়ে অগ্রবর্তী। নারী শিক্ষায় সব প্রদেশ বাংলা দেশকে অনুসরণ করত। বর্তমানে বাংলা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বহু রাজ্যের পিছনে। সাক্ষর নারীর সংখ্যা বিচারে পঃ বাংলার স্থান বর্তমানে ৭ম। কেরলে ৬-১১ বছরের সব মেয়েই বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। মাদ্রাজ ও মহীশূরে ৬৩% মেয়ে এই সুবিধা পাচ্ছে। পঃ বাংলায় ৬-১১ বছরের মেয়েদের ৫০·৭% প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ৬-১১ বছরের ৭৩·৩% মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থির হয়েছিল। এ আশা কোন রূপেই পূর্ণ হয় নি। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ৬৫% মেয়েকেও আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দিতে পারি নি। প্রাথমিক শিক্ষার যখন এই অবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা আরও খারাপ। নারী শিক্ষিতের হার কম হবার জন্য পঃ বাংলায় মোট শিক্ষিতের হার স্বাভাবিক ভাবেই নীচের দিকে রয়েছে।

শিক্ষিকার অভাব নারী শিক্ষার প্রসারের অন্যতম কারণ বলা হয়। পঃ বাংলায় শিক্ষকের অনুপাতে শিক্ষিকার হার ১৪%। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিকা সংগ্রহ করা কঠিন।

গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিকাদের জন্য আবাস গৃহ নির্মাণ করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। আঞ্চলিক আবাসিক ট্রেনিং স্কুলের পরিকল্পনা প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় অর্থের। সামগ্রিক ভাবেই শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় অর্থের অনটন। শিক্ষিকার অভাব বর্তমানে খুব বড় বাধা বলে গণ্য হবে না। যদি সুষ্ঠু শিক্ষণ ব্যবস্থা করা যায় তাহলে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার সম্ভব হবে। নারীশিক্ষায় পঃ বাংলা এক সময় যে গৌরবের স্থান ছিল তাকে ফিরে পেতে হলে সরকারের আত্মতুষ্টির মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় হচ্ছে তার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং তার প্রধান অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। পঞ্চম পরিকল্পনায় যাতে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় পঃ বাংলায় শিক্ষা বিভাগকে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।

নারীশিক্ষা ঃ—

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে নারীশিক্ষা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও বহু প্রকার বৃত্তি শিক্ষার দ্বারা নারীদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে যে সব ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশ কল্পনার বাইরে ছিল সেখানেও নারীরা আজ কৃতিত্বের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৪৯-৫০ খ্রীঃ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭,০৮,০০৭ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫০,৩৪,৭৪০ জন— প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিল ১২,৩০৬ জন, ১৯৫৮-৫৯ খ্রীঃ উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী হয় ৪,৮১,০০৬ জন, মিডল স্কুলে ১৩,৬৪,১০৭ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৪,৮২,২৫৬ জন, প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬২,৬০৫ জন অর্থাৎ দশ বছরে ছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলেদের তুলনায় এ বৃদ্ধি খুব উৎসাহ-ব্যঞ্জক ছিল না। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ জন ছেলে প্রতি শতকরা ২২ জন মেয়ে স্কুলে পড়ছিল, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ জন ছেলে প্রতি ৪৬ জন মেয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছিল। কি করে ছেলেমেয়ের শিক্ষার হারের পার্থক্য কমান যায় ও নারী-শিক্ষার প্রসার হয় সেজন্য ভারত সরকার শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের সভানেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the Development of women's education in West Bengal [B. T. 1963]
2. Trace the development of women's education in independent India and state in its problems.

———

শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস

তৃতীয় পর্ব

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ঃ মুদালিয়র কমিশন ঃ
কোঠারী কমিশন ঃ পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনা ও শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন
বা
রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯)

॥ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ॥

ইংরেজ শাসনকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু দেশের ক্রমবর্দ্ধমান উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না। দেশ ভাগ হবার পর ভারতে সরকার অনুমোদিত ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এর মধ্যে রাজপুতনা, গৌহাটি, পূর্ব পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭ খ্রীঃ স্থাপিত হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার দাবী মেটাবার জন্য দেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। স্বাধীনতা লাভের পর উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। এছাড়া ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিভিন্ন সময় গড়ে ওঠায় ও তাদের মধ্যে সাধারণ যোগসূত্রের অভাবে সংগঠন ও প্রকৃতিগত বৈষম্য থাকার ফলে সর্বভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে মানের দিক থেকে একটা বিরাট বৈষম্য দেখা দেয়। বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে গড়ে উঠেছিল দেশ স্বাধীন হবার পর সে শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন পটভূমিকায় দেশের পক্ষে উপযোগী কি না, সে বিষয়টি চিন্তা করবার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের শিক্ষার প্রসারের জন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না। কতকটা প্রয়োজনের তাগিদে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পিছনে সক্রিয় ছিল।

সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তিত নতুন পটভূমিকায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষার প্রশ্নটিকে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য এক কমিশন নিয়োগ করেন। ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪৮ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে প্রখ্যাত ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ ছাড়াও তিন জন বৈদেশিক শিক্ষাবিদ্‌কে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। ডাঃ তারাচাঁদ, ডাঃ জাকীর হোসেন, ডাঃ জেমস, এফ. ডাফ. ডাঃ আর্থার ই, মরগ্যান, ডাঃ এ. লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ করম নারায়ণ ভল, ডাঃ টিগার্ট ও ডাঃ নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত (সম্পাদক) কমিশনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। এই কমিশন রাধাকৃষ্ণণ কমিশন নামেই শিক্ষা জগতে সমধিক খ্যাত।

॥ কমিশনের বিচার্য্য বিষয় ॥

কমিশনের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ (*Terms of Reference*) বিচার বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়।

১। ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

২। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গঠনতন্ত্র, নিয়ন্ত্রণ, কার্যধারা ও সীমার (*Constitution control, function and jurisdiction*) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ।

৩। অর্থনৈতিক অবস্থা।

৪। বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনস্থ কলেজীয় শিক্ষার সর্বোচ্চ মান রক্ষা।

৫। মানবিক বিষয় (*Humanities*) ও বিজ্ঞান বিষয় এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার সমতা রক্ষা করে পাঠক্রম নির্ধারণ ও পাঠক্রম সমাপ্তির সময় নির্ধারণ।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মান নির্ধারণ।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম।

৮। ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন, চারুকলা সম্পর্কে উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা।

৯। আঞ্চলিক বা অন্য কোন ভিত্তিতে আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা।

১০। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে সময় ও শক্তির অপচয় না করে বিভিন্নমুখী জ্ঞানের উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা।

১১। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা।

১২। দিল্লী, আলিগড় ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমস্যাসমূহের আলোচনা।

১৩। অধ্যাপকদের যোগ্যতা, চাকুরীর অবস্থা, বেতন, অন্যান্য সুখ সুবিধা ও মৌলিক গবেষণার উৎসাহ দানের ব্যবস্থা।

১৪। শিক্ষার্থীদের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা, হোস্টেলের ব্যবস্থা।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উচ্চতর গবেষণার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিচার বিবেচনার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করা হয়।

কমিশনের সদস্যগণ দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু কলেজের কার্যপদ্ধতি পরিদর্শন করেন ও দেশের শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনা করেন। দেশের শিক্ষা সমস্যার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য তাঁদের সুচিন্তিত সুপারিশসমূহ ৭৪৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন।

॥ উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ॥

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিশন বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা সমস্যা অনিবার্যভাবেই নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাই নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দেশের এই পরিবর্তিত অবস্থায় উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র উভয়ই প্রসারিত হয়েছে। এজন্য উচ্চশিক্ষার এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনার ব্যাপারেও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীরা দেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক নেতৃত্ব গ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে যেন শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়েও নেতৃত্ব গ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ভারতের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হ'লে দেশের সাধারণ শিক্ষা, যান্ত্রিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। দেশের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যার প্রসার, নতুন জ্ঞানের সন্ধান, জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ, সমাজের নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা প্রভৃতি সর্বদিকে বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উচ্চশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে উচ্চতর ভাবধারা ও সমাজ জীবনের নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের বিশ্বাস ও স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতায় শ্রদ্ধা, মানব কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা এসব মানবিক গুণসমূহ শিক্ষার্থীর জীবনের সকল কাজে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই ভাবরাজির ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাবিদগণ স্বীকার করেছেন সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশ্ব সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণার সৃষ্টিতে ও জীবনে সংহতি সাধনে সহায়তা করা। জ্ঞানের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই এ সম্ভব। কতকগুলি বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করে বিচ্ছিন্নভাবে জানলেই জীবনের পূর্ণতা আসে না। খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকাশ পেলেও জ্ঞান এক ও অখণ্ড। সত্য বহুভাবে প্রকাশিত হলেও জীবন একটি অখণ্ড সত্তা এ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ বহুবিষয়ে শিক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের পরিপূর্ণ অখণ্ড রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কোন একটি বিষয় জানলেই জ্ঞান হয় না। তাঁদের আদর্শ হচ্ছে—জ্ঞানম্ বিজ্ঞান সহিতম্ (*Wisdom along with knowledge*) একজন মন্ত্রোবিদ (*knower of Texts*) হলেই আত্মবিদ (*knower of soul*) হয় না। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞার উন্মেষ। তাই কমিশন বলেন "*...education is both a training of minds. training of souls ; it should give both knowledge and wisdom.*"

যে নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলতে যাচ্ছি তার সমাজ দর্শন সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা যে সভ্যতাকে রূপ দিতে চাই সমাজ দর্শনের মধ্যে তার সন্ধান মিলবে। আমরা কি করতে চাই সে সম্পর্কে স্থির লক্ষ্য না

থাকলে আমাদের যুব সমাজকে কি শিক্ষা আমরা দেব তা স্থির করতে পারব না। জগতে বিভ্রান্তকর অস্থিরতার মধ্যে (*in a world of bewildering change*) আমাদের প্রয়োজন একটা স্থির লক্ষ্যের।

ভারতে আমরা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি। প্রতিটি নাগরিক যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার (*justice*) পায়, চিন্তায় অভিব্যক্তিতে. ধর্মবিশ্বাসে স্বাধীনতা (*Liberty*) পায়, সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ও সুযোগ (*Equality*) লাভ করে ও ব্যক্তিগত আত্ম-সম্মান ও জাতির ঐক্য (*Fraternity*) ও সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা যায়, আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজের তাই লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আধ্যাত্মিক সত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সফল করতে হলে প্রয়োজন সামাজিক ন্যায় বিচার (*social justice*) সমাজকে দারিদ্র, বেকারত্ব, অপুষ্টি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করতে হবে। শুধু তাই নয় বিভেদকারী যে শক্তি সমাজজীবনে সক্রিয় তাকে জয় করে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবার শক্তি অর্জন করতে হবে। ন্যায় বিচার থাকলেই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য কারিগরি শিক্ষা, সমাজে নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা ও সুশাসক হবার শিক্ষা দিতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের চিন্তা ও অভিব্যক্তির সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থাকবে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীন মনোভাব সৃষ্টির জন্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হবে স্বয়ংশাসিত। শিক্ষায় সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে কোনরূপ বৈষম্য থাকবে না। সবার থাকবে সমান অধিকার, সমান সুযোগ সুবিধা। উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র শিক্ষক, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে আবাসিক বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে ছাত্র শিক্ষকের প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই সোভ্রাতৃত্ববোধ থেকেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের সৃষ্টি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অপর রাষ্ট্রের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয়ের মধ্যে বিশ্বরাষ্ট্রের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে দেশে দেশে ঐক্য ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

॥ শিক্ষক ॥

শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকদের উন্নত চরিত্র, শিক্ষাগত গুণ ও শিক্ষা দেবার দক্ষতার উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন বা যে কোন রকম সংস্কারের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী অধ্যাপকের সমাবেশ করা যাঁরা তাঁদের উপর ন্যস্ত বহুমুখী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম। শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে তার নিজ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করা। কিছু পরিমাণ তথ্য পরিবেশন করে বা কোন তত্ত্ব আলোচনা করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয় না। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলা ও তাদের মনে সমালোচনার আগ্রহ সৃষ্টি করাই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। যার ফলে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে খোলা মনে তাদের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোন একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। খাঁটি শিক্ষাব্রতী তাঁর আদর্শ

ও কর্তব্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তিনি তাঁর বিষয়কেই ভালবাসেন না যাদের তিনি শিক্ষা দেন তাদেরও ভালবাসেন। কয়জন ছেলে পরীক্ষায় পাশ করল সেই হিসেব করে বা তিনি কয়টি মৌলিক প্রবন্ধ লিখলেন তা দিয়ে শিক্ষকের গুণগত যোগ্যতার পরিমাপ সম্ভব নয়। অবশ্য এ দিকটা উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু যাদের তিনি শিক্ষা দেবেন তাদের মানুষ হয়ে উঠবার জন্য তাদের চরিত্র গঠনে কতটা সহায়তা করলেন তাও বিচার্য।

কমিশন তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন শিক্ষা পরিস্থিতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। শিক্ষার মানও অনেক নীচে নেমে গিয়েছে ও শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলহীনতার জন্য অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থের অভাবে আধুনিক সাজসরঞ্জাম বই পত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। গবেষণার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষকদের নিম্ন বেতনের জন্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয় না এর উপর শিক্ষক রাজনীতিবিদগণ (*Teacher Politicians*) অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছেন। দলীয় প্রভাবে অযোগ্য লোকও উচ্চপদ পাচ্ছে। শিক্ষা অপেক্ষা রাজনীতিতেই তাদের আগ্রহ বেশী। জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা যথাযথরূপে পালন করতে হলে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা দূর করে একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। কমিশন বলেন—"*the teacher is the corner stone of the arch of education he is no less if not more than books and curricula, buildings and equipment, administration and the rest.*

শিক্ষকদের গুরুদায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে কমিশন শিক্ষকদের প্রফেসর, রীডার, লেকচারার ও ইনস্ট্রাকটর এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেন। এছাড়া কয়েকজন করে গবেষক (*Research Fellow*) থাকবেন। শিক্ষকদের পদোন্নতি নির্ভর করবে তাঁদের দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের উপর। প্রত্যেক শিক্ষককে ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করতে হবে। যোগ্য শিক্ষকেরা কর্মক্ষম থাকলে তাদের কার্যকাল ৬৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ান চলবে। শিক্ষকদের চাকুরীর অবস্থা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, কাজ করবার সময়, ছুটি প্রভৃতি স্থির করে দিতে হবে।

॥ শিক্ষার মান ॥

কমিশনের সামনে যে সব বিচার্য্য বিষয় ছিল শিক্ষার মান উন্নয়ন তার মধ্যে অন্যতম। কমিশন বলেন শিক্ষা ও পরীক্ষার সর্বোচ্চ মান রক্ষাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের প্রাথমিক কর্তব্য। কমিশনের অভিমত হচ্ছে—"*If our universities are to be the makers of future leaders of thought and action in the*

country as they should be, our degrees must contain high standard of scholarly achievment in our graduates."

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কমিশন নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন বলে মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে শিক্ষার্থী কোন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা মাধ্যমিক কলেজে বার বছরের শিক্ষা শেষ করতে হবে। এজন্য বহুসংখ্যক মাধ্যমিক কলেজ (*IX—XII* শ্রেণী বা *VI—XII* শ্রেণী সমন্বিত) স্থাপন করতে হবে। দশম বা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করে যাতে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি মূলক শিক্ষার সুযোগ পায় সেজন্য বহুসংখ্যক বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

উচ্চ বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *refresher course* এর ব্যবস্থা করতে হবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় কমাবার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে ৩০০০ এর বেশী ছাত্র নেওয়া চলবে না। কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যা ১৫০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

পরীক্ষার দিনগুলি ছাড়া কলেজে সারা বছরে কাজের দিন (*Working days*) ১৮০ দিনের কম হবে না।

কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক কোন বিভাগের শিক্ষাতেই থাকবে না। শিক্ষার্থীরা পছন্দ মত বই পড়বে। অধ্যাপকগণ সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে পাঠ দেবেন। ছোট ছোট শ্রেণীতে (*Tutorials*) ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। গ্রন্থাগারে পড়ার সুব্যবস্থা থাকবে ও শিক্ষার্থীদের প্রচুর পরিমাণে লেখার অনুশীলন করতে হবে। গবেষণার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হবে।

॥ পাঠক্রম ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ॥

সাধারণ শিক্ষার নীতি ও শিক্ষা কিভাবে পরিচালিত হবে তা অবিলম্বে স্থির করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার বই এমনভাবে লেখা হবে যাতে শিক্ষার্থী স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার প্রণালী আয়ত্ত করতে পারে। তার কর্মে ও চিন্তায় সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের যেমন সুযোগ থাকবে তেমনি তার বৃত্তিগত আগ্রহও পরিতৃপ্ত হবে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃষিবিদ্যা চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। গ্রাম্য পরিবেশে কৃষিকলেজ ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কাজ আরও প্রসারিত করতে হবে। এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে *Institute of Agricultural* স্থাপিত হবে যেখানে দীর্ঘমেয়াদী কৃষিনীতি নিয়ে গবেষণা হবে। কৃষি শিক্ষা গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব যারা কৃষির সাথে জড়িত ও কৃষকের জীবনের সাথে পরিচিত তাদের উপরই ন্যস্ত থাকবে।

আইন শিক্ষার কলেজগুলি পুনর্গঠিত করে আইন বিষয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। আইন শিক্ষাকালীন কোন শিক্ষার্থীকে অন্য কোন বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স পড়তে দেওয়া হবে না। আইন বিষয়ক উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

চিকিৎসা বিদ্যার কলেজগুলিতে ১০০ জনের বেশী ছাত্র গ্রহণ করা হবে না। প্রতি ছাত্র পিছু কমপক্ষে ১০ জন রোগীর শয্যা নির্দিষ্ট থাকবে। ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যার গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ নীতি ও আদর্শের প্রেরণা থাকবে। সমাজের প্রতি ছাত্রের দায়িত্ব ও মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য বোধ জাগ্রত করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে নিজেদের বৃত্তির মধ্যেই যেন শিক্ষার্থীর ধারণা, কল্পনা প্রভৃতি সীমাবদ্ধ না থাকে।

॥ ধর্মশিক্ষা ॥

কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া শিক্ষা সমাপ্ত হতে পারে না, এজন্য কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ শুরু হবার আগে ছাত্রদের কিছুক্ষণ নীরবে ধ্যান করে চিত্তকে সংযত করে নিতে হবে। ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুদের জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয় বছর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে সার্বজনীন আবেদনপূর্ণ বাণী আলোচিত হবে। তৃতীয় বছর ধর্মতত্ত্বের মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

॥ শিক্ষার মাধ্যম ॥

উচ্চ শিক্ষার বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে এ প্রশ্নটি কমিশনের কাছে জটিল সমস্যারূপে দেখা দেয়। শিক্ষা সম্পর্কীয় কোন সমস্যাই শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে এত বিতর্কের সৃষ্টি করে নি। ভাষার প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে আছে জাতীয় ভাবপ্রবণতা। ইংরেজ বিদায় হবার সাথে সাথে ইংরেজীকে বিদায় দেওয়া হবে ও কোন একটি ভারতীয় ভাষাকে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষারূপে গ্রহণ করা হবে বলে অনেক উগ্র জাতীয়তাবাদীই স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্নটি এত জটিল যে খুব সহজে আর অবিলম্বে এর সমাধান সম্ভব নয় বলেই কমিশন মনে করেন।

কমিশনের কার্যকালে ভারতীয় সংবিধান চূড়ান্ত রূপ পায় নি। সর্বভারতীয় ভাষা (*Federal Language*) রূপে কোন ভাষা গৃহীত হবে তা সঠিক জানা না থাকলেও কমিশন হিন্দীকেই সমৃদ্ধ করে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রশ্নটি বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে কমিটি সুপারিশ করেছেন যে সর্বভারতীয় ভাষাকে (*Federal Language*) সমৃদ্ধ করবার জন্য আঞ্চলিক ভাষা ও অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ সম্ভার গ্রহণ করতে হবে ও বিভিন্নভাবে যে সব বৈদেশিক শব্দ ভারতীয় ভাষাসমূহে স্থান পেয়েছে সে সব শব্দ রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিভাষাকেই গ্রহণ করতে হবে। তবে সেগুলি ভারতীয় ভাষার উচ্চারণ ধ্বনির সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। উচ্চ শিক্ষার

বাহন হিসেবে ইংরেজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে অন্য কোন ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তরে শিক্ষার্থীকে তিনটি ভাষা—আঞ্চলিক ভাষা, সর্বভারতীয় ভাষা ও ইংরেজী শিখতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হবে। তবে ইচ্ছা করলে সর্বভারতীয় ভাষায় কোন একটি বিষয় বা সব বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সর্ব ভারতীয় ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা সমূহের উন্নতির জন্য বোর্ড গঠন করা হবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই লিখতে হবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ মাধ্যমিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে সর্বভারতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা করবেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইংরেজী শেখান হবে।

॥ পরীক্ষা ॥

কমিশন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রভাব ও তার কুফল সম্পর্কে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। কমিশন বলেছেন অর্ধ শতাব্দী ধরে বহু কমিশন ও কমিটি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি যে সবচেয়ে খারাপ দিক এই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। দিনের পর দিন পরীক্ষা ব্যবস্থার কুফল ভয়াবহরূপে প্রসার লাভ করেছে। তবু পরীক্ষা পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয় নি। কমিশন বলেছেন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাত্র সংস্কারও আমরা সুপারিশ করি তাহলে সে হবে পরীক্ষা সংস্কার, যারা পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিতে বলেন কমিশন তাদের সাথে একমত হতে পারেন নি, কারণ কমিশন মনে করেন পরীক্ষা সুপরিচালিত হলে তা দিয়ে অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। সুতরাং পরীক্ষা প্রয়োজনীয় হলে তার আমূল সংস্কার আরও বেশী প্রয়োজনীয় (*If examinations are necessary a through reform is still more necessary*)

কমিশন বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষার (রচনাত্মক পরীক্ষা) ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে বিষয়াত্মক বা বস্তুধর্মী পরীক্ষা (*Objective Tests*) সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন পরীক্ষাকে কি করে গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করেন। কিন্তু *Objective Test* এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষার কাঠামোর মধ্যেই এই দোষ ত্রুটি যতটা সম্ভব পরিহার করে কাজ চালাবার যোগ্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সুপারিশ কারছেন।

কমিশন প্রথমেই বলেছেন, সরকারী উচ্চপদে কর্মী নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হবে না। এজন্য নিয়োগ কর্তারা বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে, তাহলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান গলদ দূর করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে *Practical work* ছাড়া শ্রেণীর কৃতিত্ব বিচার করা হয় না। কমিশন সুপারিশ করেছেন, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন শ্রেণীর কাজের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পূর্ণমানের এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর পড়বার পর প্রথম ডিগ্রী দেওয়া হবে। একটি মাত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিন

বছরের অতীত বিদ্যার বিচার করা ঠিক নয়। এতে অনাবশ্যক ভাবে মানসিক চাপের সৃষ্টি হবে। তিন বছরের শেষে একটি মাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষা না নিয়ে তিন বছরে তিনটি পরীক্ষা হবে। তিনটি পরীক্ষার জন্য সমগ্র পাঠ্য বিষয়কে তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ *unit*-এ ভাগ করে নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিচার করে পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। একটি বিষয়ে অন্ততঃ পাঁচ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা না থাকলে কেহ পরীক্ষক নিযুক্ত হবেন না। পরীক্ষা রচনাধর্মী না করে যতটা সম্ভব বস্তুধর্মী (*objective*) করে তুলতে হবে। তাহলে রচনাধর্মী পরীক্ষায় নম্বর দেবার অসুবিধা অনেকটা পরিহার করা সম্ভব হবে। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেতে হলে শতকরা ৭০ নম্বর, দ্বিতীয় শ্রেণীতে শতকরা ৫৫ নম্বর ও তৃতীয় শ্রেণীতে শতকরা ৪০ নম্বর রাখতে হবে। গ্রেস মার্ক দেওয়ার প্রথা একেবারে তুলে দিতে হবে। স্নাতকোত্তর পরীক্ষা ও বৃত্তিগত পরীক্ষার ক্ষেত্রেই মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

॥ ছাত্র মঙ্গল ও শরীর চর্চা ॥

ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য একটা উপদেষ্টা সমিতি গঠন করতে হবে। ছাত্রদের নানারূপ সমাজ কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বছরে অন্ততঃ একবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিপ্রহরে অল্পমূল্যে আহার্য দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। শরীর শিক্ষার ডিরেক্টরের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতি প্রদেশে অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পর্যায়ে শিক্ষাদানের যোগ্যতা থাকা উচিত। প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরচর্চা ও এন, সি, সি-র ব্যবস্থা থাকা দরকার।

॥ নারী শিক্ষা ॥

নারীদের শিক্ষার সুযোগ কোন রকমে সংকোচিত করা চলবে না বরং সুযোগ বাড়াতে হবে। পুরুষদের কলেজে এখন যেখানে মেয়েদের নেওয়া হচ্ছে সেখানে তাদের সুযোগ-সুবিধা ও সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। মেয়েদের ও ছেলেদের শিক্ষাক্রম প্রায় একই রকম হবে। তবে বর্তমান যেরূপ হচ্ছে সে রকম সর্বক্ষেত্রে হুবহু একই রকম হবে না। নারী হিসেবে ও নাগরিক হিসেবে তাদের কর্তব্যবোধ জাগরিত করে সমাজের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করবার উপযুক্ত তারা যাতে হয় সেভাবে নারী শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে। গার্হস্থ্য অর্থনীতি (*Home Economics*) ও পরিবার পরিচালনা (*Home Management*) প্রভৃতি বিষয় তারা যাতে পড়ে সে সম্পর্কে তাদের পরামর্শ দেওয়া হবে। সহশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদের সৌজন্যবোধ ও সামাজিক কর্তব্যবোধ সম্পর্কে দৃষ্টি রাখতে হবে। একই কাজের জন্য অধ্যাপিকাদের বেতন অধ্যাপকদের সমান হওয়া উচিত।

॥ সংবিধান ও ব্যবস্থাপনা ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার উভয়েই গ্রহণ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শুধুমাত্র অনুমোদন ধর্মী (*Affiliating*) হবে না।

সরকারী কলেজগুলি ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী কলেজরূপে (*Constituent Colleges*) রূপান্তরিত হবে। প্রতিটি অনুমোদিত কলেজ এরূপভাবে গঠিত হবে যাতে কলেজগুলি ক্রমে ঐকিক (*unitary*) ও পরে সঙ্ঘবদ্ধ (*federative*) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হতে পারে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার উচ্চমান অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র তত্বাবধায়করূপে কাজ করবে না, এখানে রীতিমত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য থাকবেন (১) পরিদর্শক (*Visitior*), (২) আচার্য (*Chancellor*), (৩) উপচার্য (*Vice chancellor*), উপাচার্য বেতন ভুক ও সর্ব সময়ের জন্য নিযুক্ত হবেন। (৪) সেনেট বা কোর্ট, (৫) সিণ্ডিকেট বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, (৬) একাডেমিক কাউন্সিল (৭) ফ্যাকল্টিস (৮) বোর্ড অব স্টাডিজ, (৯) ফিনান্স কমিটি, (১০) সিলেকসন কমিটি।

ব্যয় নির্বাহ ঃ—

উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। সম ভিত্তির উপর বিভিন্ন বেসরকারী কলেজে অর্থ সাহায্য করা হবে। শিক্ষকদের সমগ্র বেতনের এক তৃতীয়াংশ বহন করতে সরকারকে ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য মঞ্জুরী সংস্থা অবিলম্বে গঠন করতে হবে। এই সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বণ্টন করা হবে।

উচ্চশিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক দু'জায়গা থেকেই সাহায্য পায়। কিন্তু কলেজগুলি কেন্দ্রীয় সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনও আর্থিক সাহায্য পায় না। সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলি প্রাদেশিক তহবিল থেকে সাহায্য পায় এবং সাহায্যের কোন নির্ধারিত হার বা রীতি নেই। প্রদেশ ভেদে এক এক রকম রীতিতে কলেজগুলিকে সাহায্য দেওয়া হয়। রাধাকৃষ্ণণ কমিশণ বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলির আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলে উচ্চ শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়ন কোনটাই সম্ভব নয়। কমিশন মনে করেন নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সরকার থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করা উচিত। (১) গৃহ নির্মাণের জন্য সাহায্য (*Building grants*) (২) সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র কেনার জন্য সাহায্য (*Equipment grants*) (৩) গ্রন্থাগারের জন্য সাহায্য (৪) ছাত্রাবাসের জন্য সাহায্য, (৫) অধ্যাপকদের বেতন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও পেন্সন প্রভৃতির জন্য সাহায্য, (৬) বৃত্তি-গবেষণার জন্য সাহায্য, (৭) বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য সাহায্য, (৮) স্নাতকোত্তর গবেষণা বিশেষ করে উচ্চতর কারিগরী বিদ্যা অর্জনে উৎসাহিত করবার জন্য সাহায্য।

কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হবে।

॥ গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় ॥

পটভূমি ঃ আমাদের জীবন ক্রমশঃ নগরকেন্দ্রীক হয়ে উঠছে। শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র, জীবিকা অর্জনে সবরকম সুযোগ ও আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নগরে কেন্দ্রীভূত হবার ফলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। ১৯৪১ খ্রীঃ লোক গণনায় দেখা যায় ভারতের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। পল্লীময় ভারতের অতি সামান্যসংখ্যক লোকই মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। এদের মধ্যে যারা উদ্যোগী তারা উচ্চ শিক্ষার জন্য গ্রামের বাইরে আসে ও চিরতরেই তারা গ্রাম ছাড়া হয়। পল্লীময় ভারতের সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে পল্লী উন্নয়নের দিকেই দৃষ্টি দিয়ে গ্রামগুলিকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলের উচ্চশিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নটি বহু দিন অবহেলিত ছিল। গ্রামে কোন সুযোগ না থাকাতেই উচ্চশিক্ষার সন্ধানে গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় জমিয়েছে। কর্মক্ষম যুবকদের হারিয়ে পল্লীগুলি নিঃস্ব হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা লাভের পর পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সাথে পল্লীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গ্রামের মানুষ যাতে গ্রামে থেকেই নিম্নস্তরের শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাধাকৃষ্ণণ কমিশণ গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা করেন। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে নতুন গ্রামীণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন সংঘাত থাকবে না। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নগরকেন্দ্রীক। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হবে পল্লীর অগণিত অধিবাসীর প্রয়োজন মেটাতে ও পল্লীতে প্রাণসঞ্চারের উদ্দেশ্যে। তার একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক রূপ ঃ—

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে কমিশন একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রামীণ শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেছেন। শিক্ষার স্তর ভাগ করে কমিশন সুপারিশ করেছেন, (১) প্রাথমিক স্তরে আট বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা, (২) পরবর্তী তিন বছর উত্তর বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক শিক্ষা, (৩) পরবর্তী তিন বছর কলেজীয় শিক্ষা, (৪) তারপর দু'বছর উত্তর কলেজীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।

প্রাথমিক স্তর ঃ—

কমিশন প্রাথমিক স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন নি কারণ বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা ইতিপূর্বেই বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ভাবে প্রচারিত হয়েছে উত্তর বুনিয়াদী মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা না হওয়ায় কমিশন এই স্তরের একটি পূর্ণ চিত্র দিয়েছেন।

মাধ্যমিক স্তর ঃ—

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হবে আবাসিক। বিদ্যালয় সন্নিহিত পল্লীর উপযোগী গৃহে তারা বাস করবে। প্রতিটি আবাসিক বিদ্যালয়ের জন্য স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ত্রিশ

থেকে ষাট একর জমি নির্দিষ্ট থাকবে। এর মধ্যে দশ থেকে পনের একর জমিতে বিদ্যালয় গৃহ ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসগৃহ, খেলার মাঠ, শিল্পশিক্ষার ঘর ও কারখানা প্রভৃতি থাকবে। বাকী জমিতে কৃষিশিক্ষা, উদ্যান রচনা, পশুচারণ ভূমির ব্যবস্থা থাকবে। চারিদিকের সব গ্রামের ছেলেরা যাতে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে স্থান নির্বাচন করতে হবে। প্রতি বিদ্যালয়ে দেড়শতের বেশী ছাত্র থাকবে না। বিদ্যালয়ের এলাকাটিকে একটি সুপরিকল্পিত আদর্শ আধুনিক গ্রামে পরিণত করতে হবে। এরূপ গ্রামের পরিকল্পনা ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীগণ আধুনিক উন্নত ধরনের গ্রাম গঠনের শিক্ষালাভ করবে ও আধুনিক গ্রামের আদর্শ জীবন যাত্রার সাথে পরিচিত হবে।

উচ্চশিক্ষা ঃ

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষ হলে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হবে গ্রামীণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও বৃহত্তর পরিধিই হবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কয়েকটি কলেজ থাকবে। কলেজ-গুলিতে স্নাতক-পূর্ব শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতি কলেজে ৩০০-এর বেশী ছাত্র থাকবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশী হবে না। এইভাবে সমগ্র দেশ জুড়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও পর্যাপ্ত সংখ্যক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কলেজগুলিতে বুদ্ধিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে। বৃত্তিগত শিক্ষার সাথে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতির ব্যবস্থাও থাকবে। ব্যবহারিক শিক্ষাও বুদ্ধিগত শিক্ষার সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। কতকগুলি বিষয়কে গ্রামাঞ্চলে অবস্থা বিচার করে গুরুত্ব দেওয়া হলেও কোন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানই শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে বাদ যাবে না। মূল বিষয়গুলি হবে দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, পদার্থ বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, সমাজ বিজ্ঞান ও দেহ বিজ্ঞান। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ বিষয়ের গবেষনার ব্যবস্থা থাকবে। এই শিক্ষাকে গতানুগতিক পরীক্ষা ভারাক্রান্ত করে তোলা হবে না। গ্রামের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে শিল্প, কৃষি, অর্থনীতি মনস্তত্ব সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

এইসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যোগ্য পরিচালক সমিতি থাকবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করবার সুযোগ দিতে হবে।

অর্থ ঃ—

গ্রামীণ শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপ দিতে যে অর্থের প্রয়োজন সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে একে কার্যকরী করবার মত অর্থ ভারতের নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র স্বাধীন ভারতে সম্প্রসারিত হবেই। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনা রূপ দিলে শেষ পর্যন্ত

ব্যয় সাশ্রয় হবে। প্রদেশ সমূহ বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শকে গ্রহণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রত্যেক প্রদেশে গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি সুসংগঠিত গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে। উপযুক্ত শিক্ষকের জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। বিত্তবান ব্যক্তিরা ও গান্ধী স্মারকনীধিও একাজে এগিয়ে আসবে। ভবিষ্যৎ ভারতের কল্যাণের জন্য শিক্ষার প্রসারের অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে এই নতুন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে এই নতুন পরিকল্পিত ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবার সুপারিশ করেছেন।

প্রশ্নাবলী

1. What are the main recommendations of the Radhakrishnan Commission with regard to reform of University education proper? [B. T. 1950]
2. *Discuss the idea of rural Universty as outlined in the report of the Radha*krishnan Commission. How far in your opinion can Visws Bharatri University contribute towards the realisation of the idea? [B T. 1952]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)
বা
মুদালিয়র কমিশন

॥ পটভূমি ॥

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন (রাধাকৃষ্ণণ কমিশন) বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উচ্চ শিক্ষার সাথে তার পূর্ববর্তী শিক্ষাস্তরটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন মন্তব্য করেন, "*Our Secondary Education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reform*" আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল অথচ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সমস্যাসমূহ কি করে সমাধান করা যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি সে সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেন। কমিটি বুঝতে পারেন এ সমস্যার সমাধান করতে হলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের অভিমত গ্রহণ করে আমূল সংস্কার না করলে মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান হবে না। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও প্রচলিত ব্যবস্থার উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে একটি কমিশন গঠন করবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রকে সভাপতি করে একটি কমিশন "*The Secondary Education Commission 1952*' গঠন করেন। নয় জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনে দুই জন বৈদেশিক শিক্ষাবিদকে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কমিশন 'মুদালিয়র কমিশন' নামেই সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত। ১৯৫২ খ্রীঃ অক্টোবর থেকে ১৯৫৩ খ্রীঃ জুন মাস পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে কমিশন ভারত সরকারের নিকট তাঁদের সুপারিশ সহ রিপোর্ট পেশ করেন।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি ॥

মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতার কারণ খুঁজতে গিয়ে যে সব ত্রুটির সন্ধান পান সে সম্পর্কে কমিশন বলেছেন, আমাদের স্কুলগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় বাস্তব জীবনের সাথে তার কোন যোগ নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম গতানুগতিক ও পাঠক্রম বৈচিত্র্যহীন। শিক্ষা শেষ হবার পর তাই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বাস্তবের

সম্মুখীন হবার ও সামাজিক জীবনের উপযুক্ত হয়ে ওঠবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না।

শিক্ষার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা পদ্ধতির ব্যর্থতার জন্য শিক্ষার্থীর চরিত্র ঠিকভাবে বিকশিত হয় না ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করা হয় না। খেলাধূলা, হাতের কাজ, সামাজিক কাজ প্রভৃতির যে একটা স্থান শিক্ষায় রয়েছে সেটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার দিকেই ঝোঁক বেশী।

বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষার দিকে যত মনোযোগ দেওয়া হয় অন্য ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

নিষ্প্রাণ শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ, কর্মে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণের শক্তি কোনটাই তারা অর্জন করতে পারে না। যান্ত্রিক প্রাণহীন শিক্ষার ফলে শুধু মাত্র মুখস্থ বিদ্যার জোরে তারা তৈরী হয় একটি তোতাপাখী।

একই শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক হবার ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায় না। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ছেলেদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাবে, শিক্ষকদের আর্থিক দুর্দশা ও সামাজিক মর্যাদার অভাব সব মিলিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

অবাঞ্ছিত ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষাকে করেছে অনড়, শিক্ষার্থীকে করেছে অসহায়। এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার ফলে গতানুগতিক পাঠক্রম ও যান্ত্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি এতদিন প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ॥

আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে লক্ষ্যহীনতা (*aimlessness*)। যদি লক্ষ্য কিছু থাকে তা হচ্ছে এ পর্বের পাঠ শেষ করে কোন রকমে একটা চাকুরী সংগ্রহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ভিড় বাড়ান। শিক্ষার প্রসার যেভাবে হচ্ছে, চাকুরীর সুযোগ সেভাবে বাড়াতে পারে না, তাই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আর অযোগ্য শিক্ষার্থীর ভিড়ে উচ্চ শিক্ষায় শোচনীয় অবনতি দেখা দিয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতির ক্ষেত্র করে রাখবার ফলে এই স্তরের শিক্ষা শেষ করে যারা বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হয় শিক্ষার ব্যর্থতা তাদের জীবনে শোচনীয় রূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা নয়। জীবন সংগ্রামে প্রস্তুতির শিক্ষাই তাকে এখানে দিতে হবে তাই মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেশের নতুন পরিস্থিতির কথা তাঁরা বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলেছেন, গণতান্ত্রিক ভারতের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। এমন শিক্ষার ব্যবস্থা

করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থী স্বাধীন ভারতের সুযোগ্য নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করতে পারে। উদার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির পথে যা কিছু অন্তরায় তাকে যেন সে অতিক্রম করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, এই বিরাট দারিদ্র প্রপীড়িত দেশে সমৃদ্ধির জন্য জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও জীবনের মান উন্নয়নের গুরু দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, দারিদ্র্যের জন্য দেশের অধিকাংশ নরনারী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। জীবিকা অর্জনের জন্য শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ হয়ে যাবার পর জীবনের সাংস্কৃতিক দিকের কথা ভাববার সময় আর তাদের থাকে না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলবার সময় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে হবে গণতান্ত্রিক ভারতের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির কাজে যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেভাবে তাদের চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বৃত্তি শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের জন্য শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তুলতে হবে যাতে তারা দেশ গঠনের কাজে যোগ্য অংশ গ্রহণ করতে পারে। সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক দিকে তাদের উৎসাহ সৃষ্টি করে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে, তা না হলে জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠবে না।

শিক্ষার মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে শিক্ষার এই দিকটি সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম না, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষার কথা অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন। আমাদের দেশে সর্বভারতীয় নেতা অনেক আছেন কিন্তু মধ্যবর্তী স্তরে নেতৃত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত লোকের অভাব। পরিশ্রমী ও সৎ আঞ্চলিক নেতারাই জনসাধারণের মনে নতুন করে দেশ গঠন সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করবে, উৎসাহের সৃষ্টি করবে, তাদের অনুপ্রাণিত করবে, সর্বপ্রকার দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসতে। জনসাধারণ যদি শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা না পায় তাহলে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সফল হতে পারে না।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন রূপ ॥

[New Organisational Pattern of Secondary Education]

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থী যাতে বাস্তব জীবনের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হয় বা কোন বৃত্তি শিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই জীবনের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার এই স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপরিকল্পিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সাত আট বছরের শিক্ষাকাল নিয়ন্ত্রিত হবে। এই স্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করে যে সব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে দেখা গিয়েছে

তাদের শিক্ষার মান উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত নয়। ফলে উচ্চ শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে। অনেকে এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব স্তরের শিক্ষার সময়কে দীর্ঘতর করে ১২ বছর করতে বলেছেন। কমিশন কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকের আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স বিলুপ্ত করে মাধ্যমিক শিক্ষার কাল এক বছর বাড়িয়ে দিয়ে এগার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা ও তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ১১ বছর বয়স থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দু'টি স্তর থাকবে। প্রথম ভাগে ৪।৫ বছর স্থায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বা জুনিয়র বেসিক কোর্স শেষ করে তিন বছরের জন্য মিডল বা জুনিয়র মাধ্যমিক বা সিনিয়র বেসিক শিক্ষাস্তর।

চার বছরকাল স্থায়ী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করবার বাস্তব অসুবিধাসমূহ বিচার করে কমিশন বলেন, বর্তমানে প্রচলিত দশম শ্রেণীযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ও একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি একই সাথে চালু থাকবে। দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য এক বছরের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রমের আয়োজন থাকবে। প্রচলিত ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা লোপ পাবে। এই স্তরের প্রথম বছরটি যুক্ত হবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের সাথে। চার বছরের ডিগ্রী কোর্স সমন্বিত কলেজের প্রথম বছরটি *Pre-University* কোর্স শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত দশম শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকবে ততদিন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা সময় সাপেক্ষ। সে ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বর্তমান কাঠামোর মধ্যে মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষক, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার এবং সুসংগঠিত সহপাঠক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়কে অবিলম্বে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে। উচ্চতর বিদ্যালয়ের অনুমোদন করবার আগে দেখতে হবে বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান সংস্থান (*accommodation*) ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের সাজসরঞ্জাম, সুযোগ্য শিক্ষক-মণ্ডলী, শিক্ষকদের সঠিক বেতন দেবার ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত আর্থিক সংগতি আছে কি না। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্কুল পরিচালকমণ্ডলীর দায়িত্ব গ্রহণ করবার ক্ষমতা বিচার করেই বিদ্যালয়কে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও বৃত্তি সম্পর্কীয় অধিকতর সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সুযোগের অভাবে শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে। বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে ভিড় কমবে ও যার যেরূপ যোগ্যতা সেরূপ শিক্ষা গ্রহণ করবে। একই ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হওয়ায় বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কে যে অবজ্ঞার মনোভাব আছে তা দূর হবে

ও বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে আর হীনমন্যতার ভাব থাকবে না। স্বতন্ত্রভাবে বা বহুমুখী বিদ্যালয়গুলির সাথে বহু সংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য একটি সর্বভারতীয় কারিগরী শিক্ষা পরিষদ গঠন করতে হবে। অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বর্তমান সামাজিক অবস্থায় নারী শিক্ষার জন্য পৃথক আয়োজনের প্রয়োজন নেই। ছেলেদের শিক্ষার সাথে সমভাবে মেয়েদের সুবিধা দিতে হবে। কমিশন বলেছেন শিক্ষার এমন একটি ক্ষেত্র নেই যেখানে মেয়েরা প্রবেশ করে নি। এক যুগ আগে যে সব বিষয় গ্রহণ করা মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব বলে বিবেচিত হ'ত আজ সে সব ক্ষেত্রেও মেয়েরা ছেলেদের সাথে সমান কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। আমাদের শাসনতন্ত্রে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তবুও মেয়েদের সমাজে একটা বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় বলে সাধারণ শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার উপযোগী বিশেষ শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। মেয়েদের জীবনে কতকগুলি পারিবারিক কর্তব্য রয়েছে তাই মেয়েদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন সুযোগ রাখতে হবে যাতে সে তার পারিবারিক কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষা পেলে মেয়েরা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও সমস্যাকে সহজভাবে মেটাতে পারবে।

॥ সহশিক্ষা ॥

সহশিক্ষার প্রশ্নটি মেয়েদের শিক্ষা সমস্যায় আলোচনার প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সহশিক্ষা অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও সহশিক্ষায় কোন আপত্তি ওঠে নি। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষায় মতভেদ আছে। অনেকে বলেন বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের ভিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়াই উচিত। অন্য দলের অভিমত হচ্ছে আর্থিক অনটনের জন্য যদি সর্বত্র মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা না করা যায় তাহলে কি মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাবে। যেখানে সামাজিক গোঁড়ামি রয়েছে সেখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা সার্থক হবে না। কমিশনের অভিমত হচ্ছে যেখানে সম্ভব প্রাদেশিক সরকার চাহিদা অনুসারে পৃথক মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে। তাহলে স্বতন্ত্র পরিবেশে মেয়েদের দৈহিক, মানসিক ও সর্বপ্রকার সামাজিক শিক্ষার সুবিধা হবে। যেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় সেখানে অভিভাবকদের আপত্তি না থাকলে সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সহশিক্ষামূলক মিশ্রপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। মিশ্র প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য ভিন্নভাবে সহ পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকবে। সঙ্গীত, চারুকলা, সূচীশিল্প, শুশ্রূষা প্রভৃতি সম্পর্কে মেয়েদের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে বলে বিদ্যালয়ে এসব বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। মিশ্র প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিকা থাকবে।

॥ ভাষাশিক্ষা ॥

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ভাষা শিক্ষার প্রশ্নটি এক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কমিশন সুপারিশ করেন, (১) সমগ্র মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন বা মাধ্যম হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের নির্দেশমত ভাষাগত সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। (২) জুনিয়র মাধ্যমিক স্তরে অন্ততঃ দুটি ভাষা শিখতে হবে। প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের শেষে ইংরেজী অথবা হিন্দী পাঠ্য হবে। একই বছর দুটি ভাষাশিক্ষা শুরু করা চলবে না। (৩) উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে অন্ততঃ পক্ষে দু'টি ভাষা পাঠ্য হবে। তাদের মধ্যে একটি হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

॥ পাঠক্রম ॥

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠক্রমের মধ্য দিয়েই শিক্ষাক্রমকে বোঝা যায়। শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার কথাই হ'ল পাঠক্রম রচনা। আমাদের দেশের পাঠক্রম অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রচিত। শিক্ষা প্রধানতঃ পুঁথিগত। বাস্তব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে এ পাঠক্রম রচিত হয় নি। এই পাঠক্রম অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠু বিকাশ হয় না। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কিশোর শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের চাহিদা মেটান সম্ভব নয়। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রীক ও পুঁথি নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিল্পের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করবার মত বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন, বর্তমান পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গী অতি সঙ্কীর্ণ। কলেজে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জনের দিকে দৃষ্টি রেখেই উহা রচিত হয়েছে।

কলেজের শিক্ষার পাঠক্রমের প্রভাবের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম অত্যন্ত পুঁথিগত ও তত্ত্ব নির্ভর (*unduly bookish and theoritical*) হয়ে উঠেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে অধিকাংশ ছাত্রই যখন বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হবে তখন পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাঠক্রম রচিত হওয়া প্রয়োজন; শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করে জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রের জন্য সঠিক প্রস্তুতি হয় না। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন প্রগতিশীল দেশসমূহের মাধ্যমিক শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সর্বশ্রেণীর শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তার জন্য ব্যাপক পাঠক্রম রচনা করতে হবে। ব্যাপক পাঠক্রম ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বলতে বুঝায় না শিক্ষার্থীকে দুনিয়ার সব বিষয় জানতে হবে। প্রচলিত পাঠক্রমের বিরুদ্ধে অতি ব্যাপ্তির অভিযোগটি মিথ্যা নয়। বিষয়াধিক্যের দায় থেকে ছাত্রদের যথাসম্ভব মুক্তি দিতে হবে। সমধর্মী কয়েকটি বিষয়কে মিলিয়ে একটি বিষয়ে দাঁড় করান যায় কি না পাঠক্রম রচনায় সে বিষয় চেষ্টা করা দরকার।

॥ পাঠক্রম নির্ধারণের মূলনীতি ॥

পাঠক্রম বলতে চিরাচরিতভাবে যে পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হয় তাই বুঝায় না। শিক্ষার্থীর জীবনে বিদ্যালয়ের শ্রেণীগৃহ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, কর্মশালা, খেলার মাঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষালাভ করে সামগ্রিকভাবে তাই হচ্ছে পাঠক্রম। বিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার্থী যা কিছুর সংস্পর্শে আসে যার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় তাই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রুচি, যোগ্যতা অনুসারে পাঠক্রম হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সম্প্রসারণশীল। যে কোন অবাঞ্ছিত বিষয় ছেলেদের উপর চাপিয়ে দিলে স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য। কতকগুলি সাধারণ বিষয় অবশ্য সকল শিক্ষার্থীকে জানতে হবে এবং সেগুলিকে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে। সমাজ জীবনের প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় করে পাঠক্রম রচনা করতে হবে। পাঠক্রম রচনায় স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনের কথা বিচার করতে হবে।

পাঠক্রমে শুধু সাধারণ শিক্ষার কথাই থাকবে না অবসর বিনোদনের শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। এর ফলে ছাত্র জীবনই আনন্দময় হয়ে উঠবে না, পরবর্তীকালে ব্যক্তির জীবনের অবসর মুহূর্তগুলিও আনন্দ মুখর হয়ে উঠবে।

পাঠক্রমের বিষয়গুলি হবে পরস্পর সুসংবদ্ধ ও জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এই মূলনীতিকে সামনে রেখে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পাঠক্রম রচনা করেছেন।

মধ্য বিদ্যালয় স্তর বা জুনিয়র মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে থাকবে :—

(১) ভাষা, (২) সামাজিক শিক্ষা, (৩) সাধারণ বিজ্ঞান, (৪) গণিত (৫) কলা ও সঙ্গীত, (৬) হস্তশিল্প (৭) শরীরবিদ্যা।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় ॥

উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় :—[১] ভাষা—(ক) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা ও প্রাচীন ভাষার মিশ্র কোর্স। (খ) নিম্ন তালিকার মধ্য হতে যে কোন একটি ভাষা গ্রহণ করতে হবে—

(ক) হিন্দী (যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়)
(খ) প্রাথমিক ইংরেজী (মধ্য বিদ্যালয়ে যারা ইংরেজী পড়ে নি)
(গ) ইংরেজী (পূর্ব স্তরে ইংরেজী যাদের পাঠ্য ছিল)
(ঘ) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (হিন্দী নয়)
(ঙ) একটি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা (ইংরেজী নয়)
(চ) একটি প্রাচীন ভাষা।

[২] সমাজ বিজ্ঞান—সাধারণক্রম প্রথম দু'বছরের জন্য।

[৩] সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত—সাধারণক্রম প্রথম দু'বছরের জন্য।

[৪] হস্তশিল্প (নিম্নক্রমের যে কোন একটি)

(ক) বয়ন ও বুনন (খ) কাঠের কাজ (গ) ধাতুর কাজ (ঘ) উদ্যান রচনা (ঙ) দর্জির কাজ (চ) টাইপোগ্রাফী (ছ) কারখানার কাজের প্রয়োগ বিদ্যা (জ) সেলাই ও সূচী শিল্প (ঝ) মূর্তি শিল্প।

বহুমুখী পাঠক্রমে নিম্ন যে কোন একটি বিভাগ থেকে তিনটি বিষয় বেছে নিতে হবে।

১। মানবতামূলক বিষয়ঃ—(ক) একটি প্রাচীন ভাষা অথবা পূর্বোক্ত (১) (খ) থেকে একটি ভাষা যা শিক্ষার্থী গ্রহণ করি নি (গ) ইতিহাস (ঘ) ভূগোল (ঙ) প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌর বিজ্ঞান (চ) প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ও যুক্তি বিজ্ঞান (ছ) গণিত (জ) সঙ্গীত (ছ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

২। বিজ্ঞান বিষয়ঃ—(ক) পদার্থ বিজ্ঞান (খ) রসায়ন, (গ) জীব বিজ্ঞান (ঘ) ভূগোল, (ঙ) গণিত, (চ) প্রাথমিক শরীর তত্ত্ব ও স্বাস্থ্য।

৩। যন্ত্র শিল্প :—(ক) ফলিত গণিত ও জ্যামিতি অঙ্কন, (খ) ফলিত বিজ্ঞান, (গ) প্রাথমিক যন্ত্র প্রযুক্তি বিদ্যা।

৪। ব্যবসা বাণিজ্য :—(ক) বাণিজ্যিক প্রয়োগ বিদ্যা, (খ) হিসেব নিকাশ, (গ) বাণিজ্যিক ভূগোল অথবা প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, (ঘ) শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং।

৫। কৃষি :—(ক) সাধারণ কৃষি বিদ্যা, (খ) পশু পালন, (গ) উদ্যান রচনা কৃষিকাজ, (ঘ) কৃষি রসায়ণ ও উদ্ভিদ বিদ্যা।

৬। চারুকলা :—(ক) চারুকলার ইতিহাস, (খ) অঙ্কন ও নমুনা, (গ) চিত্রাঙ্কন, (ঘ) ভাস্কর্য, (ঙ) সঙ্গীত কলা, (চ) নৃত্য কলা।

৭। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান :—(ক) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, (খ) খাদ্য প্রস্তুতি ও রন্ধন প্রণালী, (গ) মাতৃমঙ্গল ও শিশু পালন, (ঘ) গৃহ পরিচালনা ও সেবা শুশ্রূষা সম্পর্কে শিক্ষা, (ঙ) উপরোক্ত বিষয় ছাড়া শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে একটি অতিরিক্ত বিষয় উপরের যে কোন বিভাগ থেকে গ্রহণ করতে পারবে।

পাঠক্রম সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে কমিশন বলেছেন পাঠক্রম যত ভালই হোক, যত সুপরিকল্পিতই হোক শুধুমাত্র পাঠক্রম বদলালেই শিক্ষা ব্যবস্থা বদলে যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর। যাদের উপর পাঠক্রম কার্যকরী করবার দায়িত্ব দেওয়া হবে তাঁদের প্রয়োগ পদ্ধতির উপর এর সাফল্য নির্ভর করছে আর পাঠক্রমকে যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে মনে না করা হয়। সময়ের পরিবর্তনে বাস্তব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রমও পরিবর্তন করতে হবে।

॥ পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণ ॥

কমিশন বলেন পাঠ্যপুস্তক বহু ত্রুটিপূর্ণ। এ সব বই যদি শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত করা হয় তাহলে তাদের শিক্ষার আগ্রহ জন্মান কঠিন হবে। কমিশন সুপারিশ

করেছেন উন্নত মানের বইয়ের জন্য উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি পাঠ্যপুস্তক কমিটি গঠন করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক বই থাকবে, স্কুলগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বই বেছে নেবে। তবে ভাষার ক্ষেত্রে প্রতি স্তরের জন্য একটি নির্দিষ্ট বই থাকবে। এমন কোন বই অনুমোদন করা হবে না যাতে কোন ধর্ম বা রাজনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি হয়। বইয়ের কাগজ, ছবি এসবের উপরও দৃষ্টি রাখতে হবে। পাঠ্যপুস্তক ঘনঘন পরিবর্তন করা চলবে না।

॥ শিক্ষাদান পদ্ধতি ॥

পাঠক্রম ও পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গের পর কমিশন বলেছেন, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ মাত্রই জানেন সর্বোত্তম পাঠক্রম আর সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন করবার পরও শিক্ষার আয়োজন মৃতই থাকবে যতক্ষণ না সুযোগ্য শিক্ষক ও সঠিক শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার প্রাণ সঞ্চার না করে। সুযোগ্য শিক্ষকের শিক্ষার গুণে অনেক সময় অতি সাধারণ পাঠ্যপুস্তক অসাধারণ হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, পাঠ সম্পর্কে তার মনের প্রতিক্রিয়া সব বিচার করে শিক্ষক এমনভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন যাতে অতি নীরস বস্তুও সরস হয়ে ওঠে। তিনি কতটা পড়ালেন সেইটাই বড় কথা নয়, শিক্ষার্থী কতটা গ্রহণ করতে পারল তা দিয়েই হবে শিক্ষার বিচার। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গতানুগতিকতা বর্জন করে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রচলন করে শিক্ষাদান পদ্ধতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে গতিশীল সজীব ও জীবনের উপযোগী।

শ্রেণী কক্ষে শুধুমাত্র তত্ত্বের আলোচনা আর মুখস্থের মধ্যেই যেন শিক্ষাপর্ব সমাধা না হয়। জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা বাস্তবের ভিত্তি ভূমে প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কর্মে আগ্রহ, চিন্তা শক্তির বিকাশ ও নিজেকে প্রকাশ করবার প্রেরণা যোগাতে হবে।

নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজের আগ্রহ, নিজের চেষ্টায় নতুন জ্ঞান আহরণ করবে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অর্জন করবার সাথে সাথে দলগতভাবে কাজের মধ্য দিয়ে যাতে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে, সমাজ জীবনের উপযোগী সে ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ চারিত্রিক শিক্ষা ॥

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টির জন্য স্কুল স্বায়ত্ত শাসন (*School Self Government*) ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার জন্য দলবদ্ধভাবে খেলাধূলা ও অন্য সহপাঠক্রমিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষা হবে ঐচ্ছিক অভিরুচি অনুযায়ী।

চরিত্রগঠন ও শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলবার জন্য সহপাঠক্রমিক বিষয়ের উপর কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সহপাঠক্রমিক বিষয়গুলি শিক্ষার এক

অত্যাবশ্যক অঙ্গ তাই এগুলির জন্য সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত আয়োজন রাখতে হবে। সর্বত্র একই রকম ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সুযোগ, আর্থিক সঙ্গতি, ছাত্র ও শিক্ষকের রুচি ও ক্ষমতা সব কিছু বিচার করে এ ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের একটা নির্দিষ্ট সময় এর জন্য ব্যয় করতে হবে।

স্কুল স্বায়ত্ত শাসন, স্কুল ম্যাগাজিন, বিতর্কসভা, অভিনয়ের ব্যবস্থা, খেলা ধূলা, বহিঃভ্রমণ ব্যবস্থা প্রভৃতি যদি ছাত্রদের জন্য করা হয় তাহলে কাজের মধ্য দিয়ে তারা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে, তার ফলে ছাত্রদের মধ্যে দলগত মনোভাব সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ, শৃঙ্খলা রক্ষার মনোভাব ইত্যাদি গড়ে উঠবার পক্ষে সহায়ক হবে। সহপাঠক্রমিক, কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা পাবে। নিজ নিজ দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা রক্ষার শিক্ষা লাভ করবে।

॥ পরামর্শ ও নির্দেশদানের ব্যবস্থা (Guidance and Counselling) ॥

বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বৈচিত্র্য সাধন হলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রবণতা, দক্ষতা ও স্বাভাবিক নৈপুণ্য অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয় নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন। বয়ঃসন্ধিকালে তাদের বিচার বিবেচনা শক্তি সব সময় বুঝে উঠতে পারে না কোন বিষয়ের চর্চায় বা কোন বৃত্তির অনুসরণে তাদের স্বাভাবিক নৈপুণ্য ও প্রবণতার সদ্ব্যবহার হবে। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষণীয় বিষয় ও বৃত্তি নির্বাচনের ও নানা ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন রয়েছে।

অনেক দেশেই বৃত্তি নির্বাচনের ও জীবনের অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ দেবার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এদিকে সামান্য চেষ্টাই হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশে উপযুক্ত বিষয় নির্বাচনের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির জন্য শিক্ষার্থীদের সময় উদ্যম ও শক্তির অপচয় হচ্ছে। বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞ পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা হলে তাদের স্বাভাবিক দক্ষতা ও প্রবণতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হ'ত ও জীবন যুদ্ধে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের জীবনকে সুখময় ও সমাজকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারত।

এই পরিচালনা ও পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা শুধু বিষয় নির্বাচন ও বৃত্তি নির্বাচনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষার্থীর জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে তাদের সাহায্য করতে হবে। এই জন্য বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিচালক ও বৃত্তি উপদেষ্টার (*Guidance officer and career master*) সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ ও উপদেশ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজটি খুব সহজ নয়, এজন্যে উপদেষ্টার অন্যান্য গুণগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তার বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই। তাঁর মন হবে সংস্কারমুক্ত, ছেলেমেয়েদের বোঝবার মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর থাকা চাই। পরামর্শ পদ্ধতি

সম্পর্কে তাঁকে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা, স্কুল রেকর্ড প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ছাড়াও বিভিন্ন পেশা ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা যেন ভালভাবে বিবেচনা না করে তাড়াতাড়ি কিছু নির্বাচন করতে গিয়ে ভুল না করে। সুতরাং পরিচালনা ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই যেন শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্তরে পুনর্নির্বাচনের সুযোগ পায়। ছায়া-চিত্রের প্রদর্শনীর সাহায্যে বিভিন্ন কাজ কর্মের ও বৃত্তি শিক্ষার স্বরূপ শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা দেখে শুনে তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের সাথে নিজের ক্ষমতার কথা বিচার করে সেই অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে।

শিক্ষক, অভিভাবক, পরিচালক, বৃত্তি উপদেষ্টা ও অন্যান্য পক্ষের সম্মিলিত সহযোগিতা এই নির্বাচনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেশের নানাস্থানে পরিচালক ও বৃত্তি উপদেষ্টার শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

॥ ছাত্র কল্যাণ ॥

প্রত্যেক রাজ্যেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রতি বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহ কর্তৃক সর্বভারতীয় শারীরিক শিক্ষা-শিক্ষণ সংস্থা গঠিত হওয়া উচিত।

॥ পরীক্ষা ও শিক্ষার পরিমাপ ॥

পরীক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ছাত্র শিক্ষক, অভিভাবক সবাই জানতে চায় শিক্ষা কতটা অগ্রসর হ'ল, শিক্ষার্থী কতটা গ্রহণ করতে পারল, কোথায় ত্রুটি রয়ে গেল সেই পরিমাপ পরীক্ষার মধ্য দিয়েই সম্ভব। কিন্তু আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। অনেকে মনে করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার প্রধান কারণ ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন।

কমিশন বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন এবং যতদূর সম্ভব বহিঃপরীক্ষা কমিয়ে দেবার সুপারিশ করেছেন।

শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম শেষ করলে তাদের স্কুল রেকর্ড এবং অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সমাপনের অভিজ্ঞান (*School Leaving Certificate*) দেওয়া হবে।

বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থা কমিয়ে দিয়ে রচনামূলক পরীক্ষার বদলে যতদূর সম্ভব বস্তুধর্মী (*objective Test*) পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে। প্রশ্নপত্রের ধরণও নতুন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ণয়কল্পে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক স্কুল রেকর্ড রাখবার

ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্কুল রেকর্ড দ্বারা শিক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষার কৃতিত্বের মাপ নিরূপিত হবে। চূড়ান্ত ফলাফল এর উপর নির্ভর করে স্থির করতে হবে।

বহিঃপরীক্ষা ও অন্তঃপরীক্ষা সম্পর্কে স্কুল রেকর্ড সংখ্যার পরিবর্তে প্রতীক মূলক মার্কের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন A-খুব ভাল, *B*-ভাল *C*-মন্দ নয়, *D*-খারাপ, *E*-খুব খারাপ, *D* ও *E* শ্রেণীভুক্ত হলে শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে মনে রাখতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পরিসমাপ্তিতে একটি মাত্র বহিঃপরীক্ষা (*Public Examination*) ব্যবস্থা থাকবে। কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় মার্ক বণ্টন যে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও অনিশ্চিত যে কথা বিবেচনা করে কমিশন বলেছেন দুটি ছাত্রের গুণাগুণ বিচারে যদি দেখা যায় একজন ৪৬ নম্বর পেয়েছে আর একজন ৪৭ নম্বর পেয়েছে তাহলে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ। কমিশনের মতে দু' এক নম্বরের পার্থক্য অনেকটা দৈবের সংঘটন "*more often a matter of chance than of exact determination.*" কমিশন *A.B.C.D.E.* এই ভাবে ভাগ করে দলগতভাবে গুণাগুণ নির্ণয় করতে বলেছেন।

কমিশন আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর জোর দিতে বলেছেন, এবং মাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করলে পরীক্ষার্থীর উপর সুবিচার করা হবে না সে কথাও বলেছেন। প্রতি বিদ্যালয়ে সর্বাত্মক পরিচয় পত্র (*Cumulative Record Card*) রাখবার প্রয়োজনীয়তার কথা কমিশন বলেছেন। এই রেকর্ড কার্ডে শিক্ষার্থীর সবদিকের উন্নতির বিচার করা সম্ভব।

পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করাও প্রয়োজন, কারণ বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র প্রশ্ন বেছে নিয়ে উত্তর মুখস্থ করে পাস করাই সম্ভব নয়, ভাল ফলও অনেক সময় করা সম্ভব। রচনামূলক পরীক্ষা যতটা সম্ভব পরিহার করে বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষার উপর বেশী জোর দিতে হবে। তাহলে মুখস্থ করে পাস করবার উৎসাহ অনেকটা কমে যাবে।

॥ শিক্ষকের উন্নতি ॥

শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা যত নিখুঁত করেই গ্রহণ করা হোক না কেন তার সার্থক রূপায়নের দায়িত্ব শিক্ষকের। শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে দিলেই দেশে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। শিক্ষানীতিকে বাস্তবে রূপ দেবে একদল সুযোগ্য শিক্ষক। শিক্ষকের শিক্ষার মান ও জীবনের মান দুই শিক্ষা সংস্কারের সাথে জড়িত। কমিশন শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন।

॥ ১ ॥ শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ ব্যাপারে সব স্কুলেই যথাসম্ভব একই নীতি অনুসরণ করা উচিত।

॥ ২ ॥ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের পরীক্ষাধীন কাল (*Probation Period*) হবে এক বছর।

॥ ৩ ॥ শিক্ষকের গুণানুসারে বেতনের হার নির্ণয়ের জন্য বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকের বেতন জীবনের মান উন্নয়নের উপযোগী হবে।

॥ ৪ ॥ শিক্ষকের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য পেন্সন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও জীবন বীমা এই ত্রিবিধ কল্যাণকর ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে।

॥ ৫ ॥ শিক্ষকের কার্যকাল ৬০ বছর পর্যন্ত বর্দ্ধিত করা চলবে।

॥ ৬ ॥ শিক্ষকদের সন্তানেরা বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা ভোগ করবে।

॥ ৭ ॥ শিক্ষকদের জন্য বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।

॥ ৮ ॥ কোন শিক্ষক গৃহ-শিক্ষকতা করতে পারবেন না।

॥ ৯ ॥ শিক্ষক-শিক্ষণের দু'রকম ব্যবস্থা থাকবে (ক) যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের জন্য দু'বছরের শিক্ষাকাল। (খ) যাঁরা স্নাতক তাঁদের জন্য এক বছরের শিক্ষাকাল। ভবিষ্যতে এই শিক্ষাকাল দু'বছর করা হবে। শিক্ষা গ্রহণকালে শিক্ষক পূর্ণ বেতন পাবেন।

॥ পরিচালনার সমস্যা ॥

সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা করে সরকারী শিক্ষানীতিকে কার্যকরী করতে হবে। রাজ্য সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন পরিষদ ও স্কুল পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে কাজের সমন্বয় করে এগিয়ে যাওয়া দরকার। পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি ও শিক্ষার মান উন্নত করতে স্কুলে পরিদর্শক বিভাগের পুনর্গঠন করতে হবে, বিদ্যালয়ের স্থানাভাব, ছাত্রসংখ্যা, বছরের মোট ছুটি, স্থানীয় পরিচালক মণ্ডলী গঠন সমস্ত বিষয়েই একটি সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

॥ বিদ্যালয় সংগঠন ॥

পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন—

যথেষ্ট সংখ্যক লোকের বাস এরূপ পল্লীতে স্কুল একটি মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হবে যার ফলে চারদিক থেকে শিক্ষার্থীদের আসবার সুবিধা হবে। শহরের স্কুলগুলি কলকোলাহলের বাইরে যতটা সম্ভব নির্জন স্থানে স্থাপন করতে হবে। স্কুলে খেলার মাঠের ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যালয় গৃহের শ্রেণী কক্ষের আয়তন অন্ততঃ পক্ষে প্রতি ছাত্রের জন্য ১০ বর্গ ফুট হিসাবে নির্ধারণ করা উচিত।

কোন শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ৩০।৪০ জনের বেশী হবে না। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৫০০।৭৫০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি সুলভ মূল্যে দেবার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন করতে হবে।

গ্রামে ও শহরে যথাসম্ভব শিক্ষকদের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করতে হবে।

বছরে অন্ততঃ ২০০ দিন স্কুলের কাজ হবে। প্রতি সপ্তাহে ৪৫ মিনিটের ৩৫টি পিরিয়ড থাকবে। গ্রীষ্মকালে দু'মাসের ছুটি থাকবে এছাড়া বছরে দু'বার ১০ থেকে ১৫ দিন ছুটি থাকবে। সপ্তাহে ছ'দিন কাজ হবে—এর মধ্যে একদিন অর্দ্ধেক স্কুল হবে, বাকী সময়টা ছেলেরা ও শিক্ষকেরা নানারকম সামাজিক ও সহপাঠক্রমিক কাজে লিপ্ত থাকবেন।

প্রতিটি স্কুলে একটি পরিচালক সমিতি থাকবে। পদাধিকার বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই সমিতির সদস্য থাকবেন। সমিতির কোন সদস্যই প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবেন না।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত সুযোগ্য পরিদর্শক থাকবে। পরিদর্শকগণ প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন ও উন্নতি সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যালোচনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ থাকবে যার সদস্য সংখ্যা ২৫ জনের বেশী হবে না। রাজ্যের শিক্ষা আধিকারিক (*Director of Education*) এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন। বোর্ডের একটি সাব-কমিটি পরীক্ষা পরিচালনা করবে।

॥ আর্থিক সমস্যা ॥

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও স্বার্থের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয় ভবন ও তৎসন্নিহিত জমির উপর কোন কর ধার্য হবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে কারিগরী এবং বৃত্তি শিক্ষার জন্য শিল্প শিক্ষাকর নামে একটি কর প্রবর্তন করা হবে। জাতীয় শিল্প সংস্থা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন রেল, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ প্রভৃতির আয় থেকে একটা অংশ কারিগরী শিক্ষার জন্য পৃথক করে রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত ও প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা উচিত।

॥ সমালোচনা ॥

দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে জড়িত। অথচ এ স্তরের শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে এর বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যার সমাধানের কোন চেষ্টা হয় নি। আমাদের দেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ এই স্তরেই তাদের শিক্ষা শেষ করে জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হয়। মাধ্যমিক স্তর থেকেই আমরা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সংগ্রহ করি আবার এখান থেকে ছাড়পত্র নিয়েই ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ভিড় করে। ত্রুটিপূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

এ জন্যই কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বলেছিলেন—*An inefficient system of Secondary Education is therefore bound to effect adversely the quality of education of all stages.* দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার প্রয়োজনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। সেই কমিশনের অভিমত, দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে দুর্বলতম সংযোগসূত্র এর অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন (“*Weakest link in our educational machinery and needs urgent reform*).” এই পটভূমিকায় সমগ্র দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তৃত ও ব্যাপক পর্যালোচনা করে দেশের নতুন পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে একটা বাস্তব শিক্ষা ব্যবস্থাকে কি করে গড়ে তোলা যায় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের উপর সে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

মুদালিয়র কমিশন দেশের নতুন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে দেশের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁদের সুপারিশ সমূহ সরকারের কাছে পেশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা শুধুমাত্র কলেজীয় শিক্ষার প্রস্তুতি ক্ষেত্র নয়, জীবন সংগ্রামে প্রস্তুত হবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে যাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলা যায় কমিশন সেভাবে দেশে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার নির্দেশ দেন।

পূর্বতন শিক্ষা ব্যবস্থায় পুঁথিগত যে বিদ্যা শিক্ষার্থীরা শিক্ষা করত তা ছিল জীবনের সাথে সম্পর্ক হীন। শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা আগ্রহ সবের কোন মূল্য সে ব্যবস্থায় ছিল না। শিক্ষার্থীর ইচ্ছামত কোন বিষয় জানবার কি শিখবার কোন সুযোগ ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ছাত্রদের যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচনের সুবিধা যাতে পেতে পারে সেজন্য বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন। কমিশনের সুপারিশে সাতটি বিভাগের কথা বলা হয়। কৃষি প্রধান দেশের কথা চিন্তা করে ও দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কৃষি ও যন্ত্রশিল্প শেখাবার নির্দেশ দিয়ে কমিশন দেশের বাস্তব প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এছাড়া বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় ছেলেদের সামনে ভবিষ্যৎ বৃত্তির পথ খুলে দেবে। মেয়েদের রুচি ও আগ্রহের উপযোগী চারুকলা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থায় মেয়েরা প্রকৃতিগত শিক্ষার সুযোগ পাবে। নবম শ্রেণী থেকে *Specialisation* সম্পর্কে অনেকে আপত্তি তুলেছেন। এটা একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার অন্যতম প্রধান ক্রটি। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বাদশ শ্রেণী যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাহলে হয়ত আরও এক বছর বাদে “বিশেষ শিক্ষার” ব্যবস্থা করা সম্ভব হ’ত। *Early Specialisation* হলেও কমিশনের সুপারিশের ফলে কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষায় যাদের আগ্রহ আছে তারা নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে বিষয় বেছে নেবার সুযোগ পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রদেশে উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন হয়েছে তা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের নির্দেশ অনুসারেই হয়েছে। কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা গিয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনা রূপ দিতে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে

হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় অর্থ ও যোগ্যতর শিক্ষকের অভাবে এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া একটা সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে।

শিক্ষাদর্শ অথবা শিক্ষা পরিকল্পনা যত উচ্চ স্তরেরই হোক না কেন তার সুষ্ঠু রূপায়ণে প্রয়োজন যোগ্য শিক্ষকের। শিক্ষা পরিকল্পনার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন শিক্ষক। শিক্ষার মান উন্নতির সাথে জড়িয়ে আছে শিক্ষকের জীবনের মান উন্নতির প্রশ্ন। কমিশন বলেছেন, শিক্ষকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব নেই, উপযুক্ত বেতন নেই, সব মিলিয়ে একটা হতাশাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে "*If the teachers present mood of discontent and frustration is to be removed and education is to become a genuine nation building activity, it is absolutely necessary to improve their status and their condition of service:* কমিশনের সুপারিশের পরও অবস্থার যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে একথা বলা যায় না। তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্য লোক আকৃষ্ট হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে যোগ্য শিক্ষকের অভাবে বহুমুখী উচ্চতর বিদ্যালয় পরিচালনা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিশন বলেছেন, পরিকল্পিত শিক্ষা সম্পর্কে কোথাও কোথাও যে সংশয় দেখা দিয়েছে তার প্রধান কারণ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে। এছাড়া শিক্ষক শিক্ষণের অসুবিধাও রয়েছে। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষানীতি, শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রভৃতি হ'ল শিক্ষাদানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষক-শিক্ষণের বিস্তৃত আয়োজন না করলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব মেটান সম্ভব হবে না। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন পরিকল্পিত শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে শিক্ষকের জীবনের মানোন্নয়ন ও উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশন সকল শাখার প্রথম দু'বছরের জন্য কতকগুলি বিষয় নির্দেশ করেছেন। এই *Core Subject*গুলি চরম পরীক্ষায় গৃহীত হয় না। যে দেশের শিক্ষা পরীক্ষাকেন্দ্রীক সেখানে চরম পরীক্ষা থেকে কোন বিষয় বাদ দেওয়া হলে স্বাভাবিকভাবেই তা অবহেলিত হবে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে হচ্ছেও তাই। যদি বিষয়গুলিকে শেখাতে হয় তাহলে অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

কমিশন বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের কথা বলেছিলেন। কমিশনের বহু সুপারিশ গ্রহণ করলেও পরীক্ষা সম্পর্কীয় সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার প্রচেষ্টা এখনও করা হয় নি। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছিলেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যদি আমাদের একটি মাত্র সংস্কারের সুপারিশ করতে বলা হয় তবে আমরা পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের কথা বলব। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয় নি। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রীক হবার ফলে প্রকৃত শিক্ষা অপেক্ষা পরীক্ষায় পাস করাটাই শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কমিশন নির্দেশিত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় গুরুত্ব আরোপ, রচনামূলক পরীক্ষার সাথে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার (*objective test*) ব্যবস্থা, সর্বাত্মক পরিচয় পত্র (*Cumulative Record Card*), প্রভৃতি ব্যবস্থা করলে শিক্ষার মান উন্নত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

রাতারাতি দেশব্যাপী উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় খুলে দিলেই শিক্ষার মান উন্নত হবে একথা আশা করা যায় না। উচ্চতর শিক্ষা সাফল্যের জন্য কমিশন যে সব সুপারিশ করেছিল আমরা মাত্র তার আংশিক গ্রহণ করেছি তাই তার ফল ভাল হয় নি। এ সম্পর্কে আরও ধীর পদক্ষেপ করা উচিত ছিল। তাড়াহুড়া করে কাজ করতে যাওয়ার ফলে প্রার্থিত ফল পাওয়া যায় নি। বহুকাল প্রচলিত একটা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হলে যে পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন সেই প্রস্তুতি না করে কাজে হাত দেবার ফলে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া দ্বাদশ শ্রেণী যা কমিশন করতে চেয়েছিল তা রাখলে শিক্ষা কাঠামো নিয়ে এত সমালোচনা হ'ত না। অসুবিধাও কম হ'ত। উচ্চতর মাধ্যমিক পরিকল্পনা নিয়ে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, দু'টি একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য একে ত্যাগ করা চলে না। তাকে কি করে সংশোধন করা যায় আমাদের সে চিন্তা করতে হবে। নতুনভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিচার করবার পূর্বে প্রয়োজনীয় কাজ যতটা হয়েছে তার অগ্রগতিকে সংহত করে নিয়ে তারপর আবার এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ।

বহু যুগ পরাধীন থাকার ফলে আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনগ্রসর, শিক্ষাক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। বহু ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ এগিয়ে চলেছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে আমাদের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রগতিশীল জাতির পক্ষে কোন একটা ব্যবস্থাকে অচল অনড় বলে চিরদিন আঁকড়ে থাকা জীবনের লক্ষ্য নয়। গতিশীলতাই জীবন। ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে একথা সমান সত্য। মুদালিয়র কমিশন পরিচালিত মাধ্যমিক শিক্ষাই এই স্তর সম্পর্কে শেষ কথা নয়। কমিশনও একথা দাবী করেন নি। কমিশন বলেছেন—"*In changing world the problem of education are also likely to change. The emphasis placed on one aspect of it to-day may not be necessary at a future date. It must be therefore be clearly understood that these recommendation are not for all time but they must necessarily be looked upon as a recommendation for a fair period. They may have to be reviewed from time to time in the light of experience,*" কমিশন যে সমস্যাসমূহের সমাধান করতে চেয়েছিলেন সেখানে আজ নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার যে কথা কমিশন বলেছেন তার মধ্য দিয়ে কমিশন তাঁর দূরদর্শিতার ও প্রগতিশীলতার পরিচয়ই দিয়েছেন।

॥ পঃ বাংলায় নতুন শিক্ষানীতি ॥

উপরের আলোচনা যখন লেখা হয় তারপর গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গিয়েছে। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশে যে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে

চালু হয়েছে। সেই ব্যবস্থায় যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, যে সব অসুবিধার উল্লেখ সমালোচনায় করা হয়েছে তার প্রতিকারের কোন চেষ্টা হয় নি। একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে দোষ ত্রুটি মুক্ত করে বাঁচিয়ে রাখবার কোন চেষ্টা না করেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাকে বাতিল করে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

কোঠারী কমিশনের রিপোর্ট বের হবার পর থেকেই দেশের শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছিল। একাদশ শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন চেষ্টা না করেই ১০+২+২ না ১০+২+৩ অর্থাৎ দশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, দুই বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা বা জুনিয়র কলেজের শিক্ষা ও দুই অথবা তিন বছরের ডিগ্রীকোর্সের শিক্ষা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। ১৯৭২ খ্রীঃ শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তনের দাবী জোরদার হয়ে ওঠে।

পঃ বাংলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমীক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে বর্তমান প্রচলিত তিন বছরের ডিগ্রীকোর্স প্রথা ব্যর্থ হয়েছে। তারা তাই দশ বৎসরের স্কুলের শিক্ষা শেষ করে দুই বছরের ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা ও দুই বছরের ডিগ্রীকোর্স শিক্ষার স্বপক্ষে তাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন। এই চার বছরের শিক্ষাই কলেজে হবে এই ছিল তাদের অভিমত। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ মনে করে একাদশ শ্রেণী শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি তবে যদি দ্বাদশ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় তা বর্তমান বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনেই হওয়া উচিত, প্রধান শিক্ষক মহাশয় অনেকেই দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থা কোঠারী কমিশনের সুপারিশ মত উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলেই প্রবর্তনের দাবী জানায়। এগার বছরের শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে একথা শিক্ষক সমাজের অনেকেই স্বীকার করেন না। ১৯৬৭ খ্রীঃ থেকে পঃ বাংলার সর্বক্ষেত্রে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। এই সময় শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলেছে তা দিয়ে শিক্ষা সার্থক কি ব্যর্থ হয়েছে এই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। বহুদিন কিছু শিক্ষাবিদ পুরোন শিক্ষা কাঠামো ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলেন। গত ১৯৭১ খ্রীঃ থেকেই শোনা যাচ্ছিল সরকার দশ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চাইছেন। ১৯৭২ খ্রীঃ দাবী আরও জোরদার হয়। এই বছরের মাঝামাঝি কলেজের অধ্যক্ষগণ এক সভায় তিন বছরের ডিগ্রী ও প্রি.ইউ. কোর্স ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তারপরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একোডেমিক কাউন্সিল দুই বছরের ইণ্টার-মিডিয়েট ও দুই বছরের ডিগ্রীকোর্স চালু করবার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। সরকার প্রথমে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সর্বভারতীয় নীতি নির্ধারণ পর্যন্ত চুপ করে থাকেন। সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির এক সভায় কোঠারী কমিশনের সুপারিশ-মত ১০ বছর স্কুলের শিক্ষা ২ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা তিন বছর ডিগ্রী কোর্স চালু করার পক্ষে অভিমত পেস করা হয়। গত ৭ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সরকারী সিদ্ধান্তে বলা হয় আগামী ১৯৭৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী থেকে সমস্ত পশ্চিম

বাংলায় দশ-ক্লাসের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে। এই ঘোষণার ফলে ১৯৫৮ খ্রীঃ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৭২ খ্রীঃ ৩১শে ডিসেম্বর সেই ব্যবস্থার অবসান ঘটবে। পঃ বাংলার ২১০০ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৭৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী এই বিদ্যালয়গুলি আবার দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। ১৯৭৫ খ্রীঃ আর কোন স্কুলে একাদশ শ্রেণী থাকবে না, ঐ খ্রীষ্টাব্দেই উচ্চতর মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য শেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর পরে যা হবে তা হবে বিশেষ ব্যবস্থা। পরে ১৫ই নভেম্বর মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে স্থির হয়েছে দশম শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৭৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারীর বদলে ১৯৭৪ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী চালু হবে।

সরকারী সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে দশ বছরের পরে দুই বছরের শিক্ষার জন্য জুনিয়র কলেজ স্থাপন করা হবে ও কিছু কিছু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশক্লাসে উন্নীত করা হবে। এই শিক্ষার জন্য বোর্ড স্থাপিত হবে। বারো বছরে শিক্ষা শেষ হলে দুই বছরের ডিগ্রী ও তিন বছরের অনার্স কোর্স চালু হবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার ভার দেওয়া হবে।

সরকারী সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে স্কুলের দশবছরের শেষে দু'বছরের জন্য জুনিয়র কলেজ বা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার পরিচালনার ভার ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড স্থাপন করে সেই বোর্ডের হাতে দেওয়া হবে। আবার এরই সাথে বলা হয়েছে ভাল উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলগুলি দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা হবে। তাহলে দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুলগুলির অবস্থা কি হবে? একই সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ ও ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ডের অধীনে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা পরিচালনা করা কি স্কুল (বা কলেজ) কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হবে। ছাত্ররা একই সাথে স্কুল ও কলেজের ছাত্র হবে শিক্ষকগণ একই সাথে স্কুল শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপক হবেন। সংক্ষিপ্ত সরকারী ঘোষণা থেকে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থা কি রূপ নেবে তা বোঝা কঠিন। এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা আশা করব বর্তমান ব্যবস্থায় যে সব দোষ ত্রুটি আছে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থা যেন সে সব দোষ থেকে মুক্ত থাকে। ভবিষ্যৎ চিত্রটি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার জন্য। ১৯৭৩ খ্রীঃ বদলে ১৯৭৪ খ্রীঃ থেকে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হবার ব্যবস্থা হওয়ায় সরকারী শিক্ষা বিভাগ ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ এক বছর সময় পেল। আশা করি এই এক বছরের মধ্যে যথা সম্ভব ত্রুটি মুক্ত পাঠক্রম তৈরী করে দেশে বলিষ্ঠ এক স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে কর্তৃপক্ষ সক্ষম হবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the main recommendations of the Mudaliar Commission and state to what extent there have been implemented.
[B. T. 1661]

2. Discuss the Development of Secondary Educatian in India since independence [B. T. 1959]
3. What are the characteristic features of secondary education in India? Discuss how it has been influenced by Western system of education. [B. T. 1964]
4. What are the major recommendation of the Secondary Education Commission regarding the curriculum at the High School stage and the examination at the end of the stage. [B. T. 1954]
5. Discuss the main features of the Report of the Secondary education commission (1952-53) and how they have influenced on educational organisation and practices [C. U. 1970]

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষা কমিশন ১৯৬৪-৬৬ (কোঠারী কমিশন)
[The Education Commission 1964-66]

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। দেশের শিক্ষার সংস্কারের জন্য রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন, জাতীয় নারীশিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিশন বা কমিটির রিপোর্ট পুরোপুরি না হলেও অধিকাংশ সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেছে ও সুপারিশ অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কিছুটা কাজ হলেও সমাজের দাবী অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থার যে উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। প্রয়োজন ও চিন্তার সাথে সত্যিকারের কাজের একটা বিরাট পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলবার জন্য ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকার কথা চিন্তা করে শিক্ষার সমগ্র দিকের পুনর্বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হয়। শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক দিয়ে পর্যালোচনা করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুসম, সংহতিপূর্ণ ও প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত একটা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য ভারত সরকার একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন—*In view of the important role of education in the economic and social development of the country, in building of a truly democratic society, in promotion of national integration and unity, and above all, for the transformation of the individual in the endless persuit of excellence and perfection, it is now considered imperative to survey and examine the entire field of education in order to realise within the shortest possible period a well balanced integrated and adequate systen of national education capable of making a powerful contribution to all spheres of national life.—[Resolution of the Govt. of India setting up the Ed. Commission.]*

দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে কারণ সমাজের রূপান্তর ও অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। এছাড়া স্বাধীনতা, সমান অধিকার ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

১৯৬৪ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই ভারত সরকার এক প্রস্তাবে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, *It is desirable to survey the entire field of educational development as the various parts of educational system strongly*

interact with and influence one another. It is not possible to have progressive and strong universities without efficient secondary schools and quality of these schools is determined by the functioning of elementary schools. What is needed, therefore, is synoptic survey and imaginative look at education considered as a whole and not fragmented into parts and stages. In the past, several commissions and Committees have examined limited sectors and specific aspects of education. It is now proposed to have a comprehensive review of the entire educutional system—[Resolution of the Govt. Of India setting up the Ed. Commission].

শিক্ষার সমাগ্রিক মূল্যায়ণ ও পুনর্গঠনের জন্য সরকারী প্রস্তাবে ১৭ জন সদস্য নিয়ে শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) গঠিত হয়। অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারী কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন 'কোঠারী কমিশন' নামেও পরিচিত। সদস্যদের মধ্যে দেশী বিদেশী বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ছিলেন, কমিশনের ১৭ জন সদস্য ছাড়াও ২০ জন পরামর্শদাতা যাঁরা সবাই বিদেশী কমিশনের কাজে সাহায্য করেছেন।*

১৯৬৪ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই কমিশন নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৪ খ্রী: ২রা অক্টোবর 'গান্ধী জন্মদিবসে' কমিশন কাজ শুরু করেন। প্রায় ২১ মাস কাজ করে ১৯৬৬ খ্রীঃ জুন মাসে কমিশন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলার নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশন দেশের নানা জায়গা ঘুরে ৯০০০ ব্যক্তির সাথে আলোচনা করেছেন। ২,৪০০ মেমোরেণ্ডাম ও নোট তাঁরা পেয়েছেন। এ ছাড়া ভারতের বাইরে বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন। কমিশন স্বীকার করেছেন রিপোর্টটি অত্যন্ত বড় হয়েছে। সমগ্র রিপোর্টটি ৬৯২ পৃষ্ঠা তার মধ্যে মূল রিপোর্ট ৪৮৯ পৃষ্ঠা।

ভারতের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে, বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাকাঠামো, পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষকদের অবস্থা, শিক্ষার প্রশাসনিক দিক প্রভৃতি পর্যালোচনা করে ভারতের শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে শিক্ষা কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করেছেন নানা দিক থেকে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'শিক্ষা কমিশনই' প্রথম কমিশন যেখানে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বরকমের শিক্ষার নানা দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। দেশের

[* 1. Prof. D. S. Kothari (Chairman) Members ; 2. Sri. A. R. Dawood. 3. Mr. H. L. Elvin. 4. Sri R. A. Gopalswami. 5. Dr. V. S. Jha. 6. Sri P. N. Kripal 7. Prof. M. V. Mathur. 8. Dr. B. P. Pal. 9. Kumari S. Panandikar. 10. Prof. Roger Revelle. 11. Dr. K. G. Saiyidian. 12. Dr. T. Sen. 13. Jean Thomas. 14. Prof. S. A. Shumovoky. 15. Prof. Sadatoshi Jhara. 16. Sri J. P. Naik (Member-Secretary). 17. Mr. J. F. Mc Dougull (Associated Secretary]

শিক্ষা ব্যবস্থার বিচার করতে গেলে একটিকে বাদ দিয়ে আর একটিকে দেখা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা সংস্কার করতে হলে সর্ব নিম্নস্তর থেকেই শুরু করা দরকার সেদিক থেকে কোঠারী কমিশনের রিপোর্ট একটি বলিষ্ঠ ও দৃঢ় পদক্ষেপ।

শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট যেমন বলিষ্ঠ ও দৃঢ় তেমন উচ্চাশাপূর্ণ। একটি উন্নতশীল জাতির শিক্ষা পরিকল্পনা উচ্চাশাপূর্ণ ও ব্যাপক হবে এইটাই স্বাভাবিক। ক্ষুদ্র পরিসরে শিক্ষা কমিশনের সমগ্র রিপোর্টের সব দিক দেখান সম্ভব নয়, তবুও, প্রধান ও প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে দেওয়া হ'ল। এর থেকে কমিশন কি বলতে চেয়েছেন, তাঁরা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

॥ শিক্ষা ও জাতীয় লক্ষ্য (Education & National objectives) ॥

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের শুরুতেই বলেছেন *The destiny of India is being shaped in her classrooms*—এটা অতিশয়োক্তি নয়। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার যুগে শিক্ষাই নিয়ন্ত্রণ করছে জাতির সম্পদ, কল্যাণ ও নিরাপত্তা। কি পরিমাণ শিক্ষার্থী আমাদের স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এল, তাদের শিক্ষার মান কিরূপ এর উপর নির্ভর করছে আমাদের জাতির পুনর্গঠন যার লক্ষ্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় উন্নয়নের সামগ্রিক কর্মসূচীতে শিক্ষার ভূমিকার নতুন করে মূল্যায়ণ বিশেষ জরুরী হয়ে উঠেছে। জাতি গঠনের কাজে শিক্ষার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা পূর্ণ করতে হলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কোথায় পরিবর্তন করতে হবে তা স্থির করে প্রয়োজনীয় কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সে কার্যসূচী রূপায়ণে উদ্যোগী হতে হবে।

কমিশন মনে করেন, শিক্ষাকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে শিক্ষা জীবনের সাথে যুক্ত হয় ও মানুষের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রূপান্তরের যে লক্ষ্য তা পূর্ণ করতে শিক্ষাই হচ্ছে একটা প্রধান অস্ত্র। এজন্য এমন ভাবে শিক্ষার উন্নতি করতে হবে যাতে উৎপাদন বাড়ে, সামাজিক ও জাতীয় সংহতি অর্জন করা যায় গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়, আধুনিক ধরনের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হয়, সামাজিক, নৈতিক ও মাধ্যমিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয় ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

In our opinion, therefore, no reform, is more important or more urgent to transform education, to relate it to the life, needs and aspiration of the people and thereby make it a powerful instrument of social, economic and cultural transformation necessary for the realization of our national goals. This can be done if education :

—is related to productivity ;

—strengthens social and national integration consolidates democracy as a form of Government and helps the country to-adopt it as a way of life ;

—hastens the process of modernizatian ; and

—strives to build Character by cultivating social, moral and spiritual values. [*Report of the Ed. Commission 1964-66*]

॥ শিক্ষা ও উৎপাদন (Education and Productivity) ॥

ভারত আজ একটা বিরাট পরিবর্তনের মুখে। শিক্ষা ছিল একটি সীমাবদ্ধ জনসংখ্যার মধ্যে সীমায়িত আজ তা ছড়িয়ে দিতে হবে আপামর জনসাধারণের মধ্যে। এজন্য যে সম্পদের প্রয়োজন তা যোগাড় করতে হলে শিক্ষার সাথে উৎপাদনের আয় বৃদ্ধি পেলে যে সম্পদ বাড়বে তাকেই আবার শিক্ষার জন্য নিযোগ করা যাবে। শিক্ষা ও উৎপাদন এমনিভাবে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যাবে।

শিক্ষা ও উৎপাদনকে এক সূত্রে গাঁথতে হলে নিম্নের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে :—

—Science as a basic component of education and culture ;

—Work experience as an integral part of general education.

—Vocationalisation of education, especially at the secondary school level, to meet the needs of industry agriculture and trade : and

—Improvement of scientific and technological education and research at the university stage with special emphasis on agriculture and allied sciences" [*Report of the Ed. Comm.*]

॥ সামাজিক ও জাতীয় সংহতি (Social & National integration) ॥

সামাজিক ও জাতীয় সংহতি সাধন শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছার জন্য জাতীয় চেতনা ও ঐক্য বৃদ্ধির জন্য কমিশন নিম্নে পরামর্শ দিয়েছেন :

সার্বজনীন বিদ্যালয় (*Common School*) :—জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্যরূপ সার্বজনীন স্কুল (*Common School*) প্রথাকে আগামী ২০ বছরের মধ্যে রূপায়িত করতে হবে। সার্বজনীন বিদ্যালয় (*Common School*) শিক্ষা প্রথায় জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সবাই শিক্ষার সুযোগ পাবে। উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ অর্থ, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল হবে না, শিক্ষার সুযোগ নির্ভর করবে মেধা ও প্রতিভার উপর।

শিক্ষার উপযুক্ত মান সার্বজনীন স্কুলে রক্ষিত হবে এবং এখানে শিক্ষার জন্য বেতন লাগবে না। অধিকাংশ অভিভাবক যা চান সার্বজনীন বিদ্যালয় (*Common School*)

তা পূর্ণ করবে। অভিভাবক তার ছেলেকে শিক্ষার জন্য কোন ব্যয় বহুল বেসরকারী স্কুলে (*Public School*) পাঠাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করবেন না।

‖ জাতি ও সমাজ সেবা (National & Social Service) ‖

শিক্ষার সর্বস্তরে সব ছেলেদের জন্য জাতি ও সমাজ সেবামূলক কাজ বাধ্যতামূলক হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ সাধ্য ও সামর্থ্য নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক জীবন গড়ে তোলবার চেষ্টা করবে। স্কুল ও কলেজের কাজ হোস্টেলের ও খেলার মাঠে নানা প্রয়োজনীয় কাজ ছেলেদের দিয়েই করান হবে।

জাতীয় পুনর্গঠন ও পল্লী উন্নয়নমূলক কাজ শিক্ষার একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে বিবেচিত হবে।

N. C. C. চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত বর্তমান রূপেই থাকবে। এর মাঝে চিন্তা করতে হবে কি ভাবে ৬০ দিনের একটানা কার্যসূচীর ভিত্তিতে এই ট্রেনিং দেওয়া যায়। ছেলেদের জন্য অন্যান্য সমাজ সেবামূলক কাজের ব্যবস্থা হবে। তখন N. C. C. স্বেচ্ছামূলক হবে।

জাতীয় ও সমাজ সেবামূলক কাজের প্রয়োজন সম্পর্কে কমিশন বলেছেন—*This can become an instrument to build character, improve discipline, incalculate a faith in the dignity of mannual labour and develop a sense of social responsibility.*

‖ ভাষানীতি (Language Policy) ‖

শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ভাষানীতি স্থির হলে জাতীয় সংহতি সাধনে সহায়ক হবে।

স্কুল ও কলেজ স্তরে শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার দাবী অগ্রগণ্য। স্কুল ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম একই রূপ হওয়া উচিত। এজন্য আঞ্চলিক ভাষা উচ্চশিক্ষার বাহন রূপে গৃহীত হওয়া উচিত। *U.G C.* ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যাতে এই সুপারিশ কার্যকরী হয় সেজন্য সচেষ্ট হবে ও দশ বছরের মধ্যে যাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয় সে চেষ্টা করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষায় গ্রন্থ, সাহিত্য বিশেষ করে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ যাতে রচিত হয় সে জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গ্রহণ করবে ও *U. G. C.* সাহায্য করবে।

সর্বভারতীয় শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজীই থাকবে অবশ্য ভবিষ্যতে কিছু রক্ষা কবচ রেখে এখানেও হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হবে।

স্কুল স্তর থেকে ইংরেজী শেখান হবে। অন্যান্য বিদেশী ভাষা বিশেষ করে রাশিয়ান শেখার জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করা হবে।

স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম-রূপে গ্রহণ করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে।

ইংরেজী উচ্চশিক্ষার ও শিক্ষাক্ষেত্রের যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমরূপে থাকবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকের যোগাযোগের ভাষারূপে ইংরেজীকে রাখা সম্ভব নয়। হিন্দীই এ স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করবে। যেহেতু হিন্দী সরকারী ভাষা ও অধিকাংশ লোকের যোগাযোগের ভাষা তাই অহিন্দী-ভাষাভাষী এলাকায় হিন্দী প্রসারের চেষ্টা করতে হবে। হিন্দী ছাড়াও অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষায় আন্তঃ প্রাদেশিক যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য স্কুল কলেজে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হবে।

॥ জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা (Promotion of National Consciousness) ॥

জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা স্কুল শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে। এজন্য আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্পর্কে সচেতন করবার সাথে সাথে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য-দর্শন-ধর্ম-ইতিহাস-শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-সংগীত নৃত্য-নাটক প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যাতে ধারণা জন্মে শিক্ষায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কথা সেখানের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে বুঝতে পারে এজন্য পাঠক্রমে ব্যবস্থা করা হবে। মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করবার জন্য আঞ্চলিক সংকীর্ণতা দূর করবার জন্য আন্তঃ রাজ্য ভিত্তিতে শিক্ষক বিনিময় *Holiday Camp, Summer School* প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মনে আস্থা ও আশার মনোভাব সৃষ্টির জন্য ভারতের সংবিধানের মূলনীতি ও মুখবন্ধে মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে যে উচ্চ আদর্শের কথা বলা হয়েছে এবং সংবিধানে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ যা আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মধ্য দিয়ে রূপ দিতে চাই সে সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

জাতীয় চেতনা ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর মধ্যে যে কোন বিরোধ নেই একথা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

॥ শিক্ষা ও গণতন্ত্র (Education & Democracy) ॥

ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কমিশন নিম্ন কর্মসূচীকে গ্রহণ করতে বলেছেন:

সংবিধানের ৪৫ ধারার নির্দেশ মত ১৪ বছর পর্যন্ত সব ছেলেমেয়ের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার ফলে শুধু নিরক্ষরতাই দূর হবে না তাদের নাগরিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে, স্ব স্ব বৃত্তিতে দক্ষতা বাড়বে ও জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতির প্রসার হবে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অর্থনৈতিক ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করে সর্বস্তরে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।

স্কুল শিক্ষার কার্যসূচী ও পাঠক্রম এমনভাবে রচিত হবে যাতে গতানুগতিক মূল্যবোধ জন্মাবার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক মন ও দৃষ্টিভঙ্গী, সহিষ্ণুতা, সমাজ সেবাবোধ, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ লাভ ঘটে।

॥ শিক্ষা ও আধুনিকীকরণ (Education & Modernisation) ॥

বর্তমান যুগে যেমন অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে জ্ঞানের প্রসার হচ্ছে, তেমনি দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞান দানই নয়। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যাতে অনুসন্ধিৎসু হয়, তার মনে নতুনকে জানবার কৌতুহল জাগে, বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। এছাড়া শিক্ষায় সে লাভ করবে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা ও অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও শিক্ষক শিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা।

আধুনিকীকরণের জন্য সমগ্র সমাজকেই শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষার মানের উন্নতির সাথে সমাজের সর্বস্তরে একদল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে। যাদের আনুগত্য, বিশ্বাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ভারতের মাটিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠবে।

॥ সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (Social, Moral and Spiritual Values) ॥

শিক্ষার মধ্য দিয়ে মৌলিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশের চেষ্টা করতে হবে।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনও ধর্মীয় ও নৈতিক উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশমত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমস্ত সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বে-সরকারী স্কুলেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে আশা করা যায়। এ জন্য প্রতি সপ্তাহে বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় কয়েকটি পিরিয়ড রাখা হবে। এজন্য ভিন্ন কোন শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে না। স্কুলের সব শিক্ষকই একাজ করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মবিভাগ কি করে ধর্মের মূল নীতিসমূহ কার্যকরী ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় সেজন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য গ্রন্থ রচনা করবে।

বহু ধর্মাবলম্বী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও পরধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব থাকলে সেখানে নাগরিকেরা প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে বাস করতে পারে। সমস্ত প্রধান ধর্মের মূল নীতি ও প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা হবে। সারা দেশের

স্কুল কলেজে একই শিক্ষা দেওয়া হলে সর্ব ধর্মের মৌলিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাবান হবে।

বিজ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে এক নতুন দৃষ্টি ভঙ্গী সৃষ্টি হবে যা আমাদের অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনোভাবাপন্ন করে তুলবে—*"We believe that India should strive to bring science and the values of the spirit together and in harmony and thereby pave the way for the eventual emergence of a society which would cater to the needs of the whole man and not to a particular fragment of his personality."*

॥ শিক্ষার কাঠামো ও মান (Structure and Standards) ॥

ভবিষ্যৎ শিক্ষার রূপ সম্পর্কে কমিশন যে সুপারিশ করেছেন শিক্ষার কাঠামো তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার মানের প্রশ্নটি কাঠামোর সাথে জড়িত। যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মান চারটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (১) সমগ্র শিক্ষা কাঠামোয় কয়টি স্তর ও প্রতি স্তরের সহিত পারস্পরিক সম্পর্ক (২) প্রতিটি স্তরের শিক্ষাকাল ও মোট শিক্ষাকাল (*duration*) (৪) শিক্ষার আনুষঙ্গিক অন্যান্য অত্যাবশ্যক সহায়ক উপাদান, যেমন, শিক্ষক, শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠক্রম, মূল্যায়ণ পদ্ধতি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, ও বিদ্যালয় গৃহ প্রভৃতি (৪) প্রাপ্ত সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার ; এই চারটি বিষয়ই পরস্পর নির্ভরশীল। শিক্ষার কাঠামো হচ্ছে কঙ্কাল—তারপরেই আসছে শিক্ষাকাল অর্থাৎ মোট কতদিন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এর একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যখন সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করেও শিক্ষাকাল না বাড়িয়ে শিক্ষার মানের উন্নতি সম্ভব হয় না তখনই সৃষ্টি হয় সমস্যার। শিক্ষা মানের অনেকটা নির্ভর করছে শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি কিভাবে কাজে লাগান হচ্ছে তার উপর। শিক্ষার মানের উন্নতি করতে হলে শিক্ষক, পাঠক্রম, মূল্যায়ণ ও শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতির ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করতে হবে।

স্কুল স্তরে অবিলম্বে দু'টি বিষয়ের উপর আমাদের মনোযোগ দিতে হবে : সুযোগ ও সম্বল আমাদের যতটুকু আছে বর্তমান শিক্ষাকালের (*duration*) মধ্যে তাকে কাজে লাগাবার ও উন্নত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তা করতে পারলে বর্তমানে যে শিক্ষাকাল নির্দিষ্ট আছে তার মধ্যেই স্কুলের এক বছরের উপযোগী পড়ার বিষয় বস্তু (*course content*) বাড়ান যাবে। তারপর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার কাল বাড়িয়ে ধীরে ধীরে ১৯৮৫ খ্রীঃ মধ্যে দু'বছর করা হবে।

॥ শিক্ষার নতুন রূপ ॥

শিক্ষা কমিশন নতুন শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে সুপারিশ করতে গিয়ে বলেছেন নতুন শিক্ষার রূপ (*Pattern*) হবে।

(ক) ১—৩ বছর প্রাক্ বিদ্যালয়ী শিক্ষা (*Pre-school education*)

(খ) ৭ বা ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার দু'টি স্তর থাকবে—৪ বা ৫ বছরের নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা (*Lower Primary*) ২ বা ৩ বছরের উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা (*Higher Primary*)।

(গ) ২ বা ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক (*Lower Secondary*)

(ঘ) ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা (*Higher Secondary Stage of two years of general education*) অথবা ১ বছর থেকে ৩ বছরের বৃত্তি শিক্ষা।

(ঙ) উচ্চ শিক্ষার স্তরে তিন বছরের বা তার চেয়ে বেশী সময়ের শিক্ষান্তে প্রথম ডিগ্রী দেওয়া হবে, এরপরে দ্বিতীয় ডিগ্রীর বা গবেষণার শিক্ষাকাল বিভিন্নতর হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিকালে শিক্ষার্থীর বয়স সীমা সাধারণতঃ ৬+কম হবে না।

দশ বছরের শিক্ষা শেষে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা (*Public Examination*) গ্রহণ করা হবে। এই দশ বছরের শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা (*General Education*), বিশেষীকরণের (*Specialisation*) কোন ব্যবস্থাই এই স্তরে থাকবে না।

নবম শ্রেণী থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায়ণে যে শাখা বিভাগ (*Streaming*) আছে তা আর থাকবে না। দশম শ্রেণীর পর থেকে ব্যবস্থা থাকবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি দু'রকম হবে—দশম শ্রেণীযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর বিদ্যালয়। প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করবার মনোভাব কি চেষ্টা ত্যাগ করতে হবে। বড় বড় স্কুলগুলির সামর্থ্য ও গুণগত যোগ্যতা বিচার করে উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত করা হবে। যে সব বিদ্যালয়ে উন্নততর মাধ্যমিকরূপে থাকার যোগ্যতা নেই সে সব নিম্নমানের স্কুল দশম শ্রেণীর স্কুলে নামিয়ে আনতে হবে।

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা একাদশ শ্রেণী থেকে শুরু হবে। একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে রূপান্তর কালে (*during transitional period*) শুধুমাত্র একাদশ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার (*Specialised Studies*) ব্যবস্থা করা হবে।

অবশ্য যেখানে প্রচলিত একাদশ শ্রেণীতে নবম শ্রেণী থেকে উপযুক্ত অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। (*Well-organised Integrated course in class IX to XI*) সেখানে দ্বাদশ শ্রেণী যুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা যেতে পারে।

॥ প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্থানান্তর (Transfer of the Pre-University Course) ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজগুলি থেকে প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা ১৯৭৫-৭৬ খ্রীঃ এর মধ্যে উচ্চতর বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ মধ্যে একে দু'বছরের

শিক্ষায় পরিণত করতে হবে। এ কাজের দায়িত্ব *U. G. C.*-কে নিতে হবে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচিত স্কুলে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

উচ্চতর দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পুনর্গঠন করা হবে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বৃত্তিশিক্ষার আয়োজন ॥

সাধারণ শিক্ষা কালে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা শেষে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী বৃত্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দু'টি স্তরের শিক্ষাকালে বৃত্তিভেদে ১ থেকে ৩ বছর পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হবে।

॥ কলেজীয় শিক্ষার পুনর্গঠন ॥

প্রথম ডিগ্রী প্রাপ্তির শিক্ষাকাল তিন বছরের কম হবে না। পরবর্তী ডিগ্রীর শিক্ষাকাল ২ বা ৩ বছরের হবে।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের *M. A./M. Sc./M.* Com. ডিগ্রীর জন্য নির্বাচিত বিষয়ে *Strong Graduate Course* খোলা হতে পারে।

তিন বছরের ডিগ্রীকোর্সের প্রথম বছরের শিক্ষা শেষে বিশেষ নির্বাচিত কয়েকটি কলেজে কয়েকটি বিষয়ে তিন বছরের বিশেষ ডিগ্রীকোর্সের ব্যবস্থা থাকবে। [অর্থাৎ প্রথম ডিগ্রী (*Special*) পেতে হলে চার বছর পড়তে হবে]

প্রচলিত কোর্স ও দীর্ঘতর নতুন কোর্সের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

দীর্ঘতর কোর্স যাতে শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করে সেজন্য উৎসাহ দেবার জন্য বৃত্তি ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

॥ সুযোগের সদ্ব্যবহার ॥

বর্তমানে শিক্ষাপ্রসার মান উন্নয়ন প্রভৃতির যে সুযোগ রয়েছে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে ও শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হবে। কমিশন মনে করেন শিক্ষার সময় ও বিদ্যালয়ের কার্যের দিন বাড়িয়ে বন্ধের সময় পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বর্তমান অবস্থাতেই শিক্ষার মান অনেক উন্নত করা যেতে পারে।

॥ শিক্ষার দিন (Instructional days) ॥

বিদ্যালয় সমূহে ২৩৪ দিন (৩৯ সপ্তাহ) ও কলেজে ২১৬ দিন (৩৬ সপ্তাহ) করবার সুপারিশ কমিশন করেছেন। দীর্ঘ ছুটি (*Vacation*) ছাড়া অন্যান্য বন্ধের দিন (*Holidays*) কমিয়ে দশ দিন করতে হবে। পরীক্ষার জন্য স্কুল ২১ দিন ও কলেজে ২৭ দিন ব্যয় করা হবে।

ছুটির (*Vacation*) দিনগুলিকে শিক্ষার্থী পড়ায়, সমাজসেবার শিবিরে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে, উৎপাদনের অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যয় করবে।

স্কুলে কাজের সময় বাড়াবার জন্য কমিশন বলেছেন নিম্নপ্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সময় হবে বছরে ৯০০ ঘণ্টা, উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার জন্য বছরে ১,১০০ ঘণ্টা ১,২০০ ঘণ্টা থাকা উচিত বলে কমিশন মনে করেন।

গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ওয়ার্কসপ প্রভৃতি সুযোগ যাতে শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বস্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কমিশন নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যেতে বলেছেন। প্রথম দশ বছরের স্কুলের শিক্ষার মান এমন ভাবে উন্নত করতে হবে যাতে এই স্তরে অপচয়ের হার অতি সামান্য হয়। দশবছরের পরে দশম শ্রেণী যুক্ত স্কুলের শিক্ষা বর্তমানে উচ্চতর স্কুলের শিক্ষার মানের সমান করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ডিগ্রীর মান উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত এক বছরের *course content* যোগ করতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নিরলস চেষ্টা করে যেতে হবে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে যে উন্নতি হচ্ছে তার তুলানামূলক বিচারের জন্য রাজ্য ও জাতীয় স্তরে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। মূল্যায়ণ পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার জাতীয় মান নির্ধারণ করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সাহায্য করবে।

॥ স্কুল জোট (School Complex) ॥

কতকগুলি স্কুল নিয়ে স্কুল জোট গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি জোটে (*Complex*) পাশাপাশি মাধ্যমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক স্কুলগুলি থাকবে। জোটের মাধ্যমে স্কুলগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হবে ও জোটের স্কুলগুলি শিক্ষামানের উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করবে।

সর্বক্ষণের শিক্ষা ছাড়াও প্রতি শিক্ষাস্তরে আংশিক সময়ের শিক্ষা (*Part time*) ও নিজে নিজের শিক্ষার (*Own time education*) উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

বর্তমানে বিদ্যালয় ও শিক্ষাস্তরের বহু নাম রয়েছে। একই স্তরের শিক্ষা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারগুলির সাথে পরামর্শ করে সর্ব ভারতীয় নামকরণের প্রস্তাব করেছেন। এই সম্পর্কে কমিশনের প্রস্তাবিত নাম নীচে দেওয়া হ'ল।

বর্তমান নাম	প্রস্তাবিত নাম
1. *Pre-Primary* *Pre-Basic* *Kindergarten* *Montessori etc.*	*Pre-Primary*
2. (*a*) *Primary* *Lower Primary* *Junior Basic* *Lower Elementary*	*Lower Primary* *Classes I—IV* *or I—V*

বর্তমান নাম	প্রস্তাবিত নাম
(b) *Middle* *Junior High* *Upper Primary* *Senior Basic* *Higher Elementary*	*Higher Primary* *Classes V—VII* *or VI—VIII*
3. (a) *High School*	*Lower Secondary Education* *Classes VIII—X* *or IX—X*
(b) *Higher Secondary School—P.U.C. in some States.*	*Higher Secondary Education* *XI—XII*

॥ ভর্তি ও জনশক্তি (Enrolment & Man Power) ॥

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার ও জনগণের মধ্যে শিক্ষার ক্রম বর্ধমান আগ্রহ সব কিছু মিলিয়ে শিক্ষার চাহিদা মেটান এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তো সর্বত্র 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' রব। জনসংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকলে এই সমস্যা স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা দেবে। এই সমস্যার বিচার করে কমিশন ভর্তি ও জনশক্তি সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করেছেন।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কমিশন ভর্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। দেশের সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষার জন্য ১৯৭৫-৭৬ খ্রীঃ এর মধ্যে প্রতিটি শিশুর জন্য পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ এর মধ্যে সকলের জন্য সাত বছরের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েরা যারা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করতে পারে নি তাদের জন্য আবশ্যিক ভাবে এক বছরের আংশিক সময়ের শিক্ষার (*Part time education*) ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তি চারটি মূলনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে (১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা (২) সমগ্র শক্তিকে কাজে লাগাবার সামর্থ (৩) শিক্ষার সুযোগ দেবার শক্তি (৪) কর্মক্ষেত্রে জনশক্তির চাহিদা।

উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে শিক্ষার যে সুযোগ রয়েছে ও জনসাধারণের মধ্যে যে চাহিদা রয়েছে তার সামঞ্জস্যের জন্য ভর্তি যোগ্যতার মাপকাঠিতে করতে হবে (*Selective admission*)।

ভাল ছেলেদের মধ্যে উপরের দিকের ৫-১৫% পর্যন্ত ছেলে যাতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের পরবর্তী স্তরে শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে জনশক্তির ভবিষ্যৎ চাহিদা (*Future manpower needs*) বিচার করে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে যোগ্যতার নির্বাচন ব্যবস্থা অপরিহার্য। কিন্তু, তপশীল ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। বৃত্তি শিক্ষার প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করবেন। নিজ নিজ রাজ্যের সামর্থ্য ও প্রয়োজন বিচার করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষার হার যেখানে ১৯৬৬ খ্রীঃ এর জাতীয় হারের নিম্নে সেখানে দ্রুত শিক্ষা প্রসারের আয়োজন করতে হবে।

স্কুল শিক্ষা প্রসারের জন্য জেলাওয়ারী পরিকল্পনা নিতে হবে। কমিশনের মতে শিক্ষা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বর্তমান জন্মহার কমিয়ে অর্ধেক করতে হবে, না হলে বর্তমান জন্মহার বৃদ্ধির সাথে শিক্ষা ও চাকুরীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না।

॥ শিক্ষার সমান সুযোগ (Equalisation of Educational Opportunity) ॥

শিক্ষার একটি বিশেষ সামাজিক লক্ষ্য হচ্ছে অনগ্রসর ও সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায় যাতে শিক্ষায় সমান সুযোগ পায় ও শিক্ষার দ্বারা নিজের ও সমাজের উন্নতি করতে পারে সে ব্যবস্থা করা। শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগের অভাব বহু কারণে সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছাড়াও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার অনেক কারণ আছে। স্কুলের অভাব, প্রতিকূল গৃহ পরিবেশ, মেয়ে স্কুলের অভাব, ভাল স্কুলের অভাব, সবই কোন-না-কোন ভাবে সমান সুযোগের অভাব বলে গণ্য হতে পারে।

কমিশন বলেছেন অর্থনৈতিক কারণে কোন ছেলেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। তাই কমিশন সুপারিশ করেছেন, এমন ভাবে পরিকল্পনা ও কার্যসূচী নিতে হবে যাতে দেশে সর্বস্তরের শিক্ষা একদিন অবৈতনিক হবে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা খুব শীঘ্র, সম্ভব হলে, চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যেই অবৈতনিক করতে হবে।

নিম্ন মাধ্যমিক সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা পঞ্চম পরিকল্পনার মধ্যে অবৈতনিক করতে হবে।

তারপর দশ বছরে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার আনুষঙ্গিক ব্যয় যাতে কম হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দেবার পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে *Book Bank* প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্কুল লাইব্রেরীতে পাঠ্যপুস্তক একাধিক কপি রাখা হবে। অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলেদের বই কেনার জন্য অর্থ সাহায্য করা হবে।

যে সব ছেলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় তাদের উপযুক্ত বৃত্তি দিতে

হবে। প্রতি বিদ্যালয়ে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর ছেলেদের শতকরা প্রথম দশজনকে বৃত্তি দিতে হবে।

প্রতিভাবান ছেলেদের চিহ্নিত করবার জন্য অবিলম্বে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। স্কুলগুলিকে একাজে সাহায্য করতে হবে, প্রতিভাবান ছেলেদের বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় বৃত্তি (*National Scholarship*) পরিকল্পনা গ্রহণ করে ১৯৭৫-৭৬ খ্রীঃ এর মধ্যে মোট পরীক্ষার্থীর ৫% ও ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ মধ্যে মোট পরীক্ষার্থীর ১০% এর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ২০% শিক্ষার্থী যাতে বৃত্তি পায় ১৯৭৬ খ্রীঃ মধ্যে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে (*Vocational education*) যাতে শতকরা ৩০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি (*Scholarship*) পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। পেশাগত উচ্চশিক্ষায় শতকরা ৫০ জনের বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতি বছর ৫০০ শিক্ষার্থীকে বিদেশে পাঠাবার জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বিদেশে পেশাগত শিক্ষার জন্য *Loan Scholarship* এর ব্যবস্থা করতে হবে।

স্কুল স্তরে বৃত্তি দেবার দায়িত্ব রাজ্য সরকার এবং উচ্চশিক্ষা ও বিদেশে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা করবে।

পশ্চাৎপদ্ ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য *National Committee on Women's education* যে সব সুপারিশ করেছেন তা কার্যকরী করতে হবে।

তপশীল ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বর্তমানে যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা আরও বাড়াতে হবে। ১৯৭৫-৭৬ খ্রীঃ এর মধ্যে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আদিবাসী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ স্কুল শিক্ষা ঃ প্রসার সমস্যা (School Education : Problem of Expansion) ॥

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সমস্যাটিকে এককভাবে একই দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে বিচার বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের পথের ইংগিত দিয়েছেন।

॥ প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

শিশুর দৈহিক গঠন—ভাবগত ও মানসিক বিকাশের দিক থেকে এই স্তরের শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ৩-৫ বছরের ছেলেমেয়েদের ৫% ও ৫-৬ বছরের ছেলেমেয়েদের ৫% যাতে ১৯৮৬ খ্রীঃ এর মধ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসে সে চেষ্টা করতে হবে।

প্রতি রাজ্যে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রাক্ প্রাথমিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। প্রতিটি জেলায় এই শিক্ষা পরিচালনা, পরিদর্শন ও প্রসারের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপিত হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে। এই সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় কোন কঠোর নীতি থাকবে না। বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে যতটুকু নেওয়া সম্ভব ততটুকু নিয়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা নাচগান ও কাজের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নানা প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে থাকবে।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

আমাদের সংবিধানের নির্দেশ রয়েছে ১৪ বছর পর্যন্ত প্রতিটি ছেলেমেয়ের বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। এই বিধান দেশের সর্বত্র দু'টি পর্যায়ে কার্যকরী করা হবে। ১৯৭৫-৭৬ খ্রীঃ এর মধ্যে সাত বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

অনুন্নয়ন ও অপচয় এমন ভাবে কমিয়ে আনতে হবে যাতে স্কুলে যারা ভর্তি হ'ল তাদের শতকরা ৮০ জন ছেলেমেয়ে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছাতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার মান এমন ভাবে উন্নত করতে হবে প্রতিটি ছাত্র যেন এই শিক্ষায় দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠে। সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষা শেষে যাদের বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হয় নি এবং যারা বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য সে ব্যবস্থা করতে হবে।

নিম্ন প্রাথমিক স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা এমন ভাবে করা হবে যাতে কোন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১ মাইলের বেশী দূরে যেতে না হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব প্রতি শিক্ষার্থীর থেকে ১-৩ মাইলের মধ্যে হবে।

পরবর্তী দশবছরের শিক্ষা পরিকল্পনায় সবচেয়ে জরুরী কার্যস্চী হবে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধ করা।

১ম শ্রেণীতে অপচয় রোধ করবার জন্য ১ম ও ২য় শ্রেণীকে *Ungraded teaching unit* রূপে গণ্য করা হবে। প্রথম শ্রেণীতে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

অন্যান্য শ্রেণীতে অপচয় রোধের জন্য স্কুলগুলির শিক্ষা মানের উন্নতি, আংশিক সময়ের শিক্ষা অভিভাবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে নি এবং যাদের মাত্র অক্ষর জ্ঞান হয়েছে তাদের জন্য এক বছরের *literacy class*-এর ব্যবস্থা করা হবে। এই ক্লাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থাকবে।

যে সব শিশু নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে আরও পড়তে চায় কিন্তু আর্থিক বা অন্য কোন কারণে পুরো সময়ের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সে নিতে পারছে না তাদের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার দিকে কমিশন বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেছেন। তাদের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হবে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ॥

পরবর্তী কুড়ি বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের কার্যসূচী গ্রহণে তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থিতি, শিক্ষার উপযুক্ত মান রক্ষা, মেধাবী ও প্রতিভাবান ছেলে খুঁজে বের করা।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতি জেলার জন্য ভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে ও দশ বছরের মধ্যে সে কার্যসূচী রূপায়িত করতে হবে। বর্তমান বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার নিম্নতম মান রক্ষিত হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে।

মাধ্যমিক স্তর থেকেই বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ২০% ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৫০% ছাত্র যাতে বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা। রাখতে হবে।

গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী নানা ধরনের আংশিক সময় ও পুরো সময়ের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে সাহায্য করবে।

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০% থেকে ২৫% শিক্ষার্থী যাতে আংশিক শিক্ষা পেতে পারে সে সুযোগ থাকবে। কৃষি বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে স্ত্রী শিক্ষার হার যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কুড়ি বছরের মধ্যে নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষিত স্ত্রী পুরুষের হার যাতে যথাক্রমে ১ ঃ ২ ও ১ ঃ ৩ হয় তাই করতে হবে।

মেয়েদের জন্য হোস্টেলের সুবিধাযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ দিতে হবে। স্কুল স্থাপনের স্থান নির্বাচন এমনভাবে করা হবে যাতে একই স্থানে পাশাপাশি একাধিক স্কুল স্থাপিত না হয়। অলাভজনক ভাবে ও অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্থাপন রোধ করতে হবে। বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয় সেই বৃত্তির উপযোগী শিল্প কেন্দ্রের নিকট স্থাপন করা হবে।

॥ বিদ্যালয়ের পাঠক্রম (School Curriculum) ॥

স্কুলের পাঠক্রম নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্রই একটা ভাঙাগড়া চলছে। এমন কি আমেরিকার মত দেশে যেখানে চিরাচরিত পাঠক্রমকে সেকেলে বলে বহু দিন আগে পরিত্যাগ করা হয়েছে সেখানেও বর্তমান পাঠক্রমের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমা ও গভীরতা এত বেড়ে গিয়েছে যে তার সাথে তাল মিলিয়ে পাঠক্রম রচনা করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের স্কুল পাঠক্রম অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে রচিত আর সেকেলে (*very narrowly conceived and largely out of date*)। কমিশন বলেছেন, "*Education is a threefold process of imparting knowledge, developing skills and inculcating proper interests, attitudes and values.*" এর মধ্যে আমাদের স্কুলগুলিতে প্রথমটি—জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা নিয়ে আমরা ব্যস্ত। যোগ্যতা বিকাশে সহায়তা করা, মূল্যবোধ সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলা বা জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরীর কথা আমাদের পাঠক্রমে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাঠক্রম তৈরী হয়। রাজ্যস্তরে যে পাঠক্রম তৈরী হয় সবাইকে তাই মেনে নিতে হয়। এই পাঠক্রমের পরিবর্তন কি সংস্কার সহজে হয় না। স্কুল স্তরের প্রয়োজন অনুসারে প্রধান শিক্ষকগণ এর কোন পরিবর্তন করতে পারেন না। কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ এখানে নেই। বাস্তব প্রয়োজনের সাথে এর সম্পর্ক অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। পাঠক্রম রচনার পিছনে প্রায়ই কোন গবেষণা থাকে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমা রেখার প্রসারের সাথে নতুন ও পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জাতীয় প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে একটা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠক্রম রচনা করতে হবে। স্কুল পাঠক্রমের উন্নত মানের জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ক) **পাঠক্রম নিয়ে গবেষণা** (*Research in Curriculum*): বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ (*Department of Education*) ও শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ সমূহে পাঠক্রম নিয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে পাঠক্রম রচনা করতে হবে। বিক্ষিপ্ত ভাবে এখানে ওখানে দু' একটা পরিবর্তন আনবার চেষ্টা না করে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠক্রম রচনা করতে হবে। (খ) পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ তৈরী (*Preparation of Text Book and other teaching aids*): যে কোন পাঠক্রমের সফল রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন ভাল পাঠ্য বই ও শিক্ষা সহায়ক সহজ সরঞ্জাম। (গ) শিক্ষকদের চাকুরীকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা (*In-service Education of Teachers*): নতুন পাঠক্রমের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাতে শিক্ষকরা সচেতন হন ও পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা হয় সেজন্য সেমিনার, রিফ্রেসার কোর্স প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠ্যসূচী তৈরী করতে বসে শিক্ষকের যোগ্যতা, বিদ্যালয়ের সুযোগ ও ছাত্রদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার কথা ভাবতে হবে। রাজ্যভিত্তিক পাঠক্রম রচিত হলে দুর্বল স্কুলগুলির ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেবে। এজন্য প্রয়োজন হলে স্কুলগুলি যাতে স্থানীয় প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন করতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

স্কুলগুলিতে যাতে পরীক্ষামূলক পাঠক্রম (*Experimental curricula*) গ্রহণ করতে পারে সে স্বাধীনতা দিতে হবে। বাস্তব প্রয়োজন বিচার করে পরীক্ষামূলক পাঠক্রম রচনা করা হলে বিভাগীয় সম্মতি নিয়ে তা স্কুলে চালু করা হবে। তা না হলে

বিভাগীয় পাঠক্রমই স্কুলে অনুসৃত হবে। পাঠক্রম রচনা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং কলেজগুলিকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।

রাজ্য শিক্ষা পর্ষৎ প্রতি বিষয়ে উন্নত পাঠক্রম (*Advanced curricula*) রচনা করে ধীরে ধীরে চালু করবেন। প্রথমে দু'টি পাঠক্রম রচিত হবে—উন্নত (*Advance*) ও সাধারণ (*General*)। সাধারণ পাঠক্রম সব স্কুলেই চালু করা হবে। ভাল স্কুলগুলিতে যেখানে উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষা পর্ষৎ নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেখানে উন্নত পাঠ্যসূচীর এক বা একাধিক বিষয় চালু করা হবে। ক্রমে বেশী সংখ্যক স্কুল যাতে উন্নত পাঠক্রম গ্রহণ করতে পারে সে চেষ্টা করা হবে। এজন্য স্কুলগুলিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হবে। বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়ে "বিষয় শিক্ষক সমিতি" (*Subject Teachers' Association*) গঠন করা হলে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যমে পাঠক্রমের মান উন্নতির সহায়ক হবে।

॥ পাঠক্রম সংগঠন (Organisation of the Curriculum) ॥

প্রথম দশ বছরের শিক্ষায় একই রকম পাঠক্রম সর্বত্র অনুসৃত হবে। দশ বছরের শিক্ষা শেষে *Public Examination* এর পূর্বে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। সাধারণ শিক্ষায় কোন বিশেষীকরণ বা শাখা বিভাগ থাকবে না (*there would be no streaming or specialisation in the general course*)।

মুদালিয়র কমিশন যে উদ্দেশ্যে বহুমুখী বিদ্যালয়ের সুপারিশ করেছিলেন তা বহু কারণে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষীকরণের শিক্ষা শিক্ষার্থীর যে বয়সে শুরু হয় তা এই ব্যবস্থার একটা দুর্বলতা। তাই কমিশন সুপারিশ করেছেন বহুমুখী শিক্ষা ও বিশেষীকরণ উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু হবে। (*'We, therefore, recommend that in the non-vocational school a common curricula of general education should be provided in the first ten years of school education and that diversification of studies and specilisation should begin only at higher secondary stage.'*)

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্য :—প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা নিরবচ্ছিন্ন হলেও নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে স্কুল শিক্ষার মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে স্তর অনুসারে যোগ্যতা অর্জনের সীমা রেখা স্থির করতে হবে।

নিম্ন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্য :—শিক্ষার্থী লেখা পড়া ও অঙ্কনের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করবে। এই সাথে নিজেকে এই স্তরে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবে। গঠনমূলক ও সৃষ্টিধর্মী কাজে সে অংশ গ্রহণ করবে ও স্বাস্থ্য সম্মত বিধানগুলি অভ্যাস করবে।

মাতৃভাষাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের জন্য প্রথম চার বছরের শিক্ষায় মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে না। শিশুর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠক্রম ধীরে ধীরে বিস্তৃত করা হবে।

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সাথে দ্বিতীয় ভাষা প্রবর্তন করা হবে। অংক শেখার যোগ্যতা এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে শিক্ষার্থী কঠিনতর অংকে পারদর্শিতা অর্জন করে। বিজ্ঞান (*Physical and Natural*), ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক সৃজন প্রবণতার উপর ভিত্তি করে কলাবিদ্যা ও কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া হবে। দৈহিক শিক্ষার ব্যবস্থাও এই স্তরে থাকবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তরুণ শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিক্ষণের প্রয়োজন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্থক নাগরিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রম রচিত হবে। এই স্তরে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা বাড়বে, বৌদ্ধিক শিক্ষালাভ ঘটবে, বিভিন্নরূপ যোগ্যতার বিকাশ লাভ ঘটবে, চিন্তাশক্তি ও নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা অর্জন করবে।

বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনে বলেছেন:—"*The needs of adolescence are relateds not only to the acquisition of knowledge and promotion of intellectual, ability but the full development of the physical, emotional' aesthetic, or moral aspects of the pupils personality. Provision has therefore, to be made in the curriculum on a more systematic scale than before two programmes of physical education and subjects like art, craft, music dancing and education in moral and spiritual values.*

পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশন চূড়ান্ত কোন সুপারিশ করেন নি, কিন্তু, একটা খসড়া পাঠক্রম রচনা করেছেন সেই কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ পাঠক্রম রচনা করা সম্ভব হবে।

1. LOWER PRIMARY (Classes I—IV)

(a) One Language—the mother tongue or regional language. (b) Mathematics. (c) Study of Environment (covering science and social studies in class III & IV) (d) Creative Activities. (e) Work experience & social service. (f) Health Education.

2. HIGHER PRIMARY (V—VII)

(a) Two Languages—(I) the mother tongue or regional language (ii) Hindi or English,

(Note :—A third language—English, Hindi or the regional language—may be studied on an optional basis)

(b) Mathematics (c) Science (d) Social Studies (or History. Geography & Civics) (e) Art. (f) Work experience & Social Service (g) Physical Education. (h) Education in Moral & Spiritual values.

3. LOWER SECONDARY STAGE (Classes VIII—X)

(a) Three Langugaes. In non-Hindi speaking areas, these Languages will normally be (i) the mother language or the regional language (ii) Hindi at a higher or lower level (iii) English at a higher or lower level. In Hindi speaking areas, they will normally be (i) the mother tongue or the regional language (ii) English (or Hindi, if English has already been taken as the mother tongue) and (iii) a modern Indian language other than Hindi (Note : A Classical language may be studied in addition to the above three languages on optional basis)

(b) Mathematics (c) Science. (d) History, Geography & Civics. (e) Art (f) Work experience & Social Service. (g) Physical Education. (h) Education in Moral & Spiritual values.

॥ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ॥

কমিশন নিম্ন প্রাথমিক স্তরে প্রথম দু'টি শ্রেণীকে এক ও অবিভাজ্য ইউনিট রূপে গণ্য করবার প্রস্তাব করেছেন যেখানে সম্ভব এই ব্যবস্থাকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা চলতে পারে। এই স্তরে শুধুমাত্র ভাষা ও গণিতের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভাষা শিক্ষায় পড়া ও বোঝা (*reading & understanding*) দুটোর উপরই জোর দিতে হবে। পরিবেশ পরিচিতি পুঁথির মাধ্যমে না হয়ে শিশু তার নিজের পরিবেশ থেকে দেখে ও শুনে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জ্ঞান লাভ করবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পরিবেশ পরিচিতির পরবর্তী ধাপ সমাজবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে। এই সময় থেকে এগুলিকে নিয়মিত বিষয়রূপে (*regular subjects*) গণ্য করা হবে। এই স্তরে সমস্ত শিক্ষাতেই কর্মকেন্দ্রীক পদ্ধতির একটা বিশেষ স্থান থাকবে। কতকগুলি বিষয় যেমন চারুকলা, গান, নাটক, হাতের কাজ প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেকে প্রকাশের সুযোগ পাবে। এই স্তরে কাজের অভিজ্ঞতা *Work experience* প্রধানতঃ হাতের কাজ, শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, স্কুল সাজান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে লাভ করবে।

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বিষয় সমূহ আরও শ্রেণীবদ্ধ হবে। পাঠক্রমের পরিধি বাড়বে সেই সাথে বাড়বে বিষয় বস্তুর গভীরতা। শিক্ষা পদ্ধতি আরও সুসংবদ্ধ হবে। যোগ্যতা অর্জনের মান আরও সুনির্দিষ্ট হবে (*Standards of attainment more specific and definite than before*) দ্বিতীয় ভাষা হিন্দী বা ইংরেজী এই স্তর থেকে শেখান সুরু হবে। দুটো ভাষা আবশ্যিক হলেও ইচ্ছা করলে শিক্ষার্থী একটি ঐচ্ছিক ভাষা

তৃতীয় ভাষারূপে শিখতে পারবে। গণিত ও বিজ্ঞানের উপর আরও বেশী জোর দেওয়া হবে। যোগ্য শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় সুযোগ থাকলে সমাজ-বিজ্ঞান এই স্তরে রাখা যেতে পারে; না হলে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি পড়ান হবে। চারুকলা (*arts*) ও হস্ত শিল্প (*crafts*) পাঠ্য সূচীতে আরও বেশি প্রাধান্য লাভ করবে। হস্ত শিল্পকে কাজের অভিজ্ঞতা (*work experience*) রূপে গণ্য করা হবে। খেলাধূলা ও দেহ চর্চাকে সময় তালিকায় উপযুক্ত স্থান দেওয়া হবে। সপ্তাহে ১।২টি পিরিয়ড নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষার জন্য রাখা হবে। ছেলেদের চরিত্র গঠনের জন্য একটা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা করা হবে। নিজের ধর্ম ছাড়া অপর ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করা সমাজ সেবার অঙ্গরূপে গণ্য করা হবে।

॥ নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর ॥

যে সব বিষয় আগে শেখান হয়েছে এই স্তরে তা থাকবে এবং ছাত্রদের বয়ঃ বৃদ্ধির সাথে শিক্ষণীয় বিষয় গভীরতর ও কঠিনতর হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির কথা স্মরণ রেখে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় রূপে পড়ান হবে। যেখানে প্রয়োজন ও স্বাভাবিক সেখানে এ বিষয়গুলি অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়ান হবে। তৃতীয় ভাষাকে এই স্তরে আবশ্যিক রূপে পাঠ্যসূচীতে স্থান দেওয়া হবে। কাজের অভিজ্ঞতা (*work experience*) ফার্ম, কারখানা বা উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে হবে। প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে সমাজ সেবামূলক কাজ করতে হবে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সংহত রূপে দেওয়া হবে।

॥ উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর ॥

দশবৎসর স্কুলের শিক্ষার পর প্রথম বহিঃপরীক্ষা (*external examination*) দিয়ে শিক্ষার্থী স্থির করবে তার ভবিষ্যৎ জীবনে সে কি শিক্ষা গ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, উৎসাহ, যোগ্যতা, রুচি প্রভৃতি বিচার করে তাকে পরিচালনা ও নির্দেশ দেবার ব্যবস্থা এ স্তরে থাকবে। এই স্তরে বৃত্তি শিক্ষার (*vocational education*) ব্যাপক আয়োজন করতে হবে। কমিশন মনে করেন দশম শ্রেণীর শিক্ষার পর ৫০% শিক্ষার্থী পুরো বা আংশিক সময়ের জন্য বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণ করবে। বাকী ৫০% এর জন্য সাধারণ শিক্ষার (*General education*) ব্যবস্থা করতে .হবে। বর্তমান প্রচলিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার মত শাখা বিভাগ (*streaming*) থাকবে না। কিন্তু, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়েছিল সে সুযোগ ছেলেদের সামনে খোলা থাকবে। বাণিজ্য, কৃষি ও কারিগরী বিদ্যা বৃত্তি শিক্ষার মধ্যে গণ্য হবে। সাধারণ শিক্ষা স্তরে কলা ও বিজ্ঞান থাকবে। বাধ্যতামূলক বিষয় বাদ দিয়ে ছেলেরা বিভিন্ন বিষয় থেকে পছন্দ মত তিনটি বিষয় গ্রহণ করতে পারবে। বর্তমান ব্যবস্থায় যেমন কলা বিভাগের ছাত্র বিজ্ঞান শাখার কোন বিষয় গ্রহণ করতে পারে না।

প্রস্তাবিত পাঠক্রমে সে অসুবিধা থাকবে না, মিশ্র বিষয় গ্রহণ করা ভবিষ্যতে চলবে। এই স্তরে ইচ্ছা করলে ইংরেজী ছাড়াও অন্য কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার সুযোগ থাকবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অন্যান্য সহকারী বিষয় পাঠ্যসূচীতে স্থান দেওয়া হবে।

কমিশন নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত স্কুলের সময় তালিকা সম্পর্কে কোন সুপারিশ করেন নি। কিন্তু উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে সময় তালিকায় কোন বিষয়কে কতটুকু স্থান দেওয়া হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনটি *elective* বিষয়ের জন্য অর্দ্ধেক সময় নির্দিষ্ট থাকবে। এক চতুর্থাংশ ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে, বাকী এক চতুর্থাংশ অন্যান্য সহকারী বিষয়-সমূহের জন্য ব্যয় করা হবে।

কমিশন দু'বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের কয়েকটি বিষয়ের একটি তালিকা দিয়ে বলেছেন বিস্তৃত পাঠক্রম বিশ্ববিদ্যালয় ও মধ্য শিক্ষা পর্ষতের ও শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধিরা মিলে স্থির করবেন।

কমিশন স্থিরিকৃত বিষয় তালিকা :—

1. *Any two languages, including any modern Indian language, any foreign language and any classical language.*

2. *Any three subjects from the following :*

(*a*) *An additional language,* (*b*) *History* (*c*) *Geography,* (*d*) *Economics* (*e*) *Logic* (*f*) *Psychology* (*g*) *Sociology* (*h*) *Art.* (*i*) *Physics* (*j*) *Chemistry* (*k*) *Mathematics* (*l*) *Biology* (*m*) *Geology* (*n*) *Home Science.*

3. *Work experience and Social Service.*

4. *Physical education.*

5. *Art or craft.*

6. *Education in Moral and Spiritual Values.*

কমিশন রাজ্য শিক্ষা বিভাগকে বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত পাঠক্রম (*advanced course*) প্রবর্তন করার সুপারিশ করেছেন। সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে ভাল স্কুলে উন্নত পাঠক্রমের দুটি একটি বিষয়ে ধীরে ধীরে চালু করা হবে। উন্নত বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় রূপে রাখা যেতে পারে। উন্নত বিষয় কিছুটা স্কুলের নিয়মিত সময় তালিকার ও কিছুটা সময় তালিকার বাইরে রেখে পড়ান হবে। ছেলেরা শিক্ষকের সহায়তায় নিজেরাই পড়বে। সময় ও সুযোগ বুঝে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

॥ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ (Special features in the Study of Different Subjects) ॥

ভাষা শিক্ষা :—ইংরেজী ভাষাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সহযোগী ভাষা বলে গ্রহণ করা হয়েছে, সেদিক থেকে চিন্তা করে স্কুল পর্যায়ে ভাষা শিক্ষার প্রশ্নটি নতুন করে

STATE INSTITUTE OF EDUCATION Govt of West Bengal.

বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। ভাষা ফর্মূলার পরিবর্তন নিম্ননীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত বলে কমিশন মনে করেন :

হিন্দী কেন্দ্রীয়স্তরে সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হওয়ায় মাতৃভাষার পরেই হিন্দীকে গুরুত্ব দিতে হবে।

কাজ চালানোর মত ইংরেজী জ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি অতিরিক্ত সম্পদ বলে গণ্য হবে।

কোন- ভাষা শিক্ষায় শিক্ষার্থী কতটা যোগ্যতা অর্জন করল তা যেমন উপযুক্ত শিক্ষকের উপর নির্ভর করে তেমনি সে ভাষা শেখার কি সুযোগ রয়েছে ও ভাষা শিখতে কতটা সময় ব্যয় করা হ'ল তার উপর নির্ভর করছে।

ভাষা শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (*VIII—X*)। এই সময়ে ভাষা শিক্ষা দিতে অল্প সংখ্যক শিক্ষক হলেই চলবে।

দুটি অতিরিক্ত ভাষা একই সাথে শেখান হবে না। ধাপে ধাপে তার প্রবর্তন করা হবে।

হিন্দী বা ইংরাজী শিক্ষার পিছনে যখন একটা উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন থাকবে (*When there is greatest motivation and need*) তখনই সেই ভাষা প্রবর্তন করা হবে।

শিক্ষার কোন স্তরেই চারটি ভাষা বাধ্যতামূলক করা হবে না।

এই নীতির উপর ভিত্তি করে ত্রিভাষা ফর্মূলা এই রকম হবে :—(ক) মাতৃ-ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা (খ) কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা বা যতদিন পর্যন্ত সহযোগী কোন ভাষা থাকে সে ভাষা (গ) 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে নেই এমন একটি আধুনিক ভারতীয় বা ইউরোপীয় ভাষা যা শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয় নি।

নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু সাধারণভাবে একটি ভাষা—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা—শিখবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে দু'টি ভাষা শিখবে—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এবং সরকারী ভাষা বা সহযোগী ভাষা। নিম্ন মাধ্যমিকস্তরে তিনটি ভাষা পড়বে—মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, সরকারী বা সহযোগী ভাষা ও একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা। উচ্চ মাধ্যমিকস্তরে কেবলমাত্র দু'টি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শেখান হবে।

ইংরেজী ছাড়া অন্য বিদেশীভাষা বাছাই করা হলে হিন্দী বা ইংরেজীর পরিবর্তে শেখান হবে।

উচ্চশিক্ষায় কোন ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শেখান হবে না।

স্বেচ্ছামূলক হিন্দী শিক্ষার জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু, অনিচ্ছুক কোন অংশে জোর করে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

ভাষা শিক্ষার একটি প্রধান অন্তরায় ভিন্ন ভিন্ন হরফ (*Script*) আধুনিক ভারতীয় ভাষার কিছু কিছু সাহিত্য দেবনাগরী বা রোমান হরফে ছাপা হওয়া দরকার। আধুনি ক ভারতীয় ভাষা সমূহের আন্তর্জাতিক রোমান সংখ্যা (*numerals*) গ্রহণ করা উচিত।

ইংরেজী শিক্ষা সাধারণভাবে পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে শুরু হবে না।

স্বেচ্ছামূলকভাবে সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিখতে ছেলেমেয়েদের

উৎসাহিত করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এইসব ভাষা শিক্ষার উন্নত ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দেশে আর কোন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে না।

বিজ্ঞান ও গণিত : বিজ্ঞান ও গণিত সাধারণ শিক্ষায় বাধ্যতামূলকভাবে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শেখান হবে।

নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষা পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পরিচ্ছন্নতা বোধ, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসগঠন, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া হবে। এরসাথে যে পরিবেশে শিশু বড় হচ্ছে তার চারপাশের গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতির সাথে পরিচয়, জলবায়ু, আবহাওয়া, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি পরিচয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হবে।

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে জ্ঞান অর্জনের সাথে যুক্তির পথে চিন্তাধারা পরিচালনার ক্ষমতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হবে। পঞ্চম শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা, সপ্তম শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও নক্ষত্রবিদ্যা পড়ান হবে।

পঞ্চম শ্রেণীতে ভারতীয় পঞ্জিকার সাথে মিলিয়ে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র চিনতে শিখবে।

এই সময় থেকে সাধারণভাবে বিজ্ঞান পড়িয়ে যাবার পরিবর্তে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দিলে আরও কার্যকরী হবে।

প্রতিটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি *Science Corner* ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষণাগার ও বক্তৃতা গৃহ অবশ্যই থাকবে।

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দেওয়া হবে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে।

বাছাই করা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেরা ছেলেদের জন্য বিজ্ঞানের উন্নত পাঠক্রম গ্রহণ করা হবে। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রামে বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে কৃষিবিদ্যা ও শহরে বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে কৃষি বিদ্যা ও কারিগরী শিক্ষা যুক্ত করতে হবে।

গণিতের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। গণিতের পাঠক্রম আধুনিক করা হবে (*modernised & brought up-to-date*)।

বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষার ব্যবস্থা আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি-সম্মত করতে হবে। বিজ্ঞানের ও গণিতের মূলনীতি সম্পর্কে অনুসন্ধানী মনোভাব তৈরী করতে হবে। গবেষণাগারের কাজের উন্নতি করতে হবে। শিক্ষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। মেধাবী ছেলেদের জন্য তাদের প্রয়োজন মেটাবার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ সমাজ বিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞান (Social Studies & Social Science) ॥

সুনাগরিকতার শিক্ষা ও জাতীয়তার সংহতির জন্য সমাজবিদ্যা শিক্ষার একটা কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় ঐক্য মানবিকতা ও আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পাঠক্রম রচনা করা হবে।

বিজ্ঞান সম্মত মনোভাব ও সামাজিক বোধ সৃষ্টির জন্য সর্বস্তরে সমাজ বিদ্যা শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে।

॥ কাজের অভিজ্ঞতা (Work Experience) ॥

নতুন সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রেখে কাজের অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে খুব সাধারণভাবে হাতের কাজ (*handi-work*) শেখান হবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে *Craft* এর দিকে মনোযোগ দেওয়া হবে। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে *work shop* ট্রেনিং-এর মাধ্যমে কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। যেখানে স্কুল ওয়ার্কসপের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না সেখানে অল্প মূল্যে যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

কাজে অভিজ্ঞতা অর্জনের পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য শিক্ষক শিক্ষণ, ওয়ার্কসপের ব্যবস্থা, স্থানীয় উপকরণের সমাবেশ, প্রয়োজনীয় পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতি ধাপে ধাপে করে পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

॥ সমাজ সেবা (Social Service) ॥

বিভিন্নস্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের উপযোগী করে সমাজ সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বস্তরে করতে হবে। শ্রমদান ও সমাজ সেবা-শিবির প্রতি জেলায় সারা বছর ধরে চালু রাখা হবে। এই সব শিবিরের মাধ্যমে সমাজ সেবার কর্মসূচীকে রূপদান করতে হবে।

॥ দেহ চর্চা (Physical Education) ॥

দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক সতর্কতা (*mental alertness*) ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিকাশে দেহ চর্চার প্রয়োজন আছে। দৈহিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ও দৈহিক ও মানসিক গঠনের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।

॥ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষা (Education in Moral & Spiritual Values) ॥

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন ধর্মের মূলনীতিগুলি ছাত্ররা জানবে। এজন্য প্রতি সপ্তাহে ১২ টি পিরিয়ড নির্দিষ্ট থাকবে।

ধর্মসম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থীরা লাভ করতে পারে সে ভাবে ধর্ম শিক্ষার আয়োজন করা হবে। বিষয়টিকে সাধারণ পাঠ্যসূচী থেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে পাঠক্রমের অঙ্গরূপেই একে স্থান দেওয়া হবে।

॥ সৃষ্টি ধর্মী কাজ (Creative activities) ॥

চারুকলা শিক্ষার (*Art education*) জন্য ভারত সরকার এই শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রসারের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করবে। দেশের সর্বত্র "কলা ভবন" প্রতিষ্ঠা করা হবে। বাছাই করা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ স্থাপন করা হবে সেখানে এ বিষয় নিয়ে গবেষণা চালান হবে।

বহু রকমের সহপাঠক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করা হবে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে।

॥ ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য ভিন্ন পাঠক্রম ॥

জাতীয় স্ত্রী শিক্ষা সংসদ ছেলে ও মেয়েদের জন্য একই পাঠক্রমের সুপারিশ করেছেন। তবে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে মেয়েদের জন্য রাখা হবে কিন্তু আবশ্যিক বিষয়রূপে তা গণ্য করা হবে না। এছাড়া গান, চারুশিল্প প্রভৃতি বিষয় শেখার ব্যবস্থা থাকবে। মেয়েদের গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী করা হবে।

॥ নতুন পাঠক্রম ও বুনিয়াদী শিক্ষা (New Curriculum and Basic Education) ॥

কমিশন শিক্ষার কোন স্তরকে 'বুনিয়াদী' নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন নি। কিন্তু কমিশন মনে করেন বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতিসমূহ একটু পরিবর্তিত করে শিক্ষার সর্বস্তরেই প্রয়োগ করা চলে। বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মকেন্দ্রীকতা ও উৎপাদন, অনুবন্ধপ্রণালীতে শিক্ষা, স্থানীয় সমাজের সাথে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভৃতি কমিশন তাদের সুপারিশের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কাজের অভিজ্ঞতা (*Work Experience*) ও উৎপাদনমূলক কাজ (*Productive Work*) নীতি ও কাজের দিক থেকে এক।

অনুবন্ধ প্রণালীকে কমিশন যতটা সম্ভব কাজে লাগাবার সুপারিশ করেছেন। স্কুল ও সমাজের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন। শিশুদের সামাজিক ও সমাজমুখীন করে তুলতে হলে সামাজিক কাজে তাদের অংশ গ্রহণ করতে হবে কমিশনের এই সুপারিশ বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম মূলনীতি।

পাঠক্রম সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনার পর কমিশন বলেছেন—"*Our overall concept is that general education requires strengthening in the areas of science, work experience and moral and spiritual values, and new orientation in some other areas. It should cover ten years of*

undifferentiated schooling before some specialisation begins. It should not be too sharply divided from vocational education. To be successful these reform require an orientation in teaching methods, evaluation and guidance."

॥ শিক্ষা পদ্ধতি (Teaching Method) ॥

পাঠক্রম নিয়ে আলোচনার শেষে কমিশন মন্তব্য করেছেন শিক্ষা সংস্কারের সফল রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাপদ্ধতি ও মূল্যায়ণ পদ্ধতির পরিবর্তন। শিক্ষা পদ্ধতির আলোচনার শুরুতে ঠিক সেই কথাই আবার কমিশন বলেছেন—"*Continual deepening of school curricula is intimately related with the equally urgent need for continual improvement in teaching methods and evaluation*"

শিক্ষার পাঠক্রম যতই গভীর ও ব্যাপক হবে সেই সাথে শিক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ণ পদ্ধতির উন্নতি করতে হবে। কমিশনের অভিমত শিক্ষাপদ্ধতি উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে তবু বর্তমান চিত্রটি বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে অবস্থা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সেকেলে গতানুগতিক যান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। তাই বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি পূর্বের মতই নীরস। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে কোন আগ্রহ বা উৎসাহের সৃষ্টি করে না। এই হতাশব্যঞ্জক অবস্থার চারটি কারণ কমিশন নির্দেশ করেছেন :

(1) *The weakness of the average teacher.*

(2) *The failure to develop proper educational research on teaching methods.*

(3) *The rigidity of existing educational system.*

(4) *The failure of the administrative machinary to bring about a new and a dynamic methods of teaching.*

এর মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ কারণ দুটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনের পথে প্রধান বাধা বলে কমিশন মনে করেন। কমিশন বলেছেন, নতুন শিক্ষা পদ্ধতি শুধু গবেষণা করে উদ্ভাবিত হয় না, সুযোগ-সুবিধা পেলে প্রতিভাবান উৎসাহী শিক্ষকেরাও অনেক সময় নতুন পথ দেখাতে পারেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিভাবান শিক্ষকের কোন নতুন প্রচেষ্টা বা সৃষ্টি ধর্মী কোন তৎপরতাকে উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা নেই। তবু যদি কোথায়ও একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় ও সাফল্যের সাথে দু'চারটি স্কুলে প্রয়োগ করা হয় সেই পদ্ধতিকে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই।

কমিশন বলেছেন, বর্তমান সমাজে যেখানে জ্ঞানের সীমা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে সেখানে তার সাথে তাল রেখে চলতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সজীব গতিশীল, এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (*the educational system must be*

elastic and dynamic) একটি গতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে শিক্ষা পদ্ধতিকে উন্নততর করতে হবে। এই কাজের সাফল্যের জন্য শিক্ষকের স্বাধীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে অধিকাংশ শিক্ষকের কোন বৃত্তিগত যোগ্যতা নেই সেখানে দৈনন্দিন শিক্ষকতার কাজে নিয়মমাফিক ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়াই তারা নিরাপদ মনে করেন। কিন্তু যারা প্রতিভাবান শিক্ষক নিয়মের চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ লাভ ঘটে না ও শিক্ষা সংস্কারের সফল রূপায়ণ সম্ভব হয় না। কমিশনের অভিমত হচ্ছে—

The success of an educational reform will depend upon the flexible approach where good school or the good teacher is able to go ahead and necessary supports are provided to the weaker institutions to induce reform gradually····· one of the essential condition for making an educational system elastic and dynamic, therefore, is for the administration to develop this competence to discriminate between school and school between teacher to adopt a flexible mode of treatment for individuals or institutions at different levels of development. This alone can help to promote initiative creativity and experimentation on the part of the teachers.

শিক্ষা পদ্ধতিতে গতিশীলতা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি প্রয়োজন সে সম্পর্কে কমিশন বলেছেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের মনোভাব (*feeling of reform*) সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক ও প্রবীণ শিক্ষকদের মনোভাব সংস্কারের অনুকূল করে তুলতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নীচের শ্রেণী থেকে শুরু করতে হবে ; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে কয়েকটি ট্রেনিং কলেজকে নতুন পদ্ধতি ও শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের উপযোগিতা সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। অভিভাবকদের মনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে যাতে কোন সংশয় সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জনপ্রিয় শিক্ষকগণ সহজেই অভিভাবকদের সংশয়হীন করতে পারেন। এ ছাড়া যে শিক্ষক নতুন ভাবে কোন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করতে চান তাঁকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। এ ব্যবস্থা করতে পারলে হয়ত কোন স্কুল বা শিক্ষক তাঁর নতুন ধ্যান-ধারণাকে রূপ দেবার জন্য এগিয়ে আসবেন। সংখ্যায় তাঁরা অল্প হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যে পথ দেখাবেন তাই হয়ত একদিন নতুন সমাজের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এর পর কমিশন কোন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলে সেই পদ্ধতি প্রসারের কথা (*The diffusion of new method*) বলেছেন। পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনের স্বপক্ষে কর্তৃপক্ষের সম্মতি রয়েছে একথা জানলেই কর্তব্য শেষ হবে না। কর্তৃপক্ষকে নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে—"*Mere permissiveness on the part of the authorities will not do the trick. They will need to play a more active part, with something that comes nearer to persuation than to pressure*…" চাপ না দিয়ে বুঝিয়ে নতুন পদ্ধতির প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য *refresher course, workshop, demonstration, exhibition* প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কমিশনের মতে কোন পদ্ধতি প্রসারের সবচেয়ে দ্রুত ও কার্যকরী পন্থা হচ্ছে "*to embed them in the tools of teaching—text books, teachers, guides and teaching aids of all kinds.*" শিক্ষা সহায়ক যাবতীয় উপাদানের সঙ্গে নতুন পদ্ধতিটিকে অঙ্গীভূত করে দিতে হবে।

শিক্ষাপদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনার শেষে কমিশন বলেছেন—"…*the essence of our recommendation is that only an elastic and dynamic system of education can provide the needed condition to encourage initiative, experimentation and creativity among teachers and thereby lay foundations of educational progress*…*we should learn to delegate authority, to trust our teachers to encourage the capacity for leadership amongst them to treat every institution as having a personality of its own which it should try to develop in an atmosphere of freedom.*"

॥ পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষাসহায়ক পুস্তক ও উপকরণ (Txet books, Teaching Guides and Teaching material) ॥

শিক্ষা মানের উন্নয়নের জন্য উন্নত ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ অল্প মূল্যে সরবরাহের এক কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে।

কমিশন সুপারিশ করেছেন প্রাক্-স্নাতক পর্যায়ে সমস্ত বই ভারতীয় লেখকদের দিয়ে লেখাবার একটি জাতীয় কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। বই লিখতে অবশ্য বিদেশী উপাদানের ব্যবহার করতে হবে। কমিশন মনে করেন ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এই কার্যসূচীকে রূপ দেওয়া যাবে।

পুস্তক রচনার ব্যাপারে দেশের সেরা লোকদের (*best talent*) সাহায্য নিতে হবে। জাতীয় ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হলে শুধুমাত্র বইয়ের মানই উন্নত হবে না এটা জাতীয় সংহতি (*national integration*) বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

রাজ্যস্তরে রাজ্যসরকারের শিক্ষাদপ্তর পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করবে বিক্রি ও সরবরাহ শিক্ষাদপ্তরের হাতে না রেখে ছাত্রদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা ঠিক হবে।

পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের দায়িত্ব স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠানের হাতে দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তক যাতে নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতি বিষয়ে ৩।৪ খানা করে বই থাকবে তার মধ্য থেকে স্কুলগুলি পছন্দমত বই বেছে নেবে। পুস্তক রচনাকারীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। পুস্তক প্রকাশের বিষয়ে সরকারের লোকসান কি লাভ কোনটাই হবে না এ নীতি গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করতে হবে। শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত উচ্চক্ষমতা যুক্ত কমিটি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করবেন।

শিক্ষক সহায়ক পুস্তক (*Teachers Guide*) ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পাঠ্যপুস্তকের সাথে ব্যবহার করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ন্যূনতম তালিকা তৈরী করে অন্ততঃ সেই উপকরণগুলি যাতে শিক্ষকেরা পেতে পারেন সে ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে।

শিক্ষা বিভাগ বেতার বিভাগের সহায়তায় শিক্ষক ও ছাত্রদের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করবেন।

॥ শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা (Class size) ॥

একটি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা যা হওয়া উচিত এদেশে তার চেয়ে কিছু বেশী হতে বাধ্য। এ অবস্থা আরও বেশ কিছু দিন চলবে। তবু কমিশন একটা সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন—নিম্ন প্রাথমিক স্তরে প্রতি শ্রেণীতে ৫০ জন, উচ্চ প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে প্রতি শ্রেণীতে ৪৫ জন ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে প্রতি শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্র থাকবে।

॥ বিদ্যালয় ভবন (School Building) ॥

বিদ্যালয় ভবনগুলির দুরাবস্থার কথা স্মরণ করে প্রথমেই কর্তব্য হচ্ছে পুরান স্কুল বাড়ীগুলির নির্মাণ শেষ করার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা ও ভবিষ্যৎ ছাত্রবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে অতিরিক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বাজেটে এজন্য বরাদ্দ বাড়ান দরকার। বে-সরকারী স্কুল বাড়ী তৈরীর জন্য ঋণ ও সাহায্য সহজ কিস্তিতে দেওয়া উচিত।

অল্প খরচে যাতে বাড়ী তৈরী হতে পারে সে চেষ্টা করা হবে। দালান তৈরীর জিনিস পত্রের অভাব ও অত্যাধিক দামের জন্য সু-পরিকল্পিত ভাবে তৈরী কাঁচা বাড়ীও স্কুল গৃহরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ্রামে স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় ও দানে যাতে স্কুল তৈরী হয় সে চেষ্টা করতে হবে। শহরে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় এ রকম জিনিসপত্র বেশী ব্যবহার করলে বাড়ী তৈরীর খরচ অনেক কম হবে।

॥ পরিচালনা ও পরামর্শ (Guidance & Counselling) ॥

পরিচালনা ও পরামর্শ শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। প্রতিটি ছাত্রের ব্যক্তিগত ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কোনরূপ সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মাঝে মাঝে সাহায্য প্রয়োজন। এই সাহায্যই তার ভবিষ্যৎ শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে পরামর্শ ও নির্দেশদান রূপে এসে থাকে। শিক্ষার স্থল থেকেই পরিচালনা ও পরামর্শ দান সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে।

॥ প্রাথমিক স্তর ॥

পরিচালনা শিক্ষার অতি নিম্নস্তর থেকেই শুরু হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরে অগণিত স্কুলের কথা চিন্তা করে কমিশন মামুলীভাবে একাজ শুরু করবার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রাথমিক স্কুলে পরিচালনার কাজ শুরু করতে হলে—(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। এই ট্রেনিংয়ে শিক্ষকগণ ব্যক্তিগত পার্থক্যের সমস্যা (*Problem of individual difference*), ত্রুটি নির্ণয়ক পরীক্ষা (*simple diagnostic testing*), ব্যক্তিগত পার্থক্যের জন্য শ্রেণী শিক্ষায় তার প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন। (২) প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষকতাকালীন অল্পদিনের শিক্ষার (*short in service course*) ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) শিশুদের কাজে নিয়োজিত রাখার জন্য সাহিত্য রচনা করতে হবে (*simple literature for the occupational orientation of children*) প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাহায্য করা।

মাধ্যমিক শিক্ষায় পরিচালনা ও পরামর্শদানের গুরুত্ব এই স্তরে অত্যন্ত বেশী। বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর বিশেষ যোগ্যতা কি ও উৎসাহ কোনদিকে তা খুঁজে বের করতে হবে ও তা বিকাশে সহায়তা করতে হবে।

পরিচালনা ও পরামর্শদান বিষয়ে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত পরামর্শদাতা (*Trained Counseller*) নিয়োগ করা। সীমাবদ্ধ আর্থিক সংস্থান ও প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের অভাবের কথা বিবেচনা করে কুড়ি বছরের জন্য একটি *short-range programme* গ্রহণ করতে হবে। এই কার্যসূচী অনুসারে :

প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলের জন্য নিম্নতম কার্যসূচী স্থির করে পরিচালনা ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রতি দশটি স্কুলের জন্য একজন পরিদর্শনকারী পরামর্শদাতা (*Visiting School Counseller*) থাকবেন। সাধারণ পরিচালনা বিষয় স্কুল শিক্ষকদের দেওয়া হবে, তিনি তাদের সাহায্য করবেন।

প্রতি জেলায় একটি স্কুল আদর্শ স্কুল রূপে (*model school*) বেছে নেওয়া হবে—সেখানে পরিচালনা ও নির্দেশ দানের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা থাকবে।

State Bureau of Guidance প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও স্কুলগুলির কাজে সাহায্যের জন্য পরিদর্শনকারী কর্মী নিয়োগ করবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরিচালনা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির জন্য প্রতিটি শিক্ষক শিক্ষকতাকালীন বা শিক্ষকতা গ্রহণের পূর্বে *Pre or in-service Training* এ যাতে ট্রেনিং পেতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য ট্রেনিং কলেজে উপযুক্ত ট্রেনিং ব্যবস্থা করতে হবে।

ট্রেনিং কলেজ ও *State Bureu of Guidance* যাতে পরিচালক কর্মীরা পেশাগত ট্রেনিং নিতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে। পরিচালনা বিষয়ক উচ্চশিক্ষা জাতীয় ভিত্তিক করতে হবে।

পরিপূরক কর্মসূচীরূপে পরিচালনা সম্পর্কে বই ও অন্যান্য সাহায্যকারী উপাদান, ছাত্রদের জন্য আংশিক কাজের সুযোগ পরিচালনা সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিভার সন্ধান ও বিকাশ (*Search and Development of Talent*) সন্ধান করে খুঁজে বের করবার ব্যবস্থা নেই বলে এদেশে প্রচুর প্রতিভার অপচয় হয়। গুণগত দিক থেকে লাভবান হতে হলে প্রতিভাবান ছাত্রদের ঠিক সময় খুঁজে বের করতে হবে ও উপযুক্ত পরিবেশে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। প্রতিভা সন্ধানের কাজ প্রতি স্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে। তবে মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সমৃদ্ধ ও উন্নত পাঠক্রম ছাড়াও মেধাবী ছাত্রদের জন্য নানা সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা থাকবে; যেমন, গ্রীষ্মকালীন স্কুল, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ইত্যাদি। যাদের বাড়ীর পরিবেশ পড়াশুনার উপযোগী নয় তাদের জন্য ডে সেণ্টার ও হোস্টেলের ব্যবস্থা থাকবে।

মেধাবী ছেলেদের পরিচালনা ও তাদের বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য শিক্ষকদের বিশেষভাবে পারদর্শী হতে হবে।

॥ পশ্চাদ্‌পদ শিশুদের শিক্ষা ॥

পশ্চাদ্‌পদ শিশুদের প্রতি অবহেলার জন্য শিক্ষায় প্রচুর অপচয় হয়। একটি উন্নতশীল দেশে এই অপচয় রোধের চেষ্টা করা দরকার।

পশ্চাদ্‌পদ শিশুদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। মানসিক দিক থেকে জড় বুদ্ধি সম্পন্ন আর যাদের শিখবার ক্ষমতা কম, যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক (*I. Q.*) ৭৫এর কম তাদের প্রচলিত শিক্ষায় কোন উপকার হয় না। ধীরে শেখে যারা (*slow learners*) তাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত মনোযোগ দিলে তারা শিখতে পারে এদের জন্য স্কুল বা স্কুলে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করতে হবে।

যারা ধীরে শেখে তাদের মধ্যেও প্রচুর সম্ভাবনা আছে তাই দেখতে হবে ও খুঁজে বের করতে হবে, তাদের কম শেখা ধীরে শেখার কারণ কি? কারণ নির্ণয় হলে তা দূর করবার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। উৎসাহী শিক্ষক ও অভিভাবক সমিতির সহযোগিতায় ও যেখানে *Child Guidance Clinic* রয়েছে তার সাহায্য নিয়ে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ মূল্যায়ণের নতুন কার্যসূচী (The new programme of Evaluation) ॥

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রভাব ও বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষার কুফল সম্পর্কে দ্বি-মতের অবকাশ খুবই কম। বহু কমিটি ও কমিশনের রিপোর্টে দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষায় পরীক্ষার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনার পর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল্যায়ণের জন্য বহিঃ পরীক্ষার ও আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের উন্নতির জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ সমূহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মূল্যায়ণের নতুন দৃষ্টি ভঙ্গীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া। ভারতের শিক্ষাবিদ মহল ক্রমেই মূল্যায়ণের পদ্ধতিকে গ্রহণ করছেন।

॥ নতুন দৃষ্টিতে মূল্যায়ণ পদ্ধতি ॥

আজ একথা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন মূল্যায়ণ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (*continuous process*) শিক্ষালয়ের সাথে মূল্যায়ণ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ও শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (*integral part*)। শিক্ষার্থীর পড়া অভ্যাস ও শিক্ষকের শিক্ষা পদ্ধতির উপর মূল্যায়ণ পদ্ধতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে মূল্যায়ণ শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপ করতেই সাহায্য করে না উন্নতিরও সাহায্য করে। অভীপ্সিত পথে শিক্ষার্থী বিকাশ লাভ করছে কি না সেই তথ্য সংগৃহীত হয় যে পদ্ধতিতে তাই হচ্ছে মূল্যায়ণ। এই পদ্ধতি হবে নির্ভর যোগ্য (*reliable*) বৈধ ও যুক্তি সিদ্ধ (*valid*) ও বস্তুনিষ্ঠ (*objective*) ও বাস্তব (*practicable*) [*It is now agreed that evaluation is a continuous process, forms an integral part of the total system of education, and intimately related to education objectives. It exercises a great influence on pupil's study habits and teacher's method of instruction and thus helps not only to measure educational achievement but also improve it. The techniques of evaluation are means of collecting evidence about the students' development in desirable directions. These techniques should, therefore, be valid, reliable, objective and practicable*—**Report of the Ed Comm.**]

বর্তমান ভারতে মূল্যায়ণের একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে লিখিত পরীক্ষা। মূল্যায়ণ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করলে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের দেখতে হবে যাতে লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থার এরূপ উন্নতি হয় যার ফলে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপ হবে বৈধ ও নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর বিকাশের এমন বহু দিক আছে যার পরিমাপ ঠিক লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে, যেমন—

মৌখিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই পদ্ধতি-সমূহ এমন ভাবে উন্নত করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীর বিকাশের ও কৃতিত্বের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিমাপ সম্ভব হয়।

॥ প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ণ ॥

প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ণের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের শিক্ষার বুনিয়াদী জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করা। প্রাথমিক স্তরে সম্ভব হলে ১ম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে একটি অবিভক্ত স্তর রূপে গণ্য করা হবে যাতে ছেলেরা নিজ নিজ শক্তিমত নিজেরাই এগিয়ে যেতে পারে। যেখানে এ ব্যবস্থা সম্ভব নয় সেখানে ১ম ও ২য় শ্রেণীকে একটি ইউনিট ধরে তাদের মধ্যে ধীর শিক্ষার্থী ও দ্রুত শিক্ষার্থী (*Slow and fast learners*) এই দু' ভাগে ভাগ করা হবে। অবিভাজ্য শ্রেণীতে শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষকদের বিশেষভাবে ট্রেনিং দেওয়া হবে।

যেহেতু অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলের এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযোগী পরিবেশ বা সামর্থ নেই সেজন্য কয়েকটি বাছাই স্কুলে ১ম ও ২য় শ্রেণী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হবে। এর ফলে ১ম শ্রেণী থেকেই অনুন্নয়ন ও সেজন্য স্কুল ছেড়ে দেবার ফলে যে অপচয় হয় তা রোধ করা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রথম দু'বছরের শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্নতা ও নমনীয়তা আসবে (*continuity and flexibility*)।

॥ উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ণ ॥

এই স্তরে মূল্যায়ণ প্রধানতঃ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে করা হয়। কমিশন মনে করেন মৌখিক পরীক্ষাকে এই স্তরে যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে যা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার একটা অঙ্গ হবে। সমগ্র স্কুল শিক্ষায় বিশেষ করে এই স্তরের শিক্ষকরা (*Diagnostic Test*) গ্রহণ করবেন। সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (*cumulative record cards*) শিক্ষার বিভিন্নস্তরে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ (*Growth and development*) নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করে। শিক্ষাগত ও আবেগজনিত (*emotional*) সমস্যা ও সামঞ্জস্য বিধানে অসুবিধার ক্ষেত্রে ত্রুটি নির্ণয় ও সমস্যা সমাধানেও সর্বাত্মক পরিচয় পত্র সাহায্য করে থাকে। প্রাথমিক স্তরে এই পরিচয়পত্র খুব সহজ ও সাধারণ হবে যা প্রাথমিক শিক্ষকরা একটু ট্রেনিং পেলেই স্কুলে ব্যবহার করতে পারেন। সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের প্রবর্তন ধীরে ধীরে করতে হবে।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বহিঃপরীক্ষা ॥

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা শেষে একটা জাতীয় মান অর্জনের সীমারেখা বেঁধে দেবার কথা বলেছেন। কিন্তু এজন্য বাধ্যতামূলক বহিঃপরীক্ষা দিয়ে সবাইকে বাঁধাধরা নিয়ম মাফিক একই পর্যায়ে সামিল হতে হবে এরূপ কোন প্রয়োজন আছে বলে বা যুক্তিসঙ্গত বলে কমিশন মনে করেন না। কমিশন আরও বলেছেন যদিও তাঁরা এই স্তরে বাধ্যতা-

মূলক ভাবে বহিঃপরীক্ষা চান না তবু তাঁরা বিশ্বাস করেন শিক্ষার মান রক্ষার জন্য প্রাথমিক স্তরে মাঝে মাঝে পরীক্ষার প্রয়োজন আছে; কমিশন সুপারিশ করেছেন জেলা কর্তৃপক্ষ কোন একটা নির্দিষ্ট এলাকায় *State Evaluation Unit*-এর রচিত নির্দিষ্ট মান নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা নির্ণয় করবেন। এই ভাবে কর্তৃপক্ষ দুর্বল স্কুলগুলিকে খুঁজে বের করতে ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন।

জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার তুলনামূলক বিচারের জন্য জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে—"*Standardised and refined test*" এর ব্যবস্থা করতে পারেন। স্কুলের পরীক্ষা থেকে আন্তঃ জেলা পরীক্ষায় স্কুল সমূহের যোগ্যতার শিক্ষা কৃতিত্বের মান নির্ণয় অনেক বেশী গ্রহণ ও নির্ভর যোগ্য। এই জাতীয় সাধারণ পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টাকালের পরীক্ষার উপযোগী করে তৈরী করা হবে।

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে একে গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত করে, ছাত্রদের মনের উপর থেকে চাপ কমিয়ে শিক্ষায় কৃতিত্বের পরিমাপ ব্যবস্থাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলা ("*...by making it less formal reducing its burden on the pupils minds and increasing its validity as a means of educational attainment."—Ed. Comm.*)। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে অভিজ্ঞানপত্র স্কুল থেকে দেওয়া হবে। এই অভিজ্ঞানপত্রে বাইরের "সাধারণ পরীক্ষা" যদি কিছু থাকে তাহলে সেই পরীক্ষার ফলাফলের সাথে স্কুলে সারা বছর শিক্ষার্থী কি করেছে তার সম্পর্কে সর্বাত্মক পরিচয় পত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অভিজ্ঞানপত্রে দেওয়া হবে।

সাধারণ পরীক্ষা (*Common Examination*) ছাড়াও বৃত্তি দেওয়ার জন্য মেধাবী ও প্রতিভাবান ছেলেদের খুঁজে বের করবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পরীক্ষা হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-মূলক। এই পরীক্ষার কৃতিত্বের মূল্যায়ণ বাইরের পরীক্ষকরা করবেন।

॥ বহিঃপরীক্ষা সংস্কার ॥

বর্তমান বহিঃপরীক্ষার প্রধান দুর্বলতার কারণ হচ্ছে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (*due to defects in the question and the question papers set for examination" —Ed. Camm.*)

প্রশ্নকর্তাদের শিক্ষাকার্যে প্রবীণতা (*Seniority*) বিষয় সম্পর্কে যোগ্যতা (*Subject Competence*) ও শিক্ষা-অভিজ্ঞতা (*teaching experience*) প্রভৃতির বিচার করে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে অতি অল্প জনেরই "*Valid and reliable Test*"-এর প্রশ্ন রচনার জন্য উপযোগী অভিজ্ঞতা বা প্রশ্ন রচনার কৌশল জানা আছে। কমিশন মনে করেন বহিঃপরীক্ষার উন্নতি করতে হলে ট্রেনিং এর মাধ্যমে প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্ন রচনা বিষয়ক যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশ্নের মাধ্যমে শুধু অর্জিত জ্ঞানের

পরীক্ষা ছাড়াও সেই জ্ঞানের প্রয়োগ ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা বিকাশের পরীক্ষা নিতে হবে। বর্তমানে যে ধরনের প্রশ্ন করা হয় তার প্রকৃতি বদলে উন্নত ধরনের প্রশ্ন রচনা করতে হবে।

প্রশ্ন ও প্রশ্নপত্রের উন্নতি ছাড়াও বহিঃপরীক্ষাকে আরও সুসংবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উত্তরপত্রের পরীক্ষা ও নম্বর দেওয়ার পদ্ধতিকে আরও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে যুক্তিসিদ্ধ ও নির্ভরশীল করে তুলতে হবে।

প্রতি বছর বহু সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, এতে দেশের সম্পদের অপচয় হয় আর এর মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি প্রতিফলিত হয়। কমিশন মনে করেন কোন একটি ছেলে কয়েকটি বিষয়ে পাস করতে পারে নি এজন্য তাকে ফেল ছাপ দিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না—"*There is no reason why he should carry with him the stigma of being declared an unsuccessful candidate if he has partially succeeded in his educational effort.*"—(*Ed. Com.*)

॥ স্কুলের ও বোর্ডের অভিজ্ঞানপত্র (Certificate by the School & Board) ॥

কমিশন সুপারিশ করেছেন নিম্ন অথবা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বহিঃপরীক্ষার ফলাফলের উপর যে অভিজ্ঞানপত্র (*certificate*) বোর্ড থেকে দেওয়া হবে সেই পত্রে শিক্ষার্থী শুধুমাত্র যে সব বিষয়ে পাস করেছে তার উল্লেখ করা হবে। সমস্ত পরীক্ষায় সে পাস কি ফেল করেছে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য থাকবে না। বোর্ডের দেওয়া অভিজ্ঞানপত্রের সাথে অবশ্য প্রতি বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ও গ্রেডের. কথার উল্লেখ থাকবে। যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছা করলে শিক্ষার্থী সমগ্র পরীক্ষায় বা পৃথক ভাবে অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে স্কুল শিক্ষার্থীর সর্বাত্মক পরিচয়পত্র লিপিবদ্ধ তথ্য থেকে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের একটি অভিজ্ঞানপত্র দেবে। বহিঃপরীক্ষার অভিজ্ঞানপত্রের সাথে এই পরিচয়পত্র জুড়ে দেওয়া যেতে পারে; কমিশন মনে করেন দশম অথবা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষা শেষে বহিঃপরীক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না। কোন একটি ছাত্র ইচ্ছা করলে বহিঃপরীক্ষা না দিয়ে শুধুমাত্র স্কুল সার্টিফিকেট নিয়ে কোন বৃত্তি শিক্ষায় যোগ দিতে পারে বা চাকুরীর সন্ধান করতে পারে।

উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার ভর্তি হবে নির্বাচন সাপেক্ষ (*Selective*)। ঐ সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ ছাত্র নির্বাচন ও ভর্তির নিয়মাবলী রচনা করবেন। যারা এখানে ভর্তি হতে আসবে তাদের বহিঃপরীক্ষায় কৃতকার্য হলে বা নির্দিষ্ট গ্রেড পেলেই চলবে না প্রয়োজন হলে ভর্তির জন্য নির্বাচনমূলক পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে।

॥ পরীক্ষামূলক স্কুল স্থাপন (Establishment of Experimental School ॥

কমিশন মনে করেন তাঁদের সুপারিশসমূহ কার্যকরী হলে স্কুল শিক্ষার উপর বহিঃ-পরীক্ষার একাধিপত্য অনেকখানি কমবে। বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব আরও কমাবার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছেন যে কয়েকটি স্কুল বেছে নিয়ে সে সব স্কুল দশম শ্রেণীর শিক্ষা শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা নেবার অধিকার দেওয়া হবে। এই সব স্কুলের ছেলেদের আর বহিঃপরীক্ষায় বসতে হবে না। স্কুলের শেষ পরীক্ষাকে বোর্ডের পরীক্ষার সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। বোর্ড স্কুলের পরীক্ষার ভিত্তিতে অভিজ্ঞানপত্র দেবে। বাছাই করা স্কুলগুলিকে শুধু বহিঃপরীক্ষার বন্ধন থেকেই মুক্তি দেওয়া হবে না। এই সব স্কুলের নিজেদের পাঠক্রম স্থির করবার ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করবার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। যে সব স্কুলকে এই সুবিধা দেওয়া হবে তাদের কার্যাবলী মাঝে মাঝেই বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে।

॥ আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ পদ্ধতি ॥

আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বহিঃপরীক্ষায় যে সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না বা যা জানা যায় না আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় তার মূল্যায়ণ হয়। শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারাকে সর্বদিক থেকে বুঝতে হলে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হয়। মূল্যায়ণ শুধু শিক্ষার্থীকে যাচাই করবার প্রয়োজনে নয়—একে শিক্ষার্থীর উন্নতির জন্য কাজে লাগাতে হবে।

বহিঃপরীক্ষার মত স্কুল পরিচালিত লিখিত পরীক্ষার উন্নতি সাধন করতে হবে। যেখানে সম্ভব *Standardised Achievement Test*কে কাজে লাগাতে হবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য মূল্যায়ণ পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে হবে। ছেলেদের আগ্রহ, উৎসাহ, রুচি প্রভৃতি জানবার জন্য—*interest inventories, apptitude tests and rating scale* প্রভৃতির সাহায্য নিতে হবে।

আভ্যন্তরীণ মূল্য বিচারের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে দুর্বল স্কুলগুলি অনেক সময় অতিরিক্ত নম্বর দিয়ে থাকে। এজন্য কেউ কেউ এ ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে বলেছেন। কিন্তু কমিশন তাদের সাথে একমত হতে পারেন নি। আভ্যন্তরীণ মূল্য বিচারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং এর উপর বেশ জোর দিতে হবে। এর ত্রুটিগুলি দূর করবার জন্য কমিশন কতকগুলি সুপারিশ করেছেন।

(১) বহিঃপরীক্ষা ও আভ্যন্তরীণ মূল্যবিচার এক করে ফেলা হবে না, কারণ দু' জায়গায় মূল্যায়ণের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ঠিক এক রকম নয়। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূল্যবিচারের তুলনা সর্বত্র সম্ভব নয়। তাই দু'টি পরীক্ষার ফল সার্টিফিকেটে ভিন্ন ভিন্ন করে দেখান হবে।

(২) আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ পদ্ধতি পরিদর্শকেরা গিয়ে দেখবেন ও বহিঃপরীক্ষা ও আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের হার তুলনা করে দেখা হবে। যে সব স্কুল অতিরিক্ত

নম্বর দেওয়ার দোষে দোষী বলে সাব্যস্ত হবে সরকারী সাহায্যের ক্ষেত্রে তারা আর্থিক সুবিধা হারাবে ও তাদের মর্যাদা হ্রাস পাবে এবং তাদের অনুমোদন (*recognition*) পর্যন্ত বার বার অপরাধ করলে প্রত্যাহার করা হবে।

॥ পরিবর্তনকালে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা (Higher Secondary Examination during Transition) ॥

পরিবর্তনকালে উচ্চতর মাধ্যমিক দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের পর পর দু'টি পরীক্ষা দিতে হবে। যেখানে নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় সেখানে দশম শ্রেণীর শিক্ষা শেষে পরীক্ষার জন্য চাপ দেওয়া হবে না। পরিবর্তন কালে যে অসুবিধা তাকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই তবে দশম ও দ্বাদশের রূপান্তরের কাজ শেষ হয়ে গেলে এ অসুবিধা থাকবে না।

॥ স্কুল শিক্ষা, প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান (School Education; Administration & Supervision) ॥

সহানুভূতিপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা শিক্ষা সংস্কার কার্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে। ঠিক বিপরীত ভাবে প্রশাসন বিভাগের আমলাতান্ত্রিক কঠোর মনোভাব যে কোন নতুন প্রচেষ্টাও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়াসের পথে বাধার সৃষ্টি করে যে কোন শিক্ষা সংস্কারকে অসম্ভব করে তুলতে পারে।

প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে সুদূর প্রসারী কতকগুলি সংস্কার করতে হবে।

Common School System : জনসাধারণের শিক্ষার জন্য *Common School* প্রথা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। সারাদেশ জুড়ে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে যাতে শিক্ষার সর্বস্তরে সমাজের সর্বস্তরের লোকেরা *Common School* এর সুবিধা সমান ভাবে গ্রহণ করতে পারে। এই স্কুল বেশ উন্নত মানের হবে যাতে অভিভাবকগণ বেসরকারী ব্যয় বহুল স্কুলে ছেলে পাঠাবার প্রয়োজন বোধ না করেন।

এজন্য কমিশন নিম্নব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করবার সুপারিশ করেছেন :—

সরকারী বেসরকারী যে কর্তৃপক্ষের অধীনেই কাজ করুক না কেন সব শিক্ষকই সমান সুযোগ সুবিধা উপভোগ করবেন।

সমান যোগ্যতা ও দায়িত্ব সম্পন্ন শিক্ষক একই রকম বেতন পাবেন। সব শিক্ষকই একই রকম অবসরকালীন সুবিধা ভোগ করবেন। চাকুরীর শর্ত ও কাজের অবস্থা সব স্কুলে একই রকম হবে। চাকুরীতে নিয়োগের পদ্ধতি সব স্কুলে একই রকম হবে।

স্কুল বেতন ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হবে। চতুর্থ পরিকল্পনা শেষে প্রাথমিক স্তর ও পঞ্চম পরিকল্পনা শেষে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে আর বেতন দিতে হবে না।

স্থানীয়, সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাজের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

সুবিধাভোগী স্কুল ও সাধারণ স্কুলের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্য প্রতিবেশী স্কুল পরিকল্পনা (*Neighbourhood School Plan*) গ্রহণ করতে হবে।

॥ জেলা স্কুল বোর্ড স্থাপন ॥

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি খুব উচ্চ মানের হয় না। এর কারণ স্বরূপ বলা যায় শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের প্রতি কোন মমত্ববোধ বা আনুগত্য বোধ জন্মায় না। স্থানীয় সমাজের সাথেও তাদের বিশেষ কোন যোগাযোগ থাকে না।

সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির দুর্বলতা দূর করবার জন্য কমিশন নিম্ন সুপারিশ করেছেন :

(১) স্থানীয় প্রতিনিধিযুক্ত কার্যকরী সমিতি সরকার পরিচালিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (*local authority*) পরিচালিত সমস্ত স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক কমিটির স্কুল তহবিল ও স্কুলের কার্য পরিচালনা করবেন।

(২) শিক্ষক বদলীর নিয়মাবলী এমন করা হবে যাতে ঘন ঘন স্কুল থেকে শিক্ষক বদলী হবে না।

(৩) এই স্কুলগুলিকে কাজের ব্যাপারে আরও স্বাধীনতা দিতে হবে।

॥ বেসরকারী স্কুল ॥

বেসরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলগুলিতে যেখানে সুপরিচালনার অভাব সেখানে সরকারী সহায়তায় যাতে স্কুলের উন্নতি হয় তা দেখবার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন।

সরকারী সহায়তা ও হস্তক্ষেপের বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত সরকারী স্কুলগুলি সম্পর্কে প্রয়োজন হলে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হবে। যে স্কুলগুলি ভাল ও সুপরিচালিত সেখানে অধিকতর স্বাধীনতা দিতে হবে ও অধিকতর সাহায্য দেওয়া হবে যাতে এই স্কুলগুলির মধ্য থেকেই *Common School* এর সূত্রপাত হতে পারে।

বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি থেকে বেতন লোপ পেলে সে স্কুলগুলিও *Common School* পর্যায়ে এসে যাবে। এই স্কুলগুলিকে সাহায্য ও পরিচালক মণ্ডলীকে শক্তিশালী করে তুলতে হলে নিম্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে :

(১) প্রতিটি বেসরকারী বিদ্যালয়ে সরকার, শিক্ষক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠন করতে হবে।

(২) সরকারী স্কুলের আদর্শে এখানে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) পৌনঃ পৌনিক সাহায্য খাতে শিক্ষক খাতে ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় হিসাব করে শিক্ষকদের জন্য পুরোটাকা ও পুরোপুরি অন্যান্য খরচ (অথবা নির্ধারিত সর্বোচ্চ

ব্যয় এর মধ্যে যেটা কম হবে) এর থেকে ছাত্র বেতন ও কতকগুলি নির্দিষ্ট খাতে পরিচালক মণ্ডলীর দেয় টাকা বাদ দিয়ে যা হবে তাই সরকার থেকে দেওয়া হবে।

(৪) যেখানে বেতন ব্যবস্থা লোপ করা হয়েছে সেখানে বিভাগীয় সম্মতি নিয়ে উন্নয়ন তহবিলে বছরে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে।

(৫) এককালীন খরচের ক্ষেত্রে বেসরকারী স্কুলের কর্তৃপক্ষ খরচের অধিকাংশ যোগাবেন।

(৬) সরকারী সাহায্য পেতে হলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই লাভ শূন্য প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে হবে।

(৭) সাহায্যের নিয়মকানুন এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে রাজ্য শিক্ষা-বিভাগ নিম্নমানের স্কুল ও পরিচালনায় গলদ রয়েছে এমন স্কুলের দায়িত্ব ও পরিচালনার ভার নিজ হাতে তুলে নিতে পারে।

॥ প্রতিবেশী বা পাড়ার স্কুল প্রথা (Neighbourhood School) ॥

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও অনেক সামাজিক বাধা নিষেধ রয়েছে আর আমাদের দেশের স্কুলগুলিও এই বাধা নিষেধের বেড়াজাল থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পারে নি। সামাজিক বা অর্থনৈতিক বাধা নিষেধ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে আজও প্রভাবিত করে। জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের জন্য এর উচ্ছেদ করা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষাকে জাতীয় উন্নতির উপায় রূপে গ্রহণ করলে এই সামাজিক বাধা নিষেধের গণ্ডিকে সহজেই ভাঙ্গা যায়। পাড়ার স্কুল প্রথা বলতে কমিশন বুঝাতে চেয়েছেন প্রতিটি স্কুলের সেই অঞ্চলের সবাইর—জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে পড়বার অধিকার থাকবে। একজন প্রতিবেশী থেকে আর একজনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে না। পাড়ার স্কুল প্রথায় ধনী দরিদ্র সবাই পাড়ার স্কুল সম্পর্কে উৎসাহী হবে যার ফলে স্কুলের দ্রুত উন্নতি হবে।

কমিশন পাড়ার স্কুল প্রথা চালু করতে দীর্ঘ কালব্যাপী রূপায়ণের এক কর্মসূচী গ্রহণ করবার সুপারিশ করেছেন। কুড়ি বছরের পরিকল্পনার মাধ্যমে এই-প্রথাকে সাফল্য মণ্ডিত করবার সুপারিশ কমিশন করেছেন।

॥ স্কুল শিক্ষা উন্নয়নের জাতীয় কার্যসূচী ॥

স্কুলস্তরের শিক্ষার উন্নতি বিশেষ জরুরী বিধায় স্কুল উন্নয়নের একটি জাতীয় কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি স্কুল নিজ নিজ কর্মসূচী গ্রহণ করবে। প্রতিটি স্কুল নিজশক্তি অনুসারে সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে সর্বোত্তম ফল লাভ করতে পারে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

এই কার্যসূচীতে ছাত্রদের উন্নতির উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হবে। স্কুল গৃহ, আসবাব পত্র, শিক্ষা সরঞ্জাম প্রভৃতির উন্নতির বাইরে ছাত্রদের উন্নতির কথা ভিন্ন ভাবে

চিন্তা করতে হবে। স্কুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রচেষ্টায় স্থানীয় সমাজের সাহায্য ও সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কার্যসূচীর সাফল্য নির্ভর করবে এর রূপায়ণে যে সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল সেই সময়ের মধ্যে কাজের উপর যতটা জোর দিয়ে কাজ করা হয়েছে তার উপর। এই কার্যসূচীতে প্রতিটি স্কুলকে একটি ইউনিট রূপে গণ্য করা হবে, আপন শক্তি ও সামর্থে স্কুলটি কতটা উন্নতি করতে পারে সেকথা বিচার করে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

স্কুলের মূল্যায়ণ কি করে হবে সে নীতি প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ স্থির করবে। স্কুলের মূল্যায়ণের বিচারে যে সব দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তা হচ্ছে—স্থানীয় সমাজের সাথে স্কুলের সম্পর্ক, শিক্ষকগণের সেই স্কুলে স্থায়িত্ব, কর্মকালীন শিক্ষণ ব্যবস্থা, স্কুল পাঠক্রমের বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন—উন্নত ও পরীক্ষামূলক পাঠক্রম প্রবর্তন, মূল্যায়ণের নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন, মেধাবী ছেলেদের বা পিছিয়ে পড়া ছেলেদের সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ অপচয়, অনুন্নয়ন প্রভৃতি সবদিক থেকে বিচার করে দেখবার জন্য বার্ষিক ও ত্রৈবার্ষিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে।

মূল্যায়ণের জন্য স্কুলের কাজ পরিদর্শন করে স্কুলের সব দিক বিচার করে স্কুলগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হবে।

A-কাম্যস্তরের উর্ধ্বে (*above the optimum level*) যে সব স্কুলের মান সেগুলি '*A*' পর্যায় ভুক্ত হবে।

B-গড়পড়তা স্কুল যেগুলির মান সর্বনিম্ন মান ও কাম্যস্তরের মধ্যবর্তী সেগুলি '*B*' পর্যায় ভুক্ত হবে।

C-সর্বনিম্নস্তরের স্কুলগুলি '*C*' পর্যায়ভুক্ত হবে।

পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে প্রাথমিক **10%** স্কুল ও প্রতিটি ব্লকে একটি করে মাধ্যমিক স্কুল যাতে কাম্যস্তরে (*Optimum level*) পৌছাতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে।

কাম্যস্তরে পৌছাবার জন্য বর্তমানে যে সব ভাল স্কুল আছে তাই বেছে নিয়ে সেগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে এসব স্কুলে প্রধানতঃ পাড়ার ছেলেরাই পড়বার প্রথম সুযোগ পাবে। তাই ভাল স্কুল যাতে সর্বত্র গড়ে ওঠে প্রথম সে চেষ্টাই করতে হবে।

॥ পরিদর্শক ব্যবস্থা (Supervision) ॥

শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়ে সব কিছু পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের। তাই শিক্ষা বিভাগ :—

১। স্কুল উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করবে ও রূপায়ণের ব্যবস্থা করবে।
২। মান নির্ধারণ ও স্কুলগুলির নির্দিষ্ট মান রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখবে।
৩। শিক্ষক শিক্ষণ ও শিক্ষক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করবে।

৪। পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করবে।

৫। রাজ্য মূল্যায়ণ প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৬। উচ্চমান যুক্ত প্রতিষ্ঠানের মান রক্ষার ব্যবস্থা করবে ও *Extension service* এর সুবিধা যাতে পায় সে ব্যবস্থা করবে।

৭। *State Institute of Education*-এর প্রতিষ্ঠা করবে।

৮। স্কুলস্তরে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান ও ক্রমে এই শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

শিক্ষার প্রশাসনিক দিককে শক্তিশালী করতে হলে জিলা পর্যায়ে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে জেলা শিক্ষা-বিভাগকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। জেলার শিক্ষা বিষয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। এজন্য জেলা শিক্ষা অফিসারদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। রাজ্যভেদে জেলা অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের তারতম্য হতে পারে তাহলেও তাদের প্রধান কর্তব্য হবে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান।

জেলা শিক্ষা অফিসারদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে তাদের হাতে মর্যাদা অনুযায়ী আরও ক্ষমতা দিতে হবে। তাদের মাইনে বাড়াতে হবে আর সেই সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতাও যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

জেলা শিক্ষাদপ্তরের কর্মী সংখ্যা বাড়াতে হবে ও একটি করে পরিসংখ্যান বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে।

॥ প্রধান শিক্ষক ॥

জেলা শিক্ষা অফিসারের ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে প্রধান শিক্ষকের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে ও তাকে কাজ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রধান শিক্ষকের মাইনে বাড়ানোর সাথে তার শিক্ষাগত যোগ্যতাও বাড়াতে হবে। তাঁদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং মাঝে মাঝে *refresher course*-এর ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে প্রধান শিক্ষক নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, তাঁদের ট্রেনিং এর সুবন্দোবস্ত করতে হবে, আর তাঁদের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে হবে। ভুল তাঁরা করতে পারেন, ভুল সব মানুষেরই হয়, কিন্তু সে স্বাধীনতা না থাকলে সে স্কুলের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে আগ্রহশীল হবে না। স্কুল পরিচালক সমিতি যাতে প্রধান শিক্ষককে উপযুক্ত ক্ষমতা দেন শিক্ষা বিভাগ সে চেষ্টা করবে।

॥ স্কুল জোট (School Complex) ॥

একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাশাপাশি তিন চারটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১০ থেকে ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে একটি স্কুল জোট বা স্কুল চক্র গড়ে তুলতে হবে। পাড়ার স্কুলের (*Neighbouring School*) ধারণা থেকেই স্কুল চক্র বা স্কুল জোট গড়ে তোলবার কথা উঠেছে। স্কুল জোটের ফলে স্কুলগুলির মধ্যে যে বিচ্ছিন্নভাব (*isolation*) রয়েছে তা দূর হবে। একটি স্কুল আর একটি স্কুলকে সাহায্য করবে। এই পারস্পরিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে এদের স্থায়িত্ব বোধ বাড়বে ও উপর থেকে এদের

হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করবার পথ সুগম হবে। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ *Unit* এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। স্কুল জোট কার্যসূচী রূপায়িত হলে স্কুলগুলি শক্তিশালী হলে, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা আরও গতিশীল ও সজীব হয়ে উঠবে।

স্কুল জোটকে কার্যকরী করতে হলে একে উপযুক্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিতে হবে। যেমন :—

যে স্কুলগুলি নিয়ে স্কুল জোট তৈরী হয়েছে সেই জোটের স্কুলগুলিতে উন্নত মূল্যায়ণ পদ্ধতি প্রবর্তন, ক্লাসে প্রমোশন ও এক স্কুল পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে প্রমোশন প্রভৃতি ব্যাপারে এক *unit* রূপে গণ্য করতে হবে।

এমন কতকগুলি শিক্ষাসরঞ্জাম বা শিক্ষা সহায়ক উপকরণ আছে বা বিশেষ সুযোগ আছে যা স্কুলগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেওয়া যায় না, কিন্তু জোটের স্কুলগুলিকে এক সাথে এক *unit* রূপে দেওয়া যায়। জোটের সব স্কুলই প্রয়োজন মত সে সব উপকরণ ব্যবহার করতে পারে বা সে সব সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। জোট মধ্যস্থ কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক স্কুলের ভ্রাম্যমান পাঠাগার কি উন্নত গবেষণাগার বা বিশেষ শিক্ষকের সাহায্য অন্য স্কুলগুলিও পেতে পারে।

প্রতি জোটের প্রধান শিক্ষকগণ মিলিত ভাবে প্রতি বছরের শিক্ষা কার্যসূচীর মূলনীতি নির্ধারণ করবেন তারপর প্রতিটি স্কুল সেই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নিজ প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে বিস্তৃত কার্যসূচী রচনা করবেন।

স্কুল জোট জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করতে পারবে।

বাছাই করা স্কুল জোটে নতুন পাঠ্য বইয়ের মূল্যায়ণ ও শিক্ষক সহায়িকা (*Teacher's Guide*) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হবে।

প্রতি জোটে শিক্ষকদের জন্য ভ্রাম্যমান পাঠাগার থাকবে। মাঝে মাঝে জোটের শিক্ষকদের আলোচনা সভা ও শিক্ষকতাকালীন শিক্ষা (*in-service training*) প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষামানের উন্নতি করা হবে।

উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া স্কুল জোট প্রথা প্রবর্তন সম্ভব নয়। পথপ্রদর্শক রূপে প্রতি রাজ্যে দু' একটি বাছাই করা জেলায় প্রথম এই প্রথা চালু করা হবে। প্রথম অবস্থায় জোটগুলির হাতে খুব বেশী দায়িত্ব বা ক্ষমতা দেওয়া হবে না। যদি দেখা যায় কোন জোট ভাল ভাবে কাজ করছে না তাহলে ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হবে।

স্কুল জোটে যৌথভাবে যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার উৎসাহ দেওয়া হবে ঠিক তেমনি *unit*-এর মধ্য থেকে পৃথকভাবে ভাল ভাবে কাজ করবার উৎসাহ দেওয়া হবে।

॥ নতুন পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা (The New Supervision) ॥

পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান হচ্ছে স্কুলশিক্ষা উন্নতির অন্যতম প্রধান সহায়ক ; তাই পরিদর্শন ব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে হবে।

প্রশাসন ও পরিদর্শনকে (*Administration & Supervision*) আলাদা করতে হবে। জেলা স্কুল বোর্ড প্রশাসনিক দিক দেখবে, জেলা শিক্ষা অফিসার পরিদর্শনের দিক দেখবে। দুই বিভাগের সহযোগিতায় জেলার শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে।

কোন স্কুলের স্বীকৃতি (*Recogniton*) রুটিন মাফিক হবে না। স্কুলকে তার কাজের দ্বারা নিয়মিতভাবে স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে।

প্রতিটি স্কুলে দু'রকমের পরিদর্শন হবে ; প্রতি বছর জেলা স্কুল বোর্ডের অফিসার প্রাথমিক স্কুল ও রাজ্য শিক্ষাবিভাগের অফিসার মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শন করবেন। এ ছাড়া ত্রি-বার্ষিক বা পঞ্চবার্ষিক বিশেষ পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকবে। নতুন পরিদর্শন ব্যবস্থার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব হবে স্কুল পরিচালনায় পরামর্শ দেওয়া।

প্রশাসনিক ও পরিদর্শন বিভাগের অফিসারদের জন্য কর্মকালীন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ State Institution of Education ॥

শিক্ষা বিভাগের কর্মীদের শিক্ষার দিক দেখবার জন্য, বিভাগীয় অফিসারদের *In-service training*-এর জন্য, শিক্ষক শিক্ষণ বিষয় উন্নতি, পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ণ ও মূল্যায়ণ নিয়ে গবেষণা প্রভৃতি কাজ পরিচালনার দায়িত্ব *State Institute of Education*কে দেওয়া হবে।

রাজ্য ও জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ :—শিক্ষামানের উন্নতির জন্য জাতীয় স্তরে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

প্রাথমিক নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষা অর্জনের নিম্নতম মান স্থির করতে হবে। এরপর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দু'বছরের শিক্ষা শেষে ছেলেদের কাছ থেকে আমরা যা আশা করি তাও পরিষ্কার ভাবে ঠিক করে নিতে হবে।

স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজন বিচার করে রাজ্যশিক্ষা বিভাগ সর্ব স্তরের শিক্ষার সর্বনিম্ন মান স্থির করবেন। রাজ্য মূল্যায়ণ বিভাগ ও রাজ্যশিক্ষা পর্ষৎ পরিমাপ ও প্রয়োজনবোধে মানের পরিবর্তন সাধন করবে। জাতীয় স্কুল শিক্ষা পর্ষৎ (*National Board of School Education*) শিক্ষামানের উন্নতির জন্য সর্বদা সাহায্য করবে। রাজ্যসমূহের জন্য একটা নিম্নতম মান স্থির হবে যার নীচে কোন রাজ্যই নামতে পারবে না। তবে সব রাজ্যের জন্য একই রকম ও অপরিবর্তনীয় মান নির্ধারণ করা হবে না।

॥ রাজ্য মূল্যায়ণ সংগঠন (State evaluation) ॥

রাজ্য শিক্ষা বিভাগকে মান নির্ণয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন, মান রক্ষা ও শিক্ষামানের পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের সাহায্যের জন্য প্রতি রাজ্যে একটি করে মূল্যায়ণ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হবে। স্বাধীন, স্বয়ং শাসিত প্রতিষ্ঠান রূপে এই সংগঠনের সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে।

রাজ্য মূল্যায়ণ সংগঠিত জেলা শিক্ষা অফিসারদের স্কুলে মূল্যায়ণ প্রথার উন্নতির কাজে সাহায্য করবে। রাজ্য শিক্ষা বিভাগকে মান উন্নয়নের জন্য উন্নত ধরনের পাঠ্য পুস্তক রচনা, পাঠক্রম রচনা, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া প্রভৃতি কাজ করবে।

রাজ্য মূল্যায়ণ সংগঠনকে সাহায্যের জন্য একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী থাকবে। রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষতের চেয়ারম্যান এই উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি হবেন।

॥ রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষৎ (State Board of School Education) ॥

প্রতি রাজ্যে একটি করে স্কুল শিক্ষা পর্ষৎ গঠিত হবে। এই পর্ষৎ বর্তমান মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ও তার অধীনস্থ সব প্রতিষ্ঠানের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

স্কুলস্তরে পাঠক্রম রচনার পূর্ণ দায়িত্ব বোর্ডের থাকবে। প্রাথমিক স্কুলের অনুমোদন জেলা শিক্ষা অফিসার করবেন। মাধ্যমিক স্কুলের অনুমোদন শিক্ষা পর্ষৎ ও রাজ্য শিক্ষা বিভাগ মিলিত ভাবে করবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা শেষে বহিঃপরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের সাধারণ শিক্ষার (*General Education*) শেষ বহিঃপরীক্ষা পর্ষৎ গ্রহণ করবে।

কালক্রমে স্কুল স্তরে সাধারণ ও বৃত্তি শিক্ষা রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষতের অধীনে আনা হবে। এটা অবশ্য এখনই সম্ভব হবে না। বৃত্তি শিক্ষার জন্য রাজ্য স্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকবে। তবে এই সব প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতা থাকবে।

স্কুল শিক্ষা পর্ষতের একটি বিশেষ কমিটি উচ্চতর শিক্ষার উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য গঠিত হবে। এই কমিটির অর্ধেক সভ্য স্কুল ও অর্ধেক সভ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করবে।

পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা যথাসম্ভব শীঘ্র করতে হবে। এই জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হবে ও জেলা ভিত্তিক সাব বোর্ড গঠন করা হবে যেখানে আরও অল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী নিয়ে কাজ করা হবে।

॥ কেন্দ্রের ভূমিকা (Role of the Centre) ॥

স্কুল শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উপদেশ ও পরামর্শ দেবার জন্য *National Board of School Education* প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বোর্ড বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে শিক্ষামান কিরূপ হওয়া উচিত, প্রয়োজন হলে শিক্ষামানের পরিবর্তন আবশ্যক ও মূল্যায়ণ সম্পর্কে শিক্ষাদপ্তরকে উপদেশ দেবেন। রাজ্যশিক্ষা বিভাগে পাঠক্রম প্রণয়ন ও শিক্ষামানের উন্নতি সম্পর্কে উপদেশ দেবেন।

স্কুল শিক্ষা বিশেষ করে বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামান উন্নয়ন, ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি ব্যাপারে কেন্দ্রকে সুবৃহৎ কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ দশম শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণী শিক্ষা শেষে কোন কোন বিষয়ে উচ্চমানের পরীক্ষা গ্রহণ করবে। এই পরীক্ষার পাঠক্রম জাতীয় ভিত্তিতে রচিত হবে। গণিত বা বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে এই পরীক্ষা শুরু হতে পারে। যে কোন অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র এই পরীক্ষা দিতে পারবে। পরীক্ষার্থীদের প্রতি বিষয় কৃতিত্বের জন্য অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া হবে।

প্রতি বিদ্যালয়কে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। বিনা অনুমোদনে স্কুল চালান অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষার নির্দিষ্ট মান রক্ষিত না হলে অনুমোদিত স্কুলের তালিকা হতে সেই স্কুলের নাম কেটে দেওয়া হবে।

‖ শিক্ষকের মর্যাদা (Teacher Status) ‖

শিক্ষকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা শিক্ষকতা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। এজন্য সর্বস্তরে বিশেষ করে স্কুল স্তরে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বস্তরের সর্বনিম্ন বেতনের হার নির্দিষ্ট করে দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে হবে যাতে তারা নির্দিষ্ট হারে বেতন দিতে পারে।

সরকারী বা বেসরকারী যেখানেই কাজ করুন না কেন একই পর্যায়ের (*Category*) শিক্ষকদের বেতন সর্বত্র একই রূপ হবে।

কমিশন শিক্ষকদের জন্য একটি বেতন হার স্থির করে দিয়েছেন। রাজ্যসমূহ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই বেতন চালু করবে বলে কমিশন আশা করেন—

The Commission proposes the following scales of pay :

Teachers	*Remuneration*
1. Teachers who have completed the Secondary course and have received two years of professional training.	*Minimum for trained teacher Rs. 150* *Maximum salary (to be reached in a period of about 20 years) Rs 250* *Selection Grade (for about 15% of the cadre) Rs. 250—300*
2. Graduate who have received one year's professional training	*Minimum for trained graduates Rs. 220* *Maximum Salary (to be reached in a period of 20 years) Rs. 400* *Selection Grade (for about 15% of the cadre) Rs. 400—500*

Teachers	*Remuneration*
3. *Teachers working in Secondary schools and having post graduate qualifications.* *N.B. On being trained, they should get one additional increment.*	*Rs.300—600*
4. *Heads of Secondary schools.*	*Depending upon the size and quality of the schools and also on their qualifications, the head masters should have on or other of the scales of pay for affiliated colleges recommended below.*
5. *Teachers in affiliated colleges.*	*Lecturer—* *Junior Scale Rs. 300-25-600* *Senior Scale Rs. 400-30-640* *40—800* *Senior Lecturer/Reader* *Rs. 700—40—1100* *Principal.* *(i) Rs. 700—40—1100* *(ii) Rs. 800—50—1250* *(iii) Rs. 1000—50—1500*
6. *Teachers in University Departments.*	*Lecturer Rs. 400—40—800* *50—950* *Reader Rs. 700—50—1250* *Professor Rs. 1100—50—* *1300—60—1600*

উন্নত হারে বেতন চালু করবার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অতিরিক্ত খরচের শতকরা ৮০ ভাগ বেসরকারী কলেজে প্রয়োজন হলে ১০০ ভাগই সাহায্য করা হবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই ব্যবস্থা চালু থাকবে তারপর রাজ্য সরকার সুষ্ঠু সাহায্যের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

শিক্ষকদের জন্য তিনটি বেতনের হার সুপারিশ করা হয়েছে—

(১) যাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে পেশাগত যোগ্যতার ট্রেনিং নিয়েছেন (২) ট্রেনিং প্রাপ্ত স্নাতক (৩) উত্তর স্নাতক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক।

ভবিষ্যতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে দু'বছর ট্রেনিং নিয়েছে এমন লোককেই শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষায় নিযুক্ত করা হবে। উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্র সংখ্যা ২০০ শতের উপর সেখানে প্রধান শিক্ষককে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্নাতক (*Trained graduate*) হতে হবে। তাঁর বেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত স্নাতক শিক্ষকের সমান হবে।

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন একদিকে কলেজ শিক্ষকদের অপর দিকে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। প্রধান শিক্ষকের বেতনের হার কলেজ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কুলের ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষামান প্রভৃতি বিচার করে স্থির হবে। পেশাগত যোগ্যতা অর্জন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে।

রাজ্য স্কুলশিক্ষা পর্ষৎ ও শিক্ষা বিভাগ সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে রীতিনীতি স্থির করে দেবেন। প্রতিটি অনুমোদিত বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীতে বিভাগীয় প্রতিনিধি থাকবেন। শিক্ষক নিয়োগের রীতিভঙ্গ করে শিক্ষক নিয়োগ করা হলে সেই শিক্ষকের জন্য সাহায্য দেওয়া হবে না।

প্রাথমিক স্তর থেকে সব স্তরের শিক্ষকদের উপযুক্ত যোগ্যতা (শিক্ষার ট্রেনিং) থাকলে তার সামনে পরবর্তী স্তরে প্রমোশনের সুযোগ থাকবে।

শিক্ষকদের বেতনের হার প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পর্যালোচনা করে দেখা হবে ও সরকারী কর্মচারীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হবে।

সমস্ত শিক্ষক অবসরকালীন একই রকম সুবিধা ভোগ করবেন। ত্রিবিধ কল্যাণকর ব্যবস্থা (*Triple-benefit scheme*) সরকারী বেসরকারী স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ভাবে চালু করতে হবে। অবসর নেওয়ার বয়স সাধারণ ভাবে ৬০ বৎসর হবে, ৬৫ বৎসর পর্যন্ত কার্যকাল বাড়াবার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজের ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে শিক্ষকরা তাঁদের যোগ্যতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ পান। ভাল ভাবে কাজ করতে হলে নিম্নতম সুযোগ-সুবিধা যেটুকু দরকার শিক্ষকদের তা দিতে হবে। তাদের পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে। শিক্ষকদের প্রতি পাঁচ বছরে একবার ভারতের যে কোন জায়গায় যাবার সুবিধাজনক ভাড়ায় রেলওয়ে পাস দেওয়া হবে।

সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্য একই রকম চাকুরীর শর্ত ও নিয়ম শৃঙ্খলার রীতি নির্ধারিত হবে।

শিক্ষকদের বিশেষ করে গ্রামের শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ও বাড়ী ভাড়া ভাতা দেবার জন্য কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে। সমবায় ভিত্তিতে শিক্ষকরা যাতে গৃহ নির্মাণ করতে পারেন সেজন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষক তাঁদের পৌর অধিকার স্বাধীনভাবে ভোগ করতে পারবেন। প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়, জেলা ও রাজ্য স্তরে নির্বাচিত হতে পারবেন। যে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবার স্বাধীনতা তাঁদের থাকবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের সব স্তরেই যথা সম্ভব বেশী করে নিয়োগ করা হবে। আংশিক সময়ের কাজের সুযোগও তাদের দেওয়া হবে। গ্রামে কাজের জন্য বিশেষ ভাতার তাদের ব্যবস্থা দেওয়া হবে ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষকদের পেশার উন্নতি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য গঠিত শিক্ষক সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষক সংগঠনের সাথে আলাপ আলোচনা করা হবে। শিক্ষকদের বেতন, কাজের অবস্থা, তাদের সুখ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষক সংগঠনের মতামত গ্রহণ করা হবে।

॥ শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Education) ॥

শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষকদের বৃত্তিগত প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন। এজন্য রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

শিক্ষকদের বৃত্তিগত প্রস্তুতিকে কার্যকরী করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান ধারার সাথে একে যুক্ত করতে হবে। অপর দিকে স্কুল জীবন ও শিক্ষার বিকাশের সাথে একে সম্পর্কিত করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, এই বর্তমান বিচ্ছিন্নতা (*existing isolation*) দূর করতে হলে কমিশন সুপারিশ করেছেন—"*Education should be recognised as a social science or an independent discipline…'education' as an elective subject should be introduced at the undergraduate and post graduate stages.*"

স্কুল শিক্ষার সাথে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাকে যুক্ত করতে হলে প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের (প্রাক্ প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার যে কোন স্তরেরই হোক না কেন) সাথে *extension service* বিভাগ যুক্ত থাকবে।

প্রাক্তন ছাত্রদের সাথে শিক্ষা পরিকল্পনা ও পাঠক্রম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রাক্তন ছাত্র সমিতি গঠন করা হবে।

বাছাই করা স্কুলে শিক্ষণ অভ্যাস (*practice-teaching*) ব্যবস্থা হবে। এসব স্কুলে উপকরণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য সাহায্য দেওয়া হবে। সহযোগী স্কুল ও শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক বিনিময় ব্যবস্থা হলে তা উভয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লাভজনক হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য যে সকল শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। এই বিচ্ছিন্নতা দূর করবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করতে হবে। দৈহিক শিক্ষা, হস্তশিল্প শিক্ষা ও কলাবিদ্যা শিক্ষার শিক্ষকদের জন্যে যে শিক্ষালয় আছে সেগুলিকেও সামগ্রিক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে হবে। এজন্য ধীরে ধীরে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে কলেজ স্তরে উন্নীত করে সমস্ত শিক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনতে হবে। প্রতিরাজ্যে *State Board of Teacher Education* প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই বোর্ড শিক্ষক-শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

শিক্ষক-শিক্ষণের মানের উন্নতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কমিশন বলেছেন—শিক্ষক-শিক্ষণ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এর গুণগত উন্নতি (*qualitative improvement*)। বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রধানতঃ সেকেলে, অপরিবর্তনীয়, স্কুলের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্ক বর্জিত। এই অবস্থার পরিবর্তন করে গুণগত উন্নতির জন্য কমিশন কয়েকটি মূল নীতিকে গ্রহণ করবার সুপারিশ করেছেন—

These are—

—re-orientation of subject knowledge :

—vitalization of professional studies :

—improvement in methods of teaching and evaluation

—improvement of student-teaching

—development of special courses and programmes, and

—revision and improvement of curricula.

স্কুলে যে বিষয় পড়ান হয় তার উদ্দেশ্য ও পড়াবার আগে সেই বিষয়ের মূলনীতি সম্পর্কে শিক্ষকের একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন (*insight into the basic concepts, objectives and implication of subjects*) ভারতের অবস্থার কথা বিবেচনা করে তার পটভূমিতে শিক্ষকের পেশাগত শিক্ষায় প্রাণ সঞ্চারের জন্য পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষাপদ্ধতি ও মূল্যায়ণ পদ্ধতির সম্পর্কে উন্নতি করতে হবে। ছাত্রদের পাঠ দেবার (*student teaching*) যে ব্যবস্থা শিক্ষাকালে আছে তার উন্নতি করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণের বর্তমান পাঠক্রম পরিবর্তন করতে হবে।

শিক্ষকদের ট্রেনিং কাল পরিবর্তন করতে হবে। যারা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে ট্রেনিং গ্রহণ করেন সেই সব প্রাথমিক শিক্ষককে দুই বছর ট্রেনিং নিতে হবে। গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের শিক্ষাকাল সে ক্ষেত্রে এক বছর হবে এবং বছরে শিক্ষার দিন বাড়িয়ে ২৩০ দিন করা হবে।

শিক্ষকদের শিক্ষার উন্নতি করতে হলে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের অধ্যাপকদের দু'টি বিষয়ে মাষ্টার ডিগ্রী থাকবে এবং বেশ কিছু সংখ্যক অধ্যাপকের *Doctorate degree* থাকবে। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদেরও নিয়োগ করা হবে।

প্রথম ডিগ্রীতে ছিল না এমন কোন বিষয় ছাত্রকে *method subject* রূপে দেওয়া হবে না। ভালছেলেরা যাতে শিক্ষকতার ট্রেনিং গ্রহণ করতে উৎসাহী হয় সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় বৃত্তি দেওয়া হবে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ কলেজে কোনরূপ বেতন থাকবে না, শিক্ষার্থী বৃত্তি, সাহায্য ও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি ট্রেনিং কলেজের সাথে *experimental* অথবা *Demonstration school* যুক্ত থাকবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য *Corres-*

pondence course এর সুযোগ থাকবে। গ্রাজুয়েটদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

প্রতি রাজ্যে শিক্ষক-শিক্ষণ এমন ভাবে বাড়াতে হবে যাতে কলেজগুলি শিক্ষকের চাহিদা মেটাতে পারে। ট্রেনিং পায় নি এমন শিক্ষকরা (*Backlog of untrained teacher*) যাতে চতুর্থ পরিকল্পনা কালের মধ্যে ট্রেনিং পেতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষকদের জন্য *in-service training* এর ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকরা যাতে প্রত্যেক পাঁচ বছর চাকুরীর পর ২।৩ মাসের ট্রেনিং পেতে পারেন সে ব্যবস্থা করা হবে।

উচ্চশিক্ষা (Higher Education) ঃ—

॥ উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ॥

ভারতে উচ্চশিক্ষার কি লক্ষ্য হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোচনায় আধুনিক জগতে উচ্চশিক্ষার কি লক্ষ্য সেই মূলনীতিগুলি বলে তারপর বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে কি চেষ্টা করা হবে সে সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করেছেন :—

নতুন জ্ঞানের সন্ধান, দৃঢ় ও নির্ভীকভাবে সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত থাকা ও প্রাচীন যুগের জ্ঞান ও বিশ্বাসকে (*Old Knowledge & beliefs*) নতুন আবিষ্কারের আলোকে ব্যাখ্যা করা।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্ভুল নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া, প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করা, তাদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা, তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সাথে নৈতিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

সমাজের জন্য কৃষি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কলা, কারিগরি বিদ্যা ও অন্যান্য বৃত্তিতে উপযুক্ত শিক্ষিত নারী ও পুরুষ কর্মী সৃষ্টি করা যারা তাদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূর করে সামাজিক ন্যায় ও ঐক্য স্থাপন করা।

এই মূলনীতিগুলি ছাড়াও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের বর্তমান সমাজ ও শিক্ষার উন্নতির জন্য আরও কতকগুলি দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

জাতীয় চেতনা দ্বারা (*national conscience*) উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা কাজ করতে শিখবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, বৈচিত্র্য ও মত বিরোধকে একটা সহনশীল পরিবেশের মধ্যে উৎসাহিত করবে (*they should encourage individuality variety and dissent within a climate of tolerance*)।

বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে সর্বত্র আংশিক সময়ের শিক্ষা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার (*Correspondence course*) উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

স্কুলগুলিকে গুণগত উন্নতির বিষয়ে সাহায্য করবে।

চিরাচরিত প্রথায় যেখানে পরীক্ষাকে শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত উন্নতির প্রধানরূপে স্থান দেওয়া হয়েছে সেই বোঝা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে।

এমন কয়েকটি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র সৃষ্টি করা হবে যা পৃথিবীর যে কোন উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনীয় হবে ও এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে ভারতের শিক্ষা জীবনের প্রাণকেন্দ্র।

যদি উচ্চশিক্ষার এই লক্ষ্যকে রূপ দিতে হয় তাহলে কুড়ি বছরের জন্য সুচিন্তিত ব্যাপক একটা শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে—

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে।

জাতীয় উন্নতিকল্পে কর্মীর চাহিদা মেটাবার প্রয়োজন অনুসারে ও কিছু পরিমাণে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য উচ্চশিক্ষার প্রসার করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক উন্নতি করতে হবে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার হচ্ছে কয়েকটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন করা (*Development of some major Universities*) যেখানে অতি উচ্চমানের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষনার ব্যবস্থা থাকবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশ্বের যে কোন উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ হবে। *U. G. C.* বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য থেকে ছাটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়ে প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় (*Major University*) রূপে গড়ে তুলবে (এর মধ্যে একটি হবে কৃষি বিদ্যালয় অপরটি *I. T.*)।

প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের চাহিদা মেটাবে। প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিভাবান ছাত্ররা যাতে শিক্ষকতা বৃত্তিতে যোগ দেয় সেজন্য সমস্ত রকম চেষ্টা করতে হবে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়কে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার সঙ্গতি দিয়ে (*through concentration of resources*) সাহায্য করতে হবে যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সেই সব বিষয়ে উন্নত শিক্ষার কেন্দ্র রূপে (*Centres of Advanced Studies*) উন্নীত হতে পারে।

ভারতে কিছু কলেজ আছে যাদের প্রতিষ্ঠা বহুদিনের ও সে কলেজগুলি অনেক ভাল কাজ করেছে যা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। শিক্ষানীতির একটা লক্ষ্য হ'ল এই কলেজগুলিকে উৎসাহ দিয়ে যাওয়া। কলেজগুলিকে তাদের কৃতিত্ব বিচার করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হবে ও সেইভাবে সাহায্য করা হবে।

উচ্চশিক্ষায় নিয়মমাফিক ক্লাস ও লেবরেটরীর কাজের সময় কমিয়ে সে সময় শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্বাধীনভাবে পড়তে, উপদেষ্টাদের নির্দেশমত নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে পড়তে, প্রবন্ধ রচনায়, সমস্যা সমাধানে, ছোট ছোট প্রজেক্ট নিয়ে গবেষণায় ও লাইব্রেরীতে তথ্য অনুসন্ধানের কাজে ব্যয় করা হবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থ সমৃদ্ধ ভাল গ্রন্থাগার গড়ে তুলবার সবরকম চেষ্টা করা হবে।

শিক্ষার্থীকে মুখস্ত করতে নিরুৎসাহ করা হবে ও সব বিষয়ে মৌলিক চিন্তায় উৎসাহিত করা হবে। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্ররা যাতে প্রবীণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকদের সংস্পর্শে আসতে পারে ও নতুন বিষয় যা তাদের পাঠ্যসূচীতে নেই সে সব বিষয় জানতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

কমিশন কলেজগুলিতে দু'টি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা (*xperimentation*) চালাতে বলেছেন—একটি হচ্ছে অধ্যাপক সংখ্যা না বাড়িয়ে, খরচ না বাড়িয়ে আরও বেশী সংখ্যক ছাত্রকে কি করে শিক্ষা দেওয়া যায়, আর একটি হচ্ছে *Research Students*-দের দিয়ে কিছুটা অধ্যাপনার কাজ কি করে করান যায়।

উচ্চশিক্ষার শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে কোন সময় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নি। *U. G. C.* এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করবেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র দল শিক্ষা বিষয়েই লিপ্ত না থেকে কলেজ শিক্ষা সম্পর্কেও চিন্তা করবে।

উচ্চশিক্ষা বহিঃপরীক্ষার সাথে আভ্যন্তরীণ পরিমাপ (*internal assessment*) ব্যবস্থা থাকবে। যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আছে (*in all teaching universities*) সেখানে বহিঃপরীক্ষার পরিবর্তে অধ্যাপকরা নিরবচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের কাজ করবেন (*internal and continuous evaluation by the teachers themselves*)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নতুন ও উন্নত আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ বিষয়ে ওয়াকিবহাল করবার জন্য আলোচনা, ওয়ার্কসপ, সেমিনার প্রভৃতির এক কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। যথাসম্ভব শীঘ্র পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক দেবার প্রথা রহিত করে দিতে হবে। প্রতি বছর অধ্যাপকদের অনধিক ৫০০ খাতা দেখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার বাহন হবে আঞ্চলিক ভাষা, এই দশ বছরের এক কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে। প্রথম অবস্থায় স্নাতক শ্রেণীতে আঞ্চলিক ভাষায় পড়ান শুরু হবে, স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ইংরেজী থাকতে পারে। অধ্যাপকরা আঞ্চলিক ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই পড়াতে পারেন এমন ভাবে প্রস্তুত হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজী শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকবে। ডিগ্রী কোর্সের প্রথমবর্ষে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক ভাষারূপে শেখাবার সুযোগ থাকবে।

শিক্ষায় মানুষ সুসভ্য ও দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক হয়ে ওঠে ও জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। আজ বহুদিকে শৃঙ্খলাহীনতা যে ভাবে উগ্র হয়ে উঠেছে এটা দূর হবে না যদি শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি আপন আপন কর্তব্য না করেন। ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা-হীনতা ও অসন্তোষের একটি কারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি। প্রশাসনিক ত্রুটি দূর ক'রে এবং পরামর্শ ও আলোচনা সভা ক'রে অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। ছাত্রদের সুখ সুবিধার দিকে আরও দৃষ্টি দিতে

হবে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্র শিক্ষক ব্যবস্থাপকরা একটি গোষ্ঠীভুক্ত হবেন। আলাদা আলাদা ভাবটা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

॥ উচ্চশিক্ষার প্রসারে ॥

ভর্তি (*enrolement*) একটি প্রধান সমস্যা। উচ্চশিক্ষার প্রসার পরিকল্পনায় কর্মীর প্রয়োজন ও চাকুরীর সম্ভাবনা (*manpower needs and employment opportunities*) দুটি বিশেষ ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। বর্তমানে যেভাবে ভর্তি হচ্ছে ডিগ্রীকোর্স ও তারপরবর্তী শ্রেণীতে ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ তাহা ৪০ লক্ষ হবে। কৃষি, ইঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষার সুযোগও বিশেষ ভাবে বাড়াতে হবে।

উচ্চশিক্ষার প্রসার যতটা সম্ভব হবে ভর্তির ভিড় তার চেয়ে অনেক বেশী হবে, তারপর নিয়োগ সম্ভাবনার কথাও ভাবতে হবে। এই অবস্থায় উচ্চশিক্ষায় ভর্তি করা হবে বাছাই করে (*Selective admission*)। কত স্থান পাওয়া যাচ্ছে, যে শিক্ষক আছে ও কলেজে যে সুযোগ সুবিধা আছে সে অবস্থায় শিক্ষামানের অবনতি না ঘটিয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভাল ছেলেদের ভর্তির জন্য বেছে নেওয়া হবে।

ভর্তির ক্ষেত্রে বাছাই করবার ভাল কোন পদ্ধতি যতদিন না খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ততদিন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরই হবে ভর্তির প্রধান ভিত্তি। পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে পরীক্ষার দ্বারা একটি ছাত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ মূল্যায়ণ হয় না তাই চূড়ান্ত বাছাইয়ের সময় স্কুলের কৃতিত্ব যা পরীক্ষায় বিচার হয় নি তা দেখা হবে, এছাড়া শিক্ষার্থীর সামাজিক অর্থ নৈতিক বাধাগুলিকেও বিচার করে দেখতে হবে। ভর্তি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেবার জন্য প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে বোর্ড থাকবে।

আংশিক সময়ের শিক্ষার জন্য কমিশন ব্যাপক প্রস্তুতির সুপারিশ করেছেন। সান্ধ্য ক্লাস, ডাকযোগে শিক্ষা প্রভৃতির সুযোগ যাতে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয় সেজন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। ১৯৮৬ খ্রীঃ মধ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারীদের এক তৃতীয়াংশ যাতে এই সুবিধা নিতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে।

সাধারণভাবে কলেজগুলি যাতে বড় হয় সে চেষ্টা করতে হবে। বড় প্রতিষ্ঠান খরচের দিক থেকে সুবিধাজনক ও যোগ্যতার বিচারেও এরা শ্রেষ্ঠ হয়। একটি কলেজে কম করে ৫০০ ছাত্র থাকবে, যত বেশী সম্ভব কলেজে ছাত্র সংখ্যা ১০০০ বেশী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নতুন কলেজের অনুমোদন দেবার বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যাতে সে অঞ্চলে যে কলেজ আছে তার যেন ক্ষতি না হয়। কমিশন মনে করেন নতুন কলেজ করার চেয়ে যে কলেজ আছে তার সম্প্রসারণই যুক্তি সংগত।

স্নাতকোত্তর শিক্ষায় ভর্তির বিষয়ে কড়াকড়ি করতে হবে। যারা ভর্তি হবে তাদের অর্দ্ধেকের জন্য বৃত্তি বা বৃত্তি ঋণ দেওয়া হবে। মেয়েদের জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার দ্বারা—সর্বক্ষেত্রে মানবিক বিষয়, কলা, বিজ্ঞান, কারিগরি শিক্ষা,—যুক্ত থাকবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য মেয়েদের ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে বলে কমিশন মনে করেন না।

উচ্চশিক্ষার বিষয় পুনর্গঠন (*reorganisation of course*) সম্পর্কে কমিশন বলেছেন প্রথম ডিগ্রীকোর্সে ও বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে বিষয় নির্বাচনে আরও স্বাধীনতা দিতে হবে।

"The combination of the subjects permissible for the first degree should also be more elastic than at present both in the arts and in the sciences. It should not be linked too rigidly the subjects studied at school"

স্নাতক শ্রেণীতে সাধারণ, বিশেষ ও অনার্স এই তিনটি কোর্স থাকবে। যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে বিশেষ ব্যবস্থা আছে সেখানেই বিশেষ কোর্স পড়ান হবে। *M. A.* ডিগ্রীর পাঠক্রমে নতুনত্ব ও নমনীয়তা (*flexibility & innovation*) আনতে হবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সমাজ বিজ্ঞান (*Social Science*) শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

॥ বৃত্তি কারিগরী শিক্ষা ॥

একটা দেশের শিল্পোন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ও কুশলী কর্মীর চাহিদা মেটাবার উপর। দেশ স্বাধীন হবার পর কারিগরী শিক্ষার অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু, একথা স্বীকার করতে হবে স্কুল স্তরে বৃত্তি শিক্ষাকে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা (*inferior form of education*) বলে মনে করা হয়। যাদের সাধারণ শিক্ষা হ'ল না, কি সুবিধা করতে পারল না অভিভাবকেরা বাধ্য হয়েই সেখানে বৃত্তি শিক্ষার দ্বারস্থ হন। এই দৃষ্টি ভঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে। দক্ষ কর্মীর *skilled craftsman* টেকনিসিয়ানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে ও সমাজকে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

কমিশন বলেছেন ১৯৮৬ খ্রীঃ মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্র সংখ্যার ২০% ও দশম শ্রেণী থেকে পাস করবার মোট ছাত্রের ৫০% পুরো বা আংশিক সময়ের জন্য কোনরূপ বৃত্তি বা পেশাগত শিক্ষা গ্রহণ করবে। ১৪।১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের বৃত্তি বা কারিগরী শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করা হবে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করবার জন্য সরকারী দপ্তর থেকে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

স্কুল স্তরে কারিগরীশিক্ষা মুখ্যতঃ চূড়ান্ত ধরনের (*Terminal in character*) হবে। বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে যারা শুধু তাদেরই পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থাকবে। দক্ষ ও কুশলী কর্মী সৃষ্টির জন্য *ITI* গুলিতে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যেই যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসন সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে। *ITI* যে ভর্তির বয়স ধীরে ধীরে কমিয়ে ১৪ বছর করা হবে তার সাথে পাঠক্রমের সামঞ্জস্য করা হবে। *ITI* এর ট্রেনিং উৎপাদন ভিত্তিক করা হবে। যারা স্কুল ছেড়ে কাজ নিতে বাধ্য হবে তাদের সুবিধার জন্য আংশিক

সময়ের বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলগুলির নাম পরিবর্তন করে টেকনিক্যাল হাইস্কুল রাখা হবে।

টেকনিক্যাল ট্রেনিং ব্যবস্থা শিল্পপতিদের সাথে আলোচনা করে ও নিয়োগের সম্ভাবনা বিচার করে পরিবর্তন করতে হবে। ডিপ্লোমাকোর্স শিক্ষা ব্যবহারিক জ্ঞানের ভিত্তিতে হবে এবং শিল্প অভিজ্ঞতা শিক্ষার অঙ্গরূপে যুক্ত হবে। পলিটেকনিকগুলি শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রামাঞ্চলে যে সব পলিটেকনিক আছে সেখানে কৃষিবিদ্যা ও কৃষির সাথে যুক্ত শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। পলিটেকনিকগুলিতে শিক্ষক কলকারখানা থেকে নিয়োগ করতে হবে। এজন্য যদি সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম শিথিল করা দরকার হয় তা করা হবে। শিক্ষাকে বাস্তবভিত্তিক করবার জন্য ছুটির সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য বা বিক্রির জন্য সাধারণ যন্ত্রপাতি তৈরী করবে। পলিটেকনিকগুলিতে প্রথম দু'বছরের শিক্ষায় গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে জোর দেওয়া হবে। ডিপ্লোমাধারীগণ যেহেতু নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র যেতে চান না তাই যেখানে যে শিল্প আছে সেখানে সেরূপ পলিটেকনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়েদের যে বিষয়ে উৎসাহ আছে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে সে সব বিষয়ে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে। পলিটেকনিকগুলিতে অপচয় বন্ধ করতে হবে ও বর্তমান বিদ্যালয়গুলিতে আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। বাছাই করা 'পলিটেকনিক'গুলিতে টেকনিসিয়ানদের জন্য ডিপ্লোমা-পরবর্তী শিক্ষা দেওয়া হবে। এই শিক্ষার সাথে কারখানার অভিজ্ঞতা যুক্ত করা হবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। হয় টেকনিসিয়ান ট্রেনিং-এর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হবে, না হয় বন্ধ করে দেওয়া হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কয়েকটি নির্দিষ্ট শাখায় যেমন *electronics and instumentation*-এ ভাল *B. Sc* ছাত্র নেওয়া হবে। পুরো সময়ের ডিগ্রীকোর্সের ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষা কারখানার সহযোগিতায় তৃতীয় বর্ষ থেকে শুরু হবে। ওয়ার্কসপের কাজ উৎপাদনভিত্তিক হবে। পরিবর্তিত প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী স্তরে শিক্ষা বহুমুখী হবে। শিক্ষার পাঠক্রম বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে নিয়মিত পরিবর্তন করতে হবে।

মাধ্যমিক ও পলিটেকনিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্য বই তৈরীর জন্য সর্বভাবে চেষ্টা করা হবে। কলকারখানায় ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। যে সব কলকারখানায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করবে তাদের কেন্দ্র থেকে সাহায্য দেওয়া হবে।

॥ কৃষি বিদ্যা শিক্ষা (Education for Agriculture) ॥

সাময়িক কতকগুলি ঘটনা আমাদের দেশের কৃষির শোচনীয় অবস্থাকে চোখের সামনে তুলে ধরেছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে নি।

ভারতীয়দের নিম্নতম খাদ্যের প্রয়োজন আজ মেটান সম্ভব হচ্ছে না, খাদ্যের জন্য আমরা পরনির্ভরশীল। অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা আমাদের শিল্পোন্নতির পথে অন্তরায় (*under developed agriculture retards industrialisation*)। কৃষির উন্নতি আমাদের করতে হবে; আগামী পনেরো বছরের মধ্যে আমাদের কৃষির উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে। কৃষির উন্নতি ও গ্রামের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রের সাহায্য নিলেই তা সম্ভব। কৃষি বিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি বিদ্যা শিক্ষার কোন কার্যসূচীতে তিনটি বিষয় প্রধান হবে—উপযুক্ত প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশ বা গবেষণা, কৃষকদের মধ্যে প্রযুক্তি বিদ্যার বিস্তার ও প্রয়োজনীয় লোকের শিক্ষা-ব্যবস্থা (*research or the development of appropriate technology, extention or the communication of the technology to practising farmers and training of needed personnel*)

যদি কৃষির উন্নতি করতে হয় তাহলে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষি বিদ্যা শিক্ষা একটা স্থান অধিকার করবে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিছুটা কৃষিমুখীন করতে হবে (*An orientation towards agriculture must be given to all educational institution*)। কৃষি বিদ্যা শিক্ষার কর্মসূচী সাফল্যের জন্য নিম্ন ব্যবস্থাগুলি অত্যাবশ্যক :—

(১) শিক্ষা, গবেষণা ও সাহায্যের কর্মসূচী নিয়ে কয়েকটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

(২) প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের কৃষি গবেষণা ও অধ্যাপনাপদে আকর্ষণ করতে হবে।

(৩) অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে।

(৪) কৃষিবিদ্যা কলেজগুলির উন্নতি করতে হবে।

(৫) কৃষি প্রকর্মীদের শিক্ষার জন্য (*to train agricultural technicians*) কৃষি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৬) সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থায় গ্রাম্য সমস্যা ও কৃষি বিষয়ে কিছুটা পরিচয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) প্রগতিশীল কৃষকদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও পলিটেকনিক কলেজের সাথে যুক্ত করতে হবে।

॥ বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education) ॥

দেশ থেকে যথাশীঘ্র সম্ভব নিরক্ষরতা দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। দেশের কোন অংশেই এ কাজে ২০ বছরের বেশী সময় লাগা উচিত নয়। ১৯৭১ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষিতের হার হবে ৫০% এবং ১৯৭৩ খ্রীঃ মধ্যে এই সংখ্যা হবে ৮০%।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টারূপে নিম্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে—

(১) প্রতিটি ৫-১১ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য পাঁচ বছরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

(২) ১১-১৪ বছরের যে সব ছেলেমেয়ে যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে নি বা শিক্ষা শেষ হবার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে তাদের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) ১৫-৩০ বছর বয়স্কদের জন্য আংশিক সময়ের সাধারণ এবং বৃত্তি শিক্ষার (*general and vocational*) ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) নিরক্ষরতার দূর করবার জন্য দু'ভাগে কাজ শুরু করতে হবে :—

(ক) *Selective approach* (খ) *mass approach.*

(ক) *Selective approach* যে সব জায়গায় সহজে নিরক্ষরদের খুঁজে বের করা যায় যেমন কলকারখানা, বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদি। সেখানে মালিক তার কর্মীদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাক্ষর করে তুলবার ব্যবস্থা করবেন। এজন্য প্রয়োজন হলে আইনের সাহায্য নেওয়া হবে।

(খ) *Mass approach*—এটা হবে বিরাট ও ব্যাপক। এ কাজের জন্য দেশের সমস্ত শক্তি—শিক্ষিত নরনারী, সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, ছাত্র নিয়ে অভিযান শুরু করতে হবে। এক একটা দলকে নির্দিষ্ট এলাকা দেওয়া হবে সেই এলাকায় শিক্ষার দায়িত্ব তারা গ্রহণ করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যারা সদ্য সদ্য লেখাপড়া শিখান তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। শ্রমিকরা যাতে তাদের দক্ষতা বাড়াবার সুযোগ পায় আংশিক শিক্ষায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। যারা আংশিক সময়ের শিক্ষায়ও অংশ গ্রহণ করতে পারবে না তাদের জন্য ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এসব ছাত্ররা মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সাথে দেখা করতে পারবে। সারা দেশে পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হবে ও স্কুলে যে পাঠাগার আছে সাধারণ পাঠাগারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে যারা পড়াশুনা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক সেখানে তাদের সুবিধা দিতে হবে।

॥ শিক্ষার জন্য ব্যয় ॥

কমিশন নির্দেশিত পথে যদি শিক্ষার উন্নতি করতে হয় তাহলে শিক্ষাখাতে ব্যয় প্রচুর বৃদ্ধি পাবে। ১৯৬৫-৬৬ খ্রীঃ মাথা প্রতি শিক্ষা ব্যয় ছিল ১২ টাকা কুড়ি বছর বাদে এই ব্যয় ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ হবে মাথা পিছু ৫৪ টাকা (মূল্য মানের যদি পরিবর্তন না হয়।) শিক্ষার জন্য ১৯৬৫-৬৬ খ্রীঃ যেখানে ব্যয় হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ ব্যয় হবে ৪০৩৬ কোটি টাকা।

শিক্ষা ব্যয় প্রধানতঃ সরকারী তহবিল থেকেই করা হবে কিন্তু সমস্ত ব্যয়ের দায় দায়িত্ব সরকারের পক্ষে একা বহন করা সম্ভব নয়। এজন্য জন-সাধারণ জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, পৌর প্রতিষ্ঠান যাতে শিক্ষার কাজে এগিয়ে আসে সে চেষ্টা করতে হবে।

স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য উন্নতি কল্পে বা স্কুলের জন্য তহবিল তৈরীতে গ্রহণ করা হবে। স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য জেলা স্কুল বোর্ড, জেলা-

পরিষদ ভূমি রাজস্বের উপর সেস্ ধার্য করবে। জেলা পরিষদ যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করবে তার আনুপাতিক হারে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে। জেলা পরিষদসমূহকে নিম্নহারে সাহায্য দেওয়া হবে।

শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মীদের বেতন ও ভাতা পুরোপুরি সরকার থেকে দেওয়া হবে, একটি প্রতিষ্ঠানে কতজন শিক্ষক ও তত্ত্বাবধানকারী কর্মী থাকবে সে সম্পর্কে একটি নীতি স্থির করা হবে।

অন্যান্য কর্মীর (*non-teachers*) জন্য ছাত্র সংখ্যার উপর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর স্কুলে টাকার হার বিভিন্ন রূপ হবে। তিন থেকে পাঁচ বছর অন্তর এই হার পুনর্বিচার করে দেখা হবে।

জেলা পরিষদ সংগৃহীত টাকা ও সরকারী সাহায্য জেলা পরিষদের হাতেই থাকবে, সেই টাকা উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় করা হবে।

এককালীন সাহায্য ভিন্ন ভাবে দেওয়া হবে। দেয় টাকা মোট খরচের এক তৃতীয়াংশের বেশী হবে না।

মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিক্ষার জন্য একটা অংশ ব্যয় করতে বাধ্য করা হবে। এজন্য তারা জমি ও দালালের উপর সেস্ ধার্য করতে পারবে। করপোরেশন-গুলি অন্ততঃ তাদের এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। মিউনিসিপ্যালিটি ও করপোরেশনকে সরকার মোট খরচের একটা অংশ সাহায্য করবে।

॥ সমালোচনা ॥

দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা সংস্কারের জন্য তিনটি কমিশন গঠিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ও মুদালিয়র কমিশন যথাক্রমে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ও উন্নতির জন্য গঠিত হয়েছিল। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা সমস্যার কথা চিন্তা করবার বা সে সম্পর্কে কোন সুপারিশ করবার কোন সুযোগ প্রথম দুইটি শিক্ষা বিষয়ক কমিশনের ছিল না। আংশিক ভাবে দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা শিক্ষা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। ফলে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। শিক্ষা-ক্ষেত্রে দিনের পর দিন জটিলতা ও সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার সংকল্প আমাদের ছিল তা আজও বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। পুরাতন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সামান্য পরিবর্তন করে আমরা অনুসরণ করছি। দেশের সামগ্রিক শিক্ষাই আমূল পরিবর্তন করে কি করে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় সে উদ্দেশ্যে শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) বা কোঠারী কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত সুপারিশসমূহও তেমনি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। কোঠারী কমিশনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা এবং বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার সমস্ত দিক (আইন ও চিকিৎসা বাদে) নিয়ে অনুসন্ধান করে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির জন্য সুপারিশ করেছেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার না করে সামগ্রিক

দৃষ্টিতে সমস্যাকে বিচার করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রূপ কল্পনা করেছেন। কোঠারী কমিশনের নির্দেশিত পথে অগ্রসর হলে হয়তো জাতীয় শিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে।

কমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা, তাই স্বাভাবিক ভাবেই কমিশনের সুপারিশ সমূহ বহু ব্যাপক। কমিশনের প্রধান সুপারিশসমুহ বিষয়েই আমরা আলোচনা করব।

শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত করবার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বুনিয়াদী শিক্ষার অবলুপ্তি নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে একটি মাত্র শিক্ষাপদ্ধতির কথা কমিশন বলেছেন। বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষা দুটি ব্যবস্থাই চালু আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে বুনিয়াদী শিক্ষার সমন্বয়ের যে চেষ্টা এতদিন চলছিল কমিশন বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ম-কেন্দ্রীতাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন তার মধ্য দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতিকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রূপান্তর সহজ হবে ও প্রাথমিক স্তরে পুঁথিকেন্দ্রীক শিক্ষার এক ঘেঁয়েমি থেকে শিক্ষার্থী মুক্তি পাবে।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাকাল একবছর বাড়িয়ে দ্বাদশ বছরের শিক্ষা করা হয়েছে। দশবছর পর্যন্ত শিক্ষা সকলের জন্য রাখা হয়েছে। দশবছরের শেষে *Public Examination* এর পর বিশেষীকরণের (*Specialisation*) সুযোগ থাকবে। বর্তমানে বহুমুখী শিক্ষায় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা শেষে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা বহু হয়েছে। এই *early Specialisation*-এর যৌক্তিকতা নিয়ে শিক্ষাবিদগণ সংশয় প্রকাশ করেছেন। দশমশ্রেণীর শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের এক বিরাট অংশ বৃত্তি শিক্ষার দিকে যাবে যারা উচ্চশিক্ষা পেতে চায় তারা একাদশ শ্রেণীর বিশেষীকরণের সুযোগ নেবে। এছাড়া বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে সাতটি শাখা বিভাগের (*Stream*) প্রয়োজনীয়তা কমিশন স্বীকার করেন নি। একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী পাঠক্রমের নির্ধারিত বিষয়সমূহ থেকে তিনটি বিষয় গ্রহণ করবে। পূর্বের শাখা বিভাগে নমনীয়তার (*flexibility*) অভাব ছিল। মিশ্র বিষয় নেবার সুযোগ ছিল না। কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান কাঠামোকেই রাখার কথা বলা হয়েছে। এখানে কমিশন প্রধানতঃ শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন। প্রথম ডিগ্রী তিনবছরের শিক্ষার পর দেওয়া হবে। কিন্তু মেধাবী ছাত্রদের জন্য অগ্রবর্তী শিক্ষার (*advanced education*) ব্যবস্থা থাকবে তাদের ডিগ্রী কোর্স হবে চার বছরের।

কমিশন *advanced course*-এর ব্যবস্থা স্কুলস্তর থেকেই প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন। একই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অগ্রবর্তী ও সাধারণ শিক্ষামানের কথা এর পূর্বে কোন কমিশন সুপারিশ করেন নি।

কমিশনের সুপারিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষার প্রতি স্তরে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার সুযোগ দানের ব্যবস্থা। অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করার পর থেকেই বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার সুযোগ থাকবে। সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে সবাই আসবে না। কমিশন সেদিক থেকে "বাছাই করার নীতিকে" গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সবাইকে গ্রহণ করতে হবে এরপর থেকেই বিভিন্ন ধারায় ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক ছাত্রই আসবে।

শিক্ষাকমিশনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হচ্ছে। সর্বস্তরের জন্য কর্মে অভিজ্ঞতা (*work experience*), সমাজ সেবা (*Social Service*) ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা (*moral spiritual education*)। পুঁথিকেন্দ্রীক শিক্ষার দোষত্রুটির কথা চিন্তা করেই সর্বস্তরের শিক্ষা কর্মে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব শিক্ষা লাভ করবে, উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হয়ে পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতির শিক্ষা পাবে। চরিত্র গঠনের জন্য ও সমাজিক বোধ সৃষ্টির জন্য নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কমিশনের একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য সুপারিশ পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ পদ্ধতির পরিবর্তন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান ত্রুটি হচ্ছে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা। বহিঃ পরীক্ষার পরিবর্তন সাধন ও আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের গুরুত্বপূর্ণ যে সব সুপারিশ কমিশন করেছেন তার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া সবাই যাতে শিক্ষার সমান সুযোগ পায় সেজন্য কমিশন *common School* এর সুপারিশ করেছেন। বিত্তবান ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ সুযোগের কমিশন নিন্দা করেছেন। ধনী দরিদ্র সবাই শিক্ষার একই সুযোগ সুবিধার অধিকারী হবে।

স্কুল জোট (*School complex*) গঠন কমিশনের আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ। আঞ্চলিক স্কুলগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দূর করে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা এর মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে। স্কুল জোটগুলি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পাঠক্রমের পরিবর্তন সাধন পর্যন্ত করতে পারবে। স্কুলগুলির এই স্বাধীনতা আমরা এর আগে ভাবতে পারি নি।

গতানুগতিক শিক্ষা ধারাকে পরিত্যাগ করে শিক্ষার যে নতুন লক্ষ্যের কথা কমিশন ঘোষণা করেছেন. সেই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কমিশন তাঁদের সুপারিশ করেছেন। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী, সমাজ সেবাবোধ সহিষ্ণুতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষার কার্যসূচী কমিশন গ্রহণ করবার কথা বলেছেন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সামাজিক বোধ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুল্য বোধ

জাগ্রত হবার চেষ্টার কথাও কমিশন বলেছেন। শিক্ষাকে উৎপাদনের সাথে যুক্ত করে বিজ্ঞানকে শিক্ষায় যথেষ্ট গুরুত্ব কমিশন দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক সরকার ও জীবন ধারা পদ্ধতি গড়ে তুলে জাতীয় সংহতিকে জোর করে তুলতে সামর্থ এরূপ একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা যাতে সার্থক হয় শিক্ষা কমিশন সে দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁদের সুপারিশ করেছেন।

কোঠারী কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবে রূপায়িত করবার কোন ব্যাপক প্রস্তুতি আজও শুরু হয় নি। বাস্তব ক্ষেত্রে যে সব অসুবিধা ও দোষত্রুটি দেখা দেবে সে সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। আদর্শে ও বাস্তবে যে সংঘাত সে দিকে দৃষ্টি রেখেই কমিশনের সুপারিশের ত্রুটি ও বাস্তব রূপায়ণে কয়েকটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করব।

কমিশন মাধ্যমিকস্তরে শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন। এর ফলে শিক্ষাকাল এক বছর বেড়ে যাবে। আর যে সব স্কুল একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে তার একটা অংশকে দশম শ্রেণীতে নামিয়ে আনতে হবে। কমিশন বলেছেন মোট বিদ্যালয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বিদ্যালয় দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হবে। পঃ বাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এর অর্দ্ধেক দশম শ্রেণীতে নেমে আসবে। এর ফলে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করতে যে অর্থ ও শ্রম ব্যয় হয়েছিল তার অপচয় হবে। বহু অর্থ ব্যয়ে যে সব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছিল, ল্যাবরেটরী তৈরী হয়েছিল তা অকেজো হয়ে থাকবে। যে সব শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে।

শিক্ষাকাল এক বছর বাড়াবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধ মতবাদ চিন্তা করে দেখবার দাবী রাখে। মুদালিয়র কমিশন দ্বাদশ বছরের শিক্ষার যৌক্তিকতা স্বীকার করেও বাস্তব অবস্থা বিচার করে একাদশ শ্রেণীর সুপারিশ করেছিলেন। এতে শিক্ষার ব্যয় বাড়বে অভিভাবক ও রাষ্ট্র সবাইর ক্ষেত্রেই এই চাপ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থী এক বছর বাদে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। এক বছর শিক্ষাকাল বাড়ানোর ফলে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। বাস্তব দক থেকে বিচার করে দ্বাদশ বছরের শিক্ষা পরিকল্পনাকে স্থগিত রেখে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করবার প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করবার চেষ্টা যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়।

ডিগ্রী কোর্স শিক্ষাকে তিন ও চার বছরের সাধারণ ও অগ্রবর্তী দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এম. এ. ও এম. এস. সি. কোর্সকে দুই ও তিন বছরের কোর্সে ভাগ করা হয়েছে। এই বৈষম্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে।

কমিশন নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ এগার বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার কথা বলেছেন। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষায় এমন কিছু শিক্ষা লাভ হয় না যাতে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপযুক্ত শিক্ষা বলা যেতে পারে। কমিশনের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা উচিত ছিল।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশনের ত্রি ভাষা ফরমূলা পূর্বের যে কোন সুপারিশের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কমিশনের বিশেষ নির্দেশ পঞ্চম শ্রেণীর থেকে ইংরেজী শেখান হবে এর আগে ইংরেজী শেখান চলবে না। পঃ বাংলার পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজী শেখানোর চেষ্টা হয়েছিল তার ফল ভাল হয় নি। এখানে আবার তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী শেখান হচ্ছে।

কমিশন *common school*-এর কথা বলেছেন আবার বেসরকারী উদ্যোগের ব্যবস্থা রেখেছেন—এটা পরস্পর বিরোধী। ছাত্র ভর্তি ও শিক্ষার সুযোগে যে সময় সীমা কমিশন নির্ধারণ করেছেন তা অত্যন্ত দীর্ঘ। কমিশনের অর্থ বরাদ্দনীতিও বাস্তব ধর্মী হয় নি।

কমিশনের সুপারিশ সমূহ অত্যন্ত উচ্চাশাপূর্ণ। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি উচ্চাশাপূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে সরকার প্রস্তুত নয়। এ ছাড়া কমিশনের সুপারিশসমূহ কিছুটা অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশসমূহ যতদিন বাস্তবে রূপায়িত না করা হচ্ছে ততদিন এর দোষ ত্রুটি সম্পর্কে—আলোচনার কোন বাস্তবভিত্তি নেই। তবে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও জাতীয় শিক্ষা

ইংরেজ ভারত ত্যাগ করবার পর জাতীয় সংগ্রামের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। পৌনে দু'শত বছর এ দেশকে শাসন ও শোষণ করে ইংরেজ যে ভারতকে ত্যাগ করে গেল তার প্রধান সম্পদ রইল অগণিত অন্নহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন নরনারী। তাই স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের সংগ্রাম শুরু হ'ল দারিদ্রের বিরুদ্ধে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ও স্বাস্থ্যহীনতার বিরুদ্ধে।

॥ জাতীয় শিক্ষার পটভূমি ॥

দেশকে গড়ে তোলবার আয়োজন শুরু হ'ল সর্বদিকে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞে প্রথমেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক রূপে দেখা দিল। পূর্বতন শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষার একটা আয়োজন ছিল—এছাড়া বৃত্তিশিক্ষার যে সামান্য ব্যবস্থা ছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ও এসব ভদ্রলোকের বৃত্তি (চিকিৎসা, আইন, ইঞ্জিনীয়ারিং) জনসাধারণের নাগালের বাইরে ছিল। দেশের পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি সর্বদিকে উন্নতি করতে হলে পরিকল্পিত ভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য কি করে কাজ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হ'ল। পরিকল্পনা কমিশন গঠনের পর আমরা পরপর চারটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া রচনা করছি। প্রতিটি পরিকল্পনায় দেখা যাচ্ছে জাতি গঠনের কাজে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। নীতিগতভাবে শিক্ষার প্রসার ও উন্নততর শিক্ষার প্রয়োজনকে মেনে নিলেও একথা স্বীকার করতে বাধা নেই পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করবার সময় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হন। প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট ১৬৯ কোটি টাকা, কিন্তু খরচ করা হয় ১৩৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য ৩০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, খরচ করা হয় ২০৪ কোটি টাকা। এর সাথে কারিগরী শিক্ষার ব্যয় যোগ করলে মোট ব্যয় হয়েছে ২৭৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয় ৪০৮ কোটি টাকা এর সাথে কারিগরী শিক্ষার ব্যয় ধরলে হবে ৫৩৮ কোটি টাকা। চীন আক্রমণের ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছিল কিন্তু অবস্থা উন্নতির সাথে বরাদ্দ আবার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা শেষে যে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার সর্বদিক মিলিয়ে মোট ৫৯৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তা যে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য একথা সবাই স্বীকার করেন কিন্তু কি করে

এই অবস্থার উন্নতি হয় তা কেউ বলেন নি। শিক্ষা বিভাগ শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেন অর্থ তার চেয়ে অনেক কম।

॥ জাতীয় শিক্ষার কার্যক্রম ॥

১৯৫১ সালে প্রথম পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন দোষ ত্রুটি দূর করে তাকে জাতীয় জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় নিম্ন কার্যসূচী গ্রহণের সুপারিশ করেন।

॥ ১ ॥ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

॥ ২ ॥ বুনিয়াদী শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার অধিকতর সুযোগ দিতে হবে।

॥ ৩ ॥ পল্লী অঞ্চলের জন্য বিশেষ ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এবং উচ্চতর ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য সুযোগ দিতে হবে। গবেষণার জন্যও ব্যবস্থা থাকবে।

॥ ৪ ॥ স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ ৫ ॥ শিক্ষকদের বেতনের হার ও চাকুরীর শর্ত উন্নত করতে হবে ও তাঁদের শিক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে।

॥ ৬ ॥ বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ ৭ ॥ অনগ্রসর রাজ্যসমূহে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ অর্থ মঞ্জুর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৫৪ খ্রীঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষার এক খসড়া পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনায় দেশের শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে বলা হয় :—

১। জনশিক্ষা প্রসারের দ্রুত ব্যবস্থা করে অশিক্ষিতের হার কমিয়ে আনা হবে। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করা হবে সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাকে একটা উন্নততর সুগঠিত রূপ দেওয়া হবে।

২। শিক্ষার সর্ব বিভাগে মেধাবী ছাত্রদের সুযোগ দেওয়া হবে এজন্য আর্থিক সাহায্য-বৃত্তি প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ বৃত্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৩। ট্রেনিং ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে দক্ষ বিজ্ঞানী, কুশলী কারিগর পর্যাপ্ত সংখ্যায় সৃষ্টি করা হবে।

৪। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে হবে ও সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সেখানে থাকবে। জাতীয় গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে জাতীয় প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে গবেষণার কাজ করতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করে জাতি গঠনের পক্ষে যে শিক্ষা সর্বাপেক্ষা সহায়ক হবে ও যাতে দেশ থেকে নিরক্ষরের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব হবে সেদিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু নীতি ও কাজের মধ্যে তাঁরা সামঞ্জস্য রাখবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে জাতীয় শিক্ষার খসড়া পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ ১০৮০ কোটি টাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। পরে দাবীর পরিমাণ কমিয়ে ৬৫০ কোটি টাকা করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন বরাদ্দ কমিয়ে ৩০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল খরচ হয়েছে ২০৪ কোটি টাকা। এর সাথে কারিগরী শিক্ষার ব্যয় ও সাংস্কৃতিক ব্যয় ধরলে দাঁড়ায় ২৭৭ কোটি টাকা। সত্যিকারের প্রয়োজন যেখানে ১০৮০ কোটি, খরচ করা হ'ল সেখানে ২৭৭ কেটি।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ৪০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ৩৭ কোটি টাকা ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণমূলক পরিকল্পনা থেকে ৫২ কোটি টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে বলে স্থির হয়। এছাড়া কারিগরী শিক্ষার জন্য ১৩০ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষা ও মাধ্যমিক স্তরে উচ্চতর ও বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তর করে যাতে ছাত্রেরা মাধ্যমিক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে সেই আয়োজন করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিকল্পনা রচয়িতারা আশা করেছিলেন যে পরিকল্পনার শেষে ৬—১১ বছর বয়স্ক স্কুলগামী ছেলেদের মধ্যে সকলেই স্কুলে যাবার সুযোগ পাবে। আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছিল সংবিধান কার্যকরী হবার ১০ বছরের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছরের সব ছেলে-মেয়ের জন্য বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের কথা বাদ দিয়ে ৬—১১ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা আজও সম্ভব হয় নি। মনে হয় পরিকল্পনা রচয়িতারা প্রাথমিক শিক্ষার বা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রশ্নে যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য গণশিক্ষার ব্যবস্থা অপরিহার্য একথা জেনেও প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে দেবার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের সাথেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রশ্নটি জড়িত তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইজন্য তুলনামূলক ভাবে ব্যয় না বাড়ানো হওয়ায় পরিকল্পনা রচয়িতারা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতির ব্যর্থতাই ঘোষিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এ ভুল সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার খাতে ব্যয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার থেকে প্রায় আড়াইগুণ বেশী করে দিয়ে তৃতীয়

পরিকল্পনায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজ পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে যাওয়া হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করবার জন্য ও বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণ করতে গিয়ে শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে সে আভাষ দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ১৯৭৬ খ্রীঃ মধ্যে ভারতের ১১—১৪ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে।

॥ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ॥

তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হবার পূর্বেই চতুর্থ পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়। পরপর তিনটি পরিকল্পনার পর দেশের যে উন্নতি আশা করা গিয়েছিল তা না হওয়ায় চতুর্থ পরিকল্পনার পূর্বে সমস্ত অবস্থাকে পর্যালোচনা করে নতুনভাবে পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা করবার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এর পর চতুর্থ পরিকল্পনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে গত বছর (১৯৬৯—৭০) থেকে পরিকল্পনার কাজ শুরু হবার কথা কিন্তু খসড়া পরিকল্পনাকে আজও চূড়ান্তরূপ দেওয়া হয় নি।

চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রথম শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য মোট ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। পরে প্রয়োজন ভিত্তিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিকল্পনা রচনার কথা হলে সমগ্র পরিকল্পনাকেই ঢেলে সাজান হয়। নতুন খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় ৮০৯ কোটি টাকা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করবে ২৫৯ কোটি টাকা ও রাজ্যসমূহ ৫৫০ কোটি টাকা। এই ৮০৯ কোটি টাকার মধ্যে ছাত্রদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বেতন ও বেসরকারী দান ধরা হয় নি। সেদিক থেকে আশা করা যায় ১৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। এছাড়া আশা করা যায় শিক্ষা সেস (*education cess*) স্থানীয় দান এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ উন্নয়ন তহবিল (*Development fund*) থেকেও টাকা পাওয়া যাবে।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে শিক্ষার প্রসার যে ভাবে হচ্ছিল তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যবর্তীকালে একটা স্থিতাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অগ্রগতি বন্ধ হয়ে এই তিন বছরে শিক্ষার কোন দিকেই কোন উন্নতি হয় নি। পরিকল্পনা রচয়িতারা চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্থির হয়েছে প্রতি গ্রামে হাঁটা পথের মধ্যে (*within easy walking distance*) প্রাথমিক ও মিডল স্কুল থাকবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে যাতে ৫-৬ বছরের প্রতিটি ছেলে মেয়ে বিদ্যালয়েয়র প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু'বেলা *double shift* ক্লাস হবে ও মিডল স্কুলে আংশিক স্কুল (*part time School*) হবে। যারা সারাক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ে আসতে পারবে না তাদের জন্য আংশিক সময় স্কুল হবে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বিশেষ ভাবে অনগ্রসর অঞ্চলে প্রসারিত করবার ব্যবস্থা করা হবে। মিডল স্কুলে তৃতীয় স্তর থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির চেষ্টা করা হবে।

কর্মে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বৃত্তিমুখীন শিক্ষার (*work experience and vocalisation*) ব্যবস্থা, স্কুল জোট (*School complex*) প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার পূনর্গঠন করা হবে।

যেখানে সম্ভব নতুন শিক্ষা কাঠামো (*new pattern*) অর্থাৎ দশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, দুই বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ও তিন বছরের ডিগ্রীকোর্স (১০+২+৩) শিক্ষার প্রবর্তন করা হবে।

ত্রিভাষা পরিকল্পনা (*3-Language plan*) কার্যকরী করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হবে।

পাঠ্য পুস্তকের মান উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় স্কুল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠন করা হবে।

জাতীয় সংহতির জন্য বিশেষ কার্যস্থচী গ্রহণ করা হবে। *N.C.C.* তে যোগ দেওয়া ঐচ্ছিক হবে তার জায়গা পুরণ করবার জন্য খেলা ধূলা ও সমাজ সেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য রাজ্যস্তরে বোর্ড গঠিত হবে, *National Council of Education Research and Training* এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে রাজ্যস্তরে পরিচালনা ও পরামর্শ ও শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হবে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। জেলাস্তরে শিক্ষা প্রশাসনকে পুনর্গঠন করে শক্তিশালী করা হবে। সিনিয়র অফিসারদের শিক্ষার জন্য *National Staff College* প্রতিষ্ঠা করা হবে।

পরিকল্পনার রূপায়ণে সমগ্র কার্যস্থচীকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। কতকগুলি কার্যস্থচী রচনা ও রূপায়ণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন। কেন্দ্র থেকে এজন্য অর্থ সাহায্য করা হয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্মস্থচী কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ রচনা করেন ও রাজ্যের মাধ্যমে ওই কর্মস্থচীকে রূপ দেওয়া হয়। কতকগুলি কর্মস্থচী রচনাও বাস্তবে রূপ দেবার দায়িত্ব পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন। এই তিন প্রকার কর্মস্থচী রচনায় সব সময় দৃষ্টি রাখা হয় যেন শিক্ষা কর্মস্থচী অন্যস্তর বা বিভাগের কর্মস্থচী রূপায়ণের সহায়ক ও পরিপূরক হয়। শিক্ষা সম্পর্কীয় কর্মস্থচী রচনা ও রূপায়ণে কেন্দ্রে ও রাজ্যের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভাগাভাগি করে নেয়। রাজ্য সরকারসমূহ যতটা সম্ভব অর্থ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সংগ্রহ করেন। বাকী অর্থ কেন্দ্র থেকে সাহায্য করা হয়। শিক্ষা যদিও রাজ্যের বিষয় তবুও শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণও এজন্য অর্থের সংস্থান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় ১৭০ কোটি টাকা শিক্ষা খাতে খরচ হবে বলে স্থির হয়েছিল। এর মধ্যে ৪৪ কোটি কেন্দ্রীয় ও ১২৬ কোটি রাজ্যসমূহ থেকে খরচ করা হবে বলে স্থির হয়। কার্যতঃ ১৫৩ কোটি টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে কেন্দ্রের তরফ থেকে ৩২ কোটি ও রাজ্যগুলির ১২১ কোটি টাকা

খরচ হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্থির হয়েছিল ৩০৭ কোটি টাকা খরচ হবে, পরে এই বরাদ্দ কমিয়ে ২৭৭ কোটি টাকা করা হয়। এর মধ্যে অবশ্য কারিগরী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যসূচীর খরচ ধরা হয়েছে। এই টাকা সাধারণ শিক্ষা বাবদ কেন্দ্র থেকে ৩৮ কোটি টাকা রাজ্য থেকে ১৫৮ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় সাহায্য ৫৭'৭১ কোটি টাকা সহ) খরচ করা হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের জন্য কেন্দ্র থেকে আট কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে 'শিক্ষা' রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত হলেও কেন্দ্র ও রাজ্য সমভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব পালন করছে।

॥ পরিকল্পনাকালে শিক্ষার বিভিন্ন দিকে অগ্রগতি ॥

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

দেশ স্বাধীন হবার সময় এদেশে ৬—১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন বিদ্যালয়ে যেত। এর মধ্যে শতকরা ৬০ জন চতুর্থ শ্রেণীতে পৌঁছাবার পূর্বেই লেখাপড়ার সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিত। আর বাকী ৪০ জনের মধ্যে ৩৫ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছাত। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হ'ত তার অর্ধেকেরও বেশী অপব্যয় হ'ত। কি করে ভারতের প্রতিটি ছেলেমেয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় সে সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৯৪৮ খ্রীঃ প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীগণ সর্বপ্রথম এক সম্মেলনে সমবেত হন। সার্জেণ্ট রিপোর্টে বলা হয়েছিল সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনে ৪০ বছর সময় লাগবে। শিক্ষামন্ত্রীগণ বলেন এ সময় অত্যন্ত দীর্ঘ। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য এতদিন দেরী করা চলবে না। খে'র কমিটি ৪০ বছর সময় কমিয়ে ১৬ বছরের মধ্যে সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা হবে বলে মত প্রকাশ করেন। সংবিধান রচয়িতারা এ সময়কে আরও কমিয়ে ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এই নির্দেশ দেন। এই পটভূমিকায় পরিকল্পনা কমিশন যখন শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন তখন দেখা গেল প্রথম পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাত্র ৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বরাদ্দ টাকাও খরচ করা হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ হ'ল মোট ৮৫ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনা শেষ হবার পর ১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ দেখা যায় ৫—১১ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৫১% প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ অন্যান্য শিক্ষার তুলনায় আনুপাতিক হারে কমিয়ে ৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, খরচ করা হয় ৮৭ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ৫—১১ বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ৬২'৭% স্কুলে শিক্ষার সুযোগ পায়। শেষে যখন দেখা গেল আমরা শাসনতন্ত্রের নির্দেশ পালন করতে সক্ষম হই নি তখন প্রাথমিক শিক্ষার উপর আরও বেশী গুরুত্ব আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ বাড়িয়ে ২০৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। পরিকল্পনা রচয়িতারা

আশা করেছিলেন এই পরিকল্পনা শেষে ৬—১১ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এ আশা মেয়েদের ক্ষেত্রে পূর্ণ হতে অনেক দেরী, ছেলেদের ক্ষেত্রেও পূর্ণ হতে আরও দু'একটি পরিকল্পনার দরকার হবে।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বাধা ॥

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে, অর্থাভাব, অপচয় ও অনুন্নয়ন। শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করলেই যদি আমাদের কর্তব্য শেষ হ'ল বলে মনে করা হয় তাহলে দেশ থেকে কোন দিনই নিরক্ষরতা দূর হবে না। পরিকল্পনা কমিশনের মতে অপচয় রোধ করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। অনুন্নয়ন রোধ করতে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের, যাতে শিক্ষার মান উন্নত হয়। মেয়েদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল মেয়েদের জন্য ভিন্ন স্কুল খোলা যেখানে সম্ভব সেখানে ভিন্ন স্কুল খুলতে হবে; যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এ ব্যবস্থা করার পরও মেয়েদের শিক্ষার হার খুব বাড়েনি।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অর্থের অভাব। আশা করা গিয়েছিল দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকার চির অবহেলিত জনশিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থের ব্যবস্থা করবেন। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হচ্ছে না। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা সচিবগণ মিলিত হয়ে তৃতীয় পরিকল্পনা চালু হবার কিছুদিন বাদে শিক্ষা খাতে অর্থ ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে তাঁরা এক প্রস্তাবে পরিকল্পনা কমিশনকে জানান যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেশে যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে তার সাথে তাল রেখে চলতে গেলে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ ছাঁটাই করা চলবে না, বরং পরিমাণ বাড়াতে হবে, না হলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে শিক্ষার গুণগত অবনতি।

পরিকল্পনা কমিশন কোন সময়েই শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে নি; যে সামান্য অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয় হচ্ছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তার মাত্র ২৯ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। অনগ্রসর দেশে উচিত অধিকাংশ অর্থ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা। এছাড়া সংবিধানের প্রতিশ্রুতির কথাও কি করে পরিকল্পনা রচয়িতারা বিস্মৃত হলেন তা বোঝা কঠিন। সংবিধানের নির্দেশ সরকারের যদি কার্যকরী করবার ইচ্ছা থাকত তাহলে অর্থের অভাব হ'ত না। সার্জেন্ট বলেছিলেন, ইচ্ছা থাকলে শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। ভারতে শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী প্রচেষ্টার অবদান কম নয়। জাতীয় সরকার চেষ্টা করলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বেসরকারী সূত্রেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারতেন। তিনটি পরিকল্পনার স্তর আমরা অতিক্রম করে এসেছি, জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে শিক্ষার প্রসার সেভাবে হয় নি। ফলে নিরক্ষরের সংখ্যা না কমে দিন দিন বেড়েই চলেছে। 'অর্থের অভাব' এই অজুহাতে বিদেশী সরকার যেভাবে এই বিরাট দেশকে অজ্ঞতার অন্ধকারে

রেখেছিল তিনটি পরিকল্পনার পর জাতীয় সরকার তার চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা ॥

বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো বলে গ্রহণ করেছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে বলে আশা করা গিয়েছিল। তিনটি পরিকল্পনার পর হিসাব নিকাশ করলে দেখা যাবে সেক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রগতি আশাপ্রদ নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হবার সময় সারা দেশে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৩,৩৭৯টি, এই সময়ে প্রাথমিক স্তরের মোট ছাত্র সংখ্যার ১৩·১% নিম্ন বুনিয়াদীর ছাত্র ছিল। ১৯৫৬ খ্রীঃ প্রথম পরিকল্পণা শেষে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪২,৯৭১টি ও শতকরা ১৭·২% ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পেত। ১৯৬০-৬১ খ্রীঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যা হয় ১ লক্ষ ও আনুমানিক ২৩·৩% প্রাথমিক ছাত্র এ সব স্কুলে শিক্ষা লাভ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়েছে ১৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৫ কোটি টাকা।

বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালাতে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অনেক বেশী টাকা লাগে। এছাড়া উপযুক্ত শিক্ষক না পেলে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যত্র তত্র বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অথচ উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় নি, এর ফলে বহু স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে। কোঠারী কমিশন বুনিয়াদী শিক্ষা বলে শিক্ষার কোন স্তর নির্দেশ করেন নি। কমিশন বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মকেন্দ্রীকতা, উৎপাদন ও অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষার নীতিগুলি গ্রহণ করেছে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা মধ্যশিক্ষার প্রভাবে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম নির্ধারণে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, রুচি ও মানসিক প্রবণতা সবদিক বিচার করে দেখতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষারও প্রসার ঘটে। ১৯৪৮ খ্রীঃ ভারতের প্রধান রাজ্যগুলি মিলিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২,৬৯৩টি ; আট বছর বাদে ১৯৫৬ খ্রীঃ এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ২৫, ৬২৫টি অর্থাৎ ১০·২% বৃদ্ধি পায়। মিডল স্কুলের সংখ্যাও এ সময়ে বেড়ে ৮,৬৯৮ থেকে ১৬,৯৩৭টি হয়। সংখ্যাগত বৃদ্ধি হলেও গুণগত দিক থেকে নানা অভিযোগ হওয়ায় দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য মুদালিয়র কমিশন নিয়োগ করা হয়। কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করবার

প্রচেষ্টা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় থেকেই শুরু হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনা-কালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের স্থপারিশসমূহ কার্যকরী করতে যে ব্যয় হয় তার ৬৬% এককালীন সাহায্য ও ২৫% পৌনঃপৌনিক সাহায্য রাজ্যসমূহকে দেওয়া হয়। প্রথম পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ২২ কোটি ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫১ কোটি টাকা ধরা হয়। খরচ করা হয় যথাক্রমে ২০ কোটি ও ৪৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দের কারণ হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনা কালে ২৫০টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে এর সংখ্যা বেড়ে হয় ১,১৮৭টি। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১১—১৪ বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীর সংখ্যা এই পরিকল্পনা কালে ২২.৫% থেকে ৩০% হবে ও ১৪—১৭ বছরের শিক্ষার্থীর হার ১১.৭% থেকে ১৫.৬% হবে আশা করা গিয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার স্থযোগ বৃদ্ধি, পূর্ব পরিকল্পনা কালে, স্থাপিত বহুমুখী বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়ন ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে যথা সম্ভব উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরের কাজ শেষ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পঃ বাংলায় ২২৬৪টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ১১৩৭টি স্কুল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (১৯৬২—৬৩খ্রীঃ) পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ হিসাবে (১৯৬৫ খ্রীঃ) দেখা যায় ২,৫০২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চতর বিদ্যালয় ১,২৯৬টি হয়েছে। সমগ্র ভারতে ১৯৬২—৬৩ খ্রীঃ মোট ২১,৩৬৪টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫,৮৯৭টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৫,৪৬৮টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবার কথা ২৩,০০০ ও মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হবে ২ কোটি। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৪—১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র ১৫.৬% বিদ্যালয়ে যাবার স্থযোগ পেয়েছে বলে মনে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি খুব বেশী হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমরা দেখেছি মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও মেয়েদের জন্যও বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যেখানে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব নয় সেখানে ছেলেদের স্কুলে মেয়েদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার যেভাবে হচ্ছে ও এ স্তরে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তা বাড়তে দেওয়া সঙ্গত কি না সে সম্পর্কে কারও কারও মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে। একদল বলেন পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। কোন কোন দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন, কোথায়ও ১৪—১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৬০% থেকে ৭০% মাধ্যমিক শিক্ষার স্থযোগ

পাচ্ছে। আমাদের দেশে এই বয়সের মাত্র ১৫·৬% ছেলেমেয়ে (১৯৬৫—৬৬ খ্রীঃ) মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার আরও দ্রুত প্রসার প্রয়োজন।

অপর পক্ষ মনে করেন আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় আমেরিকা বা রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা সম্ভব নয়। যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পেলেই যথেষ্ট। তা না হলে চাকুরীর সংস্থান এক কঠিন সমস্যারূপে দেখা দেবে। মাধ্যমিক শিক্ষায়ও এরা নির্বাচনের ভিত্তিতে ভর্তি *Selective basis of admission* করবার পক্ষপাতী।

সরকার তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের দিকেই ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি যা হয়েছে সেই অগ্রগতি সংহত করে তারপর নতুন করে প্রসারের কথা চিন্তা করবেন বলে মনে হচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি যে হারে এতদিন হচ্ছিল সেভাবে হবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

॥ উচ্চশিক্ষা ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কারের জন্য রাধাকৃষ্ণণ কমিশন যে সব সুপারিশ করে-ছিলেন ভারত সরকার মোটামুটিভাবে সেই সুপারিশসমূহ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন পরিকল্পনায় রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের নির্দেশিত পথে ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস কমিশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রথম পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ১৫ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনা শেষে (১৯৫৫—৫৬খ্রীঃ) দেখা যায় ভারতের ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় ৭,৩৬,০৮৭ জন ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয় ৫৭ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনা শেষে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৪১টি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত টাকার ২৭ কোটি টাকা ব্যয় হয় গ্রাণ্টস কমিশনের মাধ্যমে; দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথা চালু হয়। উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের ছাত্রসংখ্যা কমাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্থির হয়েছে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন কলেজের ৮০০—১০০০ এর বেশী ছাত্র থাকতে পারবে না। এ ছাড়া গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ রাধাকৃষ্ণণ কমিশন করেছিলেন সেই অনুসারে কাজ শুরু হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ১১টি কেন্দ্রে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা কালে উচ্চ শিক্ষার জন্য মোট ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। পরিকল্পনায় উৎকর্ষ সাধনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬২টি।

১৯৬২—৬৩ খ্রীঃ ভারতের মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ১,৯৩৮টি; এক বছরের মধ্যে

(১৯৬৩—১৯৬৪) এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,১১১টি। ১৯৬৩—৬৪খ্রীঃ সারা ভারতে কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার জন।

পশ্চিম বাংলায় ১৯৬৪-৬৫ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দেখা যায় ১ লক্ষ ৫৮ হাজার জন। অর্থাৎ পঃ বাংলায় প্রতি হাজারে ৪·৫ জন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। সর্বভারতীয় মান হচ্ছে প্রতি হাজারে ২·৭ জন।

স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথার প্রবর্তন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৫৫ খ্রীঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ বিচার বিবেচনা করে দেখেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (*CABE*) জাতীয় শিক্ষার নতুন কাঠামো সম্পর্কে (১৯৫৬ খ্রীঃ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম আট বছর প্রাথমিক শিক্ষা, তারপর তিন বছর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ; এই পাঠের শেষে তিন বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করলে প্রথম ডিগ্রী দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। ডাঃ সি. ভি. দেশমুখের সভাপতিত্বে যে কমিটি স্থাপিত হয় সেই কমিটি স্থির করেন দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই যত বেশী সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথার প্রবর্তন করতে হবে। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তিত হলে পাঠক্রম পরিবর্তন, সাধারণ শিক্ষার কোর্স প্রবর্তন, কলেজের ভীড় হ্রাস, শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হারের উন্নতি সাধন, গবেষণাগারের উন্নতি, গ্রন্থাগারের উন্নতি, টিউটোরিয়াল প্রথার সুষ্ঠু সংগঠন হবে বলে আশা করা হয়েছিল। ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথার প্রবর্তন হয়েছে কিন্তু উন্নতি যা হবে আশা করা গিয়েছিল তা কতটা হয়েছে সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থবেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ের *Academic council* তিন বছরে ডিগ্রী কোর্স ব্যর্থ হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পঃ বাংলায় ২ বছরের পাস ও তিনবছরের অনার্স কোর্স চালু হবে বলে স্থির হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য যে ভীড় কলেজে হয় তার ফলে শিক্ষার মান ক্রমেই নেমে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন স্বেচ্ছায় ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে আনবার জন্য কলেজগুলিকে বলেছিল। বর্তমানে যে সব কলেজ সরকারী সাহায্য নিয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু করেছে সেখানে ৮০০ থেকে ১০০০ হাজারের বেশী ছাত্র নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কলেজে ভর্তি হওয়া একটা বিরাট সমস্যায় পরিণত হয়েছে। কলেজের সংখ্যা ১৯৪৯—৫০ খ্রীঃ ৪৮৮টি থেকে ১৯৬৩—৬৪ খ্রীঃ ২১১১টি হয়েছে। তবু বহু ছেলে ভর্তি হবার সুযোগ পায় না। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ নতুন কলেজ খুলবার পক্ষপাতী নয়। তারা *Correspondence Course, postal Education Course* ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইছেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে *Postal Coaching* ব্যবস্থা করা হবে বলে স্থির হয়েছে। ফলাফল দেখে এর ব্যাপক প্রচলন করা হবে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী *Prof.* K. *R. V. Rao* সম্প্রতি এক অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় বেতারের মাধ্যমে শিক্ষা দেবে। প্রস্তাবে অভিনবত্ব আছে কিন্তু বাস্তবে কি রূপ নেবে বলা কঠিন।

॥ নারী শিক্ষা ॥

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে নারী শিক্ষা বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও বহু প্রকার বৃত্তি শিক্ষার দ্বারা নারীদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে যে সব ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশ কল্পনার বাইরে ছিল সেখানেও নারীরা আজ কৃতিত্বের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৪৯—৫০খ্রীঃ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭,০৮,০০৭ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫০,৩৪,৭৪০ জন—প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিল ১২,৩০৬ জন, ১৯৫৮-৫৯খ্রীঃ উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী হয় ৪,৮১,০০৬ জন, মিডল স্কুলে ১৩,৬৪,১০৭ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৪,৮২,২৫৬ জন, প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬২,৬০৫ জন অর্থাৎ দশ বছরে ছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলেদের তুলনায় এ বৃদ্ধি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল না। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ জন ছেলে প্রতি শতকরা ২২ জন মেয়ে স্কুলে পড়ছিল, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ জন ছেলে প্রতি ৪৬ জন মেয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছিল। কি করে ছেলেমেয়ের শিক্ষার হারের পার্থক্য কমান যায় ও নারী-শিক্ষার প্রসার হয় সেজন্য ভারত সরকার শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের সভানেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন।

॥ নারী শিক্ষা কমিটির সুপারিশ ॥

কমিটি নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। (১) নারী শিক্ষাকে কিছুদিন পর্যন্ত একটি বিশেষ সমস্যারূপে গণ্য করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষা দ্রুত প্রসারের জন্য বিশেষভাবে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। (২) কেন্দ্রে ও রাজ্যে নারী শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য *National* ও *State Council* স্থাপন করতে হবে। (৩) নারী শিক্ষার পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য কেন্দ্রে ও রাজ্যে ভিন্ন প্রসাশনিক ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিকা সংগ্রহের জন্য বয়স্কা মেয়েদের জন্য *Condensed Course*-এর ব্যবস্থা করতে হবে। (৫) গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বই দিয়ে, উপস্থিতির জন্য বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করতে হবে ও গ্রামে যারা শিক্ষিকার কাজ করবে তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ নারী শিক্ষা প্রসারের একটি পরিকল্পনা করেন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজ্য সরকারকে এই কার্যক্রমকে রূপ দিতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ সাহায্য করেন। নিম্ন কার্যক্রমের মধ্যে থেকে রাজ্যসরকারকে একাধিক কার্যক্রম বেছে নিতে বলা হয়। (১) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিকাদের জন্য বিনা খরচে বাসস্থানের

ব্যবস্থা, (২) স্কুল মাতা নিযুক্ত করা, (৩) বয়স্কা মহিলাদের জন্য স্বল্পকালীন কোর্স প্রবর্তন, (৪) শিক্ষিকাদের ট্রেনিং গ্রহণকালে ভাতা, (৫) রিফ্রেসার কোর্স, (৬) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষিকাবৃত্তি গ্রহণের জন্য বৃত্তিদান, (৭) উপস্থিতি বৃত্তি (*Attendance Scholarships*), (৮) বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, (৯) মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ।

॥ ভক্ত বৎসলম কমিটি ॥

দ্বিতীয় তৃতীয় পরিকল্পনায় নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ অর্থের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নারী শিক্ষার প্রসারের কার্যক্রম উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করা হয়েছে। আশা করা হয়েছিল তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় আনুপাতিক হারে যে বিরাট পার্থক্য ছিল তা অনেকটা কমে যাবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ কিছুটা অগ্রসর হলেও মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না। এখনও মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলের ৮৯% স্কুল শহরাঞ্চলে। গ্রামের মেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলেদের তুলনায় অনেক পিছনে। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে মাধ্যমিক শিক্ষার (১৯৬৫-৬৬ খ্রীঃ) একশত শিক্ষার্থীর মধ্যে আনুপাতিক হার হয়েছে ৭৮·৭টি ছেলে, ২১.৩ মেয়ে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য *National Council for Women's Education* মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ভক্তবৎসলমকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন, ছাত্রীদের বই দিয়ে সাহায্য করা, মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করা, গরীব মেয়েদের ইউনিফর্ম দেওয়া, বিনা বেতনে মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা, শিক্ষিকার কাজে এগিয়ে আসবার জন্য মেয়েদের বেতন, ট্রেনিং, বাসস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে সুবিধা দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন সুপারিশ ভক্তবৎসলম কমিটি করেছে।

॥ বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা ॥

প্রথম পরিকল্পনা কালে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার জন্য ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ টাকা বেড়ে হয় ৪৮ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ বাড়িয়ে ১৩০ কোটি টাকা করা হয়েছে। দেশে শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। ছেলেদের সামনে নানারূপ বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ থাকলে অযথা তারা সাধারণ শিক্ষার জন্য ভীড় করবে না। এজন্য বৃত্তি শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন দেখা যায়। দেশ স্বাধীন হবার পর জনসাধারণের মধ্যে বৃত্তি শিক্ষার জন্য অপরিসীম আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। কল কারখানায় কুশলী কর্মীর অভাব মেটাতে প্রতি পরিকল্পনায় এই খাতে অর্থের বরাদ্দ বাড়াতে হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে আনুমানিক ৪৫,০০০ হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েট ৮০,০০০ হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষা প্রাপ্ত কুশলী কর্মীর প্রয়োজন হবে। আমাদের বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে ৪১,০০০ হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েট ও ৭৬,০০০ শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষালাভ করবে।

॥ ফলশ্রুতি ॥

অনগ্রসর দেশে সবদিকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতি সাধন করতে হলে পরিকল্পনা অপরিহার্য। আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এক এক করে চারটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে তোড়জোড় করছি। দেশ স্বাধীন হবার পর ২৫ বছর অতীত হতে চলেছে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা কোথায় ছিলাম ও কোথায় এসেছি। সংখ্যা তত্ত্বের পাণ্ডিত্য নাই এমন সাধারণ লোকও জানেন সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার যে অগ্রগতি আশা করেছিলাম অর্থের অপ্রাচুর্য ও ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার জন্য আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নি।

দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবার যে দুর্জয় সংকল্প একদিন জাতীয় নেতাদের ছিল, ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সে কথা আজ তারা বিস্মৃত হতে চলেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সংবিধানে যে নির্দেশ ছিল তা পালনে কর্তৃপক্ষ শোচনীয়রূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকার করে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে কার্পণ্য দেখিয়েছেন। ১৯১০ খ্রীঃ গোখেলের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল বাতিল হয়ে গেলে আমরা তারস্বরে বৈদেশিক সরকারের শিক্ষানীতির নিন্দা করেছি। ষাট বছর পরে স্বাধীন ভারতে আজ পর্যন্ত আমরা ৬—১১ বছরের ছেলেদের পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হই নি। ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী কলকাতায় ১ লক্ষ শিশু লেখাপড়ার কোন সুযোগ পায় না। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬—১১ বছরের ছেলেমেয়েদের ৭৩% স্কুলে যাবার সুযোগ পাবে ধরা হয়েছিল কিন্তু সে লক্ষ্যেও পৌছানো যায় নি।

পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষার জন্য অর্থ দিতে সংকোচ বোধ করেন; তারপর প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ বরাদ্দ করতে কর্তৃপক্ষের উৎসাহের অভাব যেন আরও বেশী। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ যদি অযৌক্তিকভাবে আনুপাতিক হারে কমান না হ'ত তা হলে তৃতীয় পরিকল্পনায় মনে হয় ৬—১১ বছরের আরও বেশী ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'ত। যদিও সংবিধানের নির্দেশ ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েকে পুরোপুরি শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে তবু আংশিকভাবে সেই নির্দেশ পালন সম্ভব হলেও মন্দের ভাল বলা যেত। ইংরেজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের পথে প্রধান অন্তরায় অর্থাভাব বলে আমাদের বুঝিয়েছে, স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের যখন ঠিক একই অজুহাতে আমাদের তুষ্ট করতে চান তাহলে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে তাদের কোন আন্তরিকতা আছে কি না এ সম্পর্কে দেশবাসীর মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে কিছু অর্থ বেশী বরাদ্দ করা হয়েছিল। (প্রথম পরিকল্পনায় ২০ কোটি, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮ কোটি, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮৮ কোটি)। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশমত মাধ্যমিক শিক্ষার

রূপান্তরের জন্য এই বরাদ্দ বাড়ান হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করার নেশায় কে কত অর্থ বেশী খরচ করতে পারবে তার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের সদ্ব্যবহার করেছেন। এদিক থেকে পঃ বঙ্গের স্থান সর্বাগ্রে। সারা ভারতে ১৯৬৪ খ্রীঃ মে পর্যন্ত আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় ২২,২৮৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫,৩১৫টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র পঃ বাংলার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ২,১০০টি। সারা ভারতের শতকরা হার যেখানে ২৪% পঃ বাংলার সেখানে হার হচ্ছে ৫০% বেশী। খরচের দিক থেকে পঃ বঙ্গ সরকার তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকা ব্যয় করে ফেলেছিলেন।

সংখ্যার দিক থেকে বিচার করে যদি উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির কথা বিচার করা হয় তাহলে বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যার প্রসার প্রসংশনীয়। বিশেষ করে বাংলা দেশের অগ্রগতিতে বাংলার শিক্ষা বিভাগ গৌরব বোধ করতে পারে। কিন্তু গুণগত দিক থেকে বিচার করে প্রাদেশিক শিক্ষাসচিবদের অধিকাংশের অভিমত এর উপযোগিতা সন্দেহজনক (*Proved of doubtful utility*)। যদি এই অর্থ মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যয় করা হ'ত তাহলে এই প্রতিযোগিতাকে অকুণ্ঠ প্রসংশা করা যেত। নয়নাভিরাম উচ্চতর বিদ্যালয় ভবন গ্রামে গ্রামে অনেক তৈরী হয়েছে। কিন্তু নিম্নতম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের ব্যবস্থা করা অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না।

শিক্ষকের গুণগত ও আর্থিক মানোন্নয়ন এ দু'য়েরই প্রয়োজন। শিক্ষককে বাদ দিয়ে শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয় একথা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র ও কোঠারী কমিশনের রিপোর্টে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন এ কথার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে মনে হয় না। শিক্ষার উন্নতির সাথে যখন শিক্ষকের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তখন পরিকল্পনাকারীদের শিক্ষকদের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। পরের প্রশ্নটি হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষণ। যোগ্য শিক্ষক তৈরী করতে হলে যেভাবে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রসার হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষক দরখাস্ত করে ট্রেনিং এর জন্য আসন সংগ্রহ করতে পারে না। পরবর্তী পরিকল্পনায় যদি এই দিকে দৃষ্টি না দেওয়া হয় তাহলে আমরা যে তিমিরে রয়েছি সে তিমিরেই থেকে যাব।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও মানোন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের কাজে হাত দেবার পূর্বে সে প্রস্তুতির কথা চিন্তা করা হয় নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার উপকরণের ব্যবস্থা না করে কাজে হাত দিলে বিপর্যয় হতে পারে সে সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল, "*It must be stressed that the school to be raised first to the Higher Secondary*

level should be carefully (selected) both in respect of equipment and staffing, otherwise there is a real danger that indiscriminate conversion at the initial stage may lower the already poor standard of Secondary Education and threaten the chance of success of the scheme. প্রস্তুতির অভাবে ফল যে খুব ভাল হয় নি সে কথা বলাই বাহুল্য। সরকারী মহলেও নতুন পর্বের কাজ চলতে চলতেই এর উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। শিক্ষার নব রূপায়ণে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে তবু মনে হয় অভিজ্ঞতার আলোকে ত্রুটি সংশোধন করবার মত খোলা মন নিয়ে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য চেষ্টা করলে দেশের শিক্ষানীতি সার্থক হতে বাধ্য। জনসাধারণের মনে সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে সংশয় দেখা দিয়েছে সেজন্য দায়ী শিক্ষা বিভাগের নীতি নির্ধারণে দোলাচল মনোবৃত্তি। সরকারী লাল ফিতার ফাঁসে শিক্ষানীতিকে বন্ধ না রেখে দেশের শিক্ষাবিদদের অভিজ্ঞ মতামত গ্রহণ করে শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে হবে। সম্প্রতি ভারত সরকার ডাঃ কোঠারীকে সভাপতি করে যে *Education Commission* গঠন করেন সেই কমিশনে ভারত ও ভারতের বাইরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের গ্রহণ করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সমস্ত স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে শিক্ষা সংস্কারের জন্য কোন কমিশন গঠিত হয় নি। বর্তমানে *Eduction Commission* কোন একটা বিশেষ স্তরের শিক্ষার বিচার বিবেচনা না করে সমগ্রভাবে দেশের শিক্ষাকে পরীক্ষা করে দেখে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। কমিশন প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করে নতুন পরিস্থিতিতে যে সব নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তাঁদের সুপারিশসমূহ সরকারের নিকট পেশ করেছেন। আশা করি নতুন কমিশন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে সব সুপারিশ করেছেন তাকে সামনে রেখেই ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হবে।

॥ পরিকল্পনাকালে পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষার প্রসার ॥

পঃ বঙ্গের সমস্যা ঃ

দেশ স্বাধীন হবার পর ভারত বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়। দ্বিধা বিভক্ত বাংলার সমস্যার রূপ সর্ব ভারতীয় সমস্যার অনুরূপ হলেও খণ্ডিত হবার জন্য ও দীর্ঘ সাম্প্রদায়িক কলহের প্রতিক্রিয়ায় নবগঠিত পঃ বাংলার সম্মুখে কতকগুলি সমস্যা জটিলতর রূপে দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসে ভীড় করায় পঃ বাংলার আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়। বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়েও পঃ বাংলা সরকার শিক্ষা প্রসারে মনোযোগী হয়। স্বাধীনতা লাভের পরেই যে সমস্ত শিক্ষা সমস্যা পঃ বাংলা সরকারের সামনে দেখা দেয় তা হচ্ছে—(১) সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (২) বয়স্কদের জন্য নিম্নতম শিক্ষা (৩) প্রাথমিক শিক্ষা-স্তরের সংস্কার (৪) বিজ্ঞান কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি (৫) সর্বস্তরের শিক্ষার

সাথে বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান। এর সাথে যুক্ত হয় লক্ষ লক্ষ নবাগত উদ্বাস্তুদের জন্য সর্ববিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার ও পরিচালনার দায়িত্ব ১৯১৯ ও ১৯৩০ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি ও অর্থাভাবের জন্য বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করে নি। দেশ স্বাধীন হবার পর অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য পাঠক্রম ও পরিচালনা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে রিপোর্ট দেবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে রাজ্য সরকার পর্যায়ক্রমে গ্রামাঞ্চলে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কার্যসূচী গ্রহণ করে। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ১৩,৯৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০,৪৪,১১১ জন। ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে হয়, ২৬,২৯০টি ও ছাত্রসংখ্যা হয় ২৪,৬৫,৪৪৫ জন। পরবর্তী দু'বছরের এর সাথে যোগ হয় প্রায় ১,৫০০ নতুন স্কুল ও নতুন ছাত্র সংখ্যা যোগ হয় ৩,৫০,০০০ জন। এই সময়ে (১৯৫৮-৫৯) প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলে ৩৫,৪৩০ জন থেকে বেড়ে ৭৫,০০৩ জন হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় এই সময়ে ১·১৫ কোটি থেকে ৬·৩৭ কোটি হয়। পরবর্তী দু'বছরে আরও নতুন ৩০০০ শিক্ষক নেওয়া হয়। সেই হারে প্রাথমিক শিক্ষার খরচও বেড়ে যায়।

সর্বশেষ হিসাবে (১৯৬৪-৬৫) দেখা যায় পঃ বাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৩৪,৪১৩টি; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হয়েছে ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার ও শিক্ষকের সংখ্যা ৯৮,৩০৬ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অনেক পরিবর্তন সাধন করে অনেকটা কর্মমুখীন করা হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষাক্রমের পরিবেশ পরিচিতি, উদ্যান রচনা, হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যথা-সম্ভব পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। সুন্দর চিত্র শোভিত ছবি ও ছড়ার বই নীচের শ্রেণীতে ব্যবহার করা হয়। শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী, বাংলা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করা হয়েছে। দামে সস্তা হওয়ায় অভিভাবকদের বই কিনতে খুব অসুবিধা হয় না। যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে সেখানে বিনামূল্যে বই দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ছিল ৫৪টি; এতে বছরে ১৩৬৪ জন শিক্ষক শিক্ষা নিতে পারতেন। ১৯৬০-৬১ খ্রীঃ শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় হয় ৭০টি, ছাত্র ভর্তি হতে পারে বছরে ৪৮৪০ জন। পঃ বাংলায় বৃহৎ সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষকের প্রয়োজনের তুলনায় ট্রেনিং স্কুলের সংখ্যা যে খুবই কম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা ॥

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষারই আর একটি দিক। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি আমরা জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি বলে গ্রহণ করেছি। পঃ বাংলায় বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার খুব হয় নি। চিরাচরিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রমের কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে বুনিয়াদী শিক্ষা কিছুটা প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষায় গ্রহণের চেষ্টা হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যয় সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় থেকে অনেক বেশী। তারপর উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক না হলে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্তও ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ পঃ বাংলায় একটিও বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছিল না, ১৯৬০-৬১ খ্রীঃ পঃ বাংলায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়, ১,৪৯০টি ও ছাত্রসংখ্যা ১,৫৬,০০০ জন।

গ্রামাঞ্চলের নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে কৃষি কর্মের জন্য সাধারণতঃ ছয় বিঘা জমি দেওয়া হয়। স্কুল বাড়ী করতে খরচ হয় ৯,০০০ থেকে, ১২,০০০ টাকা। স্থানীয় জনসাধারণ এই ব্যয়ের ১২½% খরচ বহন করে; যতটা সম্ভব মুক্ত আকাশের নীচে ক্লাস করতে উৎসাহিত করা হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয় ভবনে প্রাতে নিম্ন-বুনিয়াদী, দুপুরে উচ্চ-বুনিয়াদী বা জুনিয়র হাই স্কুল বিকেলে মেয়েদের সামাজিক শিক্ষা ও মিলন কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয় ভবনসমূহ গ্রামের শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রকার সমাজ কল্যাণমূলক কাজের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য জুনিয়র টিচার্স ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ৩১টি এবং সিনিয়র ট্রেনিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১টি। এখানে ২১০ জন স্নাতক শিক্ষা পেতে পারেন।

প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও আমাদের সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে যা করা উচিত ছিল তা করতে পারি নি। পঃ বাংলায় সামান্য অংশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। ৬—১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা আগামী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী যুক্ত বিদ্যালয়গুলিকেই মাধ্যমিক বিদ্যালয় বলা হ'ত। এ ছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণী যুক্ত মাইনর স্কুল ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কিছুদিন পর্যন্ত পূর্ব অবস্থা চলতে থাকে। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন রূপায়ণ শুরু হয়। রাজ্য সরকার স্থির করেছেন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কাল পাঁচ বছর কাল স্থায়ী হবে। পরবর্তী স্তরে জুনিয়র হাই বা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল তিন বছর হবে। পরবর্তী সর্বশেষ স্তরে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কাল হবে তিন বছর। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো ধীরে ধীরে পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে চলেছে। দশম শ্রেণীযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে

একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করতে প্রচুর অর্থ ও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন। সারা ভারতের বাংলা দেশেই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্বাধিক। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর নিম্ন কাজগুলি করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড (১৯৫১) গঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়েছে।

(১) গ্রাম অঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে।

(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হার পরিবর্তিত হয়েছে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর ব্যয়ভার সরকার সম্পূর্ণ বহন করছে। শিক্ষণকালে শিক্ষকেরা পূর্ণ বেতন পাচ্ছেন।

(৪) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকদের বাসগৃহের ব্যবস্থা করতে না পারলে বিশেষ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এই সুবিধা শুধুমাত্র বি. টি. শিক্ষকরাই পেয়ে থাকেন।

উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ের ঘাটতি পূরণের দায় সরকার গ্রহণ করেছে। অবশ্য আর্থিক অনটনের জন্য ১৯৬৩ খ্রীঃ থেকে নতুন স্কুলগুলিকে এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। তাদের লাম্প গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয়।

পঃ বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের চিত্রটি নিম্ন সংখ্যা থেকে বোঝা যাবে: ১৯৪৭—৪৮ খ্রীঃ ১৯২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫,২২,৫০০ ছাত্র ছিল। ১৯৫৯-৬০ খ্রীঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ৪,০৭৯টি ও ছাত্র সংখ্যা হয় ৮,০৯,২০০ জন। এর মধ্যে অবশ্য উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হচ্ছে ৫৮৫টি, সিনিয়র বেসিক স্কুল ১৭২টি।

১৯৬৪-৬৫ হিসাবে পঃ বাংলায় উচ্চতর, ও উচ্চ জুনিয়র হাইস্কুলের সংখ্যা হচ্ছে মোট ৪,৯৮৪টি। ঐ সময় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে ১২ লক্ষের বেশী। এর মধ্যে ৩ ৩২ লক্ষ ছাত্রী। পঃ বঙ্গের মোট ২৫০২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (উচ্চ ও উচ্চতর মিলিয়ে) মধ্যে ১২৯৬টি উচ্চতরে উন্নীত হয়েছে (১৯৬৩-৬৪)। সারা ভারতে যেখানে শতকরা ২৪টি স্কুল উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে পঃ বাংলায় সেখানে শতকরা ৫০টির বেশী মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে বাংলার সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হবে। রাজ্য সরকার নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করায় ১৯৭৩ খ্রীঃ থেকে আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। স্কুলগুলিকে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে।

॥ উচ্চশিক্ষা ॥

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের সাথে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ পঃ বাংলায় মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে পঃ বাংলায় ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, (কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত) কল্যাণী, বর্ধমান, নর্থ বেঙ্গল, রবীন্দ্র ভারতী। সাধারণ

শিক্ষা ছাড়াও এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সেই বিষয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার বিভিন্ন দিকের উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হচ্ছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা ও জীববিদ্যা (*Biology*) শিক্ষণ শিক্ষার বিশেষ সুযোগ থাকবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বাংলার সর্বত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হলেও সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কারিগরী শিক্ষা এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুবিধা থাকলে অযথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ সৃষ্টি হবে না। এই ধারণা থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলায় এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশা করেন এক জায়গায় অতিরিক্ত ভীড় না হলে শিক্ষার মান উন্নত হবে, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক নিকটতর হবে, ছাত্রদের উন্নততর গবেষণার সুযোগ মিলবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমাবার যে উদ্দেশ্য সরকারের ছিল তা সার্থক হয় নি। ১৯৬৪-৬৫ খ্রীঃ কল্যাণীর পশু ও কৃষি বিদ্যার কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪০০ জন, এছাড়া কল্যাণীর শিক্ষক-শিক্ষণ, অনার্স ও বিজ্ঞান বিভাগে ৩০০ জন ছাত্র ছিল। এই সময় রবীন্দ্র ভারতীতে ছাত্র ছাত্রী মিলিয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০০ জন। (বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজী, *Economics*, *Political Science* প্রভৃতি বিষয়ে পড়ান হচ্ছে, ছাত্র সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে) নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উত্তর বাংলার কলেজগুলিকে সঁপে দেওয়া হয়েছে। এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের পরেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা লক্ষাধিক ও প্রতি বছরই ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

বাংলায় ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫টি, এর মধ্যে ৪১টি ছেলেদের এবং ১৪টি মেয়েদের কলেজ। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে কলেজের সংখ্যা হয় ১২৫টি, মেয়েদের ২৯টি। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সংখ্যার সাথে ২৫টি কলেজ যুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও অনেক বেড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,২০,৩৩১ জন। এর মধ্যে ৪১,৬৩৩ জন শিক্ষার্থী বিজ্ঞান নিয়ে পড়ত। ১৯৬৪-৬৫ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে মোট কলেজ শিক্ষার্থীর শতকরা ৫০ জন বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে বলে আশা করা যায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে পঃ বাংলায় ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স প্রথার প্রবর্তন হয়। পরিকল্পনা শেষে সরকার ৯৪টি কলেজকে নতুন ডিগ্রী কোর্স খুলতে আর্থিক সাহায্য দেয়। বর্তমানে বাংলার সর্বত্র তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথা চালু হয়েছে। স্কুল ফাইন্যাল ছাত্রদের জন্য এক বছরের প্রি-ইউনিভারসিটি কোর্সের ব্যবস্থাও কলেজগুলিতে আছে।

কলকাতার মত ঘন বসতিপূর্ণ শহরে ছাত্রদের পড়ার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কলেজে অত্যাধিক ভীড়। বাড়ীতে স্থানের অভাব। ছাত্রদের এই

অসুবিধা দূর করবার জন্য সরকার কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য *Day Students Home* স্থাপন করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই *Home* থেকে ছাত্রদের পড়ার বই ও আনুষঙ্গিক বই (*reference book*) দেওয়া হয়। এখানে কোন প্রবেশ মূল্য লাগে না, ছাত্ররা অল্পমূল্যে এখান থেকে দুপুরের খাবার পেতে পারে। ইউ. জি. সি. এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে কয়েকটি কলেজে *Students Home* এর কেন্দ্র স্থাপন করেছে। তবে ইউ. জি. সি-র কেন্দ্রগুলিতে অল্পমূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নেই।

ইউ. জি. সি-র আর্থিক সাহায্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমার মধ্যে *Industrial Estate*-এর একটি পরিকল্পনা চালু হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি চালু করতে ৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। পরিকল্পনা কার্যকরী হলে ছাত্ররা শিক্ষাকালীন সময়ে রোজগার করতে সমর্থ হবে।

ছোট ছোট কলেজের আর্থিক সমস্যা মেটাবার জন্য পঃ বঙ্গ সরকার এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার *Sponsored basis*-এ কতকগুলি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে ও পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কলেজকে এই ব্যবস্থাধীনে এনে আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত করেছে। *Sponsored* কলেজগুলির পম্পূর্ণ ঘাটতির দায়-দায়িত্ব সরকার থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়।

বর্তমানে পঃ বাংলার উচ্চ শিক্ষার প্রধান ,সমস্যা হচ্ছে কলকাতার কলেজগুলিতে ছাত্রদের অত্যধিক ভীড়। তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স শুরু হবার পর কলকাতার বড় বড় কলেজগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা কমান হয়েছে। নতুন যে কয়টি কলেজ কলকাতায় হয়েছে তা দিয়ে ক্রমবর্ধমান স্থানের দাবী মেটান সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয় বিভাগে পাস করা ছাত্রদের ভর্তি হওয়া এক বিরাট সমস্যা। এদিকে বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই যে শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার কলেজে ভীড় না করে অন্যদিকে যাবে। শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে কলেজ খুলে গ্রামের ছেলেদের কলকাতায় আসা রোধ করবার চেষ্টা সরকার করছে। কিন্তু গ্রামের বা কলকাতার বাইরের শহরের অধিকাংশ কলেজে এখনও অনার্স নিয়ে পড়বার সুযোগ নেই। যোগ্য অধ্যাপকের অভাবে কলেজগুলি অনার্স বিভাগ খুলতে পারছে না। বিকল্প কোন ব্যবস্থা না করে উচ্চ-শিক্ষাভিলাষী ছাত্রদের উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে তার ফল ভাল হবে না। ভারত সরকার বিকল্প ব্যবস্থারূপে ডাক যোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিয়েছে। এ ব্যবস্থা আজও চালু হয় নি, হলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সময় লাগবে। তাই কলেজের সংখ্যা না বাড়ালে এ সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। উচ্চ শিক্ষার সর্বভারতীয় অবস্থা বিচার করলে বাংলা দেশের অবস্থা খুব খারাপ নয়। সারা ভারতে প্রতি হাজারে ২.৭ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। পঃ বাংলায় সেখানে হাজারে ৪.৫ জন সে সুযোগ পাচ্ছে। এই হার কেরলের থেকেও উচ্চ। কেরলে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশী কিন্তু সেখানেও হাজারে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় ৩৮ জন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পঃ বাংলার উচ্চ শিক্ষিতের হার নিন্দনীয় নয়, একথা স্বীকার্য। কিন্তু যে কোন প্রগতিশীল দেশের তুলনায় আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কত পিছিয়ে আছি তা পশ্চিম বাংলার উচ্চ শিক্ষিতের হার দেখলেই বোঝা যায়।

॥ পঃ বাংলায় শিক্ষা ব্যয় ॥

পঃ বাংলায় শিক্ষার জন্য ব্যয় ভারতের অন্য রাজ্য থেকে বেশী হয় বলেই পঃ বঙ্গ সরকার দাবী করেন। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৭ খ্রীঃ শিক্ষার জন্য ব্যয় ধার্য্য হয়েছিল ৯.০৩ কোটি টাকা অর্থাৎ সমগ্র রাজস্বের ৭%। সেখানে পঃ বাংলায় বর্তমানে শিক্ষার জন্য খরচ হচ্ছে মোট ৩০.৯২ কোটি। অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের রাজস্বের ২০% শিক্ষার জন্য খরচ করা হয়। সংখ্যার দিক থেকে শিক্ষার জন্য রাজ্য সরকার যা ব্যয় করেছেন তা কম নয়। কারণ সাধারণভাবে দাবী করা হয় মোট রাজস্বের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ ও রাজ্যের বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ। পঃ বাংলা সরকার ২০ ভাগের কিছু বেশীই খরচ করছে। তাহলে আশানুরূপ শিক্ষার প্রসার বা উন্নতি হচ্ছে না কেন মাথা ভারী শাসন ব্যবস্থার যে গলদ থাকে বাংলার শিক্ষা বিভাগ সেই রোগেই ভুগছে। আমরা অনেক টাকা খরচ করি একথা ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলার কোন বাহাদুরি নেই যদি সেই টাকার অধিকাংশই অপব্যয় হয়। পঃ বাংলার মত ছোট একটি রাজ্যের জন্য ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন ছিল কি না সেকথা বিচার না করেই আমরা খরচের বিরাট একটা বোঝা কাঁধে নিয়েছি। ১৯৬৪-৬৫ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০০ ছাত্রের জন্য খরচ হয়েছে দু'বছরে ৪৯ লক্ষ টাকা। সেই বছর রবীন্দ্র ভারতীর ১০০ শিক্ষার্থীর জন্য খরচ খুব কম করা হয় নি। মাধ্যমিক শিক্ষার নব রূপায়ণে অর্থের প্রয়োজন। অর্থ খরচও করা হয়েছে। কিন্তু বণ্টন ব্যবস্থার প্রয়োজন উন্নতি অপেক্ষা তদ্বির ও ক্ষমতাবানদের চাপের কাছেই সরকার নতি স্বীকার করেছেন। এমনও বহু উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় আছে যেখানে লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু এক একটি বিভাগ থেকে ২।৩টি ছেলেকে বোর্ডের পরীক্ষার জন্য পাঠান হচ্ছে। আবার বহু বিদ্যালয়ের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার সরকারী সাহায্য পাচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা উচিত তা করা হয় নি। কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকায় ৬-১১ বছরের ছেলে-মেয়েদের ৩৫% প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ৩.২৫ লক্ষ শিশুর মধ্যে ২.১০ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে, বাকি ১.১৫ লক্ষের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। ভারতের প্রধান শহর পঃ বাংলার রাজধানীর শিক্ষার যে চিত্রটি দেওয়া হ'ল এর মধ্যে সারা পঃ বাংলার শিক্ষার বর্তমান অবস্থাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। পঃ বাংলা অনেক পিছিয়ে আছে একথা স্বীকার করে নিয়েই আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ

(কোটি টাকার হিসাবে)

বিভাগ	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
প্রাথমিক শিক্ষা	৯৩	৮৯
মাধ্যমিক শিক্ষা	২২	৫১
বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা	১৫	৫৭
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা	২৩	৪৮
সামাজিক শিক্ষা	৫	৫
প্রশাসন ও বিবিধ	১১	৫৭
মোট :—	১৬৯	৩০৭

(*Ten Years of Ereedom Ministry of Education.—New Delhi*)

প্রথম দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য সংশোধিত ব্যয়

(কোটী টাকার হিসাব)

বিভাগ	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
প্রাথমিক শিক্ষা	৮৫	৮৭
মাধ্যমিক শিক্ষা	২০	৪৮
বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা	১৪	৪৫
সামাজিক শিক্ষা, দৈহিক শিক্ষা ও যুবশিক্ষা	১৪	১০
অন্যান্য	×	১০
মোট :—	১৩৩	২০০
কারিগরী ও বৃত্তি	২০	৭৭
মোট :—	১৫৩	২৭৭

(*Review af Education in India (1947-61), Ministry of Education, —New Delhi*)

তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থ

(কোটী টাকার হিসাব)

বিভাগ	টাকা
প্রাথমিক শিক্ষা	২০৯
মাধ্যমিক শিক্ষা	৮৮
বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা	৮২
সামাজিক শিক্ষা, দৈহিক শিক্ষা যুব কল্যাণ	১২
অন্যান্য	১১

(*Review of Education in India (1947-61) Ministry of education, —New Delhi*)

তৃতীয় পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল জরুরী অবস্থার তাগিদে তার পরিবর্তন হয়। অবস্থার উন্নতি হলে বরাদ্দের আর এক দফা সংশোধিত হয়। পরিকল্পনা শেষ না হলে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয় কত হ'ল সঠিক বলা সম্ভব হবে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষার উন্নতি

	১৯৫৫-৬৬	১৯৬০-৬১
১। ৬—১১ বছর বয়সের স্কুলগামী ছেলেমেয়ের সংখ্যার শতকরা হার	৫১%	৬২·৭%
২। ১১—১৪ বছর বয়সের স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের শতকরা হার	১৯·২%	২২·৫%
৩। ১৫—১৭ বছর বয়সের শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীর শতকরা হার	৯·৪%	১১·৭%
৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৭৮,৭৬৮	৩,২৬,৮০০
৫। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	৮,৩৬০	৩৩,৮০০
৬। মিডল স্কুলের সংখ্যা	১৭,২৭০	২২,৭২৫
৭। উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যা	১,৬৪৫	৪,৫৭১
৮। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০,৬০০	১২,১২৫
৯। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৭	১,১৯৭
১০। বহুমুখী বিদ্যালয়	২৫০	১,১৮৭
১১। বিশ্ববিদ্যালয়	৩১	৩৮

১৯৬০-৬১ খ্রীঃ প্রস্তাবিত সংখ্যা ছাড়িয়ে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় মোট ৪৬টি।

(*Ten Years of Freedom Ministry of Education*)

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষার ব্যয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দ

(কোটি টাকার হিসাবে)

	তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়	চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দ
প্রাথমিক শিক্ষা	১৭৯	২১৭·৮৭
মাধ্যমিক শিক্ষা	১০৩	১২৬·২৫
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা	৮৭	১৮১·৭৬
শিক্ষক শিক্ষণ	২৩	৩৩
সামাজিক শিক্ষা	২	১০
সংস্কৃতিমূলক কর্ম	৭	১৫·০৬
টেকনিক্যাল শিক্ষা	১২৯	১২০·১০
অন্যান্য	৬৬	১০৪·৯১
মোট :—	৫৯৬	৮০৮·৯৫

[অমৃত বাজার পত্রিকা ৩০-১-৭৯]

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the development of Secondary Education in India during 3rd five year plans.
2. Discuss critically the position of University Education in W. Bengal after 3rd five year plan.
3. Discuss the development of elementary education in W. Bengal during 3rd five year plans.
4. Trace the growth of national educational movement through the instrumentality of the first five year plans of the Govt. of India. What are the new education which the plan the plan envisaged in the field of education. [B. T. 1956]
5. Discuss the development of Primary and Basic education in West Bengal since independence indicating the progress made under the successive five year plans. [B. T. 1967]

পরিশিষ্ট

শিক্ষার অগ্রগতির খতিয়ান

বিগত ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৫ খ্রীঃ ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ সারা ভারতে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কি উন্নতি লাভ করেছে তার সর্বশেষ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন স্তরে বিদ্যালয় সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও ব্যয় কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ওই তালিকা দেখলে সে সম্পর্কে একটা ধারণা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

খ্রীষ্টাব্দ	বিদ্যালয়	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষক	ব্যয়
১৯৪৬-৪৭	১,৭২,৬৬১ [২১ হাজার বালিকা বিদ্যালয় সহ]	১৩০ লক্ষ	৪,০০,০০০	×
১৯৫০-৫১	২,০১,০০০	১৮২ লক্ষ	৫,৩৭,৯১৮	৩৬ কোটি
১৯৫৫-৫৬	২,৭৮,১৩৫	২২৯ লক্ষ	৬,৯১,২৪৯	৫৩ কোটি
১৯৬০-৬১	৩,৩০,৩৯৯	২৬৬ লক্ষ	৭,৪১,৫১৫	৭৩ কোটি ৪২ লক্ষ
১৯৬৫-৬৬ [আনুমানিক হিসাব]	৪,০০,০০০ [২৫ হাজার বালিকা বিদ্যালয় সহ]	৪০০ লক্ষ [১০৮ লক্ষ ছাত্রী সহ]	১০,৫০,০০০ [২ লক্ষ শিক্ষিকা সহ]	১১২ কোটি [মেয়েদের জন্য ১০ কোটি সহ]

মাধ্যমিক শিক্ষা [মিডল ও জুনিয়র হাই]

খ্রীষ্টাব্দ	বিদ্যালয়	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষক	ব্যয়
১৯৪৫-৪৭	১২,৮৪৩	১৮,০০,০০০	৭২,৪১৩	৪ কোটি ৮০ লক্ষ
১৯৫৫-৫৬	২১,৭৩০	৩৮,০০,০০০	১,৫০,০০০	৭ কোটি ৬৯ লক্ষ
১৯৬০-৬১	৪৯,৬৬৩	১,০৬,০০,০০০	৩,৫০,০০০	১৫ কোটি ৪০ লক্ষ
১৯৬৫-৬৬ [আনুমানিক হিসাব]	৭৮,০০০ [৮ হাজার বালিকা বিদ্যালয় সহ]	১,৬০,০০,০০০	৫,২০,০০০	৬৫ কোটি ৫০ লক্ষ [মেয়েদের জন্য ৮ কোটি টাকা সহ]

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

খ্রীষ্টাব্দ	বিদ্যালয়	ছাত্র	শিক্ষক	ব্যয়
১৯৪৬-৪৭	৫,২৯৮	২১,৯৪,০০০	৮৮,৮৬২	১২ কোটি ২২ লক্ষ
১৯৬০-৬১	১৭,২৫৭	৭৫,১২,০০০	২,৯৬,৩০৫	৬৮ কোটি ৯১ লক্ষ
১৯৬৫-৬৬	২৭,০০০	১,১০,০০,০০০	৪,৪০,০০০	১০৮ কোটি টাকা।
[আনুমানিক হিসাব]				মেয়েদের জন্য ২২ কোটি সহ]

কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষা কলেজ

খ্রীষ্টাব্দ	কলেজ	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষক	ব্যয়
১৯৪৬-৪৭	৪২০	২,০০,০০০	×	৪ কোটি ৩৯ লক্ষ
১৯৬০-৬১	১০৩৯	৬,৯৯,০০০	৩৫,৫৫৪	২১ কোটি
১৯৬৫-৬৬	১৫০০	×	৫০,০০০	৩০ কোটি
[আনুমানিক] হিসাব	[মেয়েদের কলেজ ২০০]			

———

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

বিভিন্নস্তরে শিক্ষার প্রসার ও বর্তমান শিক্ষা সমস্যা, প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা, মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্য, উচ্চশিক্ষার সমস্যা, ভাষা সমস্যা ও শিক্ষার মাধ্যম

ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হলেও দেশের অতি সামান্য অংশে তার প্রয়োগ করা হয়েছিল। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতের ২২৪টি শহরে ও ১০,০১০টি গ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের প্রয়োগ হয়েছিল।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাই ছিল সবচেয়ে অবহেলিত। ১৯৪৭ খ্রীঃ দেখা যায় ৬—১১ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা স্কুলে যেত তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন ছেলেমেয়েই শিক্ষা শেষ হবার আগেই স্কুলের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিত৷ ফলে এরা চিরদিনই নিরক্ষর থেকে যেত। শক্তি ও অর্থের এই বিরাট অপচয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে একটা প্রধান অন্তরায় ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অবস্থাও অত্যন্ত অবহেলিত ছিল। বেতন কিম্বা চাকুরীর অবস্থা কোন কিছুই যোগ্য ব্যক্তিকে আকর্ষণ করবার মত ছিল না। এই শোচনীয় অবস্থাকে মেনে নিয়েই স্বাধীন ভারতের অগণিত জনসাধারণের জন্য নিম্নতম শিক্ষার আয়োজন শুরু হয়।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন নিরক্ষরতা দূরীকরণ। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নতি ও জীবনের মান উন্নয়নের ও সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন জনশিক্ষার। স্বাধীনতার পূর্বেই স্যার জন সার্জেন্ট বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করেছিলেন। সারা ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য দীর্ঘ ৪০ বছরের এক পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ খ্রীঃ সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে স্থির হয়' দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করা চলবে না। ১৬ বছরের মধ্যে এ কাজ শেষ করতে হবে। সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শাসনতন্ত্র চালু হবার ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের সব ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা সম্পর্কে পরিকল্পনা অধ্যায়ে আলোচনা-কালে আমরা দেখেছি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার যেভাবে হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। শিক্ষা বিস্তারের পথে বহু বাধা ও বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আবার সরকার নীতিগত-ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে যেভাবে মেনে নিয়েছেন শিক্ষা নীতিকে কার্যকরী করতে সে তৎপরতা দেখান নি। শাসনতন্ত্র চালু হবার পর ২২ বছর পার হতে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের নির্দেশ আমরা আংশিকভাবেও রূপ দিতে পারি নি। যে সব সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে আলোচনা করলে আমরা বর্তমান অবস্থার প্রকৃত রূপটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারব।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধা ॥

॥ ১ ॥ অর্থাভাব :—

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে শিক্ষা প্রসারের কথা উঠলেই বলা হ'ত রাজকোষে অর্থের অভাব। সর্ববিধ কাজে কি অকাজে অর্থের সংস্থান করতে অর্থমন্ত্রী কার্পণ্য করতেন

না। কিন্তু শিক্ষাখাতে অর্থের বরাদ্দের সময় দেখা যেত অর্থ মন্ত্রীর ভাণ্ডার শূন্য। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু দায়িত্ব বহন করবার মত অর্থ কোথা থেকে পাবে সে ব্যবস্থা করা হয় নি। স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে পারে নি, সরকার থেকেও অর্থের অভাব পূরণ করা হয় নি। এছাড়া ইংরেজ আমলে ভ্রান্ত শিক্ষানীতিও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে অন্তরায় ছিল। সরকার থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মৌখিক উৎসাহ দেখান হ'ত কিন্তু কার্যতঃ বিশেষ কিছু করা হ'ত না। শিক্ষার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হ'ত তার অধিকাংশ ব্যয় হ'ত উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য। ১৯০১ থেকে ১৯৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত শিক্ষার জন্য যে ব্যয় করা হয়েছে তার মাত্র ৩০% প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর অবস্থার পরিবর্তন হবে স্বাভাবিকভাবে এ আশাই করা হয়েছিল। কিন্তু সনাতন সেই অর্থের অভাবের কথাটি আজও আমরা অতিক্রম করতে পারি নি। বৃটিশ শাসনের অবসানের পরও দেখা যাচ্ছে অর্থের অভাবেই নাকি দেশে শিক্ষার প্রসার সম্ভব হচ্ছে না। কত উদ্ভট পরিকল্পনার জন্য অর্থের যোগাড় হচ্ছে, অর্থের অভাব শুধু শিক্ষার জন্য। তারপর প্রাথমিক শিক্ষার আনুপাতিক হারে ব্যয় বাড়ে নি। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ সমগ্র ভারতে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় ১৪৪·৮১ কোটি টাকা; তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় ৫৩·৭৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৩০% বেশী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয় নি। ১৯৫৯-৬০ খ্রীঃ শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় হয়েছিল ২২৫·৭২ কোটি টাকা। এই টাকার মধ্যে ৬৯·৬৩ কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৩০·৮% প্রাথমিক শিক্ষায় বরাদ্দ করা হয়েছিল। অধিকাংশ প্রগতিশীল দেশে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ মোট অর্থের ⅓ বা ½ ভাগ অর্থ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। আজও ভারতের প্রায় ⅓ গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেই। তাঁদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। মাত্র প্রাথমিক শিক্ষাকে অবলম্বন করে শিক্ষকতা করছে এমন শিক্ষকের অভাব নেই। সরকার যদি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না করতে পারেন তাহলে ভারতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমস্যার কোন দিনই সমাধান হবে না। প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব যখন সরকারের তখন প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে।

॥ ২ ॥ শিক্ষক :—

যুদ্ধোত্তর প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় স্যার জন সার্জেন্ট শিক্ষক সমস্যাকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অন্যতম প্রধান বাধা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, উপযুক্ত সংখ্যক সুযোগ্য শিক্ষক জোগাড় করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা। শিক্ষকদের 'আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হলে শিক্ষার সংস্কার অথবা প্রসার সম্ভব নয়।

শিক্ষকদের বেঁচে থাকবার মত বেতন না দিলে কোন লোকই স্বেচ্ছায় শিক্ষকতাকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করবেন না।

শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর অভাব প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা ছোট ছোট ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান বেশ নীচু। তারপর যদি শিক্ষকতা সম্পর্কে কোনরূপ ট্রেনিং না থাকে তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার মান নেমে যেতে বাধ্য। শিক্ষার মান নেমে গেছে বলে সাধারণতঃ অভিযোগ করা হয়। এর প্রতিকার করতে হলে প্রথম প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার ও শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

আমাদের দেশে এক শিক্ষক সম্বলিত স্কুলও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক সমস্যা। শতকরা ৩৯.৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। একজন শিক্ষকের উপর একসাথে চারিটি শ্রেণী পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলে সেখানে শিক্ষা যে কি হবে সহজেই অনুমেয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করতে হ'লে যত শীঘ্র সম্ভব এক শিক্ষক সম্বলিত বিদ্যালয় লোপ করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক শিক্ষক সম্বলিত স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো, তাদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি না হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হবার কোন আশাই নেই। পরবর্তী পরিকল্পনাকালে ৫—১১ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হ'লে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি উপযুক্ত সংখ্যক সুযোগ্য শিক্ষক যোগাড় করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্যের উপর পরবর্তী স্তরের শিক্ষার সার্থকতা অনেকখানি নির্ভরশীল। প্রাথমিক শিক্ষার যে কোন পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হ'লে শিক্ষার সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

॥ ৩ ॥ **অপচয়** (Wastage) :—

হার্টগ কমিটি বলেছেন যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করেছে তারাই সাক্ষরতা লাভ করেছে। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া চালিয়ে যায় না। কমিটি তদন্ত করে দেখেছেন ১৯২২—২৩ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীতে পড়ত এমন প্রতি একশ' ছেলেমেয়ের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৯ জন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে। অর্থ ও শক্তির এই বিরাট অপব্যয়কে কমিটি অপচয় বলেছেন।

যুগের পরিবর্তনের সাথে শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর জনসাধারণ শিক্ষায় আগ্রহশীল হয়েছে। তবু স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষায় যে বিরাট অপচয় হচ্ছে তা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বিরাট বাধা। ১৯৫২—৫৩ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীতে একশ' ছেলের মধ্যে তার পরের বছর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬৪ জন, তার পরের বছর তৃতীয় শ্রেণীতে ৫১ জন এবং ১৯৫৫—৫৬ খ্রীঃ দেখা গেল চতুর্থ শ্রেণীতে মাত্র ৪৩ জন টিকে আছে। এই বিরাট অপচয় রোধ করতে

না পারলে শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টা অনেকখানি ব্যাহত হবে। কম করে চার বছর না পড়লে সে নিরক্ষরই থেকে যাবে। হার্টগ কমিটির মতে "*Primary education is ineffective unless it at least produces literacy. On the average no child who has not completed a primary course of at least four years will become permanently literate.*" তাই দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৫৭ জন যারা চার বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না পড়ে বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিচ্ছে তাদের জন্য যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় হ'ত তা কারো ও কোন কল্যাণেই আসে না। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে মোট ব্যয় হয় তার অর্ধেকের বেশীই অপব্যয় হয়।

॥ ৪ ॥ **অনুন্নয়ন** (Stagnation) ঃ—

অপচয়ের একটা প্রধান কারণ অনুন্নয়ন। একই শ্রেণীতে একটি ছেলেকে বছরের পর বছর আটকে রাখাকে অনুন্নয়ন বলা হয়। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বিভিন্ন শ্রেণীতে শতকরা ৩০ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত না। বার বার ছেলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে অভিভাবক ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবে এটা স্বাভাবিক। এভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় বেড়ে যায়।

স্কুলে যায় ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে, যদি নিয়মিত স্কুলে গিয়েও বিরাট সংখ্যক ছেলেমেয়ে বছরের পর বছর ফেল করে তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থায় কোথাও গলদ আছে। জাতীয় সম্পদের এই অপচয় রোধ করবার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা অনেকখানি ব্যাহত হবে। হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার অনুন্নয়নজনিত অপচয় রোধের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন। কমিটির রিপোর্টের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় সরকারী নীতি পরিবর্তিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের বদলে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মনোন্নয়নের দিকে মনযোগী হয়। এর ফলে ১৯৩১ খ্রীঃ স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের গতি রুদ্ধ হয় কিন্তু পাসের সংখ্যার খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি।

১৯৪৭ খ্রীঃ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যে অবস্থা ছিল বর্তমানেও সে অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নতির জন্য যে সব কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত অর্থের অভাবে ও প্রশাসনিক ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য তা সম্ভব হয় নি। অনুন্নয়নের ফলে যারা লেখাপড়া ছেড়ে দেয় তারা আবার নিরক্ষরতার অন্ধকারে তলিয়ে যায়। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এই অনুন্নয়নকে রোধ করতে হবে।

॥ ৫ ॥ **পাঠক্রম** ঃ—

বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক বর্জিত যে পাঠক্রম বহুদিন পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছিল, আজও সামান্য পরিবর্তিত হয়ে সেই নীরস প্রাণহীন পাঠক্রমই প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য জগতে প্রাথমিক শিক্ষার বহুবিধ মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে

হয়েছে সেখানেও এই একই কারণে নির্বাচিত সদস্যগণ আইন ভঙ্গকারী অভিভাবকদের সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহসী হন না।

প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা ব্যবস্থায় ত্রুটি বহু ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। নিয়মিত পরিদর্শনের অভাবে স্কুল পরিচালনায় বহু গলদের সৃষ্টি হয়েছে। একজন পরিদর্শককে প্রতি বছর একশ'র বেশী স্কুল পরিদর্শন করতে হয়। বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত একশ স্কুল দেখা যে কোন পরিদর্শকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য। দুর্গম অঞ্চলের স্কুলগুলিতে বছরের পর বছর পরিদর্শনের অভাবে স্বভাবতঃই নানারূপ গলদ প্রবেশ করে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রয়োগ ও যথাযোগ্য তত্ত্বাবধানের জন্য ও স্কুলসমূহ পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শন ও পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি করা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার পূর্বাপর আলোচনায় দেখতে পাওয়া যায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় সরকারী নীতি প্রথম থেকেই ত্রুটিপূর্ণ। কোম্পানীর আমলে দেশে গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য কোম্পানীর বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। সরকার পক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে "চুঁইয়ে নামা" নীতি গ্রহণ করায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রথম থেকেই অবহেলিত হয়েছে। একদিকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি নিদারুণ অবহেলা, অপরদিকে নতুন কোন প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলার সরকারী প্রচেষ্টার অভাবে ঊনবিংশ শতকে সরকারী মনোভাবের কিছু পরিবর্তন হলেও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের নীতি সরকার গ্রহণ না করায় সীমাবদ্ধ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। হার্টগ কমিটির রিপোর্টে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তন হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের নীতি সরকার গ্রহণ করায় ১৯৩১ খ্রীঃ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের গতি রুদ্ধ করা হয়। স্বাধীন ভারতে সরকারী শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি যা থেকে মনে করা যেতে পারে সরকার দেশ থেকে অনতিবিলম্বে নিরক্ষরতা দূর করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

প্রাথমিক শিক্ষার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পরিচালনা ব্যবস্থার ত্রুটি ও সরকারী অবহেলা শিক্ষা প্রসারের দু'টি প্রধান অন্তরায়। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (বর্তমানে পঞ্চায়েত) প্রতিষ্ঠানগুলির উপর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারী নীতিকে কার্যকরী করতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা থাকা স্বাভাবিক। তবুও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় সাধারণ নীতি নির্ধারণ, শিক্ষার নিম্নতম মান নির্ধারণ, পরিদর্শনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা, আর্থিক সাহায্য, শিক্ষাবোর্ড বা পরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

॥ ৮ ॥ পরিকল্পনার প্রভাব :—

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে আর একটি বাধা বিদ্যালয় স্থাপনে সুপরিকল্পনার অভাব। স্কুল প্রতিষ্ঠায় সর্বক্ষেত্রে স্থানীয় প্রয়োজন বিচার করে কাজে হাত দেওয়া

হয় নি। এর ফলে বহু জায়গায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে স্কুল গড়ে উঠেছে। একই গ্রামে কি পাশাপাশি গ্রামে দু'টি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে, আবার যেখানে স্কুলের প্রয়োজন রয়েছে সেখানে স্কুলের অভাব মেটান হয় নি। প্রতি গ্রামেই অবশ্য স্কুল স্থাপন করা সম্ভব নয় কারণ বহুগ্রামে লোকবসতি এত কম যে স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ছাত্র জোটান সম্ভব নয়। সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্র যেভাবে স্কুলের সুবিধা পেতে পারে সেই কথা চিন্তা করে স্কুল স্থাপন করতে হবে। অনেক সময় স্কুলপ্রতিষ্ঠায় গ্রাম্য দলাদলি কি রাজনৈতিক প্রভাব সক্রিয় হয়ে ওঠে। সর্বাধিক লোকের সুবিধার কথা চিন্তা করে শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন যাতে সমস্ত এলাকার অধিবাসী তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারবেন।

॥ ৯ ॥ সামাজিক বাধা :—

আমাদের সমাজের একটা বিরাট অংশ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। একসময়ে বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকায় বহু বালিকা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হ'ত। বর্তমানে আইন করে বাল্যবিবাহ রোধ করা হয়েছে। অতীতে সামাজিক প্রতিরোধের ফলে পল্লীতে পল্লীতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয়েছে। বর্তমানে সাধারণের মনোভাব পরিবর্তনের ফলে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পথে সামাজিক আর কোন বাধা নেই। এই সামাজিক বাধার জন্য ভারতের অতি সামান্য সংখ্যক নারী (১২'৮) লিখতে পড়তে পারে।

॥ ১০ ॥ জাতিভেদ :—

হিন্দু সমাজের কঠোর জাতিভেদ প্রথা প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে একটি বিরাট অন্তরায়। অস্পৃশ্যতার জন্য তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বহুদিন পর্যন্ত অবহেলিত হয়েছে। আইন করে সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সমাজের বুক থেকে অস্পৃশ্যতা অভিশাপ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে একথা বলা যায় না। হরিজন পল্লীতে ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ ১১ ॥ অভিভাবকদের অবহেলা ও দারিদ্র্য :—

আমাদের দেশের দরিদ্র ও অশিক্ষিত অভিভাবকগণ জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। শিক্ষার যে কোন উপযোগিতা দৈনন্দিন জীবনে রয়েছে একথা তাঁরা বুঝতে চান না। শিক্ষার পাঠক্রম জীবনের সাথে সম্পর্কবিহীন বলে অবশ্য এ মনোভাব সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। এছাড়া দরিদ্র অভিভাবক মনে করেন ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর চেয়ে কোন কাজে লাগিয়ে দিলে দু'পয়সা রোজগারের সম্ভাবনা আছে। এখনও দেখা যায় চাষের সময় গ্রামের স্কুলে অনুপস্থিতির সংখ্যা বেড়ে

গিয়েছে। ছেলেরা এ সময়ে মাঠের কাজে বড়দের সাহায্য করে। মেয়েদের সংসারের কাজে অনেকখানি সহায়তা করতে হয়; একটু বড় হলেই তাই দেখা যায় অভিভাবক আর মেয়েকে স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না। বহু অভিভাবক আছেন যারা ছেলেমেয়ের বই খাতা পেন্সিলের খরচ বহন করতে পারেন না। জীবনযাত্রার মান উন্নত না হলে দরিদ্র দেশের অভিভাবক স্বেচ্ছায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবেন এ আশা সর্বত্র করা যায় না।

॥ ১২ ॥ **প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তি:—**

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা প্রধানতঃ গ্রামীণ ভারতের শিক্ষা সমস্যা। ইংরেজ যুগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে গ্রাম ছিল অবহেলিত। নানা প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে সুদূর পল্লী অঞ্চলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা খুবই অসুবিধাজনক; কোনরূপ একটা স্কুল হয়ত সুদূর পল্লী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হ'ল কিন্তু পরিদর্শনের অভাবে কিছুদিনের মধ্যেই গলদ দেখা দেয়। ভাল রাস্তা কি যানবাহনের অসুবিধার জন্য বিরল জন বসতি অঞ্চলে তিন চারটি ক্লাস নিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অসুবিধা আছে। বর্ষার সময় বহু অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সমগ্র ভারতের অরণ্য অঞ্চল হচ্ছে ২,৮০,১৫৯ মাইল অর্থাৎ সমগ্র ভৌগোলিক অঞ্চলের ২২·১১% ভাগই অরণ্য। পার্বত্য অঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলে প্রাকস্বাধীনতা যুগে শিক্ষাবিস্তারের কোন চেষ্টাই হয় নি। নর্থ ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার এজেন্সির একটি এলাকায় ৩০ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে ১৯৪৭ খ্রীঃ পূর্বে একটি স্কুলও ছিল না। সারা ভারতের পার্বত্য অঞ্চল জুড়েই এই অবস্থা বর্তমান ছিল। এখন রাস্তাঘাট অনেক হয়েছে কিন্তু প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি এখন শিক্ষা বিস্তারের পথে একটি অন্তরায়।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ ॥

প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা আলোচনায় শিক্ষা প্রসারের পথে বহু অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করা হলেও প্রধান সমস্যাসমূহ সমাধান করা খুব কঠিন হবে না। সমস্যাসমূহের মধ্যে প্রধান সমস্যাগুলি হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ সরকারী শিক্ষানীতি, প্রশাসনিক ত্রুটি, অর্থের অভাব, বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনে সরকারী ব্যর্থতা, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম, শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয় গৃহের অভাব, অভিভাবকদের উৎসাহের অভাব।

ভারত সরকারকে স্থির করতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতের ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। সমগ্র পরিকল্পনাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে রাজ্য সরকারসমূহ ধাপে ধাপে পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। যে সব সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষার পর্যালোচনায় আমরা দেখেছি তার সুষ্ঠু সমাধানের উপর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল।

॥ ১ ॥ সুনির্দিষ্ট সরকারী শিক্ষানীতি ও সুপরিচালনা—

বৃটিশ যুগে সরকারী শিক্ষানীতি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের সহায়ক হয় নি। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী অবহেলা ও ঔদাসীন্যে ধ্বংস হয়ে যায়। গণশিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকারের কোন উৎসাহ ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর আশা করা গিয়েছিল অবস্থার পরিবর্তন হবে, দেশের নেতৃবৃন্দ ও পরিকল্পনা রচয়িতারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক কথা বলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নি যা থেকে বলতে পারি গণশিক্ষা প্রসারে সরকারের কোনরূপ সদিচ্ছা আছে।

প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের। সংবিধানের নির্দেশ আংশিকভাবে পালনের যদি সরকারের ইচ্ছা থাকত তাহলে তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হ'ত না। স্থির হয়েছিল ১৯৭৫খ্রীঃ মধ্যে শাসনতন্ত্রের নির্দেশ পুরোপুরি কার্যকরী করা হবে। ১৯৬৫ খ্রীঃ ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৪০% শিক্ষার সুযোগ পাবে, চতুর্থ পরিকল্পনা শেষে ৬০% এবং পঞ্চম পরিকল্পনা শেষে ১০০% পৌঁছে যাওয়া সম্ভব বলে সরকারী শিক্ষা বিভাগ আশা করেছিল। বর্তমানে এই আশা পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। ১১ বছর পর্যন্ত ছেলেদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৮০ খ্রীঃ প্রবর্তন করা যায় কি না পরিকল্পনা রচয়িতারা সে কথা চিন্তা করছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার না হবার জন্য স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে দায়ী করা হয়। জেলা শিক্ষা বোর্ডের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এ খুবই স্বাভাবিক। সরকারকে দেখতে হবে জেলা বোর্ড কাজ করছে কি না। এর জন্য রাজ্য সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। সমগ্র রাজ্যের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হবে। রাজ্যের প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটা নিম্নতম মান নির্ধারণ করে দিতে হবে। শিক্ষা পরিষদ কি বোর্ড দেখবে সেই মান রক্ষিত হচ্ছে কি না। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে কি না তা দেখবার জন্য সরকারী শিক্ষা বিভাগ থেকে নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্য সরকারের পরিদর্শকগণ জেলা শিক্ষাবোর্ডের কাজ প্রয়োজন হলে পরিচালনা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে কার্পণ্য করবেন না।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের বর্তমান মনোভাব পরিবর্তন না হলে প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ হ'ত তাহলে ১৯৭৫ খ্রীঃ মধ্যে শাসনতন্ত্রের নির্দেশিত লক্ষ্যে পৌঁছান খুব কঠিন হ'ত না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য গণশিক্ষা

অপরিহার্য এই মনোভাব নিয়ে যদি সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করা যায় তাহলে বর্তমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে।

॥ ২ ॥ অর্থের ব্যবস্থা—

আজ দেশের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এ কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যদি প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না করেন তাহলে শিক্ষাবিভাগের শত চেষ্টায়ও শিক্ষার প্রসার সম্ভব হবে না। শিক্ষা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন হলে অর্থের অভাব হবে না। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরও বেশী অর্থের বরাদ্দ করতে হবে। স্যার জন সার্জেন্ট (বর্তমানে লর্ড) যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনায় অর্থের সংস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, ইচ্ছা থাকলে শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা খুব কঠিন হবে না। জরুরী অবস্থায় আমরা দেখেছি প্রয়োজন হলে জনসাধারণ বহু ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে। সরকার তৎপর হয়ে জনসাধারণের সহযোগিতা পাবার চেষ্টা করলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। শিক্ষাকর স্থাপনের প্রশ্নটি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। শিল্প প্রধান অঞ্চলে শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব শিল্পপতিদের গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হলে তাদের উপর বিশেষ কর ধার্য করতে হবে।

॥ ৩ ॥ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা—

দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে জাতীয় নেতৃবৃন্দের দাবী ছিল দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। স্বাধীনতা লাভের পর নেতৃবৃন্দ সে কথা ভুলে গিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করতে হলে, দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে হলে প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষাকে আইন করে বাধ্যতামূলক করা। প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে অবৈতনিক সেখানেও অভিভাবকগণ সব সময় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান না। প্রাথমিক শিক্ষা তাই অবৈতনিক হলেই হবে না, বাধ্যতামূলক করতে হবে। স্থানীয় লোকের সহযোগিতায় আইন প্রয়োগ করা হলে সুফল ফলতে বাধ্য। বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আরও বহু স্কুল খুলতে হবে, এজন্য শিক্ষক প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন; সে ব্যবস্থাও করতে হবে। বাধ্যতামূলক আইনের সংস্কার করা যেখানে প্রয়োজন সেখানে তা করতে হবে।

॥ ৪ ॥ শিক্ষক—

যে কোন রকম শিক্ষা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সুযোগ্য শিক্ষকের। একথা স্বীকার করতে বাধা নেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা যোগ্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারি নি। প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই, তারপর

শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রায় ক্ষেত্রেই নিম্নতম মানেরও নিম্নে। ১৯৫৭-৫৮ খ্রীঃ মোট শিক্ষকের মধ্যে শতকরা ৭১'২২% শিক্ষক ম্যাট্রিক পাশ করেন নি। প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র সম্বল করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে এমন শিক্ষকও এদেশে আছে। শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক সমস্যার সমাধান না হলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হবে না। অনুন্নয়ন ও তার ফলে অপচয় তাও রোধ হবে না।

উপযুক্ত লোককে শিক্ষাক্ষেত্রে আনতে হলে প্রথম প্রয়োজন বেতন বৃদ্ধি। বর্তমান যে বেতন দেওয়া হয় তা খুবই অপর্যাপ্ত। আর্থিক উন্নতি হলে সামাজিক মর্যাদাও বাড়বে। শিক্ষকতাকে যতই গৌরবময় বা সম্মানের বৃত্তি বলা হোক না কেন অর্থ না থাকলে আজকের সমাজে কোন মর্যাদা নেই। এর পর আছে চাকুরীর স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। শিক্ষকদের জন্য ট্রিপিল বেনিফিট পরিকল্পনাকে অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রাথমিক শিক্ষকের বৃত্তিগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ট্রেনিং-এর। ট্রেনিং ব্যবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। শিক্ষার প্রসার হলে শিক্ষকের চাহিদা বেড়ে যাবে, তাদের শিক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার জন্য শিক্ষক শিক্ষন বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

॥ ৫ ॥ পাঠক্রম—

প্রাথমিক শিক্ষায় যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় সে পাঠক্রমের ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনায় দেখেছি চিরাচরিত শিক্ষা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক বিরহিত। প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই এমন কিছু শেখাতে হবে যাতে ছেলেমেয়েরা পুঁথিগত বিদ্যার সাথে কর্মক্ষেত্রে সহায়ক বিদ্যাও লাভ করে। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমের সাথে বর্তমান পাঠক্রমের সমন্বয় সাধন করে পাঠক্রম রচিত হলে শিক্ষা ও কাজ দুইয়ের মিলন সাধন হবে।

॥ ৬ ॥ অভিভাবকদের সহযোগিতা—

আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক জীবনে শিক্ষার সুযোগ পান নি। জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের সজাগ করে তুলতে না পারলে শিক্ষা প্রসার ব্যাহত হবে। জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার করে জনসাধারণকে শিক্ষা সচেতন করে তুলতে হবে। জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত কোনরূপ শিক্ষা পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব সরকারের কিন্তু জনসাধারণের আগ্রহ ও উৎসাহ থাকলেই সে দায়িত্ব পালন সহজ হয়। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা থাকলে শিক্ষা প্রসারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সরকারের পক্ষে তা সংগ্রহ করাও কঠিন হয় না।

॥ ৭ ॥ বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা—

আধুনিক ভারতে শিক্ষার ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখেছি বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কি ইংরেজ সরকার ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে আগ্রহশীল ছিলেন না। দেশীয় শিক্ষাধারার বিলুপ্তি ও আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের সময়ে দেশীয় শিক্ষার অভাব পূরণ কি করে হতে পারে সে সম্পর্কে দেশের শাসনকর্তারা চিন্তা করেন নি। গণশিক্ষা সম্পর্কে সরকারী শিক্ষানীতি ছিল, উচ্চ বর্ণের মধ্যে ও শহরে শিক্ষার প্রসার হলেই তা আপনা থেকে ধীরে ধীরে চুঁইয়ে নেমে অবশেষে জন সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে (*Downward filtration theory*)। এই ভ্রান্তনীতি সম্পর্কে ১৮৩৮ খ্রীঃ এডাম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এমনভাবে আইন করা হোক যাতে গ্রামে একটি করে স্কুল থাকে। জাতীয় শিক্ষাধারাকে বাঁচিয়ে রেখে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে সরকারকে এগিয়ে আসবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এডাম তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন "...*existing native institutions from the highest to the lowest of all kinds and classes were the fittest means to be employed for raising and improving the character of the people that to employ those institutions for such purpose would be the simplest, the safest, the most popular, the most economical and the most effectual plan for giving that stimulus to the native mind which it needs on the subject of education and for eliciting the exertions of the native themselves for their improvement without which all other means must be unavailing.*"

এডামের প্রস্তাবকে গ্রহণ করা হলে জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি এতটা পিছিয়ে থাকত না। এডামের ২য় রিপোর্টে রাজশাহী জেলার নাটোর থানার বিস্তৃত শিক্ষা তথ্য দিয়ে দেখান সেই থানায় মোট শিক্ষিতের হার ছিল ৬·১%। ৩য় রিপোর্টে ৬টি থানায় তিনি অনুসন্ধান করেন তাতে দেখা যায় সেখানে মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৫·৮%। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে যে শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল তার ফলে দেখা যায় ১৯২১ খ্রীঃ সমগ্র ভারতে শিক্ষিতের হার হচ্ছে ৭·৩%।

এডামের পর ১৮৫২ খ্রীঃ বোম্বে প্রদেশের রেভিনিউ সার্ভে কমিশনার ক্যাপ্টেন উইনগেট প্রস্তাব করেন ভূমি-রাজস্বের উপর শতকরা ৫ ভাগ সেস বসিয়ে সে টাকা কৃষকদের ছেলেদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হোক। ১৮৫৮ খ্রীঃ গুজরাটের শিক্ষা পরিদর্শক প্রস্তাব করেন, কোন স্থানের অধিবাসীরা যদি কর বসিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চায় আইন করে সে ক্ষমতা তাদের দেওয়া হোক। ১৮৮৪ খ্রীঃ ব্রোচের সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক শ্রীশাস্ত্রী সুপারিশ করেছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। তৎকালীন সরকার এসব প্রস্তাব সময়োপযোগী নয় বলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কোন প্রস্তাব বিবেচনা করেন নি।

॥ ৮ ॥ বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য আন্দোলন—

১৮৭০ খ্রীঃ ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। জাতীয় চেতনাসম্পন্ন প্রগতিশীল ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দাবী জানাতে থাকেন। শিক্ষার বিস্তার না হলে রাজনৈতিক, সামাজিক,ও আর্থিক কোন দিক থেকেই জনসাধারণের কোন উন্নতি হবে না। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথম শিক্ষার প্রয়োজন। জাতীয় চেতনার জন্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য গণশিক্ষার প্রসার হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে নানা দিক থেকে গণশিক্ষার জন্য দাবী উঠতে থাকে। ১৮৮২ খ্রীঃ ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কাছে কোন কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী জানান। পরিতাপের বিষয় কমিশন তার সুদীর্ঘ রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। ১৮৮৫ খ্রীঃ ভ রতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাধ্যতামূলক গণশিক্ষার দাবী তীব্রতর হয়ে ওঠে। নব ভারতের যুগ প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় অনগ্রসরতার দিকে তাকিয়ে বলেন—"*Why does not the nation move ? 'First educate the nation···The kings are gone, where is the new nation, the new power of people ? Bring it up. therefore, even for social reforms, the first duty is to educate the people.*

(*As quoted by Dr. S. N. Mukherjee in his Education in India, to-day and to-morrow.*)

বোম্বে প্রদেশে স্যার ইব্রাহিম রহমতুল্লা ও স্যার চিমনলাল শীতলবাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। প্রাদেশিক সরকার বোম্বে শহরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা যায় কি না এই প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য ১৯০৬ খ্রীঃ একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি সিদ্ধান্ত করেন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার সময় এখনও হয় নি। বৃটিশ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রচেষ্টা এই ভাবে সহানুভূতি ও সদিচ্ছার অভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইংরেজ শাসিত ভারতে যা সম্ভব হয় নি, সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল ভারতের একটি দেশীয় রাজ্যে; বরোদার মহানুভব গাইকোয়ার মহারাজা সায়াজি রাও ১৮৯০ খ্রীঃ আকারলী তালুকে পরীক্ষামূলকভাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ সমগ্র বরোদা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

॥ গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা বিল ॥
(১৯১০ ও ১৯১১ খ্রীঃ) ঃ—

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার বিস্তার না হলে জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর পরাহত, এই সত্যটি জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করবার পর থেকেই তাঁরা

গণ শিক্ষা বিস্তারে সরকারকে অধিক তৎপর হবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। সরকারী প্রচেষ্টা মোটেই আশাপ্রদ না হওয়ায় ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মনোভাব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে মহামতি গোখেলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তিনি ১৯০৩ খ্রীঃ বলেন, অশিক্ষিত জাতি কোনদিনই কোনদিকে উন্নতি লাভ করতে পারে না। জীবনযুদ্ধে তাকে পিছিয়ে থাকতেই হবে। মাতৃভূমির উন্নতির জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষা।

॥ গোখেলের প্রথম বিল ॥

বরোদার মহারাজা তাঁর রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করায় বৃটিশ ভারতে দাবী উঠল প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হোক। এই উদ্দেশ্যে গোখেলে ১৯১০ খ্রীঃ ১৯শে মার্চ্চ রাজকীয় আইন পরিষদে একটি বেসরকারী বিল উত্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবে বলা হয়, সমগ্র দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তুতি পর্বরূপে এবং কি করে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা যায় তার উপায় নির্ধারণের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব সরকারী ও বেসরকারী সদস্য নিয়ে একটি মিশ্র কমিটি গঠন করা হোক—"*A beginning should be made in the direction of making elementary education free and compulsory throughout the country, and that a mixed commission of official and non-official be appointed at an early date to frame definite proposals.*"

এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করবার সময় তিনি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাষণে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রয়োজনীয়তা সরকারকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের ১৮৭০ খ্রীঃ শিক্ষা আইনের অনুরূপ একটি আইনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার দায়িত্ব দেওয়া হোক।

প্রথম অবস্থায় ছেলেদের শিক্ষাই বাধ্যতামূলক হবে। শুরুতে ৬ বছর থেকে ১০ বছরের ছেলেদের এই আইনের আয়ত্তাধীনে আনা হবে। মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না।

যে সব অঞ্চলের স্কুলে যাওয়ার যোগ্য ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৩৩জন স্কুলে যাচ্ছে সেখানেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা অবৈতনিক হবে। শিক্ষার ব্যয় সরকার ও স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান ভাগাভাগি করে বহন করবে। সরকার বহন করবে $\frac{2}{3}$ অংশ, স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান $\frac{1}{3}$ অংশ।

প্রস্তাবটি আলোচনাকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে সরকার থেকে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি বিশেষ সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে দেখা হবে। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করে গোখেল বিলটি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করা হয় নি। গোখেলের প্রস্তাবের

ফলে দেশে বিদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন আলোচিত হতে থাকে। ১৯১০ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেস এলাহাবাদ অধিবেশনে ও মুসলিম লীগ নাগপুর সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সহকারী ভারত সচিব বৃটিশ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন গণশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে।

॥ গোখেলের দ্বিতীয় বিল ॥

কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ না করায় গোখেল ১৯১১ খ্রীঃ ১৬ই মার্চ রাজকীয় আইন পরিষদে নতুন করে "প্রাথমিক শিক্ষা বিল" উপস্থিত করেন। বিলটি যাতে সরকারী ও বেসরকারী সমর্থন লাভ করে সেজন্য বিশেষ চিন্তা করে ধারাগুলি রচিত হয়। বিলটিতে বলা হয় যে কোন অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ছেলেমেয়ে অধ্যয়নরত থাকলে এই আইন সেখানে প্রয়োগ করা হবে। এই নির্দিষ্ট সংখ্যা কত হবে তা সপরিষদ বড়লাট স্থির করবেন।

কোন অঞ্চল ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে পূর্ব শর্তটি পূরন করবার পর সমগ্র অঞ্চলে বা আংশিকভাবে সেই অঞ্চলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে কি না স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষ তা স্থির করবে। কোন আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান যদি শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে চায় তাহলে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

এই আইন যে অঞ্চলে প্রবর্তিত হবে সেখানেও ১০ বছরের ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকগণ বাধ্য থাকবেন। মেয়েদের সম্পর্কে এই আইন ধীরে ধীরে প্রয়োগ করা হবে। যে ছাত্রের অভিভাবকের আয় মাসিক ১০.০০ টাকা বা তার কম তাদের কোন বেতন দিতে হবে না। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর দায় থেকে অব্যাহতি পাবার অনেক সুযোগ সুবিধা এই আইনে ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহকে শিক্ষাকর ধার্য্যের ক্ষমতা এই বিলে দেওয়া হয়। এই আয় ও সরকারী সাহায্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব প্রকার ব্যয় নির্বাহ করা হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। যে সব অভিভাবক তাদের ছেলেদের স্কুলে পাঠাবেন না তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য স্কুল কমিটি স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। এই বিলটির ধারাগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এই আইন প্রয়োগে যাতে বিশেষ কোন বেগ পেতে না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখেই বিলটি রচিত হয়েছিল।

বিল সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের মতামত গ্রহণ করা হয়। গোখেল বিলটির ধারাগুলি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি পাঠাবার প্রস্তাব করেন। সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। গোখেল বলেন—যে অঞ্চলে স্কুলে যাওয়ার যোগ্য বয়সের শতকরা ৩৩ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে সেখানেই এই আইন প্রয়োগ করা হোক। শিক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক হবে সেখানেই অবৈতনিক করতে হবে।

১৯১২ খ্রীঃ ১৮ই ও ১৯শে মার্চ বিলটির আলোচনা হয়। সরকারী সদস্য ও বেসরকারী জমিদার সদস্যদের বিরোধিতায় ৩৮—১৩ ভোটে বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

এই বিলের বিপক্ষে সরকার থেকে যুক্তি দেখান হয় যে, দেশের জনসাধারণ এখনও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় নি। এই বিল গ্রহণ করলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতি করাই হবে। স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিও বিলের বিরোধিতাই করেছে। তার কারণ তারা আর কোন অতিরিক্ত কর ধার্য্য করতে রাজী ছিল না। স্বেচ্ছামূলকভাবে গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথায় যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে সেখানে জোর করে শিক্ষাকে চাপাতে গেলে দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে।

বিলটি বাতিল হবে জেনেও গোখেল হতাশ হন নি, তাঁর ভাষণের শেষে উদাত্ত-কণ্ঠে বৈদেশিক শাসক সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে যা বলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেন "*My Lord, I know that my Bill will be thrown out before the day closes. I make no complaint. I shall not feel even depressed…I have alwaye felt and have often said that we the present generation in India can only hope to serve our country by our failures.*" (*As quoted by Dr. S. N. Mukherjee in History of Education in India.*)

বিলটি বাতিল হয়ে গেলেও সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভারত সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা করবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ক্রমে অবৈতনিক করাই সরকারের নীতি। এই উদ্দেশ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এককালীন ৮৪ লক্ষ টাকা ও পৌনপৌনিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করবে। প্রাদেশিক সরকার সমূহকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগী হতে নির্দেশ দেওয়া হয়। গোখেলের বিলের উপলক্ষে দেশব্যাপী যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে বাধ্য হয়। ১৯১২ খ্রীঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়। আসামে নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ে বেতন স্বেচ্ছামূলক করা হয়। উত্তর প্রদেশে ও মধ্য প্রদেশে অতি সামান্য বেতন ধার্য করা হয়। পাঞ্জাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবৈতনিক করা হয়। এইভাবে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশ ছাড়া অন্য সব প্রদেশে যারা বেতন দিতে অসমর্থ তাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। ১৯০৭ খ্রীঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ, ১৯১২ খ্রীঃ ছাত্র সংখ্যা বেড়ে হয় ৫০ লক্ষ, অর্থাৎ ছাত্র সংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের মনোভাব গোখেলের চেষ্টার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। সরকারী সদস্যদের বিরোধিতার ফলে গোখেলের বিল বাতিল হয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকারের দাবীকে আর অস্বীকার করতে

পারছিল না। এই বিলের বিরোধিতা করায় সরকারের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করবার জন্যই সম্রাট পঞ্চম জর্জ বলতে বাধ্য হন, *"The cause of education in India will even be very close to my heart."*

শিক্ষার জন্য তিনি রাজকোষ হতে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে বলে স্থির হয়। এই সময় সহকারী ভারত সচিব ভারতে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র পার্লামেণ্টে উপস্থিত করেন। নানাদিক থেকে ভারত সরকারের উপর চাপ আসতে থাকায় ভারত সরকার শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবে (১৯১৩ খ্রীঃ) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি কার্যকরী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবের নির্দেশ অনুসারে ১৯১৭ খ্রীঃ মধ্যে বোম্বে, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বোর্ডের পরিচালনাধীনে আনা হয়। মাদ্রাজ, বাংলা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে প্রথম থেকেই বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সরকারী সাহায্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী করায় এই প্রদেশগুলিতে "বোর্ড স্কুলের" সংখ্যা খুবই কম ছিল। বাংলা সরকার পঞ্চায়েত ইউনিয়ন স্কীম বলে একটি পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি ১৪ বর্গমাইলে একটি করে তিন শ্রেণীযুক্ত আদর্শ স্কুল সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে স্থাপিত হয়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ব্যয় সরকার থেকে বহন করা হলেও পরিচালনার দায়িত্ব জেলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। এই স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের সামান্য বেতন, পাঠক্রমের ত্রুটি, অসুবিধাজনক অবস্থিতি ও ছাত্রদের নিকট থেকে বেতন নেবার ব্যবস্থা থাকায় বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

১৯১২ খ্রীঃ যেখানে দেশের প্রতি ১০·২ বর্গমাইলে একটি করে স্কুল ছিল সেখানে ১৯১৭ খ্রীঃ প্রতি ৮·২ বর্গমাইলে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের ছেলেদের যারা লেখাপড়া করছিল তাদের হার শতকরা ৪% থেকে বেড়ে ৪·৫% হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল থেকে সামান্য অর্থব্যয় করা হ'ত বলে লর্ড কার্জন নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে শিক্ষার জন্য যা ব্যয় করা হবে তার একটা প্রধান অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলেও শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণের চার বছর পরেও দেশের অতি সামান্য সংখ্যক ছেলেমেয়েই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছিল।

॥ দ্বৈত ও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ॥

১৯১৯ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন সংস্কারের ফলে শিক্ষা হস্তান্তরিত বিষয়ে পরিণত হয়। প্রতি প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ একজন ভারতীয় মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত হয়। এই সময় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নতুন সরকারী দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু

॥ ২ ॥ **তত্ত্বাবধান—**

কোন অঞ্চলে এই আইন প্রয়োগ করা হলে সে ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হয়েছে তা দেখবার জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে। স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের ছেলে-মেয়ে স্কুলে আসছে কি না দেখতে হবে। যদি ছেলেমেয়েরা স্কুলে না আসে তাহলে অভিভাবকগণ যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান সে ব্যবস্থা করতে হবে। আইনে অবশ্য গরহাজিরার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আছে কিন্তু শাস্তির ভয় না দেখিয়ে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অভিভাবকগণ যাতে শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহশীল হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুকূল জনমত গড়ে উঠলে আইনের সাহায্য নেবার আর দরকার হবে না। জনসাধারণ শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে অবহিত হলেই তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিদ্যালয় গৃহের জন্য জমি সংগ্রহ, বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, আসবাব পত্রের ব্যবস্থা সব কিছু করবে।

॥ ৩ ॥ **বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—**

দেশে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে। তাই বাধ্যতামূলক আইন প্রয়োগ করবার পূর্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শহর অঞ্চলে অবশ্য বিদ্যালয়ের অভাব থাকবার কথা নয় তবু কলকাতায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব আছে একথা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার উপযোগী ৩৫% ছেলেমেয়েদের জন্য কলকাতায় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। প্রতি তিনটি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রতি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সব সময় প্রয়োজন হয় না। যে গ্রামে লোক সংখ্যা ৫০০ জনের কম সেখানে স্কুল চালাবার উপযোগী ছাত্র মেলে না। ১৯৫১ খ্রীঃ লোক সংখ্যার হিসাবে দেখা গিয়েছে ভারতের ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার গ্রামের মধ্যে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গ্রামের লোক সংখ্যা পাঁচ শতের কম। এসব গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা না করে পাশাপাশি দু'টি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।

॥ ৪ ॥ **পাঠক্রম—**

পল্লী প্রধান ভারতের অধিকাংশ নাগরিকের শিক্ষার শুরু হবে গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গ্রাম্য পাঠশালার পাঠক্রম বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কশূন্য হলে সাধারণ মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হবে না, তাই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় পল্লী জীবনের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য করে রচনা করলে পল্লীর অভিভাবকেরা শিক্ষার মূল্যায়ণ করতে পারবে। এর ফলে গড় হাজিরা বা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান সম্পর্কে পিতামাতার অনিচ্ছা দূর হবে।

সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রচিত পাঠক্রম যেমন নীরস তেমনি বাস্তব জীবনের পক্ষে

অনুপযোগী। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম প্রাথমিক শিক্ষায় চালু করা সম্ভব হলে পাঠক্রমের বাস্তব বিমুখীনতার অভিযোগ দূর হ'ত। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তা করা বর্তমানে সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ বুনিয়াদী ধরনের বিদ্যালয় পুনর্গঠনের জন্য তৎপর হয়েছে। বুনিয়াদী পাঠক্রমের বর্তমান প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমন্বয় করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলা যাতে সম্ভব হয় সেই চেষ্টাই আমাদের করা দরকার। কোঠারী কমিশন বুনিয়াদী ও প্রচলিত শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য যে নতুন পাঠক্রমের সুপারিশ করেছেন তা চালু করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম বাস্তবধর্মী হবে।

॥ ৫ ॥ শিক্ষক—

প্রাথমিক শিক্ষার যে কোন পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে সমস্ত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও সরকারী শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে সফল করা অসম্ভব। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সফল করতে হলে আমাদের প্রয়োজন ২৮ লক্ষ শিক্ষকের, অথচ আমাদের আছে ৭ লক্ষ শিক্ষক। শিক্ষকের অভাবে বহু গ্রামে এক শিক্ষক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন শিক্ষকের পক্ষে একই সাথে চারটি কি পাঁচটি শ্রেণীতে শিক্ষাদান ও বিদ্যালয় পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থা চলতে দিলে শিক্ষার অবনতি হতে বাধ্য। যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু'জনের কম শিক্ষক থাকা উচিত নয়। ১৯৫৯ খ্রীঃ আমাদের দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার। এদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজে নিয়োগ করা হলে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায় ও প্রাথমিক শিক্ষকের সমস্যার সমাধান হয়।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য যথাসম্ভব স্থানীয় লোক নির্বাচন করা উচিত। পল্লী অঞ্চলের সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্য থেকে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের স্বল্পকালীন শিক্ষা দিয়ে শিক্ষকের কাজে নিয়োগ করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের দরকার হবে, সে কথা চিন্তা করে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকের অপেক্ষায় বসে থাকা চলবে না। কারো মতে সকালে তিন ঘণ্টা, বিকেলে তিন ঘণ্টা স্কুলের ব্যবস্থা করলে সমস্যার সমাধান হবে। শিক্ষা প্রসারের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কাজ ত্বরান্বিত করবার জন্য বহু প্রগতিশীল দেশেই দুই বেলা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। ভারতে এই ব্যবস্থা করলে বর্তমানে আমাদের যে শিক্ষক আছে তা দিয়েই সাময়িকভাবে কাজ চালান যেতে পারে। বেতনের দিক থেকে কিছু সুবিধা ও চাকুরীর আরও অন্যান্য সুবিধা দিলে মনে হয় প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি হবে না। এই ব্যবস্থাকে পরীক্ষা-মূলকভাবে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় চালু করা যেতে পারে।

শিক্ষক পিছু ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে সমস্যার আংশিক সমাধান হবে বলে অনেকে মনে করেন। যেখানে একজন শিক্ষককে চার থেকে পাঁচটি (শিশু শ্রেণী সহ) শ্রেণীর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে সেখানে তাঁদের কাঁধে আরও বোঝা চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অচল করে তোলা কোন রকমেই যুক্তিসঙ্গত হবে না।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা ॥

শিক্ষার নানা সমস্যার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা বিশেষ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অথচ এই জটিল সমস্যা নিয়ে কোন গবেষণার ব্যবস্থা নেই। কি করে অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। যে বিরাট অপচয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে তুলেছে তা রোধ করতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ও শ্রম ব্যয় হচ্ছে তা পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে এই অপচয় রোধের কোন চেষ্টা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম পরিবর্তন একটি জরুরী প্রশ্ন। বাস্তব জীবনের সাথে শিক্ষার সমন্বয় করে কি করে পাঠক্রম রচনা করা যায় তার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার বা কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষার একটা সুষ্ঠু সমন্বয় করে শিক্ষাকে বাস্তব ধর্মী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাস্তবধর্মী জীবনমুখী শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করা কি করে সম্ভব সে সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

॥ অর্থাভাব ॥

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বাধাস্বরূপ অর্থাভাবের কথাই প্রথম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এ বাধা কতটা সরকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে তৈরী করেছেন তা বিচার্য। শিক্ষার জন্য অর্থাভাব অতি প্রাচীন সরকারী অজুহাত। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যা বলতেন আমাদের বর্তমান শাসকগণও একই সুরে সে কথা বলে থাকেন। যদি গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শিক্ষাকে অপরিহার্য বলে ধরা হ'ত তাহলে শিক্ষার জন্য অর্থের অভাব হ'ত না। দেশে কারণে অকারণে বহু কর বসানো হচ্ছে, যদি সরকার শিক্ষার জন্য কর বসিয়ে সে টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করতেন তাহলে মনে করা যেত সরকার অবশ্য একটি ক্ষেত্রে দেশবাসীর কল্যাণে কর বসিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতা-মূলক করতে সরকারের সদিচ্ছার অভাব আছে বলেই অর্থাভাব শিক্ষা প্রসারের পক্ষে প্রধান অন্তরায়রূপে দেখা দিয়েছে। সরকারী মনোভাব পরিবর্তন না হলে কোন দিনই অর্থাভাব দূর হবে না।

॥ অন্যান্য অসুবিধা ॥

প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা আলোচনাকালে আমরা দেখেছি অভিভাবকদের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার ফলে অবহেলা ও অর্থ-নৈতিক দুরাবস্থা শিক্ষা প্রসারের পথে

বাধার সৃষ্টি করে। এছাড়া জাতিভেদ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সামাজিক মনোভাব ও প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তি বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রসারের পথে অন্তরায়ের কারণ ; এসব বাধা অনতিক্রম্য নয়। প্রধান অন্তরায়গুলি অপসারিত হলে এসব ছোটখাট সমস্যার সমাধান খুব কঠিন হবে না।

॥ প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও মূল্যায়ণ ॥

প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা ও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় দেখা যায় সরকারী ভ্রান্ত নীতি ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারে অতিরিক্ত আগ্রহে আমাদের দেশে গণশিক্ষার প্রসার হয় নি। জাতীয় সরকার নীতিগতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের জন্মগত অধিকার দাবীকে স্বীকার করে নিলেও সরকার এমন কোন বলিষ্ঠ কর্মপদ্ধতি বা নীতি গ্রহণ করেন নি যার ফলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি আমাদের শাসনতন্ত্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে কার্যকরী করতে সরকার বিন্দুমাত্র উৎসুক। ১৯৫১ খ্রীঃ লোক গণনায় দেখা যায় আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ১৭.৫ জন। দশ বছর বাদে সেই সংখ্যা হয় শতকরা ২৪ জন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষিতের হার ২% থেকে দশ বছরে ৫৫% হয়েছিল। রাশিয়ায় পঁচিশ বছরে ৮% থেকে ৮৮% হয়েছিল। প্রাথমিক অসুবিধা সব দেশেই ছিল। আমাদের দেশেও আছে। অসুবিধা দূর করবার জন্য আমরা যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতাম, আমাদের সদিচ্ছা শুধুমাত্র মুখের কথায় প্রকাশ না করে যদি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজে এগিয়ে আসতাম তাহলে ১৯৬০ খ্রীঃ মধ্যে অন্ততঃ ৬—১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অসম্ভব হ'ত না। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষেও আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণের পথে খুব সাফল্যলাভ করতে পারি নি।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ১৯৬২ খ্রীঃ যে পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কেরলের স্থান সর্বাগ্রে, পঃ বঙ্গের স্থান ষষ্ঠ, রাজস্থানের সর্বনিম্নে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐ স্তরের ১১—১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে যত ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় তাদের হার সম্পর্কে ১৯৬২ খ্রীঃ মে মাসে যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেরালায় ৫০%, মাদ্রাজে ৩০%, মহারাষ্ট্রে ২৯%, পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীরে ২৮% আসাম ও গুজরাটে ২৭%, পশ্চিমবঙ্গে ২১%, বিহারে ১৯%, উত্তর প্রদেশে ১৬%, রাজস্থানে ১৫%, উড়িষ্যায় ৮% স্কুলে যায়।

প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বশেষ যে পরিসংখ্যান—কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর ১৪ই আগষ্ট ১৯৬৫ খ্রীঃ তারিখে প্রকাশ করেছে তা থেকে জানা যায় বর্তমানে সমগ্র ভারতের ৬—১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা মোট ১৩.১০ কোটি (এর মধ্যে মেয়ে ৬.৪৩ কোটি)। এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা স্কুলে যায় তাদের সংখ্যা হচ্ছে মোট ৬.৭০ কোটি (এর মধ্যে ছেলের সংখ্যা ৫.৬৩ কোটি)।

বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন তাহলে তারা সেজন্য সরকারী অনুমতি প্রার্থনা করতে পারেন। সরকার থেকে অনুমতি পেলেই যে কোন এলাকার ৬—১০ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে।

কমিশনারগণ একটি স্কুল কমিটি গঠন করবেন এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন প্রণয়ন করবেন। বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে না। তবে শিক্ষা যেখানে বাধ্যতালমূক করা হবে সেখানে অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা বিচার করে বেতন মকুব করা হবে।

যদি মিউনিসিপ্যালিটির আয় ও সরকারী সাহায্যেও শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ না হয় তাহলে সরকার থেকে অনুমতি নিয়ে শিক্ষা কর ধার্য্য করা চলবে। শিক্ষা কর কি ভাবে ধার্য্য করা হবে সে সম্পর্কে সরকার আইন প্রণয়ন করবেন।

॥ বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন ॥

১৯১৯ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ত্রুটি দূর করবার জন্য এবং শিক্ষকের অবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৩০ খ্রীঃ বাংলার পল্লী অঞ্চলের জন্য গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়।

১৯৩০ খ্রীঃ গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাংলার মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে সর্বত্র প্রযোজ্য হবে বলে স্থির হয়। পল্লী বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই আইন কার্যকরী হলে বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলের ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়ে এই আইনের আওতায় আসবে বলে স্থির হয়।

নতুন আইনে "জেলা স্কুল বোর্ড" গঠন করে সেই স্কুল বোর্ডের শিক্ষা বিস্তারের ভার দেওয়া হ'ল। জেলা বোর্ডের এলাকাধীন সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন, আর্থিক সাহায্য, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, বেতন নির্ধারণ, শিক্ষকদের শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা, শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটি ফাণ্ড গঠন প্রভৃতি সমস্ত বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে থাকবে।

জেলা স্কুল বোর্ড গঠনের পর প্রথম আট বছর জেলা শাসক বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত করবেন। বোর্ড মহকুমা শাসক, জেলার স্কুল পরিদর্শক, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, শিক্ষক প্রতিনিধি প্রভৃতি সদস্য থাকবেন।

জেলা স্কুল বোর্ড নিজ এলাকার জন্য শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা রচনা করবে। ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য ও স্কলারসিপের ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা করবে।

সরকারী নির্দেশ বলে প্রয়োজন হলে জেলা স্কুল বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা, পরিদর্শন, গৃহনির্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষমতা ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে হস্তান্তর করতে পারবে।

শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য জেলাবোর্ড শিক্ষাকর ধার্য্য করতে পারবে। রাজস্বের প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা কর ধার্য হবে। এর মধ্যে কৃষকরা দেবে সাড়ে তিন পয়সা ও জমিদারকে দিতে হবে দেড় পয়সা। এছাড়া অন্তরের বৃত্তিজীবীদের শিক্ষাকরের হার নির্ণয়ের ভার জেলা শাসকের উপর দেওয়া হয়। সরকার থেকে প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২৩,৫০০ টাকা দেওয়া হবে। শিক্ষক শিক্ষণের সমগ্র ব্যয়ভার প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে বহন করা হবে। পরিদর্শন ব্যবস্থার ব্যয়ভার সরকারী তহবিল থেকে বহন করা হবে।

জেলা স্কুল বোর্ডের সাথে পরামর্শ করে প্রাদেশিক সরকার যে কোন অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করতে পারবেন। কোন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে তা অবৈতনিক হবে। কোন ছাত্র ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক শিক্ষাগ্রহণের দায় থেকে শুধুমাত্র জেলাবোর্ডই অব্যাহতি দিতে পারবে।

যদি সম্ভব হয় স্কুল পাঠ্যের সাথে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলবে।

প্রাদেশিক সরকার জেলা স্কুলবোর্ড নিয়ন্ত্রন, ইউনিয়ন বোর্ডকে ক্ষমতা হস্তান্তর, প্রয়োজন হ'লে স্কুল বোর্ড বাতিল করা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, পাঠক্রম নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠিত হবে। শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা (*D. P. I.*), প্রতি ডিভিসন থেকে দু'জন করে স্কুল বোর্ড নির্বাচিত সদস্য ও সরকার মনোনীত পাঁচজন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে।

॥ শিক্ষার প্রসার ॥

এই আইন পাস হবার পর ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বহু জেলায় স্কুল বোর্ড গঠিত হ'ল। কয়েকটি জেলায় শিক্ষা কর ধার্য্য হ'ল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ট্রেনিং-এর কিছু ব্যবস্থা হ'ল। এত আয়োজন সত্ত্বেও কার্যতঃ প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ বিস্তার বাংলা দেশে হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই আইনের নানা ত্রুটি দেখা যায়। পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ছিল মোট পাঁচ বছরের, নতুন আইনে তা কমিয়ে চার বছর করা হ'ল। অথচ এই পাঠক্রম চার বছরে শেষ করা যায় না। এজন্য অন্ততঃ পাঁচ বছর সময় দরকার। স্কুল বোর্ডগুলিতে স্থানীয় রাজনীতি আর সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ করে সেখানের কাজে জটিলতার সৃষ্টি করল। শিক্ষক নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা সর্বাধিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। মুসলিম সম্প্রদায় থেকে যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছিল না তবু অযোগ্য লোক নেওয়া হতে লাগল, এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয়।

১৯৩০ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষা আইনের একটা বড় কথা ছিল ১০ বছরের মধ্যে সারা বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। কার্যতঃ দেখা গেল কলিকাতা কর্পোরেশনের সামান্য অংশে এবং চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকা ভিন্ন অন্য

কোন শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় নি। পল্লী অঞ্চলের মধ্যে শুধুমাত্র মৈমনসিংহ জেলার কুলিয়াচর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে এবং বাংলা সরকারের নিষ্ক্রিয়তার ফলে প্রাক স্বাধীনতা যুগে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে বাংলা দেশ অন্যান্য প্রদেশের পশ্চাতে ছিল।

॥ পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৬৩) ॥

দেশ স্বাধীন হবার পর পুনরায় আইনের দোষ ত্রুটি অপসারণ করে নতুন আইন করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পঃ বঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে দ্রুত বাধ্যতামূলক করবার উদ্দেশ্যে পঃ বাংলার শহর অঞ্চলের জন্য ১৯৬৩ খ্রীঃ একটি আইন পাস করেন।

এই আইন পঃ বাংলার সমস্ত মিউনিসিপ্যাল শহরের পক্ষে প্রযোজ্য হবে। এই আইনে স্থির হয় ৬—১১ বছর বয়সের প্রতিটি ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হবে।

এই আইন কার্যকরী হবার পর একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্যের মিউনিসিপ্যালগুলি তাদের এলাকার ছেলেমেয়েদের সংখ্যা, স্কুলের আসন সংখ্যা, কতজন শিক্ষক প্রয়োজন, কি করে ও কত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান আয় ও কত টাকা বাৎসরিক খরচ হবে, শিক্ষা কর সহ কত টাকা পাওয়া যাবে, সরকার থেকে কত টাকা অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজন হবে প্রভৃতি তথ্য সরকারকে জানাবে।

মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ প্রেরিত বিবরণ পাবার পর বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সরকার কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য নির্দেশ দেবেন।

প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত প্রাথমিক স্কুলসমূহ পরিচালনার জন্য কমিশনারগণ একটি স্কুল কমিটি গঠন করবেন।

কোন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক বলে ঘোষণা করা হলে সেই অঞ্চলে ৬—১১ বছর বয়সের প্রতিটি ছেলেমেয়ের অভিভাবক তাদের নিজ নিজ ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে বাধ্য থাকবেন। গ্রহণযোগ্য বা যুক্তি সঙ্গত কোন কারণ না থাকলে কোন অভিভাবকই এই আইনের আওতা থেকে মুক্তি পাবেন না। স্কুল কমিটির অনুমতি ব্যতীত যদি অভিভাবক ৬—১১ বছরের কোন ছেলেমেয়েকে কোনরূপ অর্থকরী কাজে লাগান এবং তার ফলে শিশুটির স্কুলে যাবার অসুবিধা হয় তাহলে নিয়োগকারী দণ্ডনীয় হবেন। তাঁর কুড়ি টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে।

মিউনিসিপ্যালিটির আয় থেকে যদি বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ সম্ভব না হয় তাহলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে শিক্ষাকর বসান যেতে পারে।

মিউনিসিপ্যাল স্কুল কমিটি পরিচালিত স্কুলসমূহ সরকারী শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শকগণ পরিদর্শন করতে পারবেন।

এই আইনের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে আইনটি শুধুমাত্র শহর অঞ্চলে প্রয়োগযোগ্য। গ্রামীণ বাংলার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এই আইনে করা হয় নি। তারপর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সরকারী শৈথিল্যের জন্য পঃ বাংলার সামান্য কয়েকটি শহরেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষাকরের সর্বাধিক হার স্থাবর সম্পত্তির বাৎসরিক মূল্যের শতকরা দু'ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু এই সামান্য করও কমিশনারগণ জনসাধারণের বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে বসাতে সাহসী হচ্ছেন না। ফলে অর্থের অভাব দূর করবার যে ব্যবস্থা আইনে করা হয়েছিল মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য কোন প্রচেষ্টা তারা করেন নি।

॥ পঃ বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির খতিয়ান ॥

পঃ বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্রটি আমাদের সামনে রয়েছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বিদেশী সরকার জনশিক্ষা বিস্তারে কোনদিনই উৎসাহী ছিল না। বর্তমান শতকের প্রথমপাদে যখন গোখেল বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিল আনেন তখন সরকার পক্ষ থেকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বিলটি নাকচ করে দেওয়া হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ প্রথম বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। এই বিলের দোষত্রুটি দূর করার জন্য ১৯৩০ খ্রীঃ বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। এই আইনে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব এই শিক্ষা বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই আইনে বলা হয়েছিল ১০ বছরের মধ্যে সারা বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ কিছুই হয় নি। স্কুলবোর্ডগুলিতে রাজনৈতিক দলাদলির ফলে ও সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৬৩ খ্রীঃ পঃ বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য এই আইন পাস হয়। এই আইন পাস হবার পর সাত বছর অতিক্রম হয়েছে, কিন্তু দার্জিলিং শহরে, পুরুলিয়া শহরে ও কলকাতায় কয়েকটি ওয়ার্ডে এবং কিছু গ্রামে কাগজপত্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় শিক্ষা আজও অবৈতনিক করা সম্ভব হয় নি। কলকাতার মত শহরে প্রায় ১ লক্ষ শিশু শিক্ষার কোন সুযোগ পায় না। শহর অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার কোন সুষ্ঠু নীতি না থাকার ফলে ফন্দিবাজ শিক্ষা ব্যবসায়ীরা কে. জি, মণ্টেসরী প্রভৃতি নামে যত্রতত্র স্কুল খুলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অরাজকতার সৃষ্টি করছে।

সরকারী হিসাবে বলা হয় পঃ বাংলায় প্রতি বর্গমাইলে গড়ে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু একথা তাঁরা ভুলে যান বাংলা দেশের আটত্রিশ হাজার গ্রামের মধ্যে চৌদ্দ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ১৯৬৪-৬৫ খ্রীঃ হিসাবে দেখা যায় পঃ বাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪,৪১৩টি, শিক্ষকের সংখ্যা ৯৮,৩০৬ জন ও ছাত্রসংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার। পঃ বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত বয়সের ছেলেদের মধ্যে ৮৩·৭% ও মেয়েদের মধ্যে ৪৫·৯% লেখাপড়ার সুযোগ পায়। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক করা হয়েছে, কিন্তু বাধ্যতামূলক না হবার ফলে গ্রামের শিশুদের মধ্যে একটা বড় অংশ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে না। লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে শিক্ষার প্রসার সে হারে না হবার ফলে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার সম্ভাবনা আজও সুদূরপরাহত বলে মনে হয়।

শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নি সেই সাথে শিক্ষকের অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, পাঠক্রম রচনায় বাস্তববোধের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা, সার্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে সরকারের আন্তরিকতার অভাব ও চিরাচরিত অর্থাভাব সবকিছু মিলিয়ে পঃ বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা হতাশাজনক।

[পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা অধ্যায়ে পরিকল্পনাকালে পঃ বঙ্গে শিক্ষার প্রসার অংশ দেখুন]।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা-সমস্যা ॥

চিরাচরিত বাস্তববিমুখ পুঁথি নির্ভর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে একথা আজ ভারতের সমস্ত শিক্ষাবিদ্ মেনে নিয়েছেন। জাতীয় শিক্ষা যদি হয় জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপোষক, জাতীয় আদর্শ তার মুখ্য উপজীব্য, তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষাকেই আমরা বলতে পারি জাতীয়-শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশের মাটি আর দেশের জীবনধারণের সাথে যে প্রাণের যোগসূত্র গড়ে উঠবে তাই হবে শিক্ষার্থীর জীবনের মূলধন আর জাতির অমূল্য সম্পদ। কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণের যে কথা বুনিয়াদী শিক্ষায় বলা হয়েছে সেই শিক্ষাই হবে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ভিত্তি ভূমি, যার বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ ভারতের নাগরিকের সার্থক সফল জীবন।

বুনিয়াদী শিক্ষার ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে আমরা এমন কোন বিকল্প শিক্ষা পরিকল্পনা এখনও উপস্থাপন করতে পারি নি যা বুনিয়াদী শিক্ষার স্থান গ্রহণ করে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার দোষ ত্রুটি দূর করতে পারে। আমরা যদি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে চাই তাহলে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-গুলিকেই তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে এখানেই এর শ্রেষ্ঠতা নয়। ডা এস, এন. মুখার্জি

বলেছেন—"*It has lifted problems of education to a higher plane, where educationists are not concerned with some slight modifications, in methods contents, and organisation of education, but in finding out a system in harmony with the currents of our national and cultural life.*"

বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি শিশু ; কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা শিখবে এ তত্ত্ব রুশো থেকে ডিউই পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাবিদ্ই মেনে নিয়েছেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রীক। এই শিল্পকেন্দ্রীকতা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। গান্ধীজি শিক্ষাকে স্বনির্ভর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বনির্ভরতাই এর পিছনে একমাত্র যুক্তি নয়। শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে কর্ম (*activity*) এ সহজ সত্যকে অস্বীকার করা যায় কি করে? অর্থনৈতিক লাভের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মেক্সিকোর প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তি শিক্ষা ও কর্ম প্রচেষ্টাকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। মেক্সিকোর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে '*That the co-ordination sensory training and confidence gained in manual arts are vital to the educational programme.*

বুনিয়াদী শিক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বজন স্বীকৃত। আজ একথা সবাই স্বীকার করেছেন একটা আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানের সাথে জড়িত থাকবে কর্মপ্রচেষ্টা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের সাথে ঘনিষ্ট পরিচিতি। সেই জন্যই দেখতে পাই বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমে শিল্প কর্ম, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে (*craft work, natural environment and social environment.*)।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টাবোর্ড (*CABE*) ১৯৫২ খ্রীঃ বলেন, শিক্ষার শিল্পকর্মের গুরুত্ব এত বেশী যে আর্থিক লাভ ক্ষতির প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে ও সুপরিকল্পিতভাবে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। এই পরিকল্পনা রূপায়নে রাজ্যগুলিকে দেখতে হবে যে উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা স্তর দু'টি যেন সুসংবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে এবং শিক্ষাগত মূল্য ও উৎপাদনগত দিক থেকে যেন শিল্পকর্মের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের যুগে প্রথম প্রবর্তিত হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব অবসানের সাথে বুনিয়াদী শিক্ষা সরকারী অনুগ্রহ বঞ্চিত হয়ে বেসরকারী প্রচেষ্টায় বেঁচে থাকে। তারপর দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হন।

একটি সরকারী রিপোর্টে ১৯৪৭-৫২ খৃঃ ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সেখানে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে—বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর গুণগত উৎকর্ষিতা সম্পর্কে সব রাজ্যের অভিজ্ঞতা সমান নয়। পুরাণ

শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় বুনিয়াদী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদী সম্মত, কিন্তু, এই শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যে আশা পোষণ করা হয়েছে ফল সর্বত্র তদনুরূপ হয় নি।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে মনোভাবও সর্বত্র একইরূপ নয়। বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে, জনমতও এর পক্ষে। মাদ্রাজ, বোম্বে ও কয়েকটি উপজাতি অঞ্চল সম্পর্কেও একথা বলা চলে। কিন্তু অন্য রাজ্যে অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। কোন কোন রাজ্যের জনসাধারণ ও শিক্ষককূল বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে বাধা সৃষ্ট করেছে। এসব এলাকায় শিক্ষার মানের উন্নতি না হয়ে বরং বুনিয়াদী শিক্ষার অবনতি হয়েছে।

জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মূলে রয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণের মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বিভিন্ন রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষাকে বিভিন্ন দৃষ্টভঙ্গী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও একটি মাত্র শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেই তাকে বুনিয়াদী শিক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে। কোন কোন বুনিয়াদী স্কুলে ট্রেনিং প্রাপ্ত কোন শিক্ষকই নেই। বহু বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষকদের বুনিয়াদী শিক্ষার তত্বগত কোন ধারণাও নেই। শিক্ষাপ্রণালীর অজ্ঞতার জন্য শিক্ষা দেবার কোন যোগ্যতাও নেই। অথচ বুনিয়াদী শিক্ষার সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষকের উপর।

এছাড়া গোঁড়া বুনিয়াদী শিক্ষাবিদেরা এ পদ্ধতিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ নিয়ম কানুনের মধ্যে বেঁধে ফেলতে চাইছেন। এর ফলে সমাজের সাথে সংযোগহীন হয়ে পড়েছে। গান্ধীজি চেয়েছিলেন নঈ তালিম শিক্ষা দেওয়া হবে উদ্দেশ্যমূলক কর্মপ্রচেষ্টা ও শিল্পের মাধ্যমে। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা একে বেঁধে ফেলতে চাইছেন সুনির্দিষ্টভাবে এঁকে দেওয়া ছকের মধ্যে।

বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সব শিল্পের কথা বলা হয়েছে তা গ্রামের পরিবেশে গ্রাম্য জীবনের পক্ষে উপযোগী। শহরাঞ্চলে মানুষের উপযোগী শিল্পের ব্যবস্থা সেখানে ছিল না তাই শহরের পরিবর্তিত পরিবেশে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সামঞ্জস্য বিধান করা কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিল্প মধ্যে শহরের উপযোগী শিল্পেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগিতাকে স্বীকার করে নিলেও বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নি। ১৯৫০ খ্রীঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে সমগ্র দেশে নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৩,৩৭৯টি, এই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যার ১৩.১% নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলে শিক্ষা পেত। ১৯৫৬ খ্রীঃ প্রথম পরিকল্পনা শেষে দেখা যায় বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যা হয়েছে ৪২.৯৭১টি ও শতকরা ১৭.২ জন প্রাথমিক শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষা পাচ্ছে। ১৯৬০-৬১ খ্রীঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যা হয় প্রায় ১ লক্ষ এবং মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থীর আনুমানিক ২৩.৩% এখানে শিক্ষা গ্রহন করত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় ১৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়েছে ২৫ কোটি টাকা। বুনিয়াদী স্কুল বহু

স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বহু স্কুলই নামে বুনিয়াদী, শিক্ষাগত দিক থেকে সেখানে বুনিয়াদী শিক্ষার তত্ত্ব পদ্ধতি কিছুই পাওয়া যাবে না। তারপর নিম্ন বুনিয়াদীর সাথে উচ্চ বুনিয়াদীর সংযোগ সাধন করে শিক্ষার যে ব্যবস্থার কথা *CABE* বলেছিল তা খুব কম জায়গায় আছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বেশী অর্থের প্রয়োজন। তারপর বুনিয়াদী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। বিশেষ ভাবে শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক না পেলে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ১৯৫১ খ্রীঃ সারা দেশে বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১৪টি, ১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ ট্রেনিং স্কুলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫২০টি। যদিও বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর তবে এ শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার *National Institute of Baisc Education* নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা ছাড়াও বুনিয়াদী শিক্ষা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রাথমিক অসুবিধাগুলি দূর না করে যততত্র বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অথচ উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নি তাই বুনিয়াদী শিক্ষা প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার অন্যতম কারণস্বরূপ গোঁড়া বুনিয়াদীর কথা বলেছি। এঁরা যেভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে রূপায়িত করতে চান সেভাবে শিক্ষাকে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। বুনিয়াদী শিক্ষা যাতে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগিতা থেকে দূরে সরে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কি করে বুনিয়াদী অভিমুখী করা যায় আমাদের সে কথা চিন্তা করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মকেন্দ্রীক দিকের সাথে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে কি করে একটা সর্বজন উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় সে চেষ্টা করা প্রয়োজন। জনসাধারণের সমর্থন পেতে হলে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে গোঁড়া মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। আদর্শবাদের সাথে সাথে কি করে একে একটা বাস্তব কার্যকরী রূপ দেওয়া যায় সে কথা চিন্তা করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য বর্তমান প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাকেই বুনিয়াদী অভিমুখী করবার নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন। মনে হয় বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে পুঁথি নির্ভর প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কর্মকেন্দ্রীক বুনিয়াদী শিক্ষার সমন্বয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এ সম্পর্কে সরকারী অভিমত প্রণিধানযোগ্য।

"*This programme*···*would help to reduce the gap between the basic and non-basic schools and enrich the curriculum of the latter of*

basic activities which neither involves much expenditure nor require any speacilly trained teachers to organise them."

[*Review of Education in India* (*1947-61*)

॥ পঃ বাংলার বুনিয়াদী শিক্ষা ॥

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বাংলা দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না। বাংলার দু'চারটি গ্রামে নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মীর একক চেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ওয়ার্ধায় লোক পাঠিয়ে সেখানে ট্রেনিং নেবার অসুবিধা সত্ত্বেও কয়েকজন উৎসাহী কর্মী শিক্ষা নিয়ে এসে কাজ শুরু করেছিলেন, তাদের সেই প্রচেষ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের কাছ থেকেও খুব সাড়া পাওয়া যায় নি। যে শিক্ষাব্যবস্থার পিছনে সরকারী স্বীকৃতি নেই অভিভাবকগণ স্বাভাবিকভাবেই সে বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাতে চাইবেন না। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শগত দিকের তাৎপর্য সাধারণ লোকের বোধগম্য হ'ত না। চিরাচরিত একটা ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থা চালু করা হলে লোকের মনে সে ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা সংশয় থাকে, বিশেষ করে সরকারী শিক্ষা বিভাগ যেখানে বিরূপ। এই পটভূমিকায় দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারী আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পঃ বাংলার বুনিয়াদী শিক্ষার নতুন যাত্রা শুরু হ'ল।

সরকারী হিসাবে ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ পঃ বাংলায় একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও ছিল না। কংগ্রেস সরকার নীতিগতভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে শিক্ষাবিভাগকে নির্দেশ দিলেন বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তন করতে। সরকারী নির্দেশ পাঠান যত সহজ বুনিয়াদী শিক্ষার ন্যায় একটি জটিল শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রবর্তন করা ঠিক তত সহজ নয়। অন্যান্য প্রদেশে স্বাধীনতার পূর্বেও বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে কাজ হয়েছে, কিছুটা প্রস্তুতি সেখানে ছিল কিন্তু বাংলাদেশে না ছিল কোন পূর্ব প্রস্তুতি, না ছিল বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী শিক্ষা বিভাগের কর্তাদের মনে কোন শ্রদ্ধা। ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাই দেখা গেল ১৯৫০—৫১ খ্রীঃ মধ্যে ৮০টি নিম্ন- বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ছাত্র সংখ্যা ৮৮০৩ জন ছেলে ও ২২৩১ জন মেয়ে। এরপর স্কুলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা

১৯৫৫—৫৬ খ্রীঃ	৫৯৩	৮৩,৩১১
১৯৫৮—৫৯ খ্রীঃ	১০৯৯	১,৫২,১৫৮
১৯৬০—৬১ খ্রীঃ	১৪৯০	১,৫৬,০০০

নীচের সংখ্যা দুটির দিকে চাইলেই বোঝা যাবে বিদ্যালয় যেভাবে বাড়ছে ছাত্রসংখ্যা সেভাবে বাড়ে নি। ১০৫৮-৫৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৬০-৬১ খ্রীঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে

চারশত, কিন্তু ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে মাত্র চার হাজার। দু'বছরে চার হাজার ছাত্র বৃদ্ধি সারা পশ্চিম বাংলার পক্ষে মোটেই গৌরবজনক নয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকার যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে দেখি গ্রামাঞ্চলে একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য ছয় বিঘা জমি দেওয়া হয়। বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করতে খরচ হয় নয় হাজার থেকে বার হাজার টাকা, এর শতকরা ১২½% গ্রামের লোককে দিতে হয়। যথাসম্ভব মুক্ত আকাশের তলে ক্লাস বসানোয় উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যালয় ভবনে সকালে নিম্ন বুনিয়াদী, দুপুরে উচ্চ বুনিয়াদী বা হাই স্কুল, বিকেলে মহিলাদের অবসর বিনোদন ও সামাজিক মিলন ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিদ্যালয় ভবন বহুপ্রকার সামাজিক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় কাজে ব্যবহৃত হয়।

রাজ্যে আণ্ডার গ্রাজুয়েট বুনিয়াদী শিক্ষকের জন্য ৩১টি বেসিক ট্রেনিং স্কুল আছে। এছাড়া পোষ্ট গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজে ২১০ জন ছাত্র পড়বার ব্যবস্থা আছে। নীতিগতভাবে পঃ বাংলা সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, যথারীতি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু যতটা জানা গিয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা বাংলা দেশে সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক। এর বহু কারণের মধ্যে প্রধান কারণ মনে হয় মানসিক। বুনিয়াদী শিক্ষা পঃ বাংলার জনসাধারণের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি। সরকারী শিক্ষা বিভাগও বুনিয়াদী শিক্ষাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নি। সরকার থেকে যদি জনমত গঠনের চেষ্টা হ'ত তাহলে হয়ত জনসাধারণের মনে সংশয় কি সন্দেহ যা আছে তা দূর হয়ে যেত। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের হার দেখে মনে হয় সরকারী শিক্ষা বিভাগ এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী উদাসীন।

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়। চিরাচরিত শিক্ষায় যে কোন একজন ম্যাট্রিক পাস শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালান যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশেষ ট্রেনিং ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ করা কোনক্রমেই উচিত নয়। ট্রেনিংহীন শিক্ষক ও উপযুক্ত সাজ সরঞ্জামহীন নিম্ন বুনিয়াদী বহু বিদ্যালয় এদেশে আছে। শুধু স্কুলের সাথে বুনিয়াদী নাম জুড়ে দেওয়া আছে। এজন্যই তাদের বুনিয়াদী কৌলিন্য। ফলে সাধারণ শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে। নিম্ন বুনিয়াদী থেকে পাস করা ছেলেকে জুনিয়র হাই স্কুল বা কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীচু ক্লাশে ভর্তি করান হয়। অভিভাবকগণ এভাবে ছেলের একটি বছর নষ্ট করতে রাজী নয় বলে সুযোগ থাকলে কোন অবস্থায়ই তাঁরা ছেলেদের বুনিয়াদী স্কুলে দিতে চান না।

১৯৫২ খ্রীঃ *CABE* নির্দেশ দিয়েছিলেন নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী স্তর দুটি যেন সুসংবদ্ধ একক শিক্ষা ব্যবস্থার অংশরূপে গড়ে ওঠে, তা না হলে সে শিক্ষা সত্যি-কারের বুনিয়াদী শিক্ষা হবে না। বাংলাদেশে ১৯৫৮-৫৯ খ্রীঃ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেখানে ১০৯১টি সেখানে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০১টি। এতগুলি নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের ছেলেরা কোথায় যাবে? যেভাবে তারা শিক্ষা পেয়েছে সেই

শিক্ষা ধারায় হঠাৎ ছেদ পড়ায় সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগে। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছেলেরা বাধ্য হয়ে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে গুণগত দিক থেকে পিছিয়ে যায়। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সাথে প্রয়োজন মত উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন না করা হলে বুনিয়াদী শিক্ষার শুভ ফল থেকে দেশ চিরদিনই বঞ্চিত থাকবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা আধুনিক যুগের উপযোগী একটি সম্ভাবনাপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা বিভাগের উদাসীনতা, অর্থের অভাব, শিক্ষকের অভাব, জনসাধারণের সংশয় প্রভৃতি মিলিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করতে পারে নি। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ত্রুটি মুক্ত করতে হলে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিকে গ্রহণ করাই একমাত্র পথ। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের সাথে বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমের সমন্বয় সাধনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পঃ বাংলা সরকার যদি পরীক্ষা-মূলকভাবে এরূপ একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেন ও বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে একটি পাঠক্রম রচনা করে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারে অগ্রসর হন তাহলে বাংলায় সত্যি-কারের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on the compulsory Primary Education in India. [B, A. 1959]
2. Indicate the Salient features of Primary Education Act of Bengal of 1930. [B. A. 1960. B. T. 1958 & 1955]
3. Trace the development of Primary Education in West Bengal since Independence. [B. A. 1961]
4. Discuss the present position of Primary Education in W est Bengal indicating the possible lines of future development. [B. T. 1952]
5. Describe briefly the efforts that have been made from the beginning of this century for the reconstruction and development of Primary Education in Bengal and W. Bengal. [B. T. 1964]
6. What legislative enactments do you find on the statue book calculated to further primary education in W. Bengal ? What measures has been achieved and what remains to be done ? [B. T. 1966]
7. Examine the present position and problems of Primary Education in India. Offer suggestions for improvement. [C. U. 1971]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা

॥ মুদালিয়র কমিশন ও কোঠারি কমিশনের দৃষ্টিতে শিক্ষা সমস্যা ॥

ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। যদি জন জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করা যায় তাহলে প্রাথমিক শিক্ষাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উত্তরাধিকারী সূত্রে যে শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছি সেখানে সমাজের প্রয়োজনের অপেক্ষা সরকারের প্রয়োজনই ছিল শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণের শেষ কথা। মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল কেরাণী গড়া যন্ত্র। সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের নানা শ্রেণীর কর্মী মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকেই গ্রহণ করা হ'ত। ইংরেজ শাসিত ভারতে তাই মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। সরকারী শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা সেই যুগে প্রধানতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা সামগ্রিক পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনা শুরু হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার দোষ ত্রুটি আলোচনায় প্রথমেই বলা হ'ত মাধ্যমিক শিক্ষা লক্ষ্যহীন শিক্ষা। ঠিক লক্ষ্যহীন বললে অন্যায় হবে, মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল প্রধানতঃ উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব। যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত না তারা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক শূন্য মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ব শেষ করে যে করে হোক একটি চাকুরী সংগ্রহ করবার জন্য চেষ্টিত হ'ত। এই একদেশদর্শী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগই ছিল না।

দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজন দেখা দিলে প্রথমেই ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণের সভাপতিত্বে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। কমিশন স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চ শিক্ষার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কেও আলোচনা করেন ও মন্তব্য করেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বলতম অংশ এবং এর আশু সংস্কার আবশ্যক। পরাধীন ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাতে পেরেছে পরিবর্তিত অবস্থায় জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে সে শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই অকেজো (useless) হয়ে উঠল। জাতীয় ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় করে শিক্ষাকে যুগের অনুসারী ও বিশ্বের অনুসারী করে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে যোগসূত্র বজায় রেখে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলাই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এই শিক্ষা শেষ করেই অধিকাংশ শিক্ষার্থী জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব

১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেছিলেন। এজন্য ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকে বোর্ডের অধীনে আনার সুপারিশ করেন। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বার বছর হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করেন। ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাখবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তাঁরা মনে করেন নি। দুইটি কমিশনই ১২ বছর মাধ্যমিক শিক্ষা ও ৩ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর প্রথম ডিগ্রী দেবার কথা বলেছেন। অর্থাৎ প্রথম ডিগ্রীর জন্য ১২+৩=১৫ বছরের শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু মুদালিয়ার কমিশন একে কমিয়ে ১১+৩=১৪ বছর করেছেন।

১৯৬২ খ্রীঃ *Emotional Integration*-এর জন্য নিয়োজিত সম্পূর্ণানন্দ কমিটি বলেছেন, এগার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্তুতির পক্ষে উপযোগী নয়। ১৯৬৪ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে দিল্লীতে রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনে বলা হয়েছে আর্থিক অসুবিধা ও শিক্ষকের অভাবের জন্য নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পূর্বে ১২ বছরের স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা করাই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বাড়িয়ে ১১ থেকে ১২ বছর করা হোক ও ৩ বছরের ডিগ্রী-কোর্স বহাল থাক। অর্থাৎ, প্রথম ডিগ্রী গ্রহণ করতে হলে ১৫ বছর শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এই হচ্ছে অধিকাংশের মত।

মাধ্যমিক স্তরের বার বছরের শিক্ষা কয়টি স্তরে ভাগ করা হবে সে সম্পর্কেও নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন অথবা রাজ্যসমূহকে এ বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত তা নিয়ে মতভেদ আছে। *Emotional Integration Committee* বলেছেন—*We consider that in the overall interest of our student Populaiton there should be a common pattern of education in the country which will minimise confusion and coordinate and maintain standards.* সাধারণ মানুষ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে সমস্ত রাজ্যে শিক্ষার রূপ একই রকম হবে বলে মনে করে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য জীবনধারার রীতিনীতি, আঞ্চলিক প্রয়োজন প্রভৃতিকে অবজ্ঞা করে যদি সর্বত্র একই রকম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায় তাহলে ফল সর্বত্র শুভ হয় না। মুদালিয়র কমিশনের শিক্ষা সংগঠনমূলক পরিকল্পনা ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ একে কার্যকরী করবার সময় স্থানীয় অবস্থার সাথে শিক্ষার নতুন রূপটিকে কি করে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করেন নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ কোন একটা বিশেষ রূপ (*Pattern*) সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারেন কিন্তু তাকেই চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠিত রূপ সম্পর্কে মূল নীতি নির্ধারণ মাত্র করে দেবেন। সর্বভারতীয় রূপে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। (ক) প্রাথমিক শিক্ষা (খ) মাধ্যমিক শিক্ষা (গ) উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা।

প্রাথমিক স্তর চার বা পাঁচ বছর শিক্ষাকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি

পরবর্তীকালে সম্ভব হয় তাহলে একটানা সাত বছর পর্যন্ত করা হবে। কিন্তু বর্তমানে চারবছরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে সাত কি আট বছর করবার চেষ্টা কোন ক্রমেই সঙ্গত হবে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে কি আছে তার বিচারে কিছু করা ঠিক হবে না। আমাদের কি সংগতি, কতটা প্রস্তুতি আছে তা বিচার করে নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয় স্তর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর, *V* অথবা *VI* থেকে *X* পর্যন্ত এই স্তরে থাকবে ; মিডল স্কুল বা জুনিয়ার হাই স্কুল স্তরটি—এই স্তরের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হবে। এই স্তরের শেষে একটি *Public Examination* থাকবে। এখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা শেষ করবে। এই স্তরের শেষে যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বৃত্তিমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থা থাকবে। এই স্তরে সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া হলেও শিক্ষার্থীর রুচি, যোগ্যতা, আগ্রহ ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা দেওয়া হবে। তবে *Intensive specialisation* এই স্তরে থাকবে না।

পরবর্তী স্তরে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব এখান থেকে শুরু। অল্প শিক্ষার্থীই এই স্তরে থাকবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য উগযোগী করে গড়ে তুলবার জন্য এখানে *Intensive specialisation*-এর ব্যবস্থা হবে। এই স্তরের শিক্ষা দু'বছর কাল হবে। দু'বছর শিক্ষার পর *public examination*-এর ব্যবস্থা থাকবে। পূর্বতন ইণ্টার-মিডিয়েট কোর্স মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে যুক্ত করবার যে কথা স্যাডলার কমিশন বলেছিল উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সেই ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠনমূলক দিকের পরিবর্তন যে অত্যাবশ্যক এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে বার বছর স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এ প্রায় সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। প্রাথমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিকের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে রাজ্যসমূহকে স্বাধীনতা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সংগঠন-মূলক দিকে মূলনীতিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ শিক্ষাবিদদের সাথে আলোচনা করে স্থির করবেন এটাই বাঞ্ছনীয়।

॥ ২ ॥ ভর্তির সমস্যা

দেশ স্বাধীন হবার পর মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে। ইংরেজ যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। বিগত পনর বছরের শিক্ষা পরিসংখ্যান যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মানুষের আগ্রহ কত বেড়ে গিয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক ও অবৈতনিক করবার কথা বলা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে বাধ্যতা-মূলক করতে আমাদের আরও বহুদিন সময় লাগবে। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ আমাদের পক্ষে কতটা মেটান সম্ভব সেটা বিচার করে দেখতে হবে।

নীচের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য জনসাধারণের মধ্যে কি পরিমাণ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে :—

মাধ্যমিক স্তরে নবম, দশম ও একাদশ ছাত্রসংখ্যা।

বছর	সাধারণ শিক্ষা	বৃত্তিশিক্ষা	মোট
১৯৫০-৫১	১৩.৩৬ লক্ষ	১.৬২ লক্ষ	১৪.৯৮ লক্ষ
১৯৫৫-৫৬	২০.১২ লক্ষ	২.৮০ লক্ষ	২২.৯২ লক্ষ
১৯৬০-৬১	৩১.৫৯ লক্ষ	৪.২২ লক্ষ	৩৫.৮১ লক্ষ
১৯৬৫-৬৬	৫০.০০ লক্ষ	৭.০০ লক্ষ	৫৭ লক্ষ

পনের বছরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে চার গুণ। লোকের আগ্রহ ও সরকারের শিক্ষা প্রসার নীতির ফলেই এ সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হলে স্বাভাবিক ভাবেই মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কল-কারখানায় সাধারণ শ্রমিকের কাজ পেতে হলেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কোন কোন রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে বা মাইনের দিক থেকে নানা সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যে ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই হারে যদি বাড়াতে থাকে তাহলে ১৯৮১ খ্রীঃ মধ্যে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৩৫০ লক্ষ ও বৃত্তি শিক্ষায় ৩০ লক্ষ। অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ খ্রীঃ ১৪—১৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ৬০% শিক্ষার সুযোগ পাবে, বর্তমানে এই হার হচ্ছে ১৮%।

গণতান্ত্রিক দেশে এ সংখ্যা বৃদ্ধিতে আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারে শঙ্কিত হয়েছেন। অর্থের অভাব থাকায় স্কুল খোলা সম্ভব হবে না। উপযুক্ত সংখ্যক সুযোগ্য শিক্ষক যোগাড় করা সম্ভব হবে না, ছাত্র-সংখ্যা অপরিমিতরূপে বেড়ে গেলে শিক্ষার মান নেমে যাবে—কর্তৃপক্ষ মনে করেন মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিই বর্তমান শিক্ষার মানের অবনতির কারণ। সংগতি এখানে পরিমিত, এদিকে শিক্ষার উচ্চমান রক্ষা যে রূপেই হোক করতে হবে—এর সহজ সমাধান হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার রোধ করা। সোজাভাবে কথাটা বললে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে তাই নানাভাবে ভর্তি কি করে রোধ করা যায় ভবিষ্যৎ সরকারী শিক্ষা নীতি সেভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। অথচ বৃত্তি শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করে এই সমস্যা কি করে সমাধান করা যায় তা ভাবা হচ্ছে না।

সরকারী শিক্ষাবিভাগ বলছেন, আমরা অনেক দূর এগিয়েছি এখন আর *expansion* নয় *consolidation* হবে আমাদের নীতি। পঃ বাংলায় এর মধ্যেই স্থির হয়েছে জুনিয়র হাই স্কুল থেকে আর হাই স্কুল করা হবে না, সরাসরি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করা হবে। নীতির বিচারে এসে সমর্থন করতে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কয়েকটি শর্ত নিয়ে। জুনিয়ার হাই স্কুল ১০ হাজার টাকা রিজার্ভ ফণ্ডের ব্যবস্থা, ১২টি ৪০০ স্কোয়ার ফিটের ঘর, কমপক্ষে তিন জন অনার্স গ্রাজুয়েট যোগাড় করে হায়ার সেকেণ্ডারীর কোর্স পড়াবার অনুমতি চাইতে হবে। একটি অলিখিত কানুন এর সাথে রয়েছে, নতুন স্কুলের জন্য সরকার কোন আর্থিক দায়

দায়িত্ব নেবেন না। শিক্ষার প্রসার সমস্যার সহজ সমাধান বোধ হয় সরকার এভাবেই করবেন।

সরকার যদি চাহিদা অনুসারে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি না করেন তাহলে স্কুলগুলিতে অতিরিক্ত ছাত্র ভিড় হবে সেখানে বাছাই করা ছেলেদের নেওয়া হবে বাদ বাকী ছেলে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে না। যেখানে সবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার খোলা থাকা উচিত সেখানে যদি 'বাছাই'র ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি (*Selective admission*) করা হয় তাহলে দেশের সামগ্রিক উন্নতির পথই রুদ্ধ করা হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সুযোগ নিয়ে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষায় দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়বার সুযোগ অধিকাংশকেই দিতে হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে যারা পড়বে তাদের ক্ষেত্রে *Selection admission* হলে উচ্চ শিক্ষার মানের অবনতির কোন ভয় থাকবে না।

॥ ৩ ॥ পাঠক্রম পুনর্গঠন সমস্যা

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন পাঠক্রম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কমিশন প্রচলিত পাঠক্রম প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পাঠক্রম সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত। কলেজীয় শিক্ষার দিকে নজর রেখে পাঠক্রম রচিত বলে অত্যন্ত পুঁথিঘেষা ও তত্ত্বনির্ভর (*Bookish and theoritical*) হয়ে উঠেছে। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন যে পাঠক্রম রচনা করেছেন তা কম বেশী সব রাজ্যেই কার্যকরী করা হয়েছে। কিন্তু নতুন পরিবর্তনের ফলে কি হয়েছে সে সম্পর্কে এডুকেশন কমিশন যে মন্তব্য করেছেন তা তুলে দেওয়া হ'ল : *"But the changes introduced have not brought about the transformation desired. Most of the defects pointed out in the report still persist in the curriculum programmes and new defects have appeared in consequence of the re-organisation a secondary education……*

"The curriculum is still conceived and is largely of unilateral character…… There is not sufficient variety and elasticity even in the diversified coure of the multipurpose schools……University requirements continue to influence to a large degree the educational programmes of the secondary schools. The education imparted in most secondary school is generally speaking of the academic type loading at the end of the school course to university admission rather than entry into a vocation."

"Inspite of the reforms and partly because of them, the curriculum is heavy and overloaded.……The multiplicity of subjects which was criticised in the report of the commission, has not been reduced inspite of the revision of the curriculum."

"The curriculum still lays very great emphasis on the acquisation of the knowledge, and comparatively little on the building up of those skills, attitudes, values and interests which are essential for the full development of the student's personality and this fruitful participation in the democratic citizenship." (*Discussion Paper on Major Problems of Secondary Education—Education Commission, Govt of India.*)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হ'ল। বর্তমান প্রচলিত পাঠক্রমের ত্রুটি কোথায় সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করে তা দূর করতে চেয়েছিলেন এডুকেশন কমিশন রচিত আলোচনা পত্রে ও কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে মুদালিয়র কমিশন সে সব ত্রুটি দূর করতে পারেননি।

পাঠক্রম বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি কতকগুলি বিষয় সমষ্টি যা বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর জীবনের শ্রেণীগৃহ, গ্রন্থাগার কর্মশালা, খেলার মাঠ, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, ব্যর্থতা ও সাফল্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষালাভ করে, সামগ্রিকভাবে তাই হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা পাঠক্রম। শিক্ষা হবে জীবনমুখী পাঠক্রম সেইভাবে ইহা রচিত হবে। বর্তমান গুরুভার সিলেবাস আমাদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সাথে পাঠক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি স্তর আমরা অতিক্রম করে এসেছি; সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের পাঠ পরিবর্তন করতে হবে। শুধু নামে মাত্র বহুমুখী পাঠক্রম না হয়ে কার্যক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। উচ্চতর বিদ্যালয়ের জন্য ৭টি শাখার (*stream*) ব্যবস্থা হলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দুটি শাখা—কলা ও বিজ্ঞান। যেখানে তিনটি কোর্স রয়েছে সেখানে তৃতীয়টি হচ্ছে বাণিজ্য। বৃত্তিমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা দু'একটি বিদ্যালয়েই আছে মাত্র।

পাঠক্রম ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে—এ বোধ যাতে সৃষ্ট হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড কোনটিই অবজ্ঞার নয়। প্রসঙ্গক্রমে (*craft*) শিক্ষার কথা বলা যেতে পারে। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ-এর মূল্য সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। পাঠক্রমে (*craft*) আছে স্কুলে তাই রুটিনে সময় দেওয়া আছে, এর-মধ্য দিয়ে যা শেখান চলে আমরা তা শেখাই না।

সেকুলার রাষ্ট্রে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে মুদালিয়র কমিশন বাদ দিয়েছিল। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্তমানে দ্বিমতের অবকাশ নেই বস্তুবাদ জীবনের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে না, সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে পাঠক্রমের মধ্যে স্থান দিয়ে শিক্ষার মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠক্রম প্রসঙ্গে পাঠ্য পুস্তক সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। শিক্ষা বিভাগ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। লক্ষ্য ছেলেমেয়েদের জন্য আদর্শ পুস্তক রচনা ও অল্প মূল্যে পুস্তক সরবরাহ। বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণের প্রচেষ্টার ফল শুভ হয় নি। যে কোন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকের এ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। সরকার প্রকাশিত বইগুলি দামে সস্তা অবশ্য যদি সংগ্রহ করা যায়। একমাত্র সাহিত্য ব্যতীত সরকার থেকে আর কোন বই প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য কিছু বই মনোনীত করা হবে, স্কুলগুলি প্রয়োজন মত বই পাঠ্য করবে। প্রতিযোগিতা থাকায় প্রকাশকের বইয়ের মান উন্নত করবার জন্য দায়িত্ব থাকবে। পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণ সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন ও শিক্ষা কমিশন যা বলেছেন তাই গ্রহণ করা সঙ্গত।

॥ ৪ ॥ শিক্ষাপদ্ধতি ॥

পাঠক্রমের সাথে শিক্ষাপদ্ধতির প্রশ্নটি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। মাধ্যমিক কমিশন ও শিক্ষা কমিশন বলেছেন, সর্বোত্তম পাঠক্রম আর সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করবার পরও শিক্ষার আয়োজন মৃতই থাকবে যতক্ষণ না সুযোগ্য শিক্ষক ও সঠিক শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার প্রাণ সঞ্চার না করেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিকে অনুকরণ করে পড়ান হয় না, এজন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান। আমাদের দেশে অধিকাংশ মাধ্যমিক শিক্ষক ট্রেনিংপ্রাপ্ত নন। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তকদের উদ্ভাবিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না। যারা শিক্ষক শিক্ষণ ডিগ্রীধারী তারাও তাদের অধীত বিদ্যাকে প্রয়োগ করবার সুযোগ পান না। শ্রেণী শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিকে প্রয়োগ করার সুযোগ খুব কম। একজন শিক্ষককে একটি শ্রেণীতে যে পরিমাণ ছাত্র পড়াতে হয় সেখানে ব্যক্তিগত যত্ন (*individual care*) নেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। ৩৫।৪০ মিনিটের একটি পিরিয়ডে ৪০।৪৫টি ছাত্রকে পড়াতে হয়। প্রতিটি ছেলের জন্য যে মনোযোগ প্রয়োজন তার সামান্যতম অংশটুকুও আমরা দিতে পারি না। প্রাথমিক শিক্ষায় যেখানে প্রতিটি ছেলের জন্য বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য সেখানে যদি একটি শ্রেণীতে ৩৫।৪০ জন ছাত্র থাকে তাহলে ৩৫ মিনিটে একজন শিক্ষক কি করতে পারেন ? শিক্ষক প্রতি ছাত্রের হার কমাতে হবে যাতে একজন শিক্ষক প্রতিটি ছেলের জন্য কিছু সময় দিতে পারেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক যাতে ট্রেনিং পেতে পারেন সেজন্য ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা বাড়াতে হবে। লাইব্রেরীর সুবিধা যাতে ছেলেরা গ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম না থাকলে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা কখনও সার্থক হবে না, তাই শিক্ষা সরঞ্জাম রাখতে হবে। গবেষণাগার, বিষয় কক্ষ, স্কুল মিউজিয়াম প্রভৃতি সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে জড়িত, স্কুলে এ সবের

ব্যবস্থা করতে হবে। রেডিও ও টেলিভিশন যন্ত্র আধুনিক শিক্ষা সহায়ক উপকরণরূপে ব্যবহার করতে হবে। শ্রেণী শিক্ষার উন্নততর পাঠপদ্ধতি কি করে প্রবর্তন করা যায় এ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শিক্ষকদের স্বাধীনভাবে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ দিতে হবে। চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যে অন্ধ মোহ রয়েছে তা দূর করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যাতে শিক্ষকগণ গ্রহণ করে সে চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের সীমায় বদ্ধ না রেখে *project, activity method* অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শ্রেণীশিক্ষায় পাঠককে চিত্তাকর্ষক করে তুলবার জন্য শিক্ষা দেবার নানাপ্রকার *Audio-Visual aid* ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি নীরস ও প্রাণহীন হলে আমাদের শিক্ষার সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

॥ শিক্ষক সমস্যা ॥

শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণের দায়িত্ব শিক্ষকদের। শিক্ষার মান উন্নতি করবার চেষ্টা সুযোগ্য শিক্ষকের সাহায্যেই সার্থক হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা সংস্কারের কোন চেষ্টাই সার্থক হবে না যদি না শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি হয়। মাধ্যমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (১) শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা (২) শিক্ষকের বৃত্তিগত যোগ্যতা ও শিক্ষকতা গ্রহণের পূর্বে ও পরে অর্জিত শিক্ষণ সম্পর্কীয় যোগ্যতা (৩) চাকুরীর ও কাজের অবস্থা (*conditions of service and conditions of work*)।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষকতা করতে আসেন তাদের বর্তমানে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়। উচ্চতর মাধ্যমিক যারা পড়েন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে বি, এ. (অনার্স) বা এম, এ.। মাধ্যমিক স্তরের জন্য বি, এ, বি, এ. (অনার্স) এম, এ, সব রকম শিক্ষকই নেওয়া হয়। তবে নিম্নতম যোগ্যতা বি, এ।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর সুযোগ্য শিক্ষক সংগ্রহ করা এক কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। মেধাবী ছাত্ররা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে আসে না। যদি দু'একজন আসে তারা কিছুদিন থেকেই অন্য জায়গায় সুবিধা হলেই শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। সহরের স্কুলগুলিতেও বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স শিক্ষক যোগাড় করা অসম্ভব। গ্রামাঞ্চলে নিম্নতম মানের শিক্ষক দিয়ে দিনের পর দিন কাজ চালানো হচ্ছে। দর্শন কি সংস্কৃতের এম, এ তাকে দিয়ে হয়ত ইংরেজী বা ইতিহাস পড়ান হচ্ছে। যে লোক স্কুলের সীমা পার হয়ে কোনদিন ভূগোল পড়েন নি তাকে দিয়েই উচ্চ শ্রেণীর ভূগোল পড়ান হচ্ছে। একই বিদ্যালয়ে হয়ত এক বা দুই বিষয়ের তিন চার জন অনার্স বা এম, এ রয়েছেন তাঁদের দিয়েই সব বিষয় পড়ান হচ্ছে। ফলস্বরূপ শিক্ষার মান স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয় পড়ান হয় অনেক সময়

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ের সাথে তার কোন যোগাযোগই থাকে না। এতে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকও অনেক সময় স্কুলের পাঠ্য পড়াতে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

অদূর ভবিষ্যতে যদি স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণী প্রবর্তন হয় তাহলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য শুধুমাত্র এম, এ. পাশ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত কিছু এম, এ. বা কিছু বি, এ. (অনার্স) পাস শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। যে শিক্ষকের যে বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে তাকে শুধু সেই বিষয় পড়াতে দিতে হবে। ইতিহাসের এম. এ, ইংরেজী পড়াবে, বাংলার এম. এ, সংস্কৃত পড়াবে, এ অবস্থা কোন রকমেই চলতে দেওয়া উচিত নয়।

॥ ৬ ॥ শিক্ষক শিক্ষণ ॥

পড়ান একটি কঠিন কাজ। উচ্চ ডিগ্রীধারী হলেই যোগ্য শিক্ষক হবেন এমন কোন কথা নেই। পড়াবার কৌশল শিক্ষককে জানতে হবে। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির, শিশুর মন, রুচি শক্তিসব কিছু জেনে শিক্ষার্থীর মনে পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে, এজন্য প্রয়োজন শিক্ষকের ট্রেনিং। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকের শিক্ষকতার কোন ট্রেনিং নেই। ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় সহস্র সহস্র শিক্ষক ট্রেনিং এর জন্য দরখাস্ত করে ভর্তি হবার কোন সুযোগ পান না।

আমাদের দেশের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমতঃ শিক্ষকদের উপর বিরাট একটি পাঠক্রমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১০ থেকে ১১ মাসের মধ্যে যে পাঠক্রম শেষ করতে হয় তার জন্য কমপক্ষে দু' বছর সময় প্রয়োজন। অর্থের অভাবে ও অল্প সময়ে বেশী সংখ্যক ট্রেনিং-এর জন্য এই এক বৎসর ট্রেনিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেনিং-এর পর কোন *Refresher course*-এর ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। গবেষণালব্ধ জ্ঞান যাতে শিক্ষকেরা জানতে পারেন, সেজন্য সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও শিক্ষা-সম্মেলন প্রভৃতি নিয়মিতভাবে করা উচিত। *In service education programme* গ্রহণ করে শিক্ষারত শিক্ষকদের জন্য গ্রীষ্মকালে বা পূজার ছুটিতে স্বল্পকালীন শিক্ষার (*Short intensive course*) ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শিক্ষকদের অবস্থা আলোচনার শুরুতে বলেছি বর্তমানে মেধাবী ছেলেরা শিক্ষকতার জন্য আসে না। যোগ্য শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকতাকে আকর্ষণযোগ্য করে তোলবার মত কোন ব্যবস্থা শিক্ষাবিভাগ আজও করে উঠতে পারেন নি। শিক্ষকতা শুধুমাত্র বৃত্তিরূপে গ্রহণ না করে ব্রতরূপে একে গ্রহন করতে হবে। একথার যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ব্রত-ধারীকে বাঁচবার মত বেতনের ব্যবস্থা করা কি সমাজের কর্তব্য নয়? সমাজের মর্যাদার মানদণ্ড যেখানে অর্থ, সেখানে অর্ধভুক্ত, পরিবার পালনে অসমর্থ শিক্ষকের কতটুকু সামাজিক মর্যাদা আছে? শুধুমাত্র আদর্শবাদের ফাঁকা বুলিতে মুগ্ধ হয়ে কোন লোক

শিক্ষকতা গ্রহণ করতে আসে নি। ভাল ছাত্র যারা আসে তারা কিছুদিনের জন্য এসে অন্য চাকুরীর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে. তারা এসে স্কুলের অসুবিধার সৃষ্টিই বেশী করে। একটু ভাল চাকুরীর সন্ধান পেলেই স্কুলের স্বার্থ, ছাত্রের স্বার্থ কোনদিক বিবেচনা না করে তারা চলে যায়। বেতন যেখানে সামান্য, চাকুরীর নিরাপত্তার যেখানে অভাব, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা যেখানে সীমাবদ্ধ, অবসর গ্রহণের পর যেখানে ভবিষ্যতে অনশনে দিন যাপনের প্রতিশ্রুতি সেখানে শিক্ষকতা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্ররা আসবে এরূপ আশা করা বাতুলতা। মূল্যমানের সাথে সঙ্গতি রেখে বেতনের হার পুনর্বিন্যাস, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের সুবিধা, ট্রিপল বেনিফিট স্কীম চালু করা (*Penson cum P. F. cum Insurance*), সন্তানের শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বাসগৃহের ব্যবস্থা, সস্তা ভ্রমণের সুবিধা, চাকুরীর নিরাপত্তা প্রভৃতি ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করতে চাই না। শিক্ষকরা ভুক্তভোগী তাঁরা তাঁদের অবস্থা ভালই জানেন। অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অর্থের অভাব এটা যুক্তি হিসাবে অচল। শিক্ষার জন্য অর্থ কোন দিনই সরকারী তহবিলে থাকে না। তবে যোগাড় করতে হবে। না হলে শিক্ষান্নোতির সব পরিকল্পনাই "কাগজে-পরিকল্পনায়" (*Paper Planning*) রূপান্তরিত হবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি না হলে শিক্ষকরা সমাজের প্রতি তাঁদের যে কি কর্তব্য আছে তা পালন করতে সক্ষম হবে না। ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের স্বার্থে এখানে কৃপণতা করলে সে ভুলের বোঝা আগামী কালের বংশধরদের বহন করতে হবে। কি করে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করা যায় শিক্ষা কমিশন তার নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান তাঁদের দাবী সরকারকে জানাচ্ছেন। ন্যায়-সঙ্গতভাবে শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ পূরন করা না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টা দিবাস্বপ্নে পরিণত হবে।

॥ ৭ ॥ পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ সমস্যা ॥

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি জটিল সমস্যা হচ্ছে পরীক্ষাবিধি। বহুদিন থেকে বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করে প্রচলিত পরীক্ষাবিধির আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রথম কমিশন (রাধাকৃষ্ণণ কমিশন) বলেছিলেন, তাঁরা যদি শিক্ষার একটিমাত্র ক্ষেত্রেও কোন পরিবর্তন বা সংস্কার সুপারিশ করেন তাহলে সেটা হবে প্রচলিত পরীক্ষা সম্পর্কে। কমিশন বলেন, পরীক্ষা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে পরীক্ষার আমূল সংস্কার আরও বেশী প্রয়োজন। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন, কিন্তু তার ফলে পরীক্ষা-ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি বিশেষ দূর হয় নি। এরপর মুদালিয়র কমিশন, তাঁরাও শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার অশুভ প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। প্রচলিত পরীক্ষা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন :—

"The examination to-day dictate the curriculam instead of

following it, prevent any experimentation hamper the proper treatment of subjects and sound method of teaching foster a dull uniformity rather than originality, encourage the average pupil to concentrate too rigidly upon too narrow a field and thus help to develop wrong values in education. Pupils assess education in terms of success in examinations. Teachers, recognise the importance of eaternal examination which can test only a narrow field of the pupils interests and capacities and so inevitably neglect the qualities which are more important though less tangible."

মুদালিয়র কমিশন পরীক্ষা-সংস্কার ও মূল্যায়ণের নতুন রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৫৬ খ্রীঃ ভূপালে পরীক্ষা-সংস্কারের জন্য এক সর্বভারতীয় আলোচনা চক্রের আলোচনা হয়। আলোচনায় কমিশনের সুপারিশ-সমূহ কার্যকরী করবার জন্য কয়েকটি কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৫৮ খ্রীঃ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পরীক্ষা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ব্লুমের উপদেশে ভারত সরকার *Central Examination unit* প্রতিষ্ঠা করেন। গত ছয় বছরে ইউনিট অনেক কাজ করেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা নিশ্চয়ই *Unit* থেকে চালান হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি প্রচলিত পরীক্ষার কোন পরিবর্তন হয় নি। রচনামূলক পরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার একচ্ছত্র আধিপত্যে এখনও কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। স্কুলের শিক্ষা বহিঃপরীক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মূল্যায়ণের নতুন পদ্ধতির এখানে কোন স্থান নেই। তোতাবৃত্তি (*rote learning*), বাছাই করে পড়া, নোট বইয়ের উপর নির্ভরশীলতা সবই যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। পরীক্ষায় পাস করাটাই জীবনের শেষ কথা। স্কুল, শিক্ষক, ছাত্র সবকিছুর ভালমন্দ বিচার হচ্ছে পরীক্ষার মাধ্যমে। জ্ঞানার্জ্জন নয়, যে কোন ভাবে পরীক্ষায় পাস করা হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য।

প্রচলিত ব্যবস্থা একটি মাত্র পরীক্ষায় ১০ বা ১১ বছরের শিক্ষার চূড়ান্ত বিচার হচ্ছে। শিক্ষার্থীর স্কুলের কাজের কোন বিচারের ব্যবস্থা নেই। ছাত্রের সারা বছরের কাজের মূল্যায়ণ হওয়া উচিত। স্কুলের সারা বছরের কাজের বিচারের সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (*cumulative record card*) রাখতে হবে। উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে চরম পরীক্ষার আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের *Internal assessment* ব্যবস্থা থাকবে। ধীরে বহিঃপরীক্ষার মূল্য কমিয়ে দিতে হবে। শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু বহিঃপরীক্ষার বিলোপ সাধনের কথা যেন আমরা চিন্তা না করি। দুটি পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সুষ্ঠ সমন্বয় সাধন করতে হবে। আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে কোন কোন রাজ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে। ফল যে খুব উৎসাহব্যঞ্জক হয়েছে তা বলা যায় না। তাই *Internal* ও *external* দু'রকম ব্যবস্থাই থাকবে। *Internal assessment* এর সাফল্য প্রধান শিক্ষকদের উপর নির্ভর করে।

তাঁদের মার্ক বণ্টন, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য হতে হবে। নিজের স্কুলের ছাত্র বলে তাদের সম্পর্কে যেন দুর্বলতা না থাকে।

Objective test সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বেশী জোরের সাথে এই পদ্ধতি গ্রহণ করবার কথা বলেছেন। শিক্ষাবিদ্‌গণ ওই ব্যবস্থাকেও দোষ ত্রুটিহীন বলে সার্টিফিকেট দেন নি। তবু পরীক্ষায় আংশিকভাবে একে গ্রহণ করা চলতে পারে। হাঁ বা না এরূপ উত্তর না হয়ে শিক্ষার্থীকে একটু চিন্তা করে দু'চার লাইন লিখতে হবে এমন প্রশ্ন হওয়া উচিত।

দেখা গিয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজীতে ফেলের হার সর্বাধিক। এর পরেই অংকের স্থান। অংক বা ইংরেজীতে ফেল করলেই একটি ছেলে পরীক্ষায় ফেল করল—এ নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। সব বিষয়ে খুব ভালো নম্বর পেয়ে একটি বিষয়ে ফেল করলে *compartmental* পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। একটা নির্দিষ্ট নম্বর পেলে এক বিষয়ে ফেল করলে সে ছেলেকে আটকে রাখা হবে না এ ব্যবস্থা থাকা উচিত। এভাবে পাস করিয়ে দিলে সে ছেলে ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারবে এমন যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

মার্ক-বণ্টন প্রথায় অনেক ত্রুটি আছে। এ সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে—অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনী জড়িয়ে আছে ত্রুটিপূর্ণ মার্ক-বণ্টনের সাথে। মার্ক-বণ্টন প্রথা নিখুঁত বা ত্রুটিশূন্য হবে একথা বলা যায় না। বিশেষ করে রচনামূলক পরীক্ষায় ঠিক নিক্তির ওজনে মেপে মার্ক দেওয়া যায় না। মুদালিয়র কমিশন মার্কের পরিমাপে সংখ্যার বদলে প্রতীক (যেমন *A-B-C-D-E*) ব্যবহার করার কথা বলেছিলেন। হার্টগ কমিটি *five point scale* ব্যবহার করবার কথা বলেছেন। পরীক্ষামূলক ভাবে কোন কোন অঞ্চলে এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে। গবেষণায় সাফল্য লাভ করলে পরে তার ব্যাপক প্রয়োগ করা যাবে। নতুন কোন পরীক্ষা বা মূল্যায়ণ পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের মনে একটা ভীতি আছে, ফলে প্রচলিত পরীক্ষার বহু ত্রুটির কথা আমরা জানলেও নতুন কোন নীতি বা পদ্ধতি গ্রহণে আমাদের উৎসাহের খুবই অভাব। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে হলে কিছুটা ঝুঁকি নিতে হবে। ভুল-ভ্রান্তি যদি হয়ও তবু সেই দায়িত্ব নিয়েই বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো দরকার [পরীক্ষা প্রসঙ্গে মুদালিয়র ও কোঠারী কমিশনের সুপারিশ দেখুন]।

॥ ৮ ॥ আর্থিক সমস্যা

শিক্ষার জন্য অর্থের অপব্যয় করতে বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোন দিনই রাজী ছিল না। ১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনে *Education Clause* বলে একটি ধারা জুড়ে দিয়ে কোম্পানীকে বলা হয় ভারতে শিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। টাকা কিভাবে খরচ হবে সে হ'ল এক সমস্যা। টাকা খরচের প্রশ্নে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ ও বিরোধ মীমাংসায় মেকলের সিদ্ধান্ত ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের

কাহিনী আমরা জানি। উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সরকার থেকে বিদ্যালয়গুলিতে গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন তখন থেকেই হয়। সরকার থেকে বিদ্যালয়ে সামান্য সাহায্যের পিছনে একটা উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল তা হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে বিদ্যালয়ে পরিচালনায় হস্তক্ষেপ। ইংরেজ যুগে অর্থের অভাবে শিক্ষার প্রসার হয় নি একথা সুবিদিত। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও অর্থের অভাব এই দুইয়ের মাঝে যখন ১৯৩৭ খ্রীঃ কংগ্রেস মন্ত্রীগণ কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য গান্ধীজী তাঁর ঐতিহাসিক বুনিয়াদী শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, প্রাথমিক শিক্ষা হবে স্বনির্ভর (*Self-Supporting*)। শিক্ষা স্বনির্ভর হয় নি—হওয়া সম্ভবও নয়। ইংরেজ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ শিক্ষার জন্য খরচ করে নি। এরপর এল স্বাধীনতা—লোকের মনে আশা জাগল, অর্থের অভাবে শিক্ষার উন্নতি, শিক্ষার প্রসার হচ্ছে না এই পুরানো বুলি শুনতে হবে না। কংগ্রেস জন্মক্ষণ (১৮৮৫) থেকে জাতীয় শিক্ষা প্রসারের দাবী করে এসেছে, তাই কংগ্রেস সরকার অর্থের জন্য শিক্ষাকে পিছিয়ে দেবে একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু জগতে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে, যেমন জাতীয় সরকার জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন নি।

যে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার অর্থের অভাবে আটকে থাকে সে দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য অর্থের দাবী করাও কঠিন। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যয়বহুল শিক্ষা। এদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার সরকারী চেষ্টায় হয় নি—হয়েছে জনসাধারণের চেষ্টায়। কিন্তু বর্তমানে ব্যয় বহুল মাধ্যমিক শিক্ষার খরচ বহন করা বেসরকারী চেষ্টায় বা স্কুলের বেতন দ্বারা সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমানে অর্থের দিক থেকে পুরোপুরি সরকারের উপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনীয় স্থান সংগ্রহ, বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, সাজসরঞ্জাম ক্রয়, শিক্ষকের বেতন, গবেষণাগার, পাঠাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা, সবকিছুর জন্য অর্থের প্রয়োজন। সরকার থেকে শিক্ষার জন্য পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী ব্যয় করেছেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। খরচের অঙ্ক বেড়েছে কিন্তু খরচ সুষ্ঠুভাবে হয় না। সরকারী টাকা যদি নিয়মিতভাবে স্কুলে আসত তাহলে শিক্ষকদের দুঃখ দুর্দশার অনেকটা লাঘব হ'ত। পরিকল্পনাবিহীন স্কুল স্থাপন করে সরকারী অর্থের বহু অপচয় রোধ করা সম্ভব হলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য আরও অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ও মুদালিয়র কমিশন শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক মূল্যবান সুপারিশ করেছেন, কিন্তু সুপারিশসমূহ কার্যকরী করতে যে অর্থের প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন নি। মুদালিয়র কমিশন বৃত্তিশিক্ষার প্রসারের জন্য শিল্প-শিক্ষার নামে একটি কর স্থাপনের কথা বলেছিলেন, জাতীয় শিল্পের আয় থেকে একটা অংশ বৃত্তি শিক্ষার জন্য ব্যয় করবার কথা কমিশন বলেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থ-

নৈতিক প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত বলে দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। অবশ্য শিক্ষা কমিশনসমূহ শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে গঠিত, তাদের কাছ থেকে আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ আশা করা যায় না। একাজ অর্থনীতিবিদ্‌দের। এজন্য প্রয়োজন ছিল শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে যে অর্থের প্রয়োজন, তা কি করে যোগাড় করা সম্ভব তার জন্য দেশের অর্থনীতিবিদ্‌দের নিয়ে কমিশন গঠন।

বর্তমান এডুকেশন কমিশন তাদের সুপারিশসমূহ কার্যকরী করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে, কি করে সেই অর্থ সংস্থান করা সম্ভব তা বিচার বিবেচনা করে দেখবার জন্য একটি *Task force* নিয়োগ করেছেন। সামগ্রিকভাবে তারা অর্থ-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন আশা করা হয়েছিল। কমিশন আর্থিক সমস্যা সমাধানের কোন পথের সন্ধান দিতে পারেন নি।

॥ ৯ ॥ প্রশাসনিক সমস্যা

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন অত্যন্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সমস্যা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন ও ৪৩ দফা সুপারিশ করেছেন। তাদের সুপারিশ সরকার আংশিক ভাবে গ্রহণ করেছিল কিন্তু কার্যে রূপ দিতে গিয়ে কমিশনের নির্দেশ যথাযথ পালন করা হয় নি।

মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার উপর থাকা উচিত এ নিয়ে মতভেদ আছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ কতটা থাকবে তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেহ কেহ মনে করেন মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। কোথাও এ দাবী মাধ্যমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণের দাবীতে পরিণত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ও আর্থিক দায়দায়িত্ব নেবার মত সামর্থ্য বর্তমানে সরকারের নেই।

বর্তমান কাঠামোতে শিক্ষা রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্বাধীন বিষয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করে শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় করতে চেয়েছিলেন। রাজ্য সরকারসমূহ নিজেদের ক্ষমতারোধের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নি। শিক্ষা রাজ্যের বিষয় হলেও কেন্দ্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য ব্যতিরেকে বহু শিক্ষা-পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নয়, তাই রাজ্য সরকারগুলিকে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতেই হয়।

শিক্ষা বিভাগ ছাড়াও কেন্দ্রের ও রাজ্যের কয়েকটি বিভাগ নিজ নিজ বিভাগীয় বিষয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। শিক্ষা বিভাগের সাথে অনেক সময় এর কোন যোগাযোগ থাকে না। এতে অনেক সময় অর্থের অপচয় হয়। মাধ্যমিক কমিশন এজন্য সুপারিশ করেছিলেন কেন্দ্রে ও রাজ্যে যে সব মন্ত্রণালয় শিক্ষার সাথে জড়িত, তাদের কাজে সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় কর্তাদের নিয়ে *Co-ordinating Committee* গঠিত হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত বিভাগের সম্পদ একত্রিত করে যদি সুপরিকল্পিত খরচ করা হয়, তাহলে সাধারণ শিক্ষা ও বিভিন্ন বৃত্তি-শিক্ষার পরিকল্পনাসমূহ সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা সহজ হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারী শিক্ষাবিভাগ ছাড়াও রাজ্যসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ১(৯১৭-১৯) প্রথম মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বোর্ডের হাতে দিবার সুপারিশ করেন। তখন থেকেই ধীরে ধীরে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে বোর্ড গঠিত হয়। বাংলা দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯৫২ খ্রীঃ পঃ বঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। বর্তমানে পঃ বঙ্গে আইন বলে বোর্ড যেভাবে গঠিত হয়েছে তার ফলে বোর্ড পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। বর্তমান বোর্ডকে স্কুলের আর্থিক সাহায্যের দায় থেকে মুক্ত করে সরকার নিজে হাতে সে দায় গ্রহণ করেন। পঃ বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এখন একটি পরীক্ষা গ্রহণের যন্ত্রমাত্র। স্কুলের অনুমোদন বোর্ড দেয় তাও সরকারী সুপারিশ সাপেক্ষ। পঃ বঙ্গের স্কুলসমূহ এখন দ্বৈত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ ছাড়া অবশ্য স্থানীয় পরিচালক সমিতি রয়েছে। পরিচালক মণ্ডলীকে আশ্রয় করে স্থানীয় রাজনীতি ও দলাদলি অনেক সময় স্কুলে প্রবেশ করে। রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব ও দলীয় স্বার্থ সাধনের চেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় স্কুলে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তাতে শিক্ষা-দরদীমাত্রেই শঙ্কিত ও ব্যথিত।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনার একটি প্রধান অসুবিধা বিভাগীয়-বিজ্ঞপ্তি (*circular*) ছাড়া স্কুল পরিচালনার কোন বিধি (*code*) নেই। যেখানে *code* রয়েছে তা অতি পুরানো, বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তার কোন সংগতি নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার মত একটা বিরাট ব্যাপার পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকবে না এটা আশা করা যায় না। কিন্তু, বাস্তবে তাই ঘটছে, তাই স্কুল পরিচালনায় পদে পদে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী অত্যাবশ্যক। সেই সাথে প্রয়োজন বোর্ড ও সরকারী শিক্ষা-বিভাগের মধ্যে সহযোগীতামূলক সম্পর্ক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি যদি একাধিক শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি হতে বাধ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে যতটা সম্ভব সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিতে হবে। সরকারী শাসনতন্ত্রের অধীনে বিদ্যালয়সমূহ একটা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হলে, বিদ্যালয়সমূহ

হবে বৈশিষ্ট্যবর্জিত সরকারী যন্ত্রের একটা অংশ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনায় ও নীতি নির্ধারণে জনগণের স্থান থাকা উচিত।

॥ ১০ ॥ পরিদর্শন

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার দায়িত্ব সরকারী শিক্ষা-বিভাগ ও বোর্ড ভাগ করে গ্রহণ করেছে, কিন্তু পরিদর্শনের দায়িত্ব কেহই গ্রহণ করে নি। সরকারী পরিদর্শক আছেন কিন্তু তাদের প্রশাসনিক কাজ এত বেশী যে বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় তাঁরা পান না। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে বলেছেন। সুষ্ঠ পরিচালনা ও শিক্ষার উন্নতির জন্য অভিজ্ঞ পরিদর্শকের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। জেলা স্কুল পরিদর্শকগণ তাদের দপ্তর সামলিয়ে খুব কম সময় পান বিদ্যালয় পরিদর্শনের। তারপর একজন জিলা পরিদর্শকের এলাকায় এত বেশী স্কুল যে দু'বছরের মধ্যে একবার করে একটা স্কুল পরিদর্শন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিদর্শক গেলেও কয়েক বছর বাদে ৩।৪ ঘণ্টায় তিনি কি করতে পারেন? এছাড়া পরিদর্শক সম্পর্কে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের মনোভাব এখনও পরিবর্তন হয়নি। পরিদর্শক এখনও ভীতির ও সন্দেহের পাত্র। পরিদর্শক যে বিদ্যালয়সমূহের হিতৈষী বন্ধু এই মনোভাব সৃষ্টি করতে না পারলে পরিদর্শন-ব্যবস্থার সার্থকতা কিছুই থাকবে না। পঃ বাংলার পরিদর্শন ব্যবস্থার দিকে চেয়ে এ আলোচনা করা হলেও একথা সমস্ত রাজ্যের পরিদর্শন-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রযোজ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন রাজ্যসমূহের পরিদর্শন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কার্যকরীভাবে কিছু করা হয়নি। ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ সারা ভারতে জেলা পরিদর্শকের সংখ্যা ছিল ৫৮০ জন (৫১৭ পুরুষ ৬৩ জন মহিলা)। সমগ্র দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদর্শনের কাজ এত অল্পসংখ্যক লোক দিয়ে সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও বিদ্যালয়ের সুপরিচালনার জন্য পরিদর্শকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করে পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করতে হবে। পরিদর্শকদের দপ্তর পরিচালনা সক্রান্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে হবে। যথাসম্ভব অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মধ্য থেকে পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে। রুটিন মাফিক পরিদর্শন-ব্যবস্থা বাতিল করে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিদর্শন-ব্যবস্থার অবিলম্বে সংস্কার অত্যাবশ্যক।

॥ ১১ ॥ অপচয়

মাধ্যমিক শিক্ষার অপচয় নিয়ে আলোচনা খুব কম হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়; এছাড়া বার্ষিক পরীক্ষায় বহু শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারে না। অনুন্নয়নের দরুণ মাধ্যমিক শিক্ষায় অর্থ ও শক্তির যে বিরাট অপচয় হচ্ছে তার খোঁজ আমরা রাখি না। কারণ অনুসন্ধান করে কি করে এই অপচয় রোধ করা যেতে পারে সে কথা আমরা চিন্তা করি না।

অনুসন্ধান ছাড়াও পরিকল্পনাহীনভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিরাট অর্থ ও শক্তির অপচয় হচ্ছে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই। এ সম্পর্কে সমীক্ষা হয় নি তাই পরিসংখ্যানের অভাব। পঃ বাংলার মাধ্যমিক পরিষদ পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিক ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বিভিন্ন বিদ্যালয় কত ছেলে পাঠিয়ে থাকে ও তারা কি হারে কৃতকার্য হয় তা পর্যালোচনা করলে বাংলার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে।

পরীক্ষার ফল দিয়েই আমরা স্কুলের ভাল-মন্দ বিচার করি। ১৯৬৪ খ্রীঃ দেখা যায় বহু স্কুল থেকে বিজ্ঞান শাখায় একটি ছেলে পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছে, সে পাশ করেছে তাই সে স্কুলের বিজ্ঞান পাশের হার ১০০%। বোর্ডের একটি নিয়ম আছে কমপক্ষে ২০ জন ছাত্র না হলে কোন নতুন বিষয়ে শাখা (*stream*) খুলবার অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রচুর স্কুল আছে যারা ১—৫ জন ছাত্র পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। হয়ত এসব স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বেশী ছিল, অনুন্নয়ন জনিত অপচয় হয়েছে। অথচ বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু দুই বা একজন ছাত্র পাঠিয়ে ১০০% পাশের সুনাম কিনতে এগিয়ে এসেছে। ২।৩ মাইলের মধ্যে পাশাপাশি স্কুলের থেকে ছেলে পাঠান হয়েছে, কোন স্কুল থেকে ৩ জন কোন স্কুল থেকে ৪ জন। এখানে একটি স্কুল থাকার কোন বাধা ছিল না। উচ্চতর বিজ্ঞানের শাখার জন্য ৩ জন অনার্স গ্র্যাজুয়েট প্রয়োজন, সাথে প্রয়োজন সুসজ্জিত পরীক্ষাগারের। ২।৪টি ছেলের জন্য এরকম অর্থব্যয়ের প্রচুর দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র এক বছরের পরীক্ষার ফল দেখলেই মিলবে।

গ্রামে ছাত্রের অভাব, প্রয়োজন সংখ্যক ছাত্র মেলে না তবু সেখানে পাশাপাশি একাধিক বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। ঠিক এর বিপরীত চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় সরকারী স্কুলের দিকে চাইলে। সরকারী স্কুলগুলি সহরে অবস্থিত সেখানে ছাত্রের অভাব নেই। ১৯৬৩ খ্রীঃ বাংলাদেশের ২৭টি সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মানবিক শাখায় গড়ে ১৪ জন ও বিজ্ঞান শাখায় গড়ে ২৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে। বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় যদি একটি করে *Section* থাকে তাহলে প্রতি শাখায় ৪০ জন ছাত্র পড়তে পারে। সেখানে গড়ে ২৩ ও ১৪ জন ছাত্র কি করে হ'ল? শহরে ছাত্রের অভাব একথা কেউ বলবে না। হয়ত ছাত্র ছিল সুনামের মোহে সবাইকে পরীক্ষা দিতে পাঠান হয় নি, না হয় ছাত্র ভর্তির সুযোগ ছিল কিন্তু ছাত্র ভর্তি করা হয় নি। যে দিক থেকেই বিচার করা যাক একেই বলে অপচয়।

যেখানে উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র মেলেনা সেখানে বহুমুখী বিদ্যালয়কে একমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করা যেতে কারে। পল্লী অঞ্চলে *Zonal School* স্থাপন করা হবে। দূরাগত ছাত্রদের জন্য নামমাত্র ব্যয়ে হোষ্টেলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখানে ছেলেদের নানা শাখায় পড়বার সুযোগ থাকবে। পাঁচ সাতটি স্কুলের জন্য যে খরচ হবে তা বাঁচিয়ে বিনামূল্যে যদি ছেলেদের হোষ্টেলে রাখা যায় তবু খরচের দিক থেকে কম

হবে। পাঁচটি স্কুলের জন্য গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক যোগাড় করা যায় না কিন্তু সেখানে যদি ১টি আঞ্চলিক স্কুল থাকে তাহলে শিক্ষক যোগাড় করা যাবে। যত্রতত্র নিম্নমানের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় না খুলে *Zonal School* ও *Free Hostel*-এর ব্যবস্থা করা যায় কি না সে কথা চিন্তা করা দরকার। নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে না একথা বলছি না, কিন্তু, যেখানে প্রয়োজন নেই, দু'টি একটি ছাত্রের জন্য তিনটি শাখা নিয়ে একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে অনুমোদন দেওয়া হয় তা বন্ধ হওয়া উচিত। সুপরিকল্পিতভাবে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে অপচয় হ্রাস হবে। যে অর্থ এভাবে বাঁচবে তা দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির চেষ্টা সম্ভব হবে।

॥ অপচয় রোধ ও শিক্ষার মান উন্নয়নের উপায় ॥

মাধ্যমিক শিক্ষার অপচয় কি করে রোধ করা যায়, কি করে অনুন্নয়ন রোধ করা যায় এ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে অসাফল্যের দরুন বিরাট অপচয় রোধ করবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে :— (১) প্রত্যেক স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক আছে কি না। (২) সিলেবাস শেষ হচ্ছে কি না। (৩) ছেলেমেয়েদের বাড়ীর কাজ দেওয়া হচ্ছে কি না; (৪) পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষা হচ্ছে কি না। (৫) ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবকগণ খবর পাচ্ছে কি না। (৬) অনুমোদিত বই পড়ানো হচ্ছে কিনা। (৭) বার্ষিক পরীক্ষার আগে ক্লাসের কোর্স শেষ হচ্ছে কি না। (৮) বার্ষিক পরীক্ষায় সিলেবাসের সব অংশ থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে কিনা। (৯) বিদ্যালয়গুলিতে কিউমিলেটিভ রেকর্ড কার্ড রাখা হচ্ছে কি না। (১০) বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা আছে কি না। (১১) লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই আছে কি না। যে সব স্কুলে এর কোন একটির অভাব আছে তা দূর করবার চেষ্টা করতে হবে। পরিদর্শকগণ এগুলি দেখবেন ও প্রধান শিক্ষক সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন এ জাতীয় কোন ত্রুটি তাঁর স্কুলে থাকলে তা দূর করা। তাহলে আশা করা যায় শিক্ষার মান উন্নত হবে, বছর বছর যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে তা অনেকটা রোধ করা সম্ভব হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা হ'ল। ভবিষ্যতে সমস্যা আবার নতুন রূপ নেবে। গঠনশীল জাতির উন্নতির মুখে সমস্যা কখনও স্থির থাকে না। এর মধ্যে কতকগুলি সমস্যা বহুদিন ধরে দুষ্ট ব্যাধির মত মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে জড়িয়ে আছে। সরকার না চাইলেও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হবেই। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার নিম্নতম মান বলে মনে করা হয় না। প্রাথমিক শিক্ষাকে ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করতে হবে। তখন সমস্যা আবার নতুন রূপ নেবে। আমাদের সামনে বর্তমানে যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের জন্য এডুকেশন কমিশনের হাতে ভার দেওয়া হয়েছিল। কমিশন নীতি ও বাস্তব অবস্থার সাথে

সামঞ্জস্য বিধান করে তাদের সুপারিশ করেছেন। নীতির দিক থেকে কি হওয়া উচিত সেদিকে ঝুঁকে পড়লে সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং আগামী ১৫ বছরে কতটা অগ্রসর হতে পারব—আমাদের সার্থক বিচার করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হলেই শিক্ষা প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

॥ বর্তমান শতকে বাংলা ও পঃ বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ॥

বর্তমান শতকের মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি আলোচনার শুরুতে বিগত শতাব্দীর শেষে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রয়োজন। বিগত শতাব্দীতে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল। হান্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩) মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার ও বেসরকারী প্রচেষ্টাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের নীতি অনুসরণ করবার সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল নিতান্ত পুঁথি ঘেসা। এ শিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষার কোন স্থানই ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বার মুক্ত করবার জন্য কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। একটি সাধারণ শিক্ষার জন্য 'এ' কোর্স, আর একটি তরুণদের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য 'বি' কোর্স।

হান্টার কমিশনের সুপারিশ মত বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবার ফলে ১৮৮২ খ্রী'র পর থেকে ১৯০১ খৃঃ মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ প্রসার লাভ ঘটে। এই সময়ের মধ্যে সারা ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে ৩৯১৬টি থেকে ৫১২৪টি হয়। এ সময়ে প্রবেশিকা পরিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। এক বাংলাদেশেই প্রবেশিকা পরিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। ১৮৮২ খৃঃ-তে যেখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩,০০০ এই সংখ্যা ১৯০১ খৃঃ-তে বেড়ে হয় ৬৩০৯ জন।

বিংশ শতকের শুরু থেকে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত (১৯২১) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারে সরকার থেকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয় নি। বিংশ শতকের সুরুতেই লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতির নামে যে নীতি অবলম্বন করেন তাকে শিক্ষা সংহার বা শিক্ষা সংকোচন নীতি বলা যায়। ১৯০১ খৃঃ-তে লর্ড কার্জন সিমলায় ভারতের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সভার প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে ১৯০৪ খৃং-তে লর্ড কার্জন তার শিক্ষানীতি সম্পর্কে এক সরকারী প্রস্তাব প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাবে বিগত ত্রিশ বছরে মাধ্যমিক শিক্ষার অভাবনীয় অগ্রগতিকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়। সাথে সাথেই বলা হয় এই সংখ্যাগত বৃদ্ধি শিক্ষার মান অবনত করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবাধ বিস্তারের ফলে শিক্ষার মান যাতে নেমে যেতে না পারে সেজন্য কার্জনের প্রস্তাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদনে কড়াকড়ি করিতে বলা হয়। ১৯১৩ খৃঃ-র সরকারী প্রস্তাবেও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার অপেক্ষা মানোন্নয়নের জন্যই অধিক

শক্তি নিয়োগ করতে বলা হয়। এইজন্য স্কুলগুলির অনুমোদন ব্যবস্থা ও পরিদর্শন-ব্যবস্থার জন্য কঠোরতম বিধান (*code*) রচিত হয়। সরকারী বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তার ফলে ১৯০৫ খ্রীঃ'র মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার অভাবনীয় প্রসার ঘটে।

এ যুগের একটি স্মরণীয় ঘটনা জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন; বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর কলতাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বিদেশী প্রভাবমুক্ত করে জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দেবার জন্য এই শিক্ষা -পরিষদ্ গঠিত হয়। কলিকাতার বাইরে বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হবার সাথে সাথে বহু জাতীয় বিদ্যালয় উঠে যায়, কিন্তু এ সময়ে যে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয় তার স্থায়ী প্রভাব বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

পরবর্তী যুগ ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগকে দ্বৈত শাসনের যুগ বলা হয়। এই যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার স্বীকৃতিলাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যুগে উচ্চশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব আগ্রহের সঞ্চার হয়। ছোট ছোট শহর ও বড় বড় গ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার সুযোগ বেড়ে যায়। এ সময় বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই বেসরকারী প্রচেষ্টায়। জনসাধারণ নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির সুযোগ গ্রহণ করায় মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে মেয়েদের মধ্যে আগ্রহসৃষ্টি। বাংলাদেশে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ১৯২৫-২৬ খ্রীঃতে বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৯২৭ খ্রীঃতে সমগ্র প্রদেশে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বাংলাদেশে এসময়ে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ও শিক্ষক-শিক্ষণের অপ্রতুল ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে থেকেই যায়। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃতে দেখা যায় বাংলাদেশে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ২০·৭%। ট্রেনিংয়ের অভাব ছাড়াও বেসরকারী বিদ্যালয়ের চাকুরির অবস্থাও ভাল ছিল না।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের যুগে (১৯৩৭-৪৭ খ্রীঃ) মাধ্যমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হয় নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু আনুপাতিক হারে সে বৃদ্ধি পূর্বযুগের চেয়ে কম। প্রাথমিক শিক্ষার যদি দ্রুত প্রসারলাভ ঘটে, তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষারও অগ্রগতি হয়। সেদিক থেকে এই যুগে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার লাভ ঘটে নি, তাই তার প্রতিক্রিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। এছাড়া এ যুগে যুদ্ধজনিত বিপর্যয়ের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদের পক্ষে পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করাও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

॥ স্বাধীনতার পরবর্তী অবস্থা ॥

দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের মানচিত্র থেকে বাংলাদেশের নাম মুছে গিয়ে সেখানে সৃষ্টি হ'ল পশ্চিম বাংলার। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই পঃ বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে যাতে একটি স্বতন্ত্র বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যায় সে চেষ্টা চলছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই শিক্ষার জন্য ভিন্ন বোর্ড গঠনের যুক্তি সবাই মেনে নিয়েছিল। পঃ বঙ্গ সরকার ১৯৪৮ খ্রীঃ-র ২০শে এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১৪ জন সদস্য নিয়ে শিক্ষা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুপারিশে বলা হয় মাধ্যমিক শিক্ষাকালে ১১ থেকে ১৭ বৎসর পর্যন্ত নয় বৎসরকাল স্থায়ী হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা হবে দুই প্রকারের—(ক) উচ্চ বুনিয়াদী বা অষ্টম শ্রেণীযুক্ত জুনিয়র হাই স্কুল, (খ) একমুখী বা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব বাস্তবমুখী করতে হবে। অবিলম্বে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশ অনুসারে ১৯৫০ খ্রীঃতে মাধ্যমিক শিক্ষা আইন পাস করা হয় ও পঃ বঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়।

এই সময় সারা ভারতে শিক্ষা-সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রকে সভাপতি করে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পঃ বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য পঃ বাংলা সরকার ডাঃ বিমানবিহারী দে-র সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি 'দে কমিটি' নামে পরিচিত। ১৯৫৪ খ্রীঃর নভেম্বর মাসে 'দে কমিটি' তাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন। এই কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে পঃ বাংলা সরকার রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে পঃ বাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীযুক্ত প্রাথমিক বিভাগসমূহ একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
২। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
৩। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীযুক্ত জুনিয়র হাই স্কুল।
৪। নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বর্তমানে পঃ বাংলায় তিন শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে :—

(ক) পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়ার হাই স্কুল।

ও তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথা চালু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন পর্যন্ত এই প্রথার কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কারের পূর্বে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু করা ঠিক হবে না বলে অনেকে আপত্তি করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এ সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে কি ভাবে তিন বছরের ডিগ্রী পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স শিক্ষার উপযোগী করা যায় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা যায় সে সম্পর্কে ব্যাপক সুপারিশ করেছেন।

তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তিত রূপ কতটা সাফল্য লাভ করে তা না দেখে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথা প্রবর্তন করা সঙ্গত কি না এ বিষয়ে অনেকের মনেই একটা সংশয় ছিল। ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস কমিশন থেকে পরোক্ষভাবে আর্থিক চাপ না দিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যকারিতা ও সাফল্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ না হয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথাকে গ্রহণ করত কি না এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার সাফল্য সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করেছিল আজ তা সত্যে পরিণত হয়েছে। এখন দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স রাখতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষার আবার সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমানে প্রয়োজন ১২ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা ও তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স না হয়ে পুরান দুই বছরের ডিগ্রী-প্রথা পুনরায় চালু করা। যে ব্যস্ততার সাথে আমরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিকে রূপান্তরিত করেছি ও তিন বছরের ডিগ্রী-প্রথাকে চালু করেছি ততটা ব্যস্ত আমাদের না হলেও চলত। যদি বলা হয় ভারতে শিক্ষাসংস্কার কিছু হয় নি শুধুমাত্র বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষাকে একাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক ও তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে পরিণত করা হয়েছে তা হলে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। সেই পুরান পাঠক্রম, চিরাচরিত শিক্ষা পদ্ধতি ও সেকেলে পরীক্ষা-ব্যবস্থা কোনটার পরিবর্তন হয়েছে? যাঁরা শিক্ষার মধ্যে আছেন তাঁরা জানেন অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলা হয়েছে। পাঠক্রমের বোঝা বাড়াইলে কি শিক্ষার মান উন্নত হয়? একদিন ছিল দেশের সবচেয়ে যাঁরা কৃতী ছাত্র তাঁরা অধ্যাপনা করতে আসতেন। এখন প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত শিক্ষকেরা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত, কৃপার পাত্র। তাই কমিশন বসালেই শিক্ষার রূপ বদলে যায় না। পরিবর্তনের জন্য চাই একটা প্রস্তুতি; তা না করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।

তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রথা প্রবর্তনের পথে প্রথম অন্তরায় ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন। আর একটি অন্তরায় ডিগ্রী কোর্সের পাঠক্রম স্থির করা। আগের থেকে পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম স্থির না করে নতুন কোন ব্যবস্থাকে চালু করতে গেলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে বাধ্য। তাই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে একটি পাঠক্রম রচনার চেষ্টা

শুরু হ'ল। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গঠিত। পাঠক্রম রচনাকালে বিজ্ঞানের ছাত্রের জন্য তার নিজের বিষয় ছাড়াও দুনিয়ার আরও কিছু জানবার আছে সে কথা চিন্তা করা হয় না। আবার সাহিত্য ও কলাবিষয়ক ছাত্রদের পাঠক্রম থেকে সাধারণ বিজ্ঞানকে এমনভাবে নির্বাসিত করা হয়েছিল যে কলাবিভাগের উচ্চশিক্ষিত মানুষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সামান্য জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যেত। অতিরিক্ত বিশেষীকরণের (over speci‹li›sation) কুফলের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য রাধাকৃষ্ণন কমিশন ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কোর্স শিক্ষাকালে সর্ব বিভাগের ছাত্রদের জন্য কয়েকটি মূল বিষয় (core subj‹e›cts) গ্রহণ করবার পরামর্শ দেন।

তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের পাঠক্রম নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌কে ১৯৪৬ খ্রীঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাধারার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার জন্য সেখানে পাঠানো হয়। অনেক বিবেচনার পর কমিটি দুটি বিকল্প প্রস্তাব করেন। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্র ব্যতীত ডিগ্রী কোর্সের প্রত্যেক ছাত্রকে প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে প্রতি সপ্তাহে ছয় ঘণ্টা (Six period) ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। দুটি প্রস্তাবই অত্যন্ত মামুলী ধরনের। এর ফলে সর্বভারতীয় পাঠক্রম রচনা করা আর হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজ নিজ পাঠক্রম রচনা করেছে।

তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স অতি অল্পদিন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে। স্কুলগুলি এখনও সব ক্ষেত্রে উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত হয় নি। এখনও পুরাতন ব্যবস্থার সাথে নতুনের সামঞ্জস্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসবার আগে তাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন সর্বত্রই প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল, সেই প্রয়োজনেই তিন বছরের ডিগ্রীকোর্স চালু করা হয়েছে। দেশের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হলে একে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তিন বছরের ডিগ্রী-কোর্সের সাফল্য সম্পর্কে এখনও কিছু বলা কঠিন। মেধাবী ছেলেরা যে কোন অবস্থার সাথে তাদের মানিয়ে নিতে পারে; কিন্তু সাধারণ মানের ছেলেদের শিক্ষামান দিয়ে বিচার করলে একে ঠিক যাচাই করা হবে। অনেক অধ্যক্ষ তিন বছরের ডিগ্রীকোর্স সম্পর্কে এখনও কোন মন্তব্য করতে রাজী হ'ন নি, ভালমন্দ বিচার করতে আরও সময় প্রয়োজন। আর এ ব্যবস্থার ভালমন্দ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়; সেখানে যে একটা পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন আবশ্যক হতে পারে। গতিশীল সমাজের প্রয়োজনে যাকে গ্রহণ করা হয়েছে তাকেই আঁকড়ে থাকতে হবে এমন কোন বাধ্য-

বাধকতা নেই, আবার সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ হলে নতুন বলে তাকে দূরে সরিয়ে রাখব এটাও ঠিক নয়।

॥ উচ্চশিক্ষার মান ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান সমস্যা ছিল শিক্ষার মানোন্নয়ন। স্বাধীনতার পর উচ্চশিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ হচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৯৫৮ খ্রীঃ সংখ্যা বেড়ে হয় ৮ লক্ষ, দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে এই সংখ্যা ১০ লক্ষে পরিণত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রায় ১৫ লক্ষে দাঁড়াবে। আমাদের দেশের কলেজগুলিতে সকাল, দুপুর, রাত্রে কারখানার মত কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অধ্যাপকদের কাজের বিরাম নেই, তারাও সকাল-সন্ধ্যা কাজ করছেন। শহরের কলেজগুলিতে বহু ছাত্র স্থানাভাবে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ প্রতি বছর সহস্র সহস্র শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। পাসের সংখ্যা বাড়াবার জন্য নির্বিচারে গ্রেস মার্কের ব্যবস্থা হচ্ছে : তবু অবস্থার খুব উন্নতি হয় নি। উচ্চশিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তার একটা বিরাট অংশের অপচয় হচ্ছে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের অসাফল্যের জন্য।

এই অপচয় সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন—

A deplorable wastage of public funds goes on year after year but what is worse, there is an unconcerned complacency about this serious loss of public funds on the one hand, and waste of time, energy and funds of students and their parents besides terrible frustration of their hopes and aspirations on the other.

এই অপচয় নিবারণের জন্য অনেকেই উচ্চশিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। শ্রীচিন্তামন দেশমুখ গ্রাণ্টস কমিশনের সভাপতি থাকাকালে বলেন, আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা উচ্চশিক্ষাকে যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-পরিষদ্ প্রায় অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করেন। যে দেশের লোকসংখ্যা ৫৪ কোটির উপরে, সে দেশে যদি ৫০।৫৫ হাজার গ্রাজুয়েট বছরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয় তাহলে উচ্চশিক্ষায় ভীড় খুব বেশী হচ্ছে একথা বলা চলে না। শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করবার চেষ্টা না করে শিক্ষার সংহার-নীতিকে কোন দিক থেকেই সমর্থন করা যায় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার জন্য ভীড় জমায় এটা বাঞ্ছনীয় নয়, সেজন্য বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে সাধারণ শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন।

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে কলেজের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করা প্রয়োজন। আমাদের কলেজগুলিতে শিক্ষা প্রধানতঃ বক্তৃতাধর্মী। কলেজগুলিতে

টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা নামে আছে কিন্তু ছাত্রাধিক্যের জন্য সে প্রথাকে কার্যকরী করা অসম্ভব। ছাত্র-শিক্ষক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো দূরের কথা, অধ্যাপকগণ ছাত্রদের মুখ চিনেও রাখতে পারেন না। ছাত্ররা বক্তৃতা টুকে, বাজারের নোট মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করতে পারাটাকেই শিক্ষার্থীর চরম কর্তব্য বলে মনে করে। অবশ্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় যেন তেন প্রকারেণ পরীক্ষায় পাস করাটাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা হয়, সেখানে এজন্য ছাত্রদের দোষী করা যায় না।

শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে কলেজের ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, টিউটোরিয়াল ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হবে। একটি মাত্র চরম পরীক্ষায় ছাত্রের ভাগ্য নির্ধারণ না করে শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন কাজের পরিমাপ করতে হবে। ছোট ছোট শ্রেণীতে ভাগ করে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের ব্যক্তিগত-ভাবে শিক্ষা দেবেন।

উপযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে অধ্যাপকবৃত্তি গ্রহণ করে সে চেষ্টা করতে হবে। পূর্বে যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা অধ্যাপক পদ গ্রহণ করবার জন্য সচেষ্ট হতেন, বর্তমানে কৃতী ও মেধাবী ছাত্ররা অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন। অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করবার পরে দেখা যায় বহু অধ্যাপকই সরকারী উচ্চ চাকুরি বা কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য সচেষ্ট হ'ন। কোন কোন অধ্যাপক অধ্যাপনাকে পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি-ক্ষেত্ররূপেই গ্রহণ করেন। যদি যোগ্য ব্যক্তিরা অধ্যাপনাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ না করেন, তাহলে শিক্ষার মান উন্নয়নের আশা দুরাশাই থেকে যাবে। অধ্যাপকদের চাকুরির অবস্থার পরিবর্তন, বেতনবৃদ্ধি, পেন্সন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা প্রভৃতির ব্যবস্থা না থাকলে যোগ্য ব্যক্তিদের অধ্যাপনার কাজে পাওয়া দুষ্কর হবে। অধ্যাপকদের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে যাতে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য তাঁরা তাঁদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারেন।

॥ বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্টস কমিশনের সমীক্ষা ॥

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষার মান ও তা কি করে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য একটি নির্ণায়ক কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। সেই কমিটি গত আগষ্ট মাসে (১৯৬৫) তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার রিপোর্টে কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা পর্যন্ত বহু বিষয় আলোচনায় যা বলেছেন, তার সার কথা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ভর্তি উপযুক্ততম পরিবেশে উন্নততম মানের ভাবী নাগরিক গঠন করা। কমিটির মতে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেরা ছাত্রদের মান ঠিকই আছে, কিন্তু সাধারণ ছাত্রের মান আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় সন্তোষজনক নয়। পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যের সুসংগতির অভাব ও শিক্ষা যে পরিবেশে দেওয়া হচ্ছে

তাও শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ নয়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম নতুন করে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

কমিটি এজন্য যেসব সুপারিশ করেছেন তা সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল :—

॥ ১ ॥ ছাত্রবাছাই—

কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ছাত্র বাছাইয়ের উপর জোর দিয়েছেন। তাদের মতে এমন অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হাজির হয় যাদের মনোভাব বা বুদ্ধি যে কোন দিক থেকেই সেখানকার যোগ্য নয়। এটা যাতে না হয় স্কুল-পর্যায়ে তার কড়া ব্যবস্থা চাই। ছাত্রদের বড় একটা অংশ যাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার খাতে প্রবাহিত হতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হতে আসবে তাদের যোগ্যতার মাপকাঠি বিচার করে দেখতে হবে তারা কয়টি ভাষা ভাল করে জানে ; এছাড়া বিজ্ঞান, অংক, ইতিহাস ও ভূগোলে তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে।

॥ ২ ॥ ইংরেজী জ্ঞান—

কমিটি জোর দিয়ে বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের ভালো ইংরেজী জানতেই হবে। এমন কি যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম আঞ্চলিক ভাষা হয়, সেখানেও এই রীতির নড়চড় হওয়া অনুচিত। ভারতের ঐক্য ও বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ দুই ক্ষেত্রেই ইংরেজী একটি বিরাট সূত্র ও শক্তি একথা কিছুতেই ভোলা চলে না। ভাষা শিক্ষণের জন্য গ্রীষ্মশিবির ও রিফ্রেসার কোর্স-এর কথাও বলা হয়েছে।

॥ ৩ ॥ ব্যক্তিত্বের বিকাশ—

কমিটির মতে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। বড় বাড়ী, সাজানো ল্যাবরেটরী, ঝকঝকে ক্লাসঘর, আরামপ্রদ ছাত্রাবাস, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রভৃতি নানা ব্যবস্থা হচ্ছে। গুণী অধ্যাপকদেরও আনা হচ্ছে। কিন্তু এসবের আড়ালে একটি কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে যে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনই এসব আয়োজনের চরম লক্ষ্য।

॥ ৪ ॥ উদারনৈতিক মূল্যবোধ—

কমিটি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে উদারনৈতিক মূল্যবোধের কথাটা মনে রাখা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে তো বটেই, কারিগরী শিক্ষা-সংস্থার পক্ষেও একথা প্রযোজ্য।

॥ ৫ ॥ ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধুনিকতা—

শিক্ষাক্রমের মধ্যে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি ছাত্রদের সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করবার প্রেরণা সঞ্চার করতে হবে।

॥ ৬ ॥ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী—

সেই সাথে সর্বভারতীয় বা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীও তাদের অর্জন করতে হবে। তাদের চোখে যেন স্থানীয় সমস্যা, স্থানীয় স্বার্থ কখনও সারা দেশের সামগ্রিক স্বার্থের চেয়ে বড় হয়ে না উঠে।

॥ ৭ ॥ সমাজ চেতনা—

শিক্ষার মধ্য দিয়েই যেন ছাত্ররা তাদের পরিবেশকে জানতে ও বুঝতে শেখে। তাদের চারিদিকে যে সব সাধারণ মানুষ আছে তাদের সম্পর্কে সম্প্রীতি ও আগ্রহ অনুভব করে।

॥ ৮ ॥ শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক—

এ সম্পর্কে কমিটি বলেছেন পড়া ও পড়ানো একটা শুকনো ধরাবাঁধা কাজ নয়—এ হচ্ছে জ্ঞানের শিখরে সানন্দে অভিযাত্রা আর তার জন্য ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ প্রাণবন্ত সম্পর্ক গড়ে তুলতেই হবে। তবেই ছাত্র ও শিক্ষক আরও বেশী কাজ, আরও বেশী অভিনিবেশ সহকারে করতে পারেন।

॥ ৯ ॥ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ—

কমিটি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের মধ্যে একটা ভাবগত সংহতির প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ তৈরির উৎসাহে বিভিন্ন বিভাগ যেন কেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এটা সংগত নয়।

॥ ১০ ॥ পরীক্ষা ব্যবস্থা—

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার উপযোগিতা নিয়ে কমিটি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে এ প্রথা এখন অচল। ছাত্রদের মান নির্ণয়ের জন্য অন্য উপায়গুলি কাজে লাগাতে হবে। নিয়মিত কাজের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। চূড়ান্ত পরীক্ষার সব দিক মিলিয়ে ফল প্রকাশ হলেই সব দিক থেকে শোভন ও ন্যায়সংগত হবে।

॥ ১১ ॥ আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা—

কমিটি বলেছেন, ছাত্র বাছাই, অধ্যাপক ও কর্মীনিয়োগ, পাঠক্রম ঠিক করা ইত্যাদি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বহুল পরিমাণে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা থাকা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাথে জড়িত প্রায় সব সমস্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির প্রশ্নটি সব দিক থেকে মান-নির্ণায়ক কমিটি বিচার করে দেখেছেন। এডুকেশন

কমিশন উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধনের ব্যাপারে এই সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সুপারিশসমূহ করেছেন।

॥ পঃ বাংলার উচ্চশিক্ষার সমস্যা ॥

পঃ বাংলার উচ্চশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সর্বভারতীয় দিক থেকে বিচার করলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য উন্নত রাজ্যসমূহে যে সমস্যা আমাদের রাজ্যেও প্রায় একই রূপ সমস্যা। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ ও কলেজগুলিতে ছাত্রের ভীড় পঃ বাংলার উচ্চশিক্ষায় এক বিরাট সমস্যা। পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ কলেজে সেই মামুলী ধরনের কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিষয় পড়ান হয়। কলকাতার বাইরে অধিকাংশ কলেজে অনার্স পড়ার ব্যবস্থা নেই। মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে বৃত্তি বা কোনরূপ কারিগরী শিক্ষার সুযোগ না থাকায় সবাই সাধারণ শিক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়। প্রতি বছর সহস্র সহস্র যুবক সাধারণ শিক্ষাশেষে যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে তখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে দেখা দেয় আশা-ভঙ্গজনিত গভীর ক্ষোভ।

উচ্চ শিক্ষার প্রসার রোধ করতে ছাত্রভর্তির ব্যাপারে বাছাই করা নীতি অবলম্বন করা চলে। কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ পাবে না, তাদের জন্য বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা দেশে ১৯৪৭-৪৮খ্রীঃ বিশ্বভারতী ও কলিকাতা দুটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উচ্চশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বহন করা প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কয়েক বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কেও স্থির হয় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হবে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। এরমধ্যে তিনটি কলকাতা পৌর সীমানার মধ্যে। একটি বৃহত্তর কলকাতার সীমার মধ্যে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সরকার যে নীতিকে অনুসরণ করেছেন বলে দাবি করা হয়, তা হচ্ছে :—*The state is encouraging these universities to plan their offerings carefully so that the facilities available at different university centres can become truly complementary. The university at Burdwan will have a technological bias while the university at Kalyani will specialise in agricultural and biological sciences. It is expected that the distribution of students of West Bengal over a number of universities with diverse educational facilities will lead to better condition of teaching and ensure better standard of instruction examination and research.*" (*Review of Education in India 1947—61. Ministry of Education, New Delhi.*)

পঃ বাংলায় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হবে তা একটি অপরটির পরিপূরক হবে। অর্থাৎ এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার এক একটি বিশেষ দিকের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। পঃ বাংলার ছাত্রসম্প্রদায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার সুযোগ পাবে। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। শিক্ষা, পরীক্ষা ও গবেষণার মান উচ্চ হবে। সরকারের সংকল্প সাধু, কিন্তু সংকল্প অনুসারে কাজের বিচারের সেই সাধু সংকল্পকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পঃ বাংলার সমস্ত রকম শিক্ষার দায়িত্ব বহন করা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের শিল্পায়ণের সাথে বৃত্তিশিক্ষার ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিরাট আয়োজন করতে হয়েছে। বিভিন্নরূপ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা ও দায়িত্ব নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর দেওয়া হলে সব দিক থেকেই ভাল হ'ত।

॥ বর্ধমান ॥

কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঐতিহ্য রয়েছে; তাই এদিক সম্পর্কে দায়িত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রেখে বর্ধমানে প্রযুক্তিবিদ্যার উপর জোর দেওয়া হবে ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা ও জীববিদ্যার উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে এ অত্যন্ত সংগত নীতি। কিন্তু বর্ধমানকে করা হয়েছে প্রধানতঃ অনুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়; বর্ধমান বিভাগের অধিকাংশ কলেজ এরও অধীন। সেই চিরাচরিত ভাবে কলাবিষয়ক ও বিজ্ঞানবিষয়ক পরীক্ষা ও শিক্ষণের দায়িত্ব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যার উচ্চতম শিক্ষার অতি সামান্য ব্যবস্থাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আছে।

॥ যাদবপুর ॥

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের আদি যুগে কারিগরী-বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে যাদবপুর টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ সেখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার বিভিন্ন শাখার কলেজ থাকবে, উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে, বৃত্তিশিক্ষার বিভিন্ন দিক খুলে দেওয়া হবে এটাই স্বাভাবিক। যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে একদিন যাদবপুরে কারিগরী শিক্ষার আয়োজন জাতীয় নেতৃবৃন্দ করেছিলেন, সেই লক্ষ্য ও আদর্শের এই বিশ্ববিদ্যালয়টির নিয়োজিত থাকা উচিত ছিল। এখানে বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস ইত্যাদি না পড়ালে কোন ক্ষতি হ'ত না। কিন্তু কলাবিষয়ক শিক্ষার দাবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেটাতে পারছে না, কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই চিরাচরিত গণ্ডির মধ্যে টেনে এনে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে বিভিন্ন বিষয় পড়াতে পারেন এমন সুযোগ্য অধ্যাপক বাংলাদেশে মুষ্টিমেয়। পাশাপাশি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ্য অধ্যাপক জোগাড় করা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ রবীন্দ্র ভারতী ॥

কবিগুরুর পুণ্য নামাঙ্কিত রবীন্দ্র-ভারতী নৃত্য, গীত, নাটক, অভিনয়, চারুকলা ও চারুশিল্প সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা ও রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে পঠন, পাঠন ও গবেষণার জন্য স্থাপিত হয়েছে। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে বাধ্য হচ্ছি বাস্তব বুদ্ধির প্রয়োগ ও প্রয়োজন বিচার না করে ভাবাবেগ দ্বারা আমরা এক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাবিত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিশ্বভারতীর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। বাংলা সরকার ইচ্ছা করলেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকেই সমৃদ্ধ করতে পারতেন। ১৯৬৩-৬৪ খ্রীঃ রবীন্দ্র-ভারতীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৮০ জন। ১৯৬৫-৬৬ খ্রীঃ রবীন্দ্রভারতীর উন্নতিকল্পে রাজ্যসরকার ৫ লক্ষ টাকা খরচ করবেন। ১৮০ জন ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো যায় না এ কথা বুঝতে পেরে এখানে অন্যান্য বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। সেই চিরাচরিত বাংলা, ইংরেজী, দর্শন ইতিহাস যদি পড়াতে হয়, তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কলকাতার বুকে একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সার্থকতা কোথায়? বর্তমানে দিনে রাতে ক্লাস্ করে বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি প্রভৃতি গতানুগতিক বিষয় সমূহ পড়ান হচ্ছে।

॥ উত্তর বঙ্গ ॥

উঃ বঙ্গের প্রয়োজন মেটাতে নর্থবেঙ্গল ইউনিভারসিটি স্থাপিত হয়েছে। সেখানে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের সাথে কারিগরী-বিদ্যার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হলে, কলকাতায় এসে ছাত্র ভীড় করত না। নর্থবেঙ্গলের বহু কলেজে সাধারণ বিষয়সমূহে অনার্স পড়াবার ব্যবস্থা করা হয় নি। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া প্রযুক্তিবিদ্যা বিভিন্ন শাখার কোন উল্লেখযোগ্য কলেজ উঃ বাংলায় নেই। পলিটেকনিকে ডিপ্লোমা-কোর্সে ছাত্র পড়াবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয় না। উঃ বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করে নানা বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা করলে ঐ অঞ্চলের ছেলেদের যথেষ্ট উপকার হবে।

॥ কল্যাণী ॥

কল্যাণীতে পশু ও কৃষি বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছিল। ১৯৬৪ খ্রীঃ এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭০০ জন। এর মধ্যে হরিণঘাটায় কৃষি-কলেজে ছাত্রসংখ্যা ৪০০ জন। কল্যাণীর শিক্ষক-শিক্ষণ, অনার্স ও বিজ্ঞানের ছাত্রসংখ্যা ৩০০ জন। রাজ্য সরকার ১৯৬২—৬৩ ও ৬৩—৬৪ খ্রীঃ দু'বছরে কল্যাণীর জন্য খরচ করেছেন ৪৯ লক্ষ টাকা। ১৯৬৫ খ্রীঃ কল্যাণীর জন্য রাজ্যসরকার শুধুমাত্র ডেভলাপমেণ্ট খাতে খরচ করবেন ১৫ লক্ষ টাকা।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির এক যুগ পার না হতেই আমরা ৭টি (এর মধ্যে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় অর্থে) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পেরেছি এটা উচ্চশিক্ষার দিক থেকে

আমাদের অগ্রগতির পরিচয় বলেই ধরে নেওয়া উচিত। এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পরও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টি টিকে আছে এবং ১৯৬৪ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য রাজ্যসরকার ১৯৬৫ খ্রীঃ দেড়লক্ষ টাকা দেবারও সিদ্ধান্ত করেন। কল্যাণীর ৭০০ ছাত্রের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা, রবীন্দ্র-ভারতীর জন্য ৫ লক্ষ, ছাত্র হচ্ছে ১৮০ জন আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১½ লক্ষ, ছাত্র হচ্ছে ১ লক্ষ ২০ হাজার। এর উপর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির, শিক্ষার ও গবেষণার মানের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি অপরটির অনুপূরক হবে। এর কোন লক্ষ্যটা পূরণ হয়েছে? টাকা থাকলে সুদৃশ্য ইমারত সৃষ্টি করা যায় কিন্তু শুধু টাকার জোরে শিক্ষার ইমারত গড়ে তোলা যায় না। বিশ্বভারতীর বিশ্বজোড়া খ্যাতি আজকের তৈরী দালান কোঠার জন্য নয়। মাটির ঘরে, গাছের তলায় বাংলার এক পল্লীর নিভৃত কোণে প্রকৃতির কোলে জ্ঞান-তপস্বীদের তপস্যার জন্যই বিশ্বভারতীর খ্যাতি। আর সেখানেই তার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের নাম জুড়ে দিলেই রবীন্দ্র-জীবন-দর্শন সাহিত্যের গবেষণা হয় না। রবীন্দ্র-ভারতীতে সেই পরিবেশ কোথায়? যে গাঁয়ের আকাশ বাতাস জুড়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি, যেখানের ধূলিকণা রবীন্দ্র-পরশে পুণ্য সেই পরিবেশকে ত্যাগ করে রবীন্দ্র-চর্চা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের গবেষণার ব্যবস্থা এই ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি অপরটির পরিপূরক হয়েছে কি? উঃ বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার এক কোণে। তাই অনুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের এখানে প্রয়োজন ছিল। কলা ও বিজ্ঞান বিষয় পড়াবার সাথে ইঞ্জিনীয়ারিং, টেকনিক্যাল, মেডিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে সুদূর উত্তর বাংলার শিক্ষার্থী কলকাতায় এসে ভীড় করত না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা গর্বের সাথে উচ্চারণ করি—এটা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের দান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যদি ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ও প্রযুক্তি-বিদ্যার নানা দিকের উন্নতির জন্য শক্তি ও অর্থ ব্যয় করত, তাহলে তাই যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অনুসারী হ'ত।

বর্ধমানের আসানসোল ও দুর্গাপুর অঞ্চল বৃহত্তর কলকাতার বাইরে সর্বাধিক শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে শিক্ষা-ব্যবস্থা হবে স্থির হয়েছিল। কার্যতঃ এটি একটি অনুমোদন ও শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে অনুমোদিত মেডিকেল কলেজ ও টেকনিক্যাল কলেজও আছে। এখানে উচিত ছিল খনি ও ধাতু বিদ্যার জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা। বহু শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠায় তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হলে বহু শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার দিকে না গিয়ে হয়ত বৃত্তি শিক্ষার দিকে যেত।

পঃ বাংলার নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবার সময় যে লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি। উচ্চশিক্ষার মানের উন্নতি করতে হলে ভর্তি সম্পর্কে বাছাই নীতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে তা তাদের জন্য বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা না করে উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করলে চলবে না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির যে সম্ভাবনা ছিল তা কাজে লাগানো হয় নি। দেশের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে উচ্চশিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তার পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। অনুমোদনধর্মী ও সেই সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয়সমূহ শেখান হয়, তার জন্য শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন সার্থকতা নেই। শিক্ষার মান উন্নতি সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতেও হয় নি। অধিকাংশ সাধারণ ছেলের জন্য কৃষি ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রের ভীড় কমানো সম্ভব হবে না, শিক্ষার মান উন্নত হবে না ও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস হবে না।

[উচ্চশিক্ষার অগ্রগতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা অধ্যায় দেখুন।]

চতুর্থ অধ্যায়

বৃত্তি শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা সমস্যা

॥ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ ॥

প্রাচীন ভারত এক সময় জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিশ্বের সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। অতীত ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শনসমূহ আজও বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। নগর-পরিকল্পনা, স্থাপত্যবিদ্যা, ভাস্কর্য, সেচব্যবস্থা, জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পচাতুর্যের যে সব নিদর্শন রয়েছে তাতে দেখা যায় এক সময়ে এ দেশের শিল্পীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বংশানুক্রমে ঐসব শিল্পীদের দক্ষতা ধারাবাহিকভাবে রক্ষিত হয়েছে পরবর্তী বংশধরদের কর্মকুশলতার মধ্যে। কিন্তু ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হবার পর অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। রাজানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে দেশীয় শিল্পের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানী ভারতকে বিলেতী পণ্যদ্রব্যের বাজারে পরিণত করতে চেয়েছিল। কোম্পানীর শাসনকালে শিল্পনীতি সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এদেশের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করে কিভাবে দেশকে কাঁচামালের যোগানদারে পরিণত করা যায় সেই ছিল কোম্পানির চেষ্টা।

বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যাক, স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের এই ঐতিহ্যময় শিল্পটি ইউরোপের সর্বত্র সমাদৃত হয়ে এসেছে। কোম্পানীর বাণিজ্যদ্রব্যের তালিকাটি দেখলে দেখা যায়, প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র এদেশ থেকে তারা ইংলণ্ডে রপ্তানি করেছে। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের পর সেখানে বস্ত্রশিল্পের প্রসার হয়। কোম্পানী সুপরিকল্পিতভাবে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করে ভারতে বিলাতী কাপড় আমদানী শুরু করল। বিদেশী কোম্পানীর চক্রান্তে ভারতের একটি ঐতিহ্যময় শিল্পের গৌরবময় যুগের অবসান হয়। শিল্পের সর্ব ক্ষেত্রেই সরকারী নীতি ছিল ভারতে বিলাতী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা। কোম্পানী কোনদিনই চায় নি ভারত একটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হোক। ভারতের অফুরন্ত কাঁচামাল বিলেতে পাঠিয়ে সেখানকার কলকারখানা চালু রাখাই ছিল কোম্পানীর নীতি বা লক্ষ্য।

দেশের শিল্পনীতি নির্ধারণে কোম্পানীর অথবা ভারত সরকারকে এই মনোভাবই প্রভাবিত করেছে। এই নীতির ফলেই ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা অবহেলিত হয়েছে। ইংরেজ ভারতে উচ্চ শিক্ষাবিস্তারে কিছুটা উৎসাহী ছিল। কোম্পানীর প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক ভারতবাসীকে শিক্ষিত করে দেশের শাসনকার্যে নিয়োগ করবার জন্য কোম্পানী উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহ দেখিয়েছে। কারিগরী বা শিল্পশিক্ষার কোন আয়োজনই কোম্পানী কোনদিনই করে নি। ফলে দু' একটি উচ্চ বৃত্তির সামান্য ব্যবস্থা (আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারীং) ছাড়া সাধারণ বৃত্তিশিক্ষার

কোন ব্যবস্থাই উনবিংশ শতকে করা হয় নি। সরকারী দপ্তর ও সদাগরী অফিসের কেরাণীর প্রয়োজন মেটাতে যেমন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল তেমনি সরকারের প্রয়োজন মেটাতে কিছুসংখ্যক ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। তাই দেখা যায়, ইঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষার জন্য রুরকী (১৮৪৭), কলকাতায় (১৮৫৭), মাদ্রাজে (১৮৫৮) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুণায় (১৮৫৪) একটি ইঞ্জিনীয়ারীং ক্লাস ও মেকানিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ জুন মাসে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ বোম্বে শহরে গ্রান্ট মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ মাদ্রাজে মেডিকেল স্কুল খোলা হয়, পরে এটি কলেজে রূপান্তরিত হয়।

উডের ডেসপ্যাচে বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনীয়ারীং প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করা হবে। কিন্তু সরকার নিজের প্রয়োজন মেটাবার মত ব্যবস্থা করেই তুষ্ট ছিলেন। এই সময়ে সরকারী নীতি যেরূপ বৃত্তিশিক্ষার অনুকূলে ছিল না, জনসাধারণের মধ্যেও তেমনি বৃত্তিশিক্ষার কোন উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল না। সাধারণ শিক্ষাকেই সেযুগে বৃত্তিশিক্ষা বলে গণ্য করা হ'ত। স্কুল কলেজে শিক্ষা গেলেই জীবন ধারণের উপযোগী একটা কেরাণীর বৃত্তিলাভ বিগত শতাব্দীতে খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। বৃত্তিশিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তা ভদ্রলোকের বৃত্তি। আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারীং প্রভৃতি শিক্ষাগ্রহণ সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হান্টার কমিশন সর্বপ্রথম কারিগরী শিক্ষাক্রমকে চালু করবার জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন। হান্টার কমিশন নির্দেশ দিয়েছিলেন, "হাই স্কুলে এণ্ট্রান্স কোর্সের পাশাপাশি আর একটি কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। তার নাম দেওয়া হবে 'বি' কোর্স। বি কোর্সে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।...'বি' কোর্সের ব্যবস্থা করা হ'ল বটে কিন্তু তাহাতে কোন দিনই বেশী ছাত্র জুটিল না। তাহার কারণ, লোকের মনে এণ্ট্রান্সের তুলনায় 'বি' কোর্স জাত্যাংশে ছোট ছিল। সেখানে ছুতোর-চামারের কাজ শিখিবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে তাই বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ব্যবহারিক করিয়া তোলার একটা চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।" (আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা—অনাথনাথ বসু) ১৯০১–০২ খ্রীঃ সারা ভারতে কারিগরী শিক্ষার জন্য মাত্র ৮০টি বিদ্যালয় ও ৪,৮০৪ জন ছাত্র ছিল।

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই দেশে বৃত্তি শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বেকার সমস্যা, বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার সমস্যা দেখা দেওয়ায় ও দেশে কিছু কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণের মনে যে বিরূপ মনোভাব ছিল তা পরিবর্তিত হতে থাকে। এতদিন ইংরেজী শিক্ষাই ছিল বৃত্তি শিক্ষা—কারণ সামান্য ইংরেজী শিখলেই একটা চাকুরী মিলত। ক্রমে এই ভ্রান্তি দূর হতে লাগল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বৃত্তি শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থার দাবী জানাতে শুরু করেন। সরকার জনমত তুষ্ট করার জন্য কিছু ভারতীয়কে বৃত্তি দিয়ে উচ্চ কারিগরী শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাতে

শুরু করে। সরকার থেকে সাধারণের জন্য কিছু করবার উদ্যোগ না থাকায় যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা সংসদের (*The National Council of Education*) পরিচালনায় ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলেও যাদবপুরের এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের যন্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য রয়ে গেল। এতেই বোঝা যায় দেশে সে সময়ে যন্ত্র-শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এই সময় থেকেই দেশে একটির পর একটি যন্ত্র ও কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু এই বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। ১৯০৮ খ্রীঃ যাদবপুর কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্সে ডিপ্লোমা দেওয়া শুরু হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন হয়।

কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হলেও বেসরকারী প্রচেষ্টায় বৃত্তি শিক্ষার সামান্য আয়োজনই সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৯ খ্রীঃ হার্টগ কমিটি বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে বলেন, সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বৃত্তি শিক্ষার কোন যোগই নেই। এই ত্রুটির সংশোধনের জন্য কমিটি সুপারিশ করেন। মধ্য ভার্ণাকুলার স্তর থেকেই বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করতে হবে এবং মধ্যশিক্ষার শেষে অধিকসংখ্যক ছাত্রই যাতে শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কীয় বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ সপ্রু কমিটির রিপোর্ট ॥

দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা একটি জটিল সমস্যা। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে জড়িয়ে আছে এই শিক্ষিত বেকারের সমস্যা। দেশের শিক্ষিত বেকার সমস্যা কি করে সমাধান করা যায় যুক্ত প্রদেশের সরকার এই সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবার জন্য ১৯৩৪ খ্রীঃ স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে এক কমিটি নিয়োগ করে।

কমিটি এই সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য ও ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত করা হয়। জীবনের প্রয়োজনীয় বৃত্তি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা এতে নেই। কমিটি সুপারিশ করেন যে :—

১। মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

২। ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বলে কিছু থাকবে না। দুটি বছরের একটি বছর স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। এগার বছরের শিক্ষাকে দু'ভাগ করে প্রথম পাঁচ বছর হবে প্রাথমিক শিক্ষা, পরের ছ' বছর হবে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল।

৩। ডিগ্রীকোর্স তিন বছরকালব্যাপী হবে।

৪। নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পার হলে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যন্ত্র প্রভৃতি নানা শিক্ষার আয়োজন করা হবে।

সপ্রু কমিটির সুপারিশে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকেই বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলা হয়।

১৯৩৫ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (*CEAB*) নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অভিমত গ্রহণের জন্য উড্ এবটের পরামর্শ গ্রহণ করেন। উড্ এবটের রিপোর্টে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বৃত্তি শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। এই রিপোর্টে ভারতে বৃত্তি শিক্ষা সম্পর্কীয় বহু মূল্যবান সুপারিশ থাকলেও কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই কার্যকরী হয় নি। এদের সুপারিশের ফলেই 'পলিটেকনিক' নামে এক নতুন ধরনের কারিগরী বিদ্যালয় আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে। [প্রাক স্বাধীনতা যুগের কয়েকটি রিপোর্ট অধ্যায় দেখুন]।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে বৃত্তিশিক্ষা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব পরিবর্তিত হয়। যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের জন্য দেশে কলকারখানা গড়ে ওঠবার সাথে সাথে দক্ষ কর্মীর চাহিদা মেটাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বৃত্তি শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে না দিয়ে বৃত্তি ও কারীগরী শিক্ষার জন্য এক সর্বভারতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শিল্প সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪০ খ্রীঃ বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

দিল্লীতে পলিটেকনিক স্থাপিত হয়। ভারতে উন্নততর কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে উপদেশ দেবার জন্য সরকার কমিটি (১৯৪৫ খ্রীঃ) গঠিত হয়। কমিটি সুপারিশ করেন যুদ্ধোত্তরকালের উচ্চ কারিগরী শিক্ষার চাহিদা মেটাতে ভারতে চারটি অঞ্চলে চারটি কারিগরী ও শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

১৯৪৫ খ্রীঃ ৩০শে নভেম্বর ভারত সরকারের এক প্রস্তাব বলে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীঃ পরবর্তী দশ বছরে দেশের বিজ্ঞানী ও কুশলী কর্মীর প্রয়োজন কি করে মেটান যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য সায়েন্টিফিক ম্যান পাওয়ার কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি অনুমান করেন যে পরবর্তী দশ বছরে দেশে ৫৪,০০০ হাজার ইঞ্জিনীয়ার ও ২০,০০০ হাজার কুশলী কর্মীর (*Technologist*) প্রয়োজন হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদ (*All India council for Technical Education*) দেশে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিষদ বিভিন্ন রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সঙ্ঘ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। এই পরিষদের কাজ হ'ল কারিগরী শিক্ষার উন্নয়নের

সুপারিশ করা, সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য পরিষদের সুপারিশ অনুমোদন করেন। পরিষদ কাজের সুবিধার জন্য একটি যোগাযোগ কমিটি, কয়েকটি আঞ্চলিক কমিটি ও কারিগরী শিক্ষাবোর্ড গঠন করেছেন। কারিগরী শিক্ষাবোর্ড পরিষদকে কারিগরী শিক্ষার রূপ নির্ধারণ, পাঠক্রম রচনা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেন। আঞ্চলিক কমিটি নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ও চালু প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতির উপর দৃষ্টি রাখেন। যোগাযোগ কমিটি হচ্ছে পরিষদের কার্যকরী সভা। এই কমিটি থেকে আঞ্চলিক কমিটি ও শিক্ষাবোর্ডের কাজের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা করেন।

॥ স্বাধীনতা লাভের পর বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার অবস্থা ॥

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়। নিত্য নতুন কলকারখানা স্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু এই কলকারখানা চালু রাখতে হলে প্রয়োজন দক্ষ কারিগরের। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে শিক্ষা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেখানে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার সুযোগ সুবিধা খুবই কম ছিল। আমাদের দেশের শিক্ষার সাধারণ অবস্থাকে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই—আমাদের দেশের শিক্ষা প্রধানতঃ পুঁথি ঘেষা। এদেশের আধুনিক শিক্ষা পত্তনের গোড়ার কথার সন্ধান করলেই আমরা দেখতে পাই পুঁথিগত শিক্ষার প্রবর্তন ও সেদিকেই শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখা বিদেশী সরকার নিজ স্বার্থেই করেছে। বৃত্তি শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার যে সামান্য আয়োজন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে হয়েছিল তা অবস্থার চাপে পড়েই হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিল্পের প্রসার ও কারিগরী শিক্ষার সরকারী উদ্যোগের মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি সরকার কখনও স্বেচ্ছায় বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষায় সচেষ্ট হয় নি।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই মূলগত ত্রুটি আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সকলেই জানেন আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্য শাসন ও বাণিজ্য চালানোর জন্য ইংরেজী জানা দেশী কর্মচারী গড়িয়া তোলা, অনেক দিন হইতেই গড়নের কাজ চলিতেছে। যতদিন ছাত্র সংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সাথে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল। ......যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতে এই শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষেই ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদের চাকুরী ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থান পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্পর্কে নালিশ থাকিত না।"

দেশ স্বাধীন হবার পর বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে সরকার ও জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তন হয়। সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন হলেও অবস্থারও পরিবর্তন হতে আরও কিছুদিন সময় লেগেছে। ১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ আমরা দেখি সারা ভারতে বৃত্তি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৩৪টি। উড-এবট ও সার্জেন্ট রিপোর্টে কারিগরী

শিক্ষা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই করা হয় নি। এদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে গিয়ে দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সংস্কারের সাথে বেকার সমস্যা সমাধানের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলবার প্রয়োজন দেখা দিল। স্থির হ'ল বৈচিত্র্যহীন মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে হবে, সেখানে সাধারণ শিক্ষার সাথে যন্ত্র, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্প প্রভৃতি নানা ধরনের শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

॥ বৃত্তি শিক্ষা বিষয়ে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ ॥

মুদালিয়র কমিশন বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, এ শিক্ষা শুধু বেকার সমস্যার সমাধানই করবে না, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সাধনও করবে। কারিগরী শিক্ষার সাথে সাথে যন্ত্র শিল্পের প্রসার ও উন্নতি হবে। এ শিক্ষার উপরে সবরকম শিল্পের উন্নতি নির্ভর করছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ বুঝতে পারেন, পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ দক্ষ ও কুশলী কর্মীর। শুধু শিল্পেই নয় দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধিও এই কারিগরী শিক্ষার উপর নির্ভরশীল।

মুদালিয়র কমিশন বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা করে বলেছেন, ১৮৮২ খ্রীঃ হাণ্টার কমিশন বৃত্তি শিক্ষার আয়োজন করতে বলেছেন, ১৯৫২ খ্রীঃ পর্যন্ত আমরা যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই আছি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের উদাসীনতা, কারিগরী বিষয়সমূহে শিক্ষাদানে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সংযোগ ও সহযোগিতার অভাব, সর্বোপরি অর্থাভাব কারিগরী শিক্ষার পথে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক স্তরে কারিগরী শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ও তাদের কারিগরী শিক্ষার জন্য কতকগুলি সুচিন্তিত সুপারিশ করেছেন :—

১। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য কারিগরী শিক্ষা।

২। যারা পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে অক্ষম বা যারা আর্থিক কারণে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে এবং অবিলম্বে যাদের অর্থোপার্জনের প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য কারিগরী শিক্ষা।

৩। যারা মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম শেষ করেছে ও যারা উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে ইচ্ছুক।

৪। যারা পূর্বোক্ত শ্রেণীর যে কোন একটি পাঠক্রম শেষ করে কোন কার্যে নিযুক্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আংশিক সময়ের জন্য সান্ধ্যকালীন ক্লাসে নিজ নিজ বিষয় সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে চায়।

এদের শিক্ষার জন্য কমিশন নিম্নরূপ ব্যবস্থার কথা বলেছেন :—স্বতন্ত্রভাবে বা বহুমুখী বিদ্যালয়ের অঙ্গরূপে অধিক সংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

বড় বড় শহরে কেন্দ্রীয় কারীগরী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং নিকটবর্তী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কারিগরী শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হবে।

শিক্ষানবীশি (*apprenticeship*) কারিগরী শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। প্রয়োজন হলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে ছাত্রদের শিক্ষানবীশ (*apprentice*) রূপে নিতে বাধ্য হয় সেরূপ আইন বিধিবদ্ধ করতে হবে।

কারিগরী শিক্ষার উন্নতির জন্য "শিল্প শিক্ষা কর" নামে একটি কর ধার্য করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের উপযোগী পাঠক্রম নির্ণয় করবার জন্য সর্বভারতীয় কারিগরী শিক্ষা পরিষদ স্থাপন করতে হবে। এই পরিষদ কারিগরী শিক্ষার বিস্তৃত পাঠক্রম রচনা করবেন।

॥ বৃত্তি শিক্ষার অগ্রগতি ॥

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখা যায় পরিকল্পনা পরিষদ শিল্প বিদ্যালয়ে ২৪৮ হাজার ও অন্যান্য কারিগরী বৃত্তি শিক্ষা স্কুলে ৪৩৬ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করবে বলে অনুমান করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করেছিলেন ১৪৪ কোটি টাকা। রাজ্যগুলি ব্যয় বরাদ্দ করেছিল ৭৬ কোটি টাকা।

দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশের সর্বস্তরের কারিগরী শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়েছে। ১৯৫০ খ্রীঃ ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনলজি বিষয়ে প্রথম ডিগ্রীকোর্সের জন্য ৪০টি ও ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ৮৬টি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ডিগ্রী কোর্সে ৪১২০ জন ছাত্র ভর্তি করা হ'ত। ১৯৬১ খ্রীঃ ডিগ্রী কোর্সে কলেজের সংখ্যা হয়েছে ১০০টি ও ডিপ্লোমা কোর্সের প্রতিষ্ঠান সংখ্যা হয়েছে ১৯৬টি। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের ডিগ্রী কোর্সে ১৩.৮৫০ জন ও ডিপ্লোমা কোর্সে ২৫,৫৭০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা পায়। কারিগরী শিক্ষার এই দ্রুত প্রসারের পরও পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে দেশে ১৫,০০০ ইঞ্জিনীয়ার ও ৩০,০০০ হাজার ডিপ্লোমা হোল্ডারের অভাব ছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রতি বছর ১৯,০০০ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য বরঙ্গল, বাঙ্গালোর, নাগপুর, ভূপাল, দুর্গাপুর, এলাহাবাদ, শ্রীনগর ও দিল্লীতে একটি করে মোট ৯টি টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়েছে। পুরাতন কলেজগুলিকে সম্প্রসারিত করে অধিক ছাত্র নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিল্প বাণিজ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আবশ্যক কারিগরী কর্মীর শিক্ষালাভের সুবিধার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সম্মিলিত বৃত্তি ও সাহায্য কারিগরী শিক্ষায় এ উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় পরীকল্পনাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮৪টি পলিটেকনিক স্থাপিত হয়।

পলিটেকনিকগুলিতে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ান হয়। স্কুল ফাইনাল বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষার্থীকে তিন বছর ডিপ্লোমা কোর্স পড়তে হয়। সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বয়ন শিল্প বিদ্যা, চর্মশিল্প বিদ্যা, ধাতু বিদ্যা, খনি ইঞ্জিনীয়ারিং, অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং, টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং, রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং, প্রিন্টিং টেকনোলজি ও আরও কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েদের শিক্ষার জন্যও কিছু কিছু শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে দরজির কাজ, সূচীশিল্প, বয়ন, বুনন, সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরী করতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও উচ্চতর কারিগরী শিক্ষালয়ে প্রথম ডিগ্রী কোর্স শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম ডিগ্রী কোর্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকনলজিষ্টদের শিক্ষা দেওয়া। এদের মধ্যে কেউ ডিজাইনার গবেষক, ইঞ্জিনীয়ার বা ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন। কোন বিশেষ শিল্পে চাকুরী গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই কোর্সে শিল্প বিদ্যার অন্তর্নিহিত নীতি ও প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর এই কোর্স চার বছর পড়তে হয়। বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে পাঁচ বছর ডিগ্রী-কোর্সে পড়তে হয়।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্সে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষার বা গবেষণার কোন ব্যবস্থা ছিল না। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বিদেশে যেতে হ'ত। এখন এদেশে বারটি প্রতিষ্ঠানে পাঁচ শতাধিক স্নাতকের গবেষণা চালাবার সুবিধা আছে। এ সুবিধা ক্রমশঃ বাড়িয়ে আশা করা যায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দু'হাজার শিক্ষার্থীর জন্য স্নাতকোত্তর গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

এদেশে উচ্চতর কারিগরী শিক্ষার জন্য খড়্গপুর, মাদ্রাজ, বোম্বে, কানপুর ও দিল্লীতে পাঁচটি কারিগরী শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে। খনি ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিদ্যার বিশেষ কোর্স শেখাবার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মুদ্রণ-শিল্প শিক্ষার জন্য মাদ্রাজ, কলিকাতা, এলাহাবাদ ও বোম্বে শহরে একটি করে আঞ্চলিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। দিল্লীতে বৃটেনের সহায়তায় ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

কারিগরী শিক্ষা ও এসম্পর্কে উচ্চতর গবেষণার উৎসাহ দেবার জন্য ভারত সরকার বৃত্তি ও ফেলোসিপের জন্য তিনটি পরিকল্পনা করেছেন। শিক্ষানবীশ কর্মীদের সাহায্য দান, গবেষণার জন্য বৃত্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ৮০০ রিসার্চ স্কলারসিপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কারিগরী ও শিল্পশিক্ষা প্রসারের জন্য আর একটি প্রচেষ্টা হচ্ছে সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা। বিশেষভাবে শিক্ষিত লোকের তত্ত্বাবধানে গবেষণাগারসহ ২২টি বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও বিজ্ঞানের সহায়তায় আমাদের জীবনধারা কি করে দিন

দিন বদলে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সাধারণ লোককে শিক্ষা দেবার জন্য এই বিজ্ঞান মন্দিরগুলি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে এই পরিষদের অধীনে সারা ভারতে ২১টি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে।

॥ বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার কয়েকটি সমস্যা ॥

ভারতে শিক্ষার ইতিহাসের সাথে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন বৃটিশ যুগে এদেশে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার কোন সার্থক প্রচেষ্টা হয় নি। ইংরেজ ভারতকে বিলাতী পণ্যের বাজাররূপেই রাখতে চেয়েছিল। তাই পরাধীন ভারতে সরকারী নীতির ফলেই দেশের অত্যাবশ্যক শিল্প পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সরকার অনুসৃত শিল্পনীতি অনুসারে দেশের বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে সরকার থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু করা হয় নি যার থেকে আমরা বলতে পারি সরকার সত্যি সত্যি বৃত্তি শিক্ষার প্রসার কামনা করত।

দেশ স্বাধীন হবার পর যখন দেশে দ্রুত শিল্প প্রসার শুরু হ'ল, তখন সরকার ও দেশের জনসাধারণ বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে যেরূপ দ্রুত শিল্পের উন্নতি হচ্ছে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনও সেই হারে বেড়ে গিয়েছে। কারিগরী শিক্ষার প্রসার হবার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে। দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করতে হলে কারিগরী শিক্ষার আয়োজন অত্যাবশ্যক কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে এ শিক্ষার প্রসার না হলে এখানেও অপচয় দেখা দেবে। দেশের শিল্পের প্রয়োজন বিচার করেই কারিগরী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়ে তাদের কোন কাজে লাগান না যায় তাহলে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা হবে। কোন্ শিল্পে কি পরিমাণ সুদক্ষ ও শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হতে পারে সেদিক বিচার করেই আমাদের নানারূপ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এখনই দেখা যাচ্ছে কোন কোন শিল্পে দক্ষ শিল্পী পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষিত কর্মীর সংখ্যাধিক্যের জন্য সকলের কর্মসংস্থান হচ্ছে না। সুপরিকল্পিতভাবে দেশের শিল্পের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা না করার ফলে এইক্ষেত্রে বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও দক্ষ কর্মী সৃষ্টি হয়ে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

আমাদের দেশে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের পথে একটা প্রধান অন্তরায় হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। সাধারণ শিক্ষার মত এখানেও উপযুক্ত দক্ষ শিক্ষকের অভাব ঘটলে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হবে না। কারিগরী ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত কর্মীর অভাব থাকায় যারা কারিগরী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন, তারা উচ্চ বেতনে কলকারখানায় চাকরী গ্রহণ করেছেন। কারিগরী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের

যে বেতন দেওয়া হয় তাতে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ কর্মী পাওয়া কষ্টসাধ্য। চাকুরীর অবস্থার উন্নতি করে বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পূরণ না করলে দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের যে কোন পরিকল্পনাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কারিগরী শিক্ষার আর একটি ত্রুটি শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ খুব কম পায়। কারিগরী বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পেল সে শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগের দিকের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় না ঘটলে কারিগরী শিক্ষা সার্থক হয় না ও সুদক্ষ কর্মী সৃষ্টির সম্ভাবনাও কমে যায়। শুধুমাত্র ক্লাসরুমের বিদ্যা নির্ভর করে অন্য ক্ষেত্রে কাজ চালান সম্ভব কিন্তু কারিগরী বিদ্যা বা কৃষিবিদ্যাকে হাতে কলমে প্রয়োগ করবার সুযোগ না পেলে বিদ্যা শেখা ঠিক হয় না ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তার কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকে না। তাই কারখানায় ও কৃষিকার্যে শিক্ষানবীশি করবার সুযোগ যাতে শিক্ষার্থীরা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকার ও দেশের শিল্পপতিদের সাথে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আবশ্যক হলে আইন করে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বিভিন্ন কারখানায় কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণ করে।

কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষার প্রশ্নও কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র থেকে ইংরেজীকে অপসারণ সম্ভব নয় বলে এদেশের বহু শিক্ষাবিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন। একথা ঠিক আজ পর্যন্ত ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কোন বই প্রকাশিত হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত পরিভাষা সমিতি যে পরিভাষার সংকলন করেছেন তার সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায় না একথা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বহুদিন শিক্ষার অনুশীলন হওয়াতে আমাদের একটা সংস্কার জন্মেছে ইংরেজী ভিন্ন দেশের ভাষায় বিজ্ঞান বা কারিগরী শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। দেশের বহু বিজ্ঞানবিদ্ বর্তমানে এই ধারণার বিপরীত মত পোষণ করেন। পরিভাষা শব্দগুলি বর্তমানে কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যবহারের ফলে তা সহজ হয়ে উঠবে। প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে যখন নিজ নিজ ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে তখন ভারতীয় ভাষায় কেন সম্ভব হবে না? আজ পর্যন্ত কোন চেষ্টা না করেই আমরা সিদ্ধান্ত করে বসে আছি আমাদের ভাষাগুলি বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে অনুপযোগী. ভারতীয় ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনায় প্রাথমিক কতকগুলি অসুবিধা থাকবেই, তাকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের সুযোগ পেলে তরুণ শিক্ষার্থীর পক্ষে তা শুভ ফলদায়ক হবে। পরে যখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করবেন তখন তারা প্রয়োজনে শুধু ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষাও শিখবে। তবে ইংরেজী ভাষার সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয়ের ফলে যে ভাষায় বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানকে আহরণ করবার যে সুযোগ রয়েছে, উচ্চতর গবেষণায় যারা রত হবে তারা সে সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করবে। কিন্তু সাধারণ

ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার পথকে সহজতর করতে হলে আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

কারিগরী শিক্ষার আর একটি সমস্যা হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু কারিগরী বা বৃত্তিশিক্ষা স্থানীয়-শিল্প-নির্ভর। কোন অঞ্চলে কারিগরী শিক্ষা সে স্থানের শিল্পের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে গড়ে ওঠে। যেহেতু কারিগরী শিক্ষার পিছনে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে তাই এই শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে দেশের শিল্পোন্নয়নের সাথে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। তাই কারিগরী শিক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হলে রাষ্ট্র ও শিল্পপতিদের সাথে সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। কারিগরী শিক্ষা যারা পেল তাদের কর্মে নিয়োগ ও শিক্ষানবীশ-রূপে কাজ করবার সুযোগের জন্যই এই সহযোগিতার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ দেশের শিল্পে বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎ শিল্প উন্নয়নে কি পরিমাণ সুশিক্ষিত কারিগরের প্রয়োজন হতে পারে তা বিচার করে কারিগরী শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনা রচনা করলে কারিগরী শিক্ষার অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে।

আমাদের দেশে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বল্পকালীন শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রাপ্তদের জন্য রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা নেই। এক কথায় কারিগরী শিক্ষা শেষ করে বের হলে তার যে আবার নতুন করে শিক্ষার প্রয়োজন হতে পারে একথা আমরা চিন্তা করি না। শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন অভিনব আবিষ্কারের ফলে অতীতের শিক্ষা বহু ক্ষেত্রেই অচল হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে আমাদের কর্মীদের মান উন্নত রাখতে হলে নতুনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের দেশের শিল্পায়ণ মাত্র স্বাধীনতার পর ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। ক্রমবর্ধমান শিল্পের উন্নতির সাথে কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটবেই, তাই দেশের কারিগরী শিক্ষার জন্য সুপরিকল্পিত এমন কর্মপন্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে যার ফলে কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় হবার সুযোগ সৃষ্টি না হয়। সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যা, জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে এক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। সুপরিকল্পনার অভাবে যদি কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষায় সে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কারিগরী ও বৃত্তি-শিক্ষার উপরই আমাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভরশীল। তাই পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে জাতীয় প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

পশ্চিম বাংলায় বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার অগ্রগতি :—

দেশে সাধারণ শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাংলার জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিংশ শতকের শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য বেঙ্গল টেকনিক্যাল

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়টিই কালক্রমে কলেজ ও পরে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রূপ নিয়েছে। বে-সরকারীভাবে যাদবপুর *College of Engineering and Technology* এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের *Engineering Colleg.*-এর কারিগরী শিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে যুদ্ধের চাপে সরকার কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশ যখন শিল্পের উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন সুপরিকল্পিতভাবে কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হয়। সাধারণ শিক্ষার মত কারিগরী শিক্ষারও তিনটি স্তর বিভাগ আছে। প্রথম পর্যায়ে সাধারণ কারিগরী শিক্ষা, দ্বিতীয় ডিপ্লোমা কোর্স, তারপর উচ্চ শিক্ষা বা ডিগ্রী কোর্স।

প্রাথমিক কারিগরী শিক্ষার জন্য *Industrial Training Institute* (*I. T. I.*) নামে স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এখানে ফিটার, টার্নার, কারপেন্টার, ওয়েল্ডার প্রভৃতি বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা যাদের আছে তারা এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পায়। কোন কোন *I. T. I.* তে সার্ভে ও ড্রাফটসম্যানসিপ পড়াবার ব্যবস্থা আছে। তবে এজন্য শিক্ষার্থীকে নিম্নতম স্কুল ফাইনাল পাস হতে হবে।

॥ ডিপ্লোমা কোর্স ॥

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ডিপ্লোমা কোর্স, লাইসেনসিয়েট কোর্স। স্কুল ফাইনাল পাস করে এ কোর্সের জন্য ভর্তি হওয়া চলে তবে শিক্ষার্থীকে অঙ্কে ভাল হতে হবে। পশ্চিম বাংলায় প্রতি জেলায় একটি করে ও কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়েকটি পলিটেকনিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে পঃ বাংলায় মোট ২১টি পলিটেকনিক স্কুল আছে। এই স্কুলগুলি পঃ বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের "*State Council of Engineering and Technical Education*" দ্বারা অনুমোদিত। এখানে শিক্ষাকাল তিন বছর। এখানে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমা কোর্স পড়ান হয়। যাদবপুর, এন্টালী ও খিদিরপুর পলিটেকনিক স্কুলে চাকুরীজীবিদের জন্য সান্ধ্য ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। আসানসোলে মাইনিং পড়াবার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন পলিটেকনিকে ড্রাফটসম্যানসিপ কোর্সেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

কলকাতায় মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক স্কুল আছে। এখানে টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং ও ড্রাফটসম্যানসিপ পড়ান হয়। এখানে স্কুল ফাইনাল পাস করে ভর্তি হতে হয়। শিক্ষাকাল তিন বছর। জরিপ শেখাবার জন্য ব্যাণ্ডেল শহরে একটি স্কুল আছে। স্কুল ফাইনাল পাস করে এখানে দুবছর পড়তে হয়। কলকাতার এস. এন. ব্যানার্জি রোডে "ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল" ও বি. টি. রোডের উপর বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী এই দুটি স্কুলে যারা কলকারখানায় কাজ করছে বা শিক্ষা-নবীশি করছে তারাই পড়তে পারে। এখানে শিক্ষাকাল চার বছরের। কারখানার সাথে বন্দোবস্ত করে এখানে শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে তিন-চার দিন পড়ে। উপার্জনের সাথে

পড়ার সুযোগ এ দুটি স্কুলের বৈশিষ্ট্য। কলকাতায় আরও দু'টি বিশেষ কারিগরী শিক্ষার স্কুল আছে। একটি যাদবপুরে স্কুল অফ প্রিন্টিং টেকনোলজি, এখানে মুদ্রণ সংক্রান্ত কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুল ফাইনাল পাস করে শিক্ষার্থীকে তিন বছর পড়তে হয়। আর একটি প্রতিষ্ঠানের নাম স্কুল অফ কেটারিং টেকনোলজি। এটি ভারত সরকারের কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের পরিচালনাধীন। এন্টালির কনভেন্ট রোডে এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। প্রবেশের যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল পাস, শিক্ষাকাল তিন বছর।

॥ ডিগ্রী কোর্স ॥

ডিপ্লোমা কোর্স বা দ্বিতীয় স্তরের পরবর্তী শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষা বলা হয়, এটা ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষা। স্বাধীন হবার পূর্বে সরকারী অনুমোদিত একটি মাত্র কলেজ বাংলাদেশে ছিল, তা হচ্ছে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। বর্তমানে পঃ বাংলায় প্রায় ছয়টি ডিগ্রী স্তরের কলেজ স্থাপিত হয়েছে। যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি। এখানে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, কেমিক্যাল, টেলিকমিউ-নিকেশন, আর্কিটেকচার, ফারমেসী ও ফুড টেকনোলজি ও ব্যায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এই আটটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভর্তি হবার যোগ্যতা উচ্চতর মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা পাস। অংকে কম করে শতকরা পঞ্চাশ নম্বর পেতে হবে। ভর্তি করবার সময় অংক, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ণ বিদ্যার ফল বিচার করা হয়। শেষের বিষয়টি পড়তে হলে বি. এস সি. হওয়া চাই।

পঃ বাংলায় খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (*I. I. T.*) একটি বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। সারা ভারতে এরকম পাঁচটি কলেজ আছে —খড়্গপুর, কানপুর, মাদ্রাজ, বোম্বে দিল্লী। যে কোন প্রদেশের ছাত্র এখানের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা থাকলে ভর্তি হতে পারে। এই কলেজগুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের অধীন। এখানে এগারটি বিষয় পড়বার সুবিধা আছে। এখানকার ছাত্ররা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বি টেক. উপাধি পান। *I. I. T.*-তে প্রায় প্রতিটি প্রধান বিষয়ে দু'বছরব্যাপী স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুবিধা আছে। পরীক্ষা শেষে এম. টেক. উপাধি দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় দুর্গাপুরে একটি রিজিওন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে আসনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এই রাজ্যের ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত। বাকী পঞ্চাশটি আসনে যে কোন রাজ্যের ছেলে নেওয়া যেতে পারে। দুর্গাপুর রিজিওন্যাল কলেজে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, মেটালার্জী ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াবার ব্যবস্থা আছে। প্রবেশের যোগ্যতা উচ্চতর মাধ্যমিকের বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল বিভাগে পাস ও কলেজের বিশেষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস। শিক্ষাকাল পাঁচ বছর। দুর্গাপুর কলেজটি এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বি. ই. উপাধি দিয়ে থাকে।

শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এক শ' বছরেরও পুরানো কলেজ। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। এখানে বর্তমানে ৭টি বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা আছে—সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, মেটালার্জী, টেলিকমিউনিকেশন, মাইনিং, আর্কিটেকচার। শেষেরটির শিক্ষাকাল ছয় বছর, অন্যগুলির পাঁচ বছর।

বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছাড়া কলকাতায় আর একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সেটির নাম উত্তর কলিকাতা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। এখন এই কলেজটি শিবপুর কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। লবণ হ্রদ উপনগরী হলে কলেজটি স্থানান্তরিত হবে। এখন খুব অল্প ছাত্র এখানে ভর্তি করা হয়। সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল বিষয় এখানে পড়ানো হয়। শিক্ষাকাল ও পাঠক্রম শিবপুর কলেজের মত।

উত্তর বাংলায় জলপাইগুড়িতে একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এখানে বর্তমানে তিনটি বিষয় পড়ান হয়—সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল। কলেজটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। শিক্ষাকাল পাঁচ বছর। পাস করলে বি. ই. উপাধি দেওয়া হয়।

কলকাতার তারাতলায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আছে। কলেজটি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা শেষে যে উপাধি দেন তা ভারত সরকারের অনুমোদিত। জাহাজ সংক্রান্ত কলকব্জা ও যন্ত্রচালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চতর মাধ্যমিকের বিজ্ঞান বা টেকনিক্যাল বিভাগে পাস হলে এখানে ভর্তি হওয়া যায়। শিক্ষা কাল পাঁচ বছর।

সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা ছাড়া আরও কতকগুলি কারিগরী বিদ্যা আছে তাকে টেকনোলজি বলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কতকগুলি টেকনোলজী বিভাগ আছে, যেমন এপ্লায়েড ফিজিকস্, রেডিও ফিজিকস্, এপ্লায়েড কেমিষ্ট্রি। অনার্সসহ বি. এস. সি. পাশ করলে এখানে ভর্তি হওয়া যায়। শিক্ষাকাল তিন বছর। পাস করলে এম. টেক্ উপাধি দেওয়া হয়।

তা ছাড়া আরও কয়েকটি টেকনোলজী বিভাগ আছে যা শিল্প বিশেষের সাথে জড়িত। বাংলার বস্ত্রশিল্পের সহায়করূপে ১৯০৮ খ্রীঃ শ্রীরামপুরে টেক্সটাইল শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এটি কলেজে উন্নীত হয়েছে, এটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে এখানে ভর্তি হওয়া যায়। শিক্ষাকাল চার বছর। পরীক্ষায় পাশ করলে বি. এস. সি. (টেক) উপাধি দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বহরমপুরে একটি টেক্সটাইল টেকনোলজীর কলেজ আছে। শিক্ষাকাল ও প্রবেশ যোগ্যতা শ্রীরামপুরের মত। বাংলার চর্ম শিল্পের সহায়তার জন্য ট্যাংরা অঞ্চলে 'কলেজ অফ লেদার টেকনোলজী' অবস্থিত। বাংলার মৃৎশিল্পের সাহায্যের জন্য কলকাতার খুঁড়া অঞ্চলে বেঙ্গল সেরামিক ইনষ্টিটিউট অবস্থিত। পাঠকাল ও প্রবেশ যোগ্যতা অন্য টেকনোলজীর মত। বস্ত্র, চর্ম ও মৃৎশিল্পের কলেজগুলি বাংলা সরকারের শিল্প দপ্তরের পরিচালনাধীন।

যুদ্ধের পর থেকে বাংলাদেশে কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার প্রসারের যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পরেও সে চেষ্টা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার আমরা কামনা করি ও সাধারণ শিক্ষা শেষ করে যাতে অধিকাংশ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী কারিগরী শিক্ষার সুযোগ পায়, সে জন্য আমরা পলিটেকনিক স্কুল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজী কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী করি। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে সাধারণ শিক্ষা অন্য নিরপেক্ষ, কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে সে কথা বলা চলে না। দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দক্ষ কারিগর, কুশলী ইঞ্জিনীয়ার প্রয়োজন। তাই শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি শিল্পের প্রয়োজনের চেয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীধারী কারিগরের সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে পাস করা ছেলেমেয়েরা চাকুরী যোগাড় করতে পারবে না—শিল্পের ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরী বেকারের সংখ্যা বেড়ে জটিলতার সৃষ্টি হবে। কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টায় দেশের শিল্পপতিদের প্রয়োজন বিচার করে ও ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতির কথা চিন্তা করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনুন্নত দেশে উন্নতির প্রথম পর্যায়ে যে পরিমাণ কর্মীর প্রয়োজন, পরে ধীরে ধীরে আনুপাতিক হারে কর্মীর প্রয়োজন কমে যায়। কারিগরী শিক্ষার জন্য খুবই আগ্রহ দেখা দিয়েছে কিন্তু আগ্রহ বিচার করেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেই চলবে না। বর্তমানে কারিগরের যে প্রয়োজন আছে ও ভবিষ্যতে কত কারিগরের প্রয়োজন হতে পারে সে কথা বিচার করে সুপরিকল্পিতভাবে কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুপরিকল্পিতভাবে কারিগরী বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা না হবার ফলে শিক্ষিত কুশলী কর্মীদের মধ্যে বেকারী দেখা দিয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ও পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তির হার হ্রাস পেয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বেই সতর্ক হলে এ বিপদ দেখা দিত না।

॥ শিক্ষক-শিক্ষণ ॥

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী যুগ :—

যে কোন শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। শিক্ষার মান উন্নয়নের সাথে শিক্ষকের বিশেষ শিক্ষার প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে জড়িত। শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা অতি আধুনিক কালের ঘটনা। আধুনিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা পূর্বের থেকে জটিলতর। শিক্ষককে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবার পূর্বে নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে সেই বিশেষ কাজটির জন্য। জাতির জীবন গঠনে শিক্ষকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গণতান্ত্রিক ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের তারাই গড়ে তুলবেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সময় থেকে উচ্চতর শিক্ষার শেষ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে গড়ে ওঠে শিক্ষার্থীর জীবন। তাই নবীন শিক্ষার্থীর জীবন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। আজকের যুগে শিক্ষার সমস্ত আয়োজন শিশুকে কেন্দ্র করে হলেও শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার

ভার ছেড়ে দিতে হয়েছে শিক্ষকের হাতে। তাই শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষণের গুরুত্ব আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শুরু থেকেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন যে শিক্ষাব্যবস্থা তা দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা নামে খ্যাত। সেই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক শ্রেণীর ছাত্র শিক্ষকতার শিক্ষা পেত। শিক্ষার ইতিহাসে আমরা যাকে *Monitorial System* বা 'সর্দার পোড়ো প্রথা' বলে জানি, তাকেই বলা চলে দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষণ প্রথা। মনিটারের তত্ত্বাবধানে গুরুমশায় নবীন ছাত্রকে সঁপে দিতেন। সেই নবীন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রথম পর্ব সর্দার পোড়োর কাছেই সমাধা করতে হ'ত। স্মরণাতীতকাল থেকেই নিখরচায় শিক্ষক তৈরীর এ প্রথাটি আমাদের দেশীয় ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত ছিল। ডাঃ বেল মাদ্রাজে মিলিটারী এসাইলামে অধ্যক্ষ থাকা কালে তাঁর প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতির সাফল্যে তিনি ইংলণ্ডে এই পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত করেন। দেশে ফিরে তিনি "*An experiment in Education made at Male Asylum at Madras* নামে একখানা বই লেখেন। তাঁর এই পদ্ধতি ইংলণ্ড গ্রহণ করবার ফলেই অতি অল্প খরচে ১৮০১ খ্রীঃ থেকে ১৮৪৫ খ্রীঃ সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার সম্ভব হয়েছিল।

ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থাপন করেন দিনেমার মিশনারী সম্প্রদায়। শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। বোম্বে শহরে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নতির জন্য ২৪ জন সংগঠককে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। স্যার টমাস মনরোর পরামর্শে ১৮২৬ খ্রীঃ মাদ্রাজে শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় খোলা হয়। বাংলা দেশে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য ল্যাঙ্কেস্টার প্রথা প্রবর্তন করেন। এ প্রথা সর্দার পোড়ো প্রথার পরিবর্তিত রূপ। ক্যালকাটা লেডিস সোসাইটি শিক্ষিকাদের শিক্ষার জন্য ক্যালকাটা সেন্ট্রাল স্কুলে ব্যবস্থা করেন। বেসরকারী এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারী পরিচালনায় কয়েকটি শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। বোম্বে প্রদেশে এলিফিনস্টোন ইনষ্টিটিউশন, পুণা সংস্কৃত স্কুল ও সুরাট স্কুলের সাথে শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য নর্মাল ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪৯ খ্রীঃ কলিকাতা নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আগ্রা, মিরাট ও বেনারসে তিনটি (১৮৫২-৫৭) নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়।

উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য প্রতি প্রদেশে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এ নির্দেশ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কার্যকরী করা প্রয়োজন বোধ করেন নি। ১৮৫৯ খ্রীঃ স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে অভিযোগ করা হয় কোর্ট অব ডিরেক্টারস্-এর নির্দেশমত শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় নি। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথায় স্থির হয়, যে স্কুলে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষক আছেন সেই স্কুলেই সাহায্য দেওয়া হবে। এর ফলে শিক্ষকদের ট্রেনিং নেওয়ার আগ্রহ বেড়ে যায়। ১৮৮১-৮২ খ্রীঃ পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশে ১০৬টি নর্মাল স্কুলে ৩,৮৮৬ জন শিক্ষক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ও এজন্য বছরে চার লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

উনবিংশ শতকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য কিছু ব্যবস্থা হলেও মাধ্যমিক-শিক্ষার শিক্ষকদের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই ছিল না। সারা ভারতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য দু'টি মাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল, একটি মাদ্রাজে গভর্ণমেণ্ট নর্মাল স্কুল (১৮৫৬) আর একটি লাহোর ট্রেনিং কলেজ (১৮৮১)। দুটি প্রতিষ্ঠানেই গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের একসাথে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ হাণ্টার কমিশন ও ১৯০৫ খ্রীঃ ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে কয়েকটি সুপারিশ করা হয়। শিক্ষা কমিশন বিভিন্ন স্থানে নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের সম্পর্কে বলা হয় কেবল মাত্র শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চাকুরীতে স্থায়ী করা হবে। গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য কমিশন পৃথক ট্রেনিং-এর সুপারিশ করেন। উনবিংশ শতকের শেষে মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য ভারতে ৫টি কলেজ ও ৫০টি ট্রেনিং স্কুল ছিল।

১৯০৪ খ্রীঃ থেকে অধিক সংখ্যায় ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯১২ খ্রীঃ সরকারী শিক্ষা প্রস্তাবে বলা হয় অদূর ভবিষ্যতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকতার ট্রেনিংহীন কোন ব্যক্তিকে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করা হবে না। স্যাডলার কমিশন শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই কমিশন প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথকভাবে শিক্ষা বিষয় পড়াবার ও সে বিষয়ে বিভাগ খুলবার ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শিক্ষাকে একটি বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করবার সুপারিশ করেন। এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "শিক্ষা বিভাগ" খোলা হয়। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিন শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য নর্মাল স্কুল, প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য গুরু ট্রেনিং স্কুল। বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষকদের ট্রেনিং ব্যবস্থা করার ফলে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা বেড়ে যায়। ১৯৪৭ খ্রীঃ দেখা যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা ৬১'৫%।

স্বাধীনতার পর :—

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও সরকারী শিক্ষা নীতির এক বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকদের অবস্থা ও শিক্ষকতার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রশ্নটিকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়েছে। দেশে গণতান্ত্রিক শিক্ষার সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের। আজকের দিনের শিক্ষার পরিবর্তিত রূপের সাথে যার পরিচয় নেই শিক্ষকতার দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাকে নিয়োগ করা উচিত হবে না বিবেচনা করে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপক আয়োজনের কথা বলেছেন। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষকের ট্রেনিং দেবার রীতিও পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার সামাজিক মূল্য, ছাত্রদের প্রয়োজন, তার গ্রহণ করবার ক্ষমতা, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সমাজ সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার সমন্বয় সাধন প্রভৃতি নানা

প্রশ্ন আজ শিক্ষার সাথে জড়িত। এসব প্রশ্নের সুষ্ঠ্ সমাধান কি করে হতে পারে সেদিকে বিচার করে শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান যুগে শিক্ষকতার জন্য যে তাকে প্রস্তুতি ট্রেনিং দেওয়া হয় না বলে, শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা বলাই সঙ্গত।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে যে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার হয়েছে তা বলা বাহুল্য। ১৯৪৮ খ্রীঃ শিক্ষক-শিক্ষন প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪২,১৫৭ জন; ১৯৫৬ খ্রীঃ এই সংখ্যা বেড়ে হয় ১,০৫,১৯৬ জন। এ জন্য ব্যয় ১·১৬ কোটি থেকে বেড়ে ২·৬৩ কোটি হয়।

॥ বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ॥

॥ ১ ॥ প্রাক্ প্রাথমিক :—

বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আমাদের দেশে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার অতি সামান্য ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত হয়েছে। বড় বড় শহরে কিছু নার্শারী বা কে. জি. স্কুল স্থাপিত হয়েছে। সরকারীভাবে কোন প্রচেষ্টা আজও শুরু হয় নি। মিশনারীদের পরিচালিত বা ব্যক্তিগত মালিকানায় বর্তমানে কিছু কে. জি. বা নার্শারী স্কুল রয়েছে। এর অধিকাংশই ব্যবসা হিসাবে লাভজনক কিন্তু রীতি, পদ্ধতি ও আদর্শের দিক থেকে কে. জি. নামের অযোগ্য। প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের শিক্ষার জন্য ১৪টি প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে তিনটি সরকার পরিচালিত। বাকীগুলি বেসরকারী পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত। এসব প্রতিষ্ঠানে ম্যাট্রিক বা প্রাইমারী সার্টিফিকেট পাস শিক্ষার্থীদের এক বছরের কোর্সে শিক্ষা দেওয়া হয়।

॥ ২ ॥ বুনিয়াদী ও প্রাথমিক :—

প্রাথমিক শিক্ষায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ বুনিয়াদী শিক্ষকদের ৫২০ টি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ৪০৩ টি প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে যথাক্রমে ৫০৯৯ ও ৫২৪১ শিক্ষক শিক্ষার্থী ছিলেন। এখানে শিক্ষাকাল সাধারণতঃ দু'বছর। রাজ্যভেদে পাঠক্রম ও শিক্ষাকাল বিভিন্নরূপ দেখা যায়। শিক্ষার নীতির সাথে প্রয়োগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে একটি হস্তশিল্পের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ম্যাট্রিক পাস বা স্কুল ফাইনাল পাস শিক্ষকদের সিনিয়ার টিচার্স সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষাকেন্দ্রে 'নঈ তালিমে'র শিক্ষাদর্শ সামনে রেখে পাঠক্রম রচনা করা হয়েছে। তবে সব প্রদেশে একই পাঠক্রম অনুসৃত হয় না।

॥ ৩ ॥ জুনিয়র হাই ও মিডল :—

আণ্ডার গ্রাজুয়েট জুনিয়র হাই অথবা মিডল স্কুলের আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য সেকেণ্ডারী ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে শিক্ষাকাল এক বছর থেকে দু'বছর। ট্রেনিং শেষে বিশ্ববিদ্যালয় বা রাজ্য সরকার শিক্ষার সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দিয়ে থাকেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ, পাস শিক্ষকদের জন্য এক বছর কোর্সের পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। রাজ্যভেদে পাঠক্রম ভিন্নরূপ হলেও নীতিগত ঐক্য রক্ষা করেই পাঠক্রম রচিত হয়। সর্বত্র শিক্ষাতত্ত্ব ও প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষকতার ট্রেনিং দেওয়া হয়।

॥ ৪ ॥ হাই ও হায়ার সেকেণ্ডারী :—

গ্রাজুয়েট শিক্ষকরা তাঁদের বৃত্তিগত শিক্ষা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ থেকে গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খ্রীঃ সারা ভারতে এরূপ কলেজের সংখ্যা ছিল ১০৭টি। এর মধ্যে শুধুমাত্র মেয়েদের কলেজ ২১টি, বাদবাকী ৮৬টি কলেজের অধিকাংশ কলেজগুলিতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য দু'শ্রেণীর কলেজ আছে। প্রথম শ্রেণীতে প্রচলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষার কলেজ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে সিনিয়র বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রচলিত কলেজগুলিতে এক বছরের কোর্স শেষে *B. T. B. Ed.* অথবা *Dip in-Ed.* প্রভৃতি ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী দেওয়া হয়।

॥ ৫ ॥ সিনিয়র বেসিক :—

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে এক বছরের কোর্স শিক্ষার জন্য ডিপ্লোমা দেবার ব্যবস্থা আছে। এই ডিপ্লোমা সাধারণতঃ রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে দেওয়া হয়। সমস্ত রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার মানের সমতা রক্ষার জন্য পাঠক্রমের একটা নির্দিষ্ট মান স্থির করা হয়েছে। স্থানীয় প্রয়োজনে সামান্য অদল বদল করে এই পাঠক্রমই সব রাজ্য গ্রহণ করেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমে স্বাভাবিক ভাবেই হস্ত শিল্প ও বৃত্তি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ থেকে যারা শিক্ষা সমাপ্ত করেন, তাঁদের বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক বা বেসিক ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক রূপেই নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৬-৫৭ খ্রীঃ ভারতের ৩২টি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে ২,৪৬৯ জন শিক্ষক শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

॥ ৬ ॥ দেহ চর্চা :—

শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ-শিক্ষা দেওয়ার কলেজ ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার জন্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেহ চর্চার বিশেষ শিক্ষার জন্য গ্রাজুয়েট-

দের কলেজ ও আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের জন্য স্কুল দুই-ই স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে এজন্য ২০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে এক বছরের জন্য ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সের ব্যবস্থা আছে।

॥ ৭ ॥ **শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার ত্রুটি :—**

আমাদের দেশে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষণের দ্রুত প্রসার হয়েছে, কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতি ও তার প্রয়োগের মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গিয়েছে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সুযোগ সুবিধা খুব কম। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে তা যতদিন দূর না হবে, ততদিন শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতির সম্ভাবনা খুবই কম। প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষার তত্ত্বগত দিকের উপর অত্যন্ত বেশী জোর দেওয়া হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা কর্মকেন্দ্রীক হওয়ায় সেখানে ব্যবহারিক দিক ও বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই দুই শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে এনে এই দুই পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষক-শিক্ষণের নতুন পাঠক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব কি না তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। একই দেশে মাধ্যমিক শিক্ষকদের দু'রকম শিক্ষণ বিধি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে, তা দূর করে নতুন পাঠক্রম রচনা করে শিক্ষক-শিক্ষণকে বাস্তবধর্মী করে তুললেই শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। যাতে শিক্ষার সাথে জীবনের যোগসূত্র নিবিড় হয় সে ব্যবস্থাই করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত স্বল্পকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থা। মাত্র নয় মাসে শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। মুদালিয়র কমিশন এই ত্রুটি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য দু'বছরের শিক্ষার কথা বলেছেন। বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে আরও বেশী সময় দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। একজন শিক্ষককে শিক্ষাকালীন অবস্থায় কম পক্ষে তিন মাস অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই প্রার্থিত ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

॥ ৮ ॥ **শিক্ষকদের অবস্থা :—**

যে কোন দেশের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। শিক্ষায় প্রধান শিক্ষার্থী, তার পরেই শিক্ষক। ভারতে বৈদেশিক সরকারের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি সরকার এদেশের জাতীয় শিক্ষা-

ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় নি। শিক্ষার মনোন্নয়নের কথা, শিক্ষক-শিক্ষণের কথা, শিক্ষকের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে চিরাচরিত নীতিই অনুবর্তিত হয়েছে।

নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবার পরও শিক্ষকদের অবস্থার খুব উন্নতি হয়েছে একথা বলা যায় না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ শিক্ষকতাকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীঃ ভারতের ১১ লক্ষ শিক্ষিত নাগরিক শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিল। এ সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়—বিভিন্ন বৃত্তিজীবিদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে শিক্ষকদের স্থান বেশ নীচুতে। প্রাচীন ভারতে গুরুকে যে সম্মান দেওয়া হ'ত, সে গৌরব আজ ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। যে সমাজে অর্থগৌরব সামাজিক মান মর্যাদার মাপকাঠি, সেখানে সামান্য বেতনভোগী দরিদ্র শিক্ষক যে সবার করুণার পাত্র হবে তা অস্বাভাবিক নয়। শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে যে, শিক্ষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে সেকথা সবাই স্বীকার করেন। যে পরিবেশে শিক্ষক কাজ করেন তা যাতে শিক্ষার উপযোগী হয় তাও মনে রাখতে হবে। বর্তমানে বহু স্কুলে দেখেছি স্থানীয় স্কুল পরিচালক সমিতির দলাদলি ও খাম খেয়ালীর মধ্যে শিক্ষকদের জীবন এমন দুর্বিসহ হয়ে উঠে যে বহু ক্ষেত্রেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষকতাকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে ইতঃস্তত করেন। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, চাকুরীর স্থায়িত্ব, চাকুরীর অবস্থার উন্নতি, বহুঘোষিত ট্রিপিল বেনিফিট প্রভৃতির ব্যবস্থা না করে শিক্ষক-শিক্ষণের যত উন্নততর আধুনিক পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন শিক্ষার মানের উন্নতি হবে না। উপযুক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষকতা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হলে শিক্ষকের অবস্থার পরিবর্তন করেই তা সম্ভব। শুধু মাত্র বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ আর শিক্ষাবিদ্‌দের উপদেশ দিয়েই সার্থক জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের। সমাজ যাঁদের উপর একটি বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিল সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না সেটা দেখা যেমন সমাজের কর্তব্য, যাঁরা এই দায়িত্বকে গ্রহণ করলেন তাঁদের যথোচিত সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাও সমাজের ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন ও শিক্ষকের অবস্থার পরিবর্তন যাতে করা সম্ভব হয় সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

[মুদালিয়র কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যার শিক্ষক অংশ দেখুন]

সামাজিক শিক্ষা বা বয়স্কদের শিক্ষা
(Social Education or Adult Education)

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকারী। আপন-যোগ্যতাবলে ভারতের যে কোন নাগরিক রাষ্ট্রের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তিরা দেশ শাসন করেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের আপন অধিকারের সঠিক প্রয়োগের উপর। জনসাধারণের সম্মতির উপর সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাই যদি ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা তাদের অধিকার ও ক্ষমতার প্রয়োগ করেন তাহলে বিভ্রান্তজনিত অরাজকতার সৃষ্টি হবার যথেষ্ট সম্ভবনা আছে। আবার যদি অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদের অধিকার প্রয়োগে বিরত থাকেন তাহলেও সমূহ বিপদ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবাই নির্বাচিত হবেন না, অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যারা নির্বাচিত হয়ে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাঁদের নির্বাচন নির্ভর করছে জনসাধারণের সম্মতির উপর। জনসাধারণ যদি অজ্ঞ হয়, নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন না থাকে, তাহলে তাদের নির্বাচনে ভুল হতে পারে। তাই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য গণশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা যদি সমাজের প্রতি স্তরে ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জন্মাবে না। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ও সমৃদ্ধির জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন, সমাজের প্রতিটি লোকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা। জগতের সমস্ত উন্নতিশীল ও প্রগতিশীল দেশে আজ সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি নরনারীর শিক্ষার অধিকার রয়েছে এবং তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রাষ্ট্রের। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক যাতে আপন যোগ্যতার সদ্ব্যবহারের সুযোগ পায় সে সুযোগ তাকে করে দিতে হবে। সুযোগের ব্যাপারে কোন বৈষম্যমূলক নীতির স্থান গণতন্ত্রে নেই। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের সাফল্যের মুল কথা।

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধ-বণিতার জন্য এখানে শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা সম্প্রসারিত করতে হবে। এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে আছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক তাদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত ব্যবস্থা। যারা বয়স্ক অথচ নিরক্ষর তাদের কথাও আমরা ভুলে থাকতে পারি না।

প্রাথমিক শিক্ষাসমস্যা আলোচনায় আমরা দেখেছি আমাদের দেশের অভিভাবকগণ ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সম্পর্কে উৎসাহী নন ও তাদের শিক্ষায় প্রয়োজনীয়তা

সম্পর্কে সচেতন নন। এর একটা কারণ তাঁরা নিজেরা শিক্ষা পান নি তাই নিজের স্বার্থ ও সমাজের কল্যাণের জন্য শিক্ষার যে কি মূল্য তা তাঁরা জানেন না। যদি বয়স্কদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তাঁরা পরবর্তীকালে উৎসাহী হয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবেন। শিক্ষার অনগ্রসরতার সাথে দেশের বৈষয়িক উন্নতির প্রশ্নটিও জড়িত আছে। দেখা গিয়েছে শিক্ষায় অনগ্রসর দেশ বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রেও পিছিয়ে থাকে। শিল্পোন্নতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রমিক ও চাষীকে অবহিত করতে হলেও তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। তাই বয়স্ক শিক্ষা জাতীয় উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক যে দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনায় বয়স্ক শিক্ষাকে কোন প্রকারেই বাদ দেওয়া যায় না।

॥ স্বাধীনতার পূর্বযুগে বয়স্ক শিক্ষা ॥

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে খুব বেশী তৎপরতা দেখা যায় না। কালের বিচারে বয়স্কদের শিক্ষা প্রচেষ্টা অতি আধুনিক কালের ঘটনা। ১৯২০ খ্রীঃ পূর্বে এদিকে সরকার থেকে কিছু করা হয় নি। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হবার পর সর্বপ্রথম বয়স্কদের শিক্ষাদান সম্পর্কে সরকারী ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ-পর্ব শুরু হয়। দেশীয় মন্ত্রীগণ বিভিন্ন প্রদেশে এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯২১ খ্রীঃ পাঞ্জাবে বয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে গ্রাম সংস্কার আন্দোলনের অঙ্গরূপে বয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিহারে ১৯২৮ খ্রীঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন শুরু হয়। সংযুক্ত প্রদেশে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়। আট বছরের মধ্যে এখানে পুরুষদের জন্য ৪০০টি ও মেয়েদের জন্য ৬২টি স্কুল খোলা হয়। সরকারী ছাড়া বেসরকারী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট হয়েছিল।

১৯২৭ খ্রীঃ সারা ভারতে ১১,২০৫টি প্রাপ্তবয়স্কদের বিদ্যালয়ে ২,৯০,৩৫২ জন শিক্ষার্থী ছিল। পরবর্তী দশ বছর অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বহু নৈশ বিদ্যালয় ও বয়স্কশিক্ষার স্বতন্ত্র ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীঃ বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ২,০২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৩,৬৩৭ জন। সংখ্যার হিসাবে বয়স্ক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার না হলেও নীতিগতভাবে বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছিল ও প্রাথমিক কাজ কিছুটা এগিয়েছিল। পরবর্তী কালে এই কাজের সূত্র ধরেই কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ খ্রীঃ কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয় ও তাদের চেষ্টায় সুপরিকল্পিতভাবে বয়স্ক শিক্ষার কাজ কিছুটা এগিয়ে যায়। ১৯৩৯ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা

উপদেষ্টা পরিষদ (CABE) বিহারের শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদকে সভাপতি করে কেন্দ্রীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতি গঠন করেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ বিহার সরকার এজন্য আশী হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীঃ বিহারে প্রতি বছর দু'লক্ষ বয়স্কদের শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

১৯৩৭ খ্রীঃ বোম্বে প্রদেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি বোম্বে শহরে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে কর্মসূচী সীমাবদ্ধ রাখে।

॥ স্বাধীনতার পরবর্তী অবস্থা ॥

সমগ্রভাবে বিচার করলে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বয়স্ক শিক্ষার কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নি। ১৯৪৭ খ্রীঃ যখন দেশ স্বাধীন হ'ল তখন দেশে শিক্ষিতের হার মাত্র ১৫ জন, যদি শুধুমাত্র বয়স্কদের কথা বিচার করা যায় তাহলে এই সংখ্যা হয় ১০ জন। অর্থাৎ যারা প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সর্ববিধ দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই নিরক্ষর। এই শতকরা ৯০ জনের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা এক সুকঠিন কাজ। ১৯৪৮ খ্রীঃ থেকে সারা ভারতে শিক্ষা প্রসারের জন্য সর্বভারতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা হয়। বয়স্ক শিক্ষা পরিকল্পনা এই ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনার একটি দিক। আমাদের দেশের অনগ্রসরতার মূলে যে অশিক্ষা তা সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃত। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ভারতের বৈষয়িক উন্নতির জন্য অশিক্ষা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারত সরকার সচেতন। তাই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সাথে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করতে সরকার সচেষ্ট।

শুধুমাত্র বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান করলেই তাদের শিক্ষা পর্ব শেষ হবে না। বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞানের সাথে আরও কতকগুলি বিষয় জানা দরকার। এজন্য ভারত সরকার বয়স্ক শিক্ষা অভিযানের অঙ্গস্বরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পাঁচটি বিষয়ে যাতে বয়স্করা বিশেষভাবে অবহিত হয় সে পরিকল্পনা করেছেন। পাঁচটি বিষয় হচ্ছে (১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, (২) স্বাস্থ্যজ্ঞান, (৩) বয়স্কদের অর্থনৈতিক অবস্থার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, (৪) নাগরিকতা বোধ, (৫) আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা। শুধুমাত্র নিরক্ষরতা দূরীকরণের মধ্যে সরকারের কর্মপ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি ব্যক্তিকে সুনাগরিক করে তোলা, জীবনের মান উন্নত করে সমাজের মান উন্নত করা হচ্ছে সরকারের বয়স্ক শিক্ষা প্রচেষ্টার লক্ষ্য। তাই বয়স্ক শিক্ষার কর্ম প্রচেষ্টাকে আজ আর নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান না বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে সামাজিক শিক্ষা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে সরকারকে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৫১ খ্রীঃ লোক গণনায় দেখা যায় ভারতে শিক্ষিত জনগণের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৬·৬ জন। ১৯৬১ খ্রীঃ লোক গণনায় দেখা গিয়েছে শিক্ষিতের হার কিছুটা বেড়ে ২৩·৭ জন হয়েছে। ঐ সময় অনুমান করা হয় আমাদের দেশে বয়স্ক নিরক্ষরের

সংখ্যা ২০ কোটি। ১৯৪৪ খ্রীঃ সার্জেণ্ট রিপোর্টে দেখা যায় বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা ৯ কোটি ৫০ লক্ষ। ষোল বছরের মধ্যে এ সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশীতে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বয়স্ক শিক্ষার সামান্য যে ব্যবস্থা হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উপলক্ষে তা-ও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪১-৪২ খ্রীঃ বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ৬,৪০৭টি বিদ্যালয় ছিল, ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে ৫,৯৩৮টি হয়।

যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনায় সার্জেণ্ট রিপোর্টে বয়স্ক শিক্ষার জন্য ২০ বছরের একটি পরিকল্পনা করা হয়। রিপোর্টে শুধুমাত্র নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর জোর না দিয়ে যারা কেবলমাত্র স্বাক্ষর করতে জানেন তাদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলা হয়। বয়স্ক শিক্ষার কাজে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বলে সার্জেণ্ট রিপোর্টে বলা হয়। এই কুড়ি বছরের পরিকল্পনায় ২০ কোটি খরচ হবে বলে অনুমান করা হয়।

অর্থের অভাবে সার্জেণ্ট পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে প্রয়াস, তা ছিল প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব ব্যাপার। তাই একই নীতি অনুসরণ করে সুপরিকল্পিত ভাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কিছু করা সম্ভব হয় নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। ভারত সরকার বয়স্ক শিক্ষার বিরাট প্রশ্নটি সম্পর্কে আর উদাসীন থাকা উচিত নয় বিবেচনা করে একাজে এগিয়ে আসেন। ভারত সরকার নতুন পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বয়স্ক শিক্ষা মূলনীতি নির্ধারণ করেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা অভিযানে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞানই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে না বলে স্থির হ'ল। প্রথমতঃ, এতে দেখা গিয়েছে বয়স্করা খুব উৎসাহবোধ করে না, দ্বিতীয়তঃ, বাস্তব ক্ষেত্রে এর উপযোগিতাও সীমাবদ্ধ। নতুন গণতান্ত্রিক সমাজের সুনাগরিক কি করে গড়ে তোলা যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সরকার স্থির করেন নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, কিন্তু তারপরেও জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রতিটি লোক সুনাগরিক হবার শিক্ষা পায়। অক্ষরজ্ঞানের সাথে স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, যে যেই বৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে সেই সম্পর্কে নতুন তথ্য ও কি করে আরও দক্ষতা অর্জন করা যায় সে শিক্ষা দিতে হবে। সারাদিনের কর্মের পর অবসর বিনোদনের জন্য আয়োজন এই শিক্ষারই লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে। পূর্বতন যে লক্ষ্য তা ছিল শুধুমাত্র নিরক্ষরতা দূর করবার চেষ্টা। এখন যে পরিকল্পনা নেওয়া হ'ল তা প্রতিটি ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলবার চেষ্টা। তাই বয়স্ক শিক্ষার যে সামাজিক শিক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে তা খুবই সঙ্গত। যে পাঁচদফা কার্যসূচীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাকে কার্যকরী করা যায় তাহলে সামাজিক শিক্ষা নামকরণ সার্থক হবে। অতীতে প্রাপ্ত বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যার সম্মুখীন বহু দেশকেই হতে হয়েছে। সব দেশে দ্রুত

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর বিহার, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিন বাদেই কার্যসূচীর পরিবর্তন করে, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সরকারী কর্তাব্যক্তিরা নাকি বুঝতে পেরেছেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত-বয়স্কদের উপর শিক্ষা রূপ বোঝা চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যেখানে প্রাপ্ত-বয়স্করা নিজেরা শিক্ষার জন্য আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসবে, সেখানেই বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র বা ক্লাস খোলা হবে। সরকারী হিসাবে দেখা গিয়েছে এ ব্যবস্থায় বছরে গড়ে ৫০,০০০ হাজার ক্লাস হয়েছে আর ছাত্র হাজির হয়েছে ১২ লক্ষ, খরচ হচ্ছে এজন্য বছরে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা।

॥ সামাজিক শিক্ষা প্রসারে সরকারের ব্যর্থতা ॥

দেশ স্বাধীন হবার পর বয়স্ক শিক্ষা নাম পরিবর্তন করে গালভরা সামাজিক শিক্ষা নামকরণ করা হয়েছে, পাঁচদফা কার্যসূচী লওয়া হয়েছে, কিন্তু কাজ কিছুই হচ্ছে না। যদি পাঁচদফার অঙ্গচ্ছেদ করে একদফা অর্থাৎ বয়স্কদের শিক্ষাটুকু রাখা হ'ত তাহলে হয়ত কাজ কিছুটা হ'ত। সামাজিক শিক্ষাকে সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। ব্লকে ব্লকে সামাজিক শিক্ষা সংগঠক ও মুখ্য সেবিকা নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যস্তরে কাজ দেখবার জন্য অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। পঃ বাংলার কথা যারা জানেন তাঁরা বলবেন সারা পঃ বাংলায় যে কয়জন মুখ্যসেবিকা ও সামাজিক শিক্ষা সংগঠক আছে, ৩৩টি সক্রিয় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এখনও স্থাপিত হয় নি। মাঝে মাঝে শিক্ষা-শিবির স্থাপন করে এক মাসের কি পনের দিনের শিক্ষায় যারা নিরক্ষরতা দূর করা হ'ল বলে বিশ্বাস করেন তাদের দেওয়া হিসাব অবশ্য অন্যরকম হবে। শিক্ষাকেন্দ্র কয়টিতে যা কাজ হচ্ছে তা দিয়ে বিচার করতে হবে।

সামাজিক শিক্ষার প্রসার প্রচেষ্টায় মধ্যপ্রদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিপুল আগ্রহ নিয়ে এরা কাজ শুরু করেছেন। এখানেই সর্বপ্রথম চলমান বিদ্যালয় পরিকল্পনা গৃহীত হয়। গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের উপর বয়স্ক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যারা কিছু শিখল তাদের জ্ঞান-পিপাসা মেটাবার জন্য পল্লীতে পাঠাগার খোলা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে রেডিও সেট দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এসব কাজে নারী কর্মীদের উৎসাহে সুফল পাওয়া গিয়েছে। বিহার ও রাজস্থানেও সামাজিক শিক্ষা প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে।

সমাজ-শিক্ষা সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনারই একটি অঙ্গ। সমাজের যে কোন রকম উন্নতিমূলক কাজ শিক্ষাকে দিয়ে হতে পারে না। পূর্বে যে কাজ শুধুমাত্র বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমানে তা আরো ব্যাপক হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার সাথে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনও সুষ্ঠু, জীবন ও বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন সরকার থেকে তাই সমাজ শিক্ষার অঙ্গরূপে

গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নততর সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই সমাজ-শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন রাজ্যে সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর যারা পরিণত বয়সে শিক্ষার সুযোগ পেল কেন্দ্রীয় সরকার তাদের জন্য নতুন নতুন পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। ভাল বইয়ের জন্য বাৎসরিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। নব-শিক্ষিতদের (*neoliterates*) জন্য এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছেন। কাগজে কলমে অনেক পরিকল্পনা থাকলেও সামগ্রিক-ভাবে বিচার করলে বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতিকে আশাপ্রদ বলা যায় না।

॥ পঃ বাংলায় সামাজিক শিক্ষা ॥

পঃ বাংলায় সামাজিক শিক্ষার প্রচেষ্টা অত্যন্ত সীমাবদ্ধভাবে হয়েছে। এর জন্য সরকার বা সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন জোরদার আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোন চেষ্টাই প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে হয় নি। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকার থেকে সমাজ শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সে সম্পর্কে সরকারপ্রদত্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল।

রাজ্য সামাজিক শিক্ষার দায়িত্ব "প্রধান পরিদর্শক সামাজিক শিক্ষা" নামক একজন অফিসারের উপর ন্যস্ত। তার অধীনে প্রতি জেলায় একজন করে সামাজিক শিক্ষার অফিসার রয়েছেন। জেলা অফিসার বা নিজেদের জেলার জন্য পরিকল্পনা রচনা ও সংগঠন ও পরিদর্শনের কাজ করেন। প্রতি ব্লকে দুজন সামাজিক শিক্ষা সংগঠক (একজন পুরুষ ও একজন নারী) রয়েছেন।

সামাজিক শিক্ষার জন্য যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার লক্ষ্য হচ্ছে: (১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সামাজিক শিক্ষার প্রসার (২) নবীন শিক্ষিতদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও পাঠাগারের সুবিধা সম্প্রসারণ (৩) অবসর বিনোদনের জন্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যসূচী প্রণয়ন।

বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৪৯-৫০ খ্রীঃ ৫৭৯টি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ১৯৬০-৬১ খ্রীঃ শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে ৩১০১টি দাঁড়ায়। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২,০৮,১৭০ জন এর মধ্যে ৮৬,৪৬৯ জন লেখাপড়া শিখেছিল। সরকারের কাগজপত্রে এই হিসাব কতটা বাস্তব তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পঃ বঙ্গে ১৯৬১ খ্রীঃ সাক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৯ জন, এই সংখ্যা ১৯৭১ খ্রীঃ বেড়ে হয়েছে শতকরা ৩৫ জন। স্বাধীনতা লাভের ২৫ বছর পরে এই চিত্রটি হতাশা ব্যঞ্জক। সারা ভারতের চিত্রটি আরও ম্লান। ভারতে সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ২৯ জন।

নব শিক্ষিতদের জন্য পুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খ্রীঃ *Literacy Work-shop* প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত ৫২টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন

অঞ্চলে পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯টি জেলা, ২৪টি আঞ্চলিক ও ৩৬৪টি পাঠাগার আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পল্লীর লোকদের অবসর বিনোদনের জন্য লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কথক ও কীর্তনীয়াদের শিক্ষার জন্য তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

॥ সামাজিক শিক্ষার সমস্যা ও প্রতিকার ॥

সামাজিক শিক্ষা বিশেষ করে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচী যাই গ্রহণ করা হোক না কেন কাজ যে খুব বেশী হয় নি এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এজন্য প্রথম দায়ী হচ্ছে সরকারী তৎপরতার অভাব। শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে গতানুগতিক ও চিরাচরিত কর্মপন্থা পরিত্যাগ করে নতুন কোন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করলেই তাকে কার্যকরী করতে সরকারী কর্মচারীরা খুব উৎসাহ বোধ করেন না। সামাজিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও জনসাধারণের জন্য যে সহানুভূতির প্রয়োজন সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হলে যে কোনরূপ সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনা শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় সার্থক হতে পারে না। এজন্য সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজের সাথে যাদের নাড়ীর টান রয়েছে ত্যাগ ও সেবার মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যারা কাজে এগিয়ে আসবে, তাদের চেষ্টায় ও সরকারী সহযোগিতায় সামাজিক শিক্ষার প্রসার সম্ভব।

আমাদের দেশের সাধারণ লোক শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন। সামাজিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হলে প্রচার করতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি। গণতান্ত্রিক সমাজে তার অধিকার কতটুকু, কি তার কর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হলেই তারা শিক্ষায় আগ্রহী হবে, সামাজিক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচীকে রূপ দিতে এগিয়ে আসবে। সরকার ও বিভিন্ন লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রচারের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন।

সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর নৈশবিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ খুব কম লোকের কাছ থেকেই আশা করা যায়। বয়স্কদের মধ্যে যারা উৎসাহী হয়ে লেখাপড়া শিখতে এগিয়ে আসে তাদের উৎসাহ কিছু দিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে আসে শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি ও তাদের উপযোগী বইয়ের অভাবে। একটি ছোট ছেলেকে যেভাবে শেখান হবে বড়দের শিক্ষা পদ্ধতি সে রকম হতে পারে না। ছোটরা যে বই পড়ে আনন্দ পাবে একজন বয়স্ক লোক—হতে পারে সে সবে মাত্র লেখাপড়া শিখছে তবু সেই বই পড়ে আনন্দ পেতে পারে না। বয়স্কদের শিক্ষার উপযোগী বই লিখতে হবে।

সরকার থেকে এ চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ে নবীন শিক্ষিতদের (*neoliterate*) জন্য বই লেখার ও অল্প মূল্যে তাদের হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রে নানারূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। প্রচারধর্মী নাটকের মধ্য দিয়ে সামাজিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পল্লীর লোকদের আগ্রহশীল করে তুলতে হবে। সংবাদপত্র, রেডিও দেওয়াল পত্রিকা, পল্লী বার্তা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের সংবাদ পিপাসা মেটাবার ব্যবস্থা ও যেখানে সম্ভব সাহিত্য চর্চার সুযোগ করে দিতে হবে।

এইসব সমস্যার সমাধান করে কাজে অগ্রসর হলেই সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনা সার্থক হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the problems of University education in W. Bengal ? Discuss how far they are going to be solved by the establishment of new Universities [B, T. 1965]
2. Write a critique on the recent University reforms in India with particular reference to W. Bengal. [B. T. 1954]
3. Discuss the types of education provided in technical institutions of W. Bengal. What are their problems and what suggestions do you offer for theri solution ? [B. T. 1968]
4. Describe the system of teacher education in W. Bengal and suggest how it can be improved. [B. T. 1953]
5. Give short history of adult education movement in Bengal in the last fifty years and briefly discuss the programme of adult education sponsored by W. Bengal Govt. [B. T. 1952]
6. It has been said that in a sense the problem of social education in India is as the problem of primary education. Examine this statement. Discuss what progress has been made in W. Bengal for the promotion and extention of social education since independence. [B. T. 1968]

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষা সমস্যা ও শিক্ষার মাধ্যম

আধুনিক ভারতের শিক্ষায় যে সব সমস্যা সর্বভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে ভাষা সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। ভাষা সমস্যা শুধুমাত্র শিক্ষা সমস্যারূপেই নয়, রাজনৈতিক সমস্যারূপেও ভারতীয় জীবনে ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কিছুটা যুক্তি কিছুটা ভাবাবেগ মিশ্রিত হয়ে ভাষা প্রশ্নে দেশকে রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতের জাতীয় সংহতি যে কয়টি প্রশ্নে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে ভাষার প্রশ্ন তার মধ্যে অন্যতম। যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে সর্বজনগ্রাহ্য কোন পথে ভাষা সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে এই প্রশ্নেই একদিন দেশের সংহতি নষ্ট হবে।

ভাষা সমস্যা ও শিক্ষার মাধ্যম দু'টি প্রশ্ন ঠিক এক না হলেও একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে বিচার করা যায় না। ভাষার প্রশ্নে আমরা যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিব্রত তা হচ্ছে—(১) শিক্ষার মাধ্যম কি হওয়া উচিত (২) সর্ব-ভারতীয় ভাষারূপে হিন্দীর দাবী (৩) ইংরেজীর স্থান (৪) প্রাচীন ভাষার দাবী। ভারতের মত বহু ভাষা-ভাষী রাষ্ট্রে ভাষা সমস্যা থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই জটিল সমস্যার সমাধান সময়-সাপেক্ষ। বহুদিন যে ভাষার একাধিপত্য শিক্ষা তথা সরকারী ক্ষেত্রে প্রায় বিনা বাধায় আমরা মেনে নিয়েছি তার পরিবর্তন ও আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে একটি সর্বভারতীয় ভাষার প্রবর্তন শুধুমাত্র আন্দোলনের জোরেই সম্ভব নয়। ভাষার প্রশ্নটি জটিল কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্ন, প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি ও ভাবাবেগ জড়িত হয়ে জটিলতর হয়ে উঠেছে। ইংরেজী হঠাও আর তার পাল্টা দাবীরূপে হিন্দী হঠাও আন্দোলনে ভাষা সমস্যার সমাধান হবে না, জটিলতা বৃদ্ধি পাবে মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যবাদীদের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সেই দ্বন্দের নিরসন হয় মেকলের মন্তব্যে। কোম্পানী সেদিন দেশের শিক্ষারীতিকে মেকলের রায় অনুসারেই গড়ে তুলেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষায় সেদিন থেকে শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষাসাহিত্যই শিখতে হ'ত না, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সব কিছুই ইংরেজীতে শিখতে হ'ত। অপরিণত বুদ্ধি কিশোর কিশোরীদের পক্ষে একটি বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সাধারণ বিষয়সমূহ আয়ত্ত করা যে কি কঠিন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের শক্তি ও সময়ের একটা বিরাট অংশ অপচয় হ'ত ইংরেজীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করতে। সহজ বিষয় দুস্তর ভাষার বাধায় বিভীষিকা রূপে দেখা দিত। ইংরেজী ভাষার বাধা ছিল সেদিন মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজী ভাষাই উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে গৃহীত হ'ল। ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করবার স্বপক্ষে মেকলে বহু অবান্তর ও অশ্রদ্ধেয় কথা বলেছেন। তবু সে যুগে আঞ্চলিক ভাষা সমৃদ্ধ ছিল না, আধুনিক ভারতীয় ভাষাতে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন বই ছিল না। তাই শিক্ষার তৎকালীন প্রয়োজন মেটাতে ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। মনে হয় সরকারও এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। "১৯০৪ খ্রীঃ লর্ড কার্জন ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবে বলেন—*The line of division between the use ef vernacular ond of English as medium of instruction should broadly speaking be drawn at a minimum age of 13*" সরকার অষ্টম শ্রেণীর পূর্বে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু সরকারী প্রস্তাব সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজী ভাষা বহুদিন পর্যন্ত ছিল। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌দের আন্দোলনের ফলে ইংরেজ শাসন অবসানের পূর্বেই মাতৃভাষা মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়েছিল।

কোন একটি বিষয় মাতৃভাষার মাধ্যমে যত শীঘ্র গ্রহণ করা ও প্রকাশ করা যায় বিদেশী কোন ভাষার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। শিশু যখন কোন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে বা নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তখন মাতৃভাষাই হচ্ছে সেই প্রকাশের সহজতম ও স্বাভাবিক মাধ্যম। একটি বিদেশী ভাষার বিশিষ্ট গঠন রীতি, রচনা-শৈলী, বাগ ভঙ্গিমা প্রভৃতি আয়ত্ত করবার পরই সেই ভাষার মাধ্যমে কোন কিছু গ্রহণ ও নিজেকে প্রকাশ করতে পারা যায়। নিজের চিন্তাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে যেভাবে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করা চলে, বিদেশী ভাষায় পদে পদে হোঁচট খেয়ে যেটুকু প্রকাশ করার ইচ্ছা তার অধিকাংশই হয়ত অনুক্ত থেকে যায়। বিদেশী ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার পর্যাপ্তরূপে আয়ত্ত করতে পারলেই সেই ভাষায় কিছু প্রকাশ করা সম্ভব। মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভাণ্ডারের পরিধি সীমাবদ্ধ। বিদেশী ভাষার বেড়াজাল ডিঙিয়ে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানকেও সে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করতে পারত না। ভাষাকে আয়ত্ত করতে সবটুকু শক্তি ব্যয় করে তারপর অন্য অন্য বিষয় আর তার আয়ত্ত করা সম্ভব হ'ত না। মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজীকে মাধ্যমরূপে রাখবার সর্বপ্রধান যে যুক্তি ছিল তা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা দেবার মত বই বিভিন্ন বিষয়ে ছিল না। এছাড়া উনবিংশ শতকে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সমূহ খুব সমৃদ্ধ ছিল না। আর একটি কারণ হচ্ছে সরকারী চাকুরীর জন্য ইংরেজী জানার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সরকার কর্মচারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজী শেখাতে চাইত, আর সাধারণ মানুষ চাকুরীর জন্য ইংরেজী শিখতে চাইত।

INSTITUTE OF EDUCATION
Bengal

বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয় ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপযোগী বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়। এরপর মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজীকে বাঁচিয়ে রাখবার অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক মনোভাব আঁকড়ে থাকা সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে সব প্রদেশেই মাতৃভাষাই মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন অবশ্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান বহুদিন থেকে দখল করেছিল, ইংরেজ যুগের অবসানে সেই গৌরবজনক স্থান থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আজও বিচ্যুত হয় নি। ইংরেজীর মত একটি সমৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা পরে আলোচনা করব। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবকে স্বীকার করে নিয়েও নিঃসংশয়ে বলতে পারি মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষাই একমাত্র ভাষা হওয়া উচিত। আজও আমাদের দেশে কিছু *English medium* স্কুল রয়েছে। অ-ভারতীয় মনোভাবসম্পন্ন একদল অভিভাবক ইংরেজী শিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত হবার জন্য ছেলেমেয়েদের সে সব স্কুলে পাঠান। যদি ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানার্জনই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে তাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু সাধারণ বিষয়সমূহে তারা অতি সামান্য জ্ঞানলাভ করে। শুধুমাত্র ইংরেজ-প্রীতির জন্য এই অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক আচরণ কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না।

মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজী যে কারণে গ্রহণযোগ্য নয় ঠিক সেই কারণেই অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দীও গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয়দের পক্ষে ইংরেজী ভাষা শেখা অপেক্ষা হিন্দী শেখা সহজতর, কিন্তু মাতৃভাষাই হচ্ছে নিজেকে প্রকাশের সহজতম ভাষা। স্বাভাবিক নিয়মে মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যমরূপে গ্রহণযোগ্য ভাষা।

॥ উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ॥

উচ্চশিক্ষার বাহন কি হবে, এ প্রশ্নটি নিয়ে ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এই প্রশ্নটি নিয়ে স্বাধীনতালাভের পর থেকেই যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, আজও তার সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত ছিল—ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবার পর তাদের ভাষাও আমাদের বর্জন করতে হবে। শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই এই মত সমর্থন করেছিলেন। ভারতের শাসন-তন্ত্রে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দী আমাদের জাতীয় ভাষা হবে বলে স্থির হয়েছে। ইংরেজীকে বাতিল করে দেবার প্রশ্নটি যত সহজ বলে মনে হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এখনও সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ভাষারূপে ইংরেজীই প্রচলিত আছে। শাসন-তান্ত্রিক কাজ-কর্মে, বিচার ব্যবস্থায়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, আমাদের অধিমানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে—সর্বদিকেই ইংরেজী তার প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজী সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির পিছনে যে কারণ ছিল,

ইংরেজ চলে যাবার পর ইংরেজ বিদ্বেষের সাথে ইংরেজী বিদ্বেষের সে কারণ নেই, উচ্চ-শিক্ষায় ইংরেজী থাকা উচিত কি না সে কথা আজ বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করতে হবে।

কোন বিষয় শিক্ষা দেবার পক্ষে—নিম্নতম থেকে উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়াই যে প্রকৃষ্টতম পন্থা, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম। ইংরেজীর মাধ্যমে আমাদের দেশে বহু ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতম জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিদেশী ভাষার দুস্তর বাধা অতিক্রম করতে না হলে তারা আরও কৃতিত্ব অর্জন করতে পারত। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই ভাষার বাধাকে অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য, তাই যোগ্যতা থাকলেও হয়ত তাদের কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পায় না। মাধ্যমিক শিক্ষারস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবার পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর মাধ্যমে কোন বিষয়কে আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা গ্রহণের দাবীকে বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

॥ ইংরেজীর পক্ষে যুক্তি ॥

ইংরেজীকে উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে যাঁরা রাখতে চান, তাদের প্রধান বক্তব্য,—উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা দেবার মত ভারতীয় ভাষায় বই কোথায়? বৈজ্ঞানিক বিষয়-সমূহ শিক্ষা দেবার মত শব্দ-সম্ভার ভারতীয় ভাষায় নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম পর্যায়ের বই ইংরাজীতে লেখা, তাই ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই সঙ্গত। যাঁরা অধ্যাপক তাঁরা ইংরেজীর মাধ্যমে শিখেছেন। তাঁরা বিদেশে গিয়ে জটিল বিষয়সমূহ নিয়ে ইংরেজীর মাধ্যমেই, গবেষণা করেছেন, তাঁদের পক্ষে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া কষ্টসাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলে নিজ প্রদেশের বাইরের কৃতবিদ্য অধ্যাপকদের সাহায্য গ্রহণ সম্ভব হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে না। পৃথিবীর সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব আবিষ্কার, বিভিন্ন বিষয় ও তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষা করতে হলে পৃথিবীর সমৃদ্ধতম ভাষা ইংরেজীকেই উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা উচিত।

॥ মাতৃভাষার পক্ষের কথা ॥

উচ্চশিক্ষার স্তরে ইংরেজীকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও যুক্তিগুলি অখণ্ডনীয় নয়। মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করবার পথে যে সব বাধা আছে তা চেষ্টা করলেই অতিক্রম করা যায়। শিক্ষণীয় ভাষারূপে ইংরেজীকে রাখা আর ইংরেজীকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে রাখা এক কথা নয়। এ দু'টি প্রশ্ন

আলাদাভাবে বিচার করতে হবে। উচ্চশিক্ষা দেবার উপযোগী বই ভারতীয় ভাষাসমূহে নেই। বিশেষ করে চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী বইয়ের অভাব, একথা স্বীকৃত। যেহেতু ইংরেজীকে আমরা আঁকড়ে আছি তাই বই লিখবার চেষ্টা হয় নি। ডিগ্রীকোর্স পর্যন্ত কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে বহু বই আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহে লেখা হয়েছে। অনার্স স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা হলে বই লেখা হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে পরিভাষা সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজন হলে অতি পরিচিত ইংরেজী শব্দকে ভাষায় স্থান দিতে হবে। যাঁরা শিক্ষা দেবেন তাঁদের কিছুদিন অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু মাতৃভাষায় তাঁরা নিজেদের প্রকাশ করতে পারবেন না এ কথা অবিশ্বাস্য। বিদেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা বিদেশের জ্ঞানের ভাণ্ডারের সাথে পরিচয় রাখার জন্য ইংরেজীকে শিক্ষণীয় ভাষারূপে রাখবার প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু উচ্চশিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষাই হওয়া প্রয়োজন।

॥ রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের অভিমত ॥

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের অভিমত হচ্ছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তরে আঞ্চলিক ভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। শিক্ষার্থীর দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায়—মাতৃভাষায় কোন বিষয় আয়ত্ত করা ও নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করা যত সহজ, অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে তত সহজ নয়। তাই রাধাকৃষ্ণণ কমিশন সুপারিশ করলেন—উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে অন্য কোন ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্তরে শিক্ষার্থীকে তিনটি ভাষা—আঞ্চলিক ভাষা, সর্বভারতীয় ভাষা (*Federal Language*) ও ইংরেজী শিখতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হবে। তবে ইচ্ছা করলে সর্বভারতীয় ভাষায় কোন একটি বিষয় বা সব বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সর্বভারতীয় ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উন্নতির জন্য বোর্ড গঠন করা হবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই লিখতে হবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ মাধ্যমিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে সর্বভারতীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা করবেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইংরেজী শেখান হবে।

ইংরেজীর স্থানে মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করবার সুপারিশ করবার ফলে মাতৃভাষার বিরুদ্ধবাদীরা সেই চিরাচরিত অসুবিধার কথার পুনরাবৃত্তি শুরু করেন। আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিলে দৃষ্টিভংগী সংকীর্ণ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এক একটি ভাষাভাষী অঞ্চলে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়বে। পৃথিবীর অগ্রগামী চিন্তাধারা থেকে শিক্ষার্থীরা দূরে সরে যাবে। নিজের দেশের অন্যান্য অংশের সাথেও তারা যোগসূত্র হারিয়ে ফেলবে। এজন্য ইংরেজী ভাষার সমর্থকরা বললেন—ভারত যদি তার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়, তাহলে উচ্চশিক্ষায় ইংরেজীকে মাধ্যম রাখা অত্যাবশ্যক।

॥ কুঞ্জুরু কমিটি ॥

এই বিতর্কিত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্টস কমিশন (U. G. C) ১৯৫৫ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জুরুকে সভাপতি করে চারজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা, ইংরেজী শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের পন্থা নির্ধারণ করতে বলা হয়। প্রশ্নটিকে বিশদভাবে আলোচনা করে কমিটি সুপারিশ করেন উপযুক্ত প্রস্তুতির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর পরিবর্তে ভারতীয় ভাষার প্রচলন করা হবে। ভারতীয় ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার পরেও সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব সম্পর্কে কমিটি বলেছেন—

It is in our educational interest to retain English as a properly studied second language in our Universities used as the ordinary medium of teaching.

কুঞ্জুরু কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৯ খ্রীঃ রাজ্যসভায় আলোচিত হয়, এবং আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে ভারত সরকার গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ধীরে ধীরে প্রাদেশিক ভাষা গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চ শিক্ষাদানের উপযোগী গ্রন্থ রচিত না হলে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের অসুবিধা থেকেই যাবে। তারপর সর্বভারতীয় ভাষারূপে কোনও ব্যাপক প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজী বিদায় দিলে, যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার বাহনরূপে রয়েছে। ১৯৬৫ খ্রীঃ থেকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে ব্যবহার করার প্রশ্নে যে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর সর্বভারতীয় ভাষা সমস্যা একটা অচল অবস্থার মধ্যে রয়েছে। অচল অবস্থা দূর করবার জন্য সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে ভাষা আইন রচিত হলেও আজও তা গৃহীত হয় নি। তবে এটা ঠিক যে ইংরেজী বর্তমানে সর্বভারতীয় দ্বিতীয় ভাষারূপে যে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে, তারপর ইংরেজীকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা খুব কষ্টসাধ্য হবে। অসুবিধা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষায় ধীরে ধীরে মাতৃভাষা ইংরেজীর স্থান দখল করছে।

॥ শিক্ষণীয় ভাষা ॥

শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হবে, প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে, সর্বদেশে শিক্ষায় এই নীতিই অনুসৃত হয়। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করলেও প্রত্যেক দেশেই স্কুল ও কলেজে আধুনিক বৈদেশিক ভাষাসমূহ ও প্রাচীন ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীর বহু দেশে

মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে কোন একটি বিদেশী ভাষা শেখানো হয়। ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে একাধিক ভাষা শেখাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কয়টি ভাষা শেখানো হবে? দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব-পর্যন্ত মাতৃভাষা আর ইংরেজী ভাষাই ছিল অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষা। এর সাথে একটি প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী) শেখানো হ'ত। দেশ স্বাধীন হবার পর ইংরেজীর পরিবর্তে কোন একটি ভারতীয় ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ভারতীয় সংবিধানে দেবনাগরী হরফে হিন্দীকেই সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করবার পর শিক্ষণীয় ভাষা সমস্যা জটিল হয়ে দাঁড়াল।

॥ মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ ॥

দেশ স্বাধীন হবার পর হঠাৎ একদল লোক ইংরেজী শিক্ষার উপর বিরূপ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা চান ইংরেজীকে দেশ থেকে তাড়াতে। অপর দল বলেন, যতদিন উচ্চশিক্ষায় ইংরেজী রয়েছে ততদিন মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজীকে অবহেলা করলে চলবে না। ভাষাগত অসুবিধার জন্য যাতে কেউ উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় তাও দেখতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ভাষা-শিক্ষার প্রশ্নটি বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেন, সমগ্র মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন বা মাধ্যম হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। জুনিয়র বা নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে অন্ততঃ দু'টি ভাষা শিখতে হবে। প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের শেষে ইংরেজী অথবা হিন্দী পাঠ্য হবে। একই বছর দু'টি ভাষা শিক্ষা দেওয়া চলবে না। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে অন্ততঃপক্ষে দু'টি ভাষা পাঠ্য হবে। তাদের মধ্যে একটি হবে মাতৃভাষা। কমিশনের ভাষা সম্পর্কীয় সুপারিশসমূহ সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল আলোচনা করে (১১ই জানুয়ারী ১৯৫৬ খ্রীঃ) সিদ্ধান্ত করেন যে, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্রকে তিনটি ভাষা পড়তে হবে। তাঁরা যে নির্দেশ দেন তাতে প্রাচীন ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। তাই প্রাচীন ভাষাকে অবহেলা করা হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ হয়েছে। দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক স্তরে চারটি ভাষা, শিক্ষণীয় ভাষার দাবিদার। মাতৃভাষা, ইংরেজী ভাষা, হিন্দী ভাষা ও প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত)। এর মধ্যে কোন একটিকে বাদ দিতে গেলেই বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হবে। প্রত্যেকটি ভাষার পক্ষে তীক্ষ্ণ যুক্তি রয়েছে। অথচ শিক্ষার্থীর স্কন্ধে বোঝা চাপাবার একটা সীমা অছে। প্রত্যেকটি ভাষা আয়ত্ত করতে যথেষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা চিন্তা না করে চারটি ভাষার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। যারা সাধারণ শিক্ষার্থী, মাধ্যমিক স্তরের পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হবেন, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে চারটি ভাষা শিক্ষার কোন সার্থকতা আছে বলেও অনেকে মনে করেন না। চার ভাষার জটিল সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান হওয়া প্রয়োজন একথা সবাই স্বীকার করেন, কিন্তু

সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন সমস্যা সমাধানের সূত্র আজও বের হয় নি। বিভিন্ন ভাষার পক্ষে যে সব যুক্তি রয়েছে আমরা সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করব।

॥ মাতৃভাষা ॥

জন্মের পর মাতৃক্রোড়ে মায়ের মুখ থেকে যে ভাষা শিশু শেখে তা হচ্ছে মাতৃভাষা। শিক্ষণীয় ভাষারূপে প্রাথমিক স্তরে প্রথম যে ভাষা শিশু শেখে তা মাতৃভাষা। শিক্ষণীয় ভাষারূপে মাতৃভাষার দাবী সর্বাগ্রে। জন্মাবার পর শিশু যা কিছু শোনে যে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করে তা তার মাতৃভাষার মাধ্যমে। শিশুর আনন্দ, বেদনা, বিস্ময় প্রকাশের ভাষাও তার মাতৃভাষা। যতই সে বড় হয়, তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়। তাই প্রাথমিক স্তরে সে একটিমাত্র ভাষাই শিখবে তা হচ্ছে মাতৃভাষা। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা। এ স্তরেও শিক্ষণীয় ভাষার মধ্যে মাতৃভাষার স্থান সর্বপ্রথম। মাতৃভাষার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ভাষার উপর তার অধিকার বিস্তৃত হবে। যার মাতৃ-ভাষার জ্ঞান গভীর, কঠিনতম বিষয়ও সে সহজ সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত ও অবশ্যপাঠ্য ভাষারূপে মাতৃভাষা সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ মতের অবকাশ নেই।

উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার দাবী নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। স্নাতক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় ইংরেজীর সাথে মাতৃভাষায় পড়বার ব্যবস্থা হয়েছে। উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় ভাষারূপে মাতৃ ভাষার পাঠ হবে কি না এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, উচ্চশিক্ষায় যেখানে কোন একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুশীলন (*specialisation*) করা হয় সেখানে মাতৃভাষা বা অন্য কোন ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা নেই। কলা (*Arts*) বিভাগ ব্যতীত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তি-শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার যে কোন স্তরেই ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ভারতে এখনও বিজ্ঞান ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক বিষয় সমূহ ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলে ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির প্রয়োজন শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই বজায় থাকবে। মাতৃভাষাকে ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারলে জটিল বিষয়ে চিন্তার রূপ সেই ভাষার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ সহজতর হবে।

মানুষের একটা ভাবমূলক দিক আছে। মানুষের ভাবপ্রবণতা শুধুমাত্র বিজ্ঞান চর্চা বা বৃত্তিমূলক জ্ঞানের অনুশীলনে তৃপ্ত হয় না। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর সে মনের কোণে যে শূন্যতা অনুভব করে, তা জড়বিজ্ঞান পূর্ণ করতে পারে না। অবসর মুহূর্তগুলি ভরে তুলতে তার প্রয়োজন সাহিত্যের, দর্শনের, সংস্কৃতিমূলক নানা আয়োজনের। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চার মধ্য দিয়ে তার জ্ঞান-ভাণ্ডারই শুধু পুষ্ট হয় না, মনের সমৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজন সাহিত্যের চর্চা। উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবহার হলে শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

॥ ইংরাজী ॥

শতাধিক বছর ধরে যে ভাষা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বপ্রধান স্থানটি দখল করেছিল তা হচ্ছে ইংরেজী। ১৮৩৫ খ্রীঃ মেকলের মিনিটের পর থেকে প্রায় দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব-পর্যন্তও ইংরেজীই ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার সাথে আমরা এমনভাবে জড়িত যে, দেশ স্বাধীন হবার পরও মাতৃভাষার পরেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষণীয় ভাষারূপে দ্বিতীয় দাবিদার। ইংরেজী হঠাও আন্দোলন যতই জোরদার হোক না কেন ভারতের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজী প্রভাবকে অস্বীকার করতে আজও পারে নি। ইংরেজী বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের ভাষা, এ উক্তিতে ইংরেজী বিতাড়ন সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমৃদ্ধিতম ভাষাসমূহের মধ্যে ইংরেজী অন্যতম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে ইংরেজী ভাষায় যে অমূল্য গ্রন্থরাজি রচিত হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। ইংরেজী সাহিত্যসম্ভার জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকারের দানে সমৃদ্ধ। জ্ঞান জগতের এই অমূল্য রত্নরাজির সাক্ষাৎ আমরা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই পেয়েছি। যে অবস্থার মধ্য দিয়েই ইংরেজীর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হোক না, ইংরেজীর ন্যায় সমৃদ্ধ একটি ভাষার সাথে শুধুমাত্র ভাবপ্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে ছিন্ন করবার কথা উঠতে পারে না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে স্বীকার করতে হবে ভারতের শিক্ষামূলক অবগতির পিছনে ইংরেজীর অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন কি জাতীয়তার উন্মেষ যেদিন প্রথম হয়েছিল সেদিন বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত মিলনের বাধা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই আমরা ভাঙ্গতে পেরেছিলাম। ভাষাসমূহের মধ্যে ইংরেজী আমাদের পরিচিত ভাষা। তাই শিক্ষণীয় ভাষারূপে বিদেশী মাতৃভাষার পর ইংরেজীর দাবীই সবচেয়ে বেশী। ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষণীয় ভাষারূপে রাখবার যৌক্তিকতাকে কোনক্রমে অস্বীকার করা যায় না।

হিন্দী সর্বপ্রথম যোগাযোগ্য রক্ষাকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের ন্যায় বহু ভাষা-ভাষী রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি ভাষা অত্যাবশ্যক। হিন্দীকে সেই যোগাযোগ রক্ষাকারী বলে গ্রহণ করা হলেও হিন্দী সে স্থান আজও গ্রহণ করতে পারে নি। এতদিন পর্যন্ত ইংরেজীই সর্বভারতীয় ভাষারূপে শেখানো হয়েছে ও ইংরেজীই সর্বভারতীয় সরকারী ভাষায় কাজ করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ চালাবার ও যোগাযোগ রক্ষা করবার মত একটি ভাষার প্রয়োজন। ইংরেজীর মত একটি সমৃদ্ধিশালী আন্তর্জাতিক ভাষার দ্বারাই সে প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে।

প্রগতিশীল জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে। জগতের এই অগ্রগতির বার্তা প্রধানতঃ ইংরেজীর মাধ্যমেই আমরা পেয়ে থাকি। বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবনের সাথে পরিচয় রাখতে হলে একটি বিদেশী ভাষার সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর যে স্থানে যাই ঘটুক না কেন, ইংরেজীতে তার অনুবাদ সর্বাগ্রে হয়। বৃহত্তর দুনিয়ার সাথে মিলবার ভাষারূপেই ইংরেজী আমাদের শিখতে হবে।

তারপর আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষার মাধ্যম এখনও ইংরেজী। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজীর পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে বিবেচনা করে অগ্রসর হতে উপদেশ দিয়েছেন। নীতিগতভাবে অবশ্য আমরা মেনে নিয়েছি মাতৃভাষাই হবে উচ্চশিক্ষার বাহন। ভবিষ্যতে সে ব্যবস্থা কবে হবে কেউ বলতে পারে না। উচ্চশিক্ষায় ইংরেজী মাধ্যমরূপে আছে ও বহুদিন থাকবে, সেখানে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিখব না অর্থাৎ যে ডালের মাথায় বসে আছি তার গোড়া কাটব, এই সর্বনাশা বুদ্ধি হিন্দী প্রেমিকদের কি করে হ'ল বোঝা কঠিন।

ইংরেজী শিক্ষণীয় ভাষারূপে থাকবে কি না তার মূল্যায়ণ হবে তার উপযোগিতা বিচার করে। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারী কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে ইংরেজী প্রধান স্থান দখল করে আছে তা আমরা দয়া করে রেখেছি বলে নয়, ইংরেজী আপন অধিকার বলেই সেখানে আছে। ইংরেজীকে যারা রাতারাতি দেশ ছাড়া করতে চেয়েছিলেন, কালের গতিতে তারা বুঝতে পেরেছেন কাজটা তত সহজ নয়। আমাদের সংবিধানে ১৯৬৫ খ্রীঃ মধ্যে ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার নির্দেশ ছিল। কিন্তু ১৯৬৫ খ্রীঃ মধ্যে ইংরেজীর স্থান হিন্দী গ্রহণ করতে পারবে না বলে ইংরেজীকে হিন্দীর সহযোগী ভাষারূপে রাখবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইংরেজী আমাদের জাতীয় ভাষা হতে পারে না কিন্তু প্রয়োজন মেটাবার ভাষারূপে ইংরেজী আমাদের শিখতেই হবে। মনের দিক থেকে ইংরেজীকে না চাইলেও বুদ্ধির বিচারে ইংরেজীর প্রয়োজনকে অস্বীকার কোন দিক থেকেই করতে পারি না। শিক্ষণীয় ভাষারূপে ইংরেজীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিচার করে তার উপযোগিতা ও মূল্য বুঝেই তাকে গ্রহণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজী থাকবে এই আমাদের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

॥ হিন্দী ॥

ভারত বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্র। এক প্রদেশের সাথে অন্য প্রদেশের যোগাযোগের প্রয়োজন এতদিন ইংরেজীর মাধ্যমে সিদ্ধ হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর একটি ভারতীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। উপযোগিতা হিসাবে ইংরেজীর মূল্য স্বীকার করে নিলেও একটি বিদেশী ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা যায় না কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন। নানাদিক বিচার করে হিন্দীকেই সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধানে নির্দেশ ছিল ১৯৬৫ খ্রীঃ মধ্যে হিন্দী ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করবে। হিন্দী ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত ইহার যোগ্য ভাষা কি না সে বিতর্কের বিষয়। হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে এই সত্যকে মেনে নিয়েই শিক্ষণীয় ভাষারূপে হিন্দী শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সর্বভারতীয় সরকারী ভাষারূপে হিন্দী আমাদের পড়তে হবে। অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী শিক্ষা সম্পর্কে শুধু আগ্রহের অভাবই নয়, একটা বিরূপ মনোভাবও দেখা দিয়েছে। অতি উৎসাহী হিন্দী প্রেমিকদের অহিন্দী

ভাষীদের উপর হিন্দী চাপিয়ে দেবার তৎপরতার ফলেই এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ভাষা ও সাহিত্যের দিক থেকে বাংলার সাথে হিন্দীর তুলনা করে লাভ নেই। প্রাদেশিক স্বার্থের কথা চিন্তা করেই আমাদের হিন্দী শেখা উচিত। সবাই যে হিন্দী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করবে এমন কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ চালানোর মত হিন্দী জানা থাকলেই চলতে পারে। ইংরেজীর থেকে হিন্দী লেখা অনেক সহজ। তিন চার বছর নিষ্ঠার সাথে হিন্দী শেখাবার চেষ্টা করলে প্রাথমিক হিন্দীর জ্ঞান হয়। এরপর যারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে তারা হিন্দী সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করবার চেষ্টা করবে। বর্তমানে বাংলা দেশে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দী শেখাবার যে ব্যবস্থা আছে, তা যদি নিষ্ঠার সাথে মেনে চলা হয় তাহলে কাজ চালানোর মত হিন্দী শেখান যায়। উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতে হলে উৎসাহী ছাত্ররা নিজেরাই এগিয়ে যেতে পারে। ভারতের শিক্ষার্থীর পক্ষে হিন্দী খুব কঠিন ভাষা নয়। (১৯৭০ খ্রীঃ থেকে হিন্দীকে পঃ বাংলায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে)।

॥ সংস্কৃত ॥

মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুদিন থেকে সংস্কৃত শেখান হচ্ছে। সংস্কৃতের এই সুদৃঢ় আসনটির আর একটি দাবীদার দেখা দিয়েছে। হিন্দীর দাবীর কাছে সংস্কৃতকে রক্ষা করা কঠিন। দুইটিই ভারতীয় ভাষা। একটির সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের জাতীয় সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা, অপরটির সাথে জড়িয়ে আছে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনবোধ। অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী শেখার যুক্তি, প্রয়োজনবোধ এবং কিছুটা স্বার্থ চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করা যায় তাহলে সংস্কৃতের দাবী খুব জোরদার নয়। সংস্কৃত ভারতীয় ভাষাসমূহের জননী। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে সংস্কৃতে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যুক্তির দিক থেকে এটাই হচ্ছে সংস্কৃতের পক্ষে প্রধান যুক্তি। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, ব্যাকরণশাসিত সংস্কৃত ভাষা শেখা অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য। ধাতুরূপ শব্দরূপের চাপে ছেলেদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ছেলেরা সংস্কৃত শিখতে চায় না। বলা যায় অঙ্ক ছেলেরা শিখতে চায় না, ইংরেজীও খুব ভাল মনে শেখে না, তবু তাদের কেন শেখান হয়? এর একমাত্র উত্তর ব্যবহারিক প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষা শেখাবার পিছনে কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনের যুক্তি নেই। তাই বর্তমান যুগে সংস্কৃত অচল— এই যুক্তিই কি মেনে নিতে হবে?

বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সব কিছুর মূল্য বিচার হয় ব্যবহারিক উপযোগিতা দিয়ে। জৈবিক প্রয়োজনে আমরা খাদ্য সন্ধান করি। দেহের ক্ষুধা মেটাবার পর মানুষের আর কি কোন ক্ষুধা থাকে না? মানসিক ক্ষুধা বোধ বলে কি কিছু নেই? মানসিক ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ সৃষ্টি করেছে সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, স্থাপত্য। যে সংস্কৃতির বড়াই মানুষ করে তার পিছনে ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ

ছিল না। সংস্কৃত শেখাব কি না তা বিচার করতে হবে ব্যবহারিক প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয়, ব্যবহারিক প্রয়োজনের উর্ধে যে প্রয়োজন সেই মানসিক শূন্যতাবোধের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে সংস্কৃত শিক্ষার কথা বিচার করতে হবে। কিশোর শিক্ষার্থী সে প্রয়োজন বোধ করে না, তার মনে সে শূন্যতাবোধ নেই। কিন্তু পরিণত মানুষের মনে যে পিপাসা জাগে, অতি বড় বিজ্ঞানীর মনও একদিন জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে তবে মনের শূন্যতায় সে পীড়া বোধ করে। তাই সব কিছুকেই শুধুমাত্র প্রয়োজনবোধের মাপকাঠিতে বিচার করলে ভুল করা হবে।

সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে যুক্তি কিছুটা ভাবপ্রবণতার উপর নির্ভরশীল। আবেগ বা ভাবপ্রবণতাকে আমরা জীবনে অস্বীকার করতে পারি না, এ তো মনের একটা সম্পদ। সাহিত্য, দর্শন, চারুকলা এসব স্বষ্টির পিছনে মানুষের ভাবপ্রবণ মনটিই তো সক্রিয়। বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতির দরবারে, ভাবুক দার্শনিকের কাছে ভারতের যে মর্যাদা, তা সংস্কৃত ভাষায় রচিত অমূল্য সম্পদের জন্য। শুধুমাত্র বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার আর কেরাণী স্বষ্টি আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য নয়। অতীত ভারতের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই আমরা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। জাতীয় শিক্ষা জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হবে। জাতীয় শিক্ষা হবে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপোষক, জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি তার প্রধান বাহন, জাতীয় আদর্শ তার মুখ্য উপজীব্য। সংস্কৃতকে বাদ দিলে আমরা জাতীয় সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। তাই সংস্কৃতকে শিক্ষণীয় ভাষারূপে রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে বলেই মনে করি।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে চারটি ভাষা শেখাবার চেষ্টা করলে ছাত্রদের উপর ভাষা শিক্ষার চাপ অত্যধিক হয়ে পড়ে। একসাথে মাতৃভাষাসহ চারটি ভাষা, তারপর আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি শিক্ষার চাপে কিশোর মন পিষ্ট হলে, অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তা শিক্ষার্থীর পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে। হিন্দী যদি পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুরু করে তিন বছর পড়ান হয়, তাহলে সপ্তম শ্রেণীর পর আর হিন্দীর চাপ থাকে না। অষ্টম শ্রেণী থেকে সংস্কৃত শেখার ব্যবস্থা হলে এক সাথে চারটি ভাষার চাপ আর থাকে না। এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এ রীতিতেই হিন্দী ও সংস্কৃত শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। যতদিন পর্যন্ত এর চেয়ে যুক্তিপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত সম্ভব না হবে ততদিন এই নীতিকে অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে পঃ বাংলায় সপ্তম শ্রেণী থেকে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

॥ ভাষা-সমস্যা ও কোঠারী কমিশন ॥

কোঠারী কমিশনের সামনে যে সব সমস্যা সমাধানের জন্য রাখা হয়েছিল ভাষা-সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। মুদালিয়র কমিশন বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় ভাষা সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করেছিল, তার উপর ভিত্তি করে ভাষা শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। কিন্তু তাতে ভাষা শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হয় নি। কোঠারী কমিশন শিক্ষণীয় ভাষা

ও শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন। কমিশন মনে করেন তাঁদের স্থিরীকৃত নীতির দ্বারা ভাষার প্রশ্নটি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

কমিশন মনে করেন হিন্দী কেন্দ্রীয়-স্তরে সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হওয়ায় মাতৃ-ভাষার পরই হিন্দীকে গুরুত্ব দিতে হবে। কাজ চালানোর মত ইংরেজী জ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে একটা অতিরিক্ত সম্পদ বলে গণ্য হবে।

ভাষা শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে নিম্ন মাধ্যমিক-স্তর (*VIII—X*)। এই সময় ভাষা শিক্ষা দেওয়া অল্প পরিশ্রমসাধ্য। দু'টির অতিরিক্ত ভাষা একই সাথে শেখান হবে না, ধাপে ধাপে তার প্রবর্তন করা হবে। কোন স্তরেই চারটি ভাষা বাধ্যতামূলক করা হবে না।

॥ ত্রি-ভাষা ফর্মুলা ॥

এই নীতির উপর ভিত্তি করে ত্রিভাষা ফর্মুলা এই রকম হবে—(ক) মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা (খ) কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা বা যতদিন পর্যন্ত সহযোগী কোন ভাষা থাকে সে ভাষা (গ) 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যে নেই এমন একটি আধুনিক ভারতীয় বা ইউরোপীয় ভাষা যা শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয় নি।

নিম্ন প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু সাধারণভাবে একটি ভাষা—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা—শিখবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে দু'টি ভাষা শিখবে—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এবং সরকারী ভাষা বা সহযোগী ভাষা। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে তিনটি ভাষা পড়বে—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, সরকারী বা সহযোগী ভাষা ও একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কেবল মাত্র দু'টি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শেখান হবে।

স্বেচ্ছামূলকভাবে সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিখতে ছেলে-মেয়েদের উৎসাহিত করা হবে।

[কোঠারী কমিশনের বিবরণে 'ভাষা' অংশ দেখুন।]

॥ পশ্চিম বাংলায় ভাষা সমস্যা ॥

সর্বকালে সর্বদেশে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা। শিক্ষার নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করেছে ও করে এটাই চিরাচরিত রীতি। আধুনিক যুগে মাতৃভাষার বাইরে দু'একটি ভাষা শেখবার ব্যবস্থা প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থায় হয়েছে। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে দাঙ্গাহাঙ্গামা, জাতীয়-সংহতি বিপন্ন এমন অবস্থা কোথাও সৃষ্টি হয় নি। বাংলা তথা ভারতে ভাষা সমস্যাটি যত জটিল, কোন দেশে তা দেখা যায় না। আমাদের দেশে ভাষা-সমস্যা শিক্ষা-সমস্যা নয়, এ একটি রাজনৈতিক সমস্যা। রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ইংরেজ একদিন এই সমস্যাটি সৃষ্টি করেছিল এবং দেশ স্বাধীন হবার পর তেইশ বছরেও আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি নি।

ভাষা-সমস্যার দু'টি দিক। একটি শিক্ষার নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতর শিক্ষার

বাহন কি হবে, দ্বিতীয়টি, শিক্ষণীয় ভাষা কি হবে। পশ্চিম বাংলার ভাষা সমস্যা সর্বভারতীয় ভাষা শিক্ষা-সমস্যা থেকে পৃথক নয়। তাই সর্বভারতীয় পটভূমিকায় এ রাজ্যের ভাষা শিক্ষাসমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে।

শিক্ষার বাহন ও শিক্ষণীয় ভাষা সমস্যা সৃষ্টির কারণ হচ্ছে দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসন ও ভারত একটি বহু ভাষা-ভাষী রাষ্ট্র।

শিক্ষার বাহন স্বাভাবিক ভাবে মাতৃভাষা হওয়া উচিত ও সেটাই সঙ্গত। শিক্ষার বাহন নিয়ে যে সমস্যা তা সৃষ্টি হয়েছিল উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে। মেকলে দেশীয় ভাষাসমূহকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত বাহন বলে বিবেচনা করেন নি। মেকলের মন্তব্যের পর থেকেই উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজীর জয়যাত্রা শুরু হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম দাবী ছিল মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন-রূপে গ্রহণ করতে হবে। ইংরেজ বিদায় নেবার পূর্বেই মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে ডিগ্রীকোর্সের বিভিন্ন বিষয়ে (অনার্স বাদে) মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন হচ্ছে। উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার দাবীও নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া হবে, এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সম্মেলনে (এপ্রিল, ১৯৬৯) বলেছেন। সেই সাথে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যেন উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া এদিকে কিছু করা না হয়। বাংলাদেশের যুক্ত ফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রীও শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে বাহন করবার পক্ষপাতী ছিলেন। মাতৃভাষার দাবী সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করে সর্বোচ্চ স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করলে হিতে বিপরীত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার—শিক্ষার বাহন আর ইংরেজী ভাষা শেখার প্রশ্নটি এক নয়। সবদেশের মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন। পশ্চিম বাংলায়ও তাই হবে, এটাই স্বাভাবিক। অদূর ভবিষ্যতে এম. এ. পর্যন্ত শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে দেওয়া হবে এ আশাই আমরা করি।

শিক্ষার বাহন আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়। ভাষা সমস্যায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষণীয় ভাষা বিশেষ করে ইংরেজী ও হিন্দীর স্থান নিয়ে। বিভিন্ন ভাষার দাবী ও কোঠারী কমিশনের সমস্যা সমাধানমূলক ত্রি-ভাষা ফর্মূলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার রূপটি নিয়েই এই অংশ আলোচনা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা। পশ্চিম বাংলায় শিক্ষার্থীদের তৃতীয় শ্রেণী থেকেই ইংরেজী শিখতে হয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকে হিন্দী বাধ্যতামূলক ভাবে শিখতে হয়। আইন অনুসারে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী তিনটি ভাষা ছেলেদের শেখার কথা। সপ্তম শ্রেণী থেকে হিন্দীর স্থান গ্রহণ করে প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী)। নবম শ্রেণী থেকে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য

বিভাগের ছাত্রদের বাংলা ও ইংরেজী শিখতে হয়। কলা বিভাগের ছেলেদের এর সাথে সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক ভাষা রূপে শেখান হয়। সংস্কৃতকে অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষারূপে শিখবার যৌক্তিকতা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। উভয়পক্ষের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে অবস্থা বিচার করলে দেখা যাবে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় কলা বিভাগের ছাত্ররা তিনটি ভাষার ভারে পিষ্ট হচ্ছে।

কোঠারী কমিশনের ত্রি-ভাষা ফর্মূলা ভাষাসমস্যা সমাধানের আদর্শ সমাধান নয়। তবু বর্তমান অবস্থায় যতদিন পর্যন্ত এর চেয়ে ভাল সূত্র পাওয়া না যায়, এ সূত্রকে গ্রহণ করেই ভাষা-সমস্যা সমাধানের পথে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে যারা জড়িত আছেন তাঁরা জানেন ইংরেজীর জন্য শিক্ষার্থীদের সর্বাধিক সময় ব্যয়িত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্রদের বাংলা ভাষায় জ্ঞান অতি নীচুমানের বলে অভিযোগ করেন। তারপর হিন্দী ও সংস্কৃতের বোঝা যখন তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন তাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পশ্চিম বাংলার বিদ্যালয়সমূহে ভাষা নিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা যে কোন সুষ্ঠু শিক্ষানীতির বিরোধী। ছাত্রদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হচ্ছে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী বা সংস্কৃত শিখতে। কোন স্তরেই একসাথে দু'টির বেশী ভাষা শেখার চাপ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী কোর্সে মানবিক শাখার ছাত্রদের সংস্কৃত বাধ্যতামূলক। পূর্বে সপ্তম শ্রেণী থেকে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তারপর স্থির হ'ল সংস্কৃত অষ্টম শ্রেণী থেকে শুরু হবে। এ ব্যবস্থা ১৯৬৯ খ্রীঃ পর্যন্ত চালু ছিল। কিন্তু নবম ও দশম শ্রেণীর সংস্কৃতের পাঠক্রম পূর্বের মতই রাখা হ'ল। শিক্ষাকাল এক বছর কমান হ'ল, কিন্তু পাঠক্রমের বিষয় ভার কমান হ'ল না, এটা কোন বিচারে হয়েছিল বোঝা কঠিন। এর ফলে প্রায় সব স্কুলেই বেসরকারী ভাবে সপ্তম শ্রেণী থেকে সংস্কৃত শেখান হচ্ছিল। অর্থাৎ ১৯৬৯ খ্রীঃ পর্যন্ত সপ্তম শ্রেণীতে ছাত্রদের চারটি ভাষা পড়তে হচ্ছিল। উচ্চতর মাধ্যমিকের সংস্কৃতের পাঠক্রম যে কোন ছাত্রের পক্ষে ভীতিজনক। 'কলা' বিভাগে ছাত্র সংখ্যা কমে যাবার কারণে সংস্কৃত ভীতি বলে অনেকে মনে করেন।

পঃ বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার প্রশ্নটি পুনর্বিবেচিত হওয়া উচিত। ত্রি-ভাষাসূত্রের মধ্যেই কি করে ছাত্রদের উপর চাপ কমিয়ে অল্প সময়ের কাজ চালাবার মত ভাষাজ্ঞান হয় সে বিষয়ে চিন্তা করে ভাষা-নীতি নির্ধারিত করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the position and problems of language teaching in Secondary schools in W. Bengal? What suggestions do you get in this connection from the report of Education Commission (1964-66). Give your own views. [B. T. 1968]
2. Discuss the following problem of Indian education and state how it is being teached? Medium of instruction in schools & college. [B. T. 1966]
3. Write an Essay on Language Problem in India. [B. Ed. 1970

পঞ্চম পর্ব

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা

॥ ইংল্যাণ্ডের শিক্ষার ইতিহাস পড়ার প্রয়োজনীয়তা ॥

আধুনিক যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত সেই শিক্ষা-ব্যবস্থা ইংরেজ শাসনকালে প্রবর্তিত হয়েছিল। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তক ইউরোপীয় মিশনারী সম্প্রদায়। ইংরেজ শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পর বেশ কিছু-দিন পর্যন্ত কোম্পানি এদেশে শিক্ষাবিস্তারে তাদের কোন নৈতিক দায়িত্ব আছে বলে মনে করত না। মিশনারী প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ও দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা বহুদিন পর্যন্ত পাশাপাশি চলছিল। তারপর কি করে ধীরে ধীরে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হ'ল সে ইতিহাস আমরা পর্যালোচনা করেছি। ভারতের শিক্ষানীতি ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত করেছে যারা সারা ভারতের মত একটা প্রাচীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরে একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুললো, উপরন্তু তাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ থাকাও স্বাভাবিক। ভারতে ইংরেজ শাসনকালে শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হয় নি। শাসক সম্প্রদায় শাসনকার্যের প্রয়োজন ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রবর্তন করেন। ইংরেজের শিক্ষানীতি দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন অপেক্ষা শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ চিন্তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'ত। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে এদেশে জাতীয় শিক্ষা বলে কিছু ছিল না। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা দেখেছি ইংল্যাণ্ডের শিক্ষানীতি বৃটিশ ভারতের শিক্ষানীতিকে বহুভাবে প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে গঠিত হয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের যখনই সংস্কার হয়েছে তার সাথে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির সংস্কারের কথা উঠেছে। ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সাথে সেখানের জনমত পার্লামেণ্টের মাধ্যমে ও ভারতের শিক্ষিত সমাজ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার ও প্রসারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারতের শিক্ষা-নীতি সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-নীতির দ্বারা। ভারতের শিক্ষার ধারাকে অনুসরণ করতে হলে ইংল্যাণ্ডের ধারার সাথে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার।

॥ ইংরেজ জাতীয়-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ॥

যে কোন একটি দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। ইংরেজ জাতি রক্ষণশীল। স্বভাবতঃই ইংরেজ চরিত্র বিপ্লববিমুখ ও সংস্কার-বিরোধী। আবার ইংরেজ জাতি যখন বুঝতে পেরেছে জাতীয় উন্নতির জন্য সংস্কারের প্রয়োজন,

তখন তারা সংস্কারকে অকুণ্ঠভাবেই মেনে নিয়েছে; উনবিংশ শতকের শুরুতে দেখি ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-পদ্ধতি একান্তভাবে রক্ষণশীল ও গতানুগতিক। কিন্তু জাতীয় নেতৃবৃন্দ যখন বুঝল পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতিসমূহের সাথে সমানে এগিয়ে চলতে হলে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার, তখন সে পরিবর্তন মেনে নিতে ইংরেজ জাতি দ্বিধাবোধ করে নি। অবশ্য এ পরিবর্তন যে একেবারে বিনা বাধায় হয়েছে তা নয়। যাজক সম্প্রদায় ও রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বাধা সত্ত্বেও উনবিংশ শতকে দেখা যায় ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা-বিস্তার ও শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের (*Local Education Authorities*) সহ-অবস্থান আজও অব্যাহতভাবে চলেছে। ১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে ইংল্যাণ্ডের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তবু স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ এলাকায় যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করেছে। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা নতুন ও পুরাতনের এক বিচিত্র সমন্বয়। আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন ও নার্শারী স্কুলের পাশেই রয়েছে অতি প্রাচীন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষায়তন।

এক সময় ইউরোপে শিক্ষা ছিল ধনিক ও যাজক সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত। বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সন্তানরাই শিক্ষার অধিকারী ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহামন্ত্র প্রচারিত হবার সাথে সাথেই শিক্ষায় জনসাধারণের দাবীর কথা ধ্বনিত হতে শুরু করে। ইংল্যাণ্ডে উনবিংশ শতাব্দী থেকে প্রাথমিক শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলতে থাকে। চার্চের প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। উনবিংশ শতকের শেষদিকে বিত্তবানদের দানে ইংল্যাণ্ডের শিল্প-প্রধান শহরগুলিতে অবৈতনিক কিণ্ডারগার্টেন গড়ে ওঠে। এই কিণ্ডারগার্টেন স্কুল থেকেই নার্শারী স্কুলের সূচনা হয়। প্রথম অবস্থায় নার্শারী শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গ বলেই বিবেচিত হ'ত। প্রাথমিক শিক্ষা ও নার্শারী শিক্ষার যে পার্থক্য আছে উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ইংল্যাণ্ডে সে বোধ জাগরিত হয়।

॥ প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

১৮৭৩ খ্রীঃ স্যালফোর্ডে স্যার উইলিয়াম মাথের একটি শিশু উদ্যান স্থাপন করেছিলেন। ১৯০০ খ্রীঃ মিস এ. র‍্যাগী উল উইচে যে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল স্থাপন করেন তা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এই যুগে নার্শারী স্কুল ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করা হ'ত না। প্রাথমিক-পূর্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে নার্শারী শিক্ষাব্যবস্থা নামে পরিচিত। তিন থেকে পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েরা নার্শারী স্কুলে যায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই স্কুলগুলিতে সরকার থেকে কোন সাহায্য দেওয়া হ'ত না। ইংল্যাণ্ডের নার্শারী স্কুলগুলি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কোন দিক থেকেই উন্নত ছিল

না। ইংল্যাণ্ডে প্রথম আদর্শ নার্শারী স্কুল স্থাপন করেন রাচেল ও ম্যাকমিলান নামে দুই বোন। ১৯০৮ খ্রীঃ লণ্ডনের বস্তি অঞ্চলে প্রথম তাঁরা নার্শারী স্কুল স্থাপন করেন। ১৯১৮ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষকে নার্শারী স্কুলে সাহায্যের অধিকার দেওয়া হয়। তবে কোন বাধ্যতা আরোপ করা হয় না। অর্থ নৈতিক কারণে নার্শারী স্কুল ধীরে ধীরে স্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু ১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইন গৃহীত হবার পর নার্শারী স্কুলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই আইনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে—যাতে দুই বা তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েরা বিনা বেতনে নার্শারী স্কুলে পড়তে পারে সে ব্যবস্থা করতে। তবে নার্শারী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় নি। যেখানে ভিন্নভাবে নার্শারী স্কুল খোলা সম্ভব নয়, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথেই নার্শারী ক্লাস খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নার্শারী স্কুল যে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে তা নার্শারী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকার প্রচারিত পুস্তকে য়া বলা হয়েছে তা থেকেই বোঝা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রচারিত পুস্তিকায় বলা হয়েছে—"*The aim of the nursery school is three fold to provide the medical care which such young children need, a training in good habits and right behaviour, and an environment in which they can learn the things appropriate to their age. Thus it provides a variety of play activities manupulative, creative, and imaginative, and opportunities for the activity required for a childs bodily development. Opportunities, too, are provided to gain the experiences of the common property of things they see about them, to acquire skill and show enterprise in dealings with them, and use to language by taking to each other and to grow people*" (*As quoted by I. L. Kandel in The New Era in Education.*)

নার্শারী স্কুলে সাধারণতঃ ৪০ জন ছেলেমেয়ে থাকে যাতে প্রতিটি ছেলেমেয়ে সম্পর্কে যত্ন নেওয়া সম্ভব হয়। স্কুলগুলিতে গৃহ পরিবেশ সৃষ্টি করে নানারূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিশুদের লিখন, পঠন ও গণিতের গোড়ার দিককার জ্ঞানলাভ করতে সাহায্য করা হয়। এই সাথে ছেলে মেয়েরা গান করে, খেলা করে, হাতের টুকিটাকি কাজ শেখে। এখানে বিনা খরচায় ছেলেমেয়েদের দুধ খেতে দেওয়া হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তাদের বিদ্যালয় জীবন শুরু করতে পারে তার প্রস্তুতি পর্বরূপে ইংল্যাণ্ডের নার্শারী বা প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও নীতি নির্ধারণ বহুদিন পর্যন্ত বিতর্ক ও বিভেদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাষ্ট্র ও চার্চ এই দুয়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার

তদারকের অধিকার নিয়ে বহুদিন বিতর্ক চলেছে। চার্চও শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিল। শিক্ষাকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন করবার উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই কয়েকটি বিল আনা হলে চার্চ ও রক্ষণশীল দলের বিরোধিতায় কোন আইন এ সময় পাস করা সম্ভব হয় নি। ১৮৪৭-৭০ খ্রীঃ মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে থাকে। ১৮৭০ খ্রীঃ এক সুদূর প্রসারী শিক্ষা আইন পাশ হয়। ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র বিশেষ করে অনুন্নত স্থানগুলিতে শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা গ্রহণ যাতে সর্বসাধারণের পক্ষে সহজতর হয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইনটি পাস হয়। ধীরে ধীরে লোক বুঝতে শেখে শিক্ষা কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের আধিপত্য করবার বিষয় নয়। শিক্ষা সমগ্র জাতির ব্যাপার, জাতির কল্যাণে রাষ্ট্রই শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

১৯০২ খ্রীঃ ব্যালফুর আইন পাস হয়। এ সময় থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরোধের অবসানে সমন্বয়ের যুগ শুরু হয়। রাষ্ট্র এখন থেকে গণশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষার সর্বস্তরের মধ্যে যাতে একটা সামঞ্জস্য করা যায় সে জন্য শিক্ষাকে কেন্দ্রানুগ করে তোলবার চেষ্টা চলতে থাকে। এর ফলে শিক্ষার মান বিশেষ উন্নত হয়। ১৯০২ খ্রীঃ শিক্ষা আইন পাস হবার পর বহু উন্নত মান প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। এক শ্রেণীর নতুন উচ্চতর এলিমেণ্টারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় যার নাম হয় সেন্ট্রাল স্কুল। এখানে সাধারণ শিক্ষা শেষ হবার পর ১১-১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের 'শিক্ষা' বা 'ব্যবসা বাণিজ্য' সংক্রান্ত কোন কাজ হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হ'ত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফিশার আইন বিধিবদ্ধ হয়। শিক্ষাকে জনসাধারণের নিকট সহজ লভ্য করে তোলা ও জাতীয় শিক্ষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা ছিল এই আইনের লক্ষ্য। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় ও সেই সাথে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ ঘনিষ্ট করে তোলবার দিকে লক্ষ্য রেখে এ আইনটি রচিত হয়। এই আইনে বলা হয় নার্শারী, ইনফ্যাণ্ট ও জুনিয়র স্কুলে তিন থেকে এগার বছরের শিশুদের যে শিক্ষা তাকে বলা হবে প্রাথমিক শিক্ষা। আর বার বছর থেকে আঠার বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য যে শিক্ষা চালু থাকবে তাকে বলা হবে মাধ্যমিক শিক্ষা।

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইন অনুসারে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সাড়ে দশ বছর বয়স পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। নার্শারী বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পায়।

ইনফ্যাণ্ট স্কুল নার্শারী স্তরকে ঠিক প্রাথমিক শিক্ষার স্তর বলা যায় না। ইনফ্যাণ্ট বা শিশু বিদ্যালয়ের থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ৫ থেকে ৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ে। পাঁচ বছর থেকেই ইংল্যাণ্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়।

জুনিয়র স্কুল—শিশু বিদ্যালয়ে থেকে ৭ বছর পর্যন্ত পড়বার পর ছেলে-মেয়েরা এখানে এসে ভর্তি হয়। ১১ বছর বয়স পর্যন্ত এখানে শিক্ষার পর শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়।

এছাড়া কোন স্কুলে ৫ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৯৪৪ খ্রীঃ আইনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক কাউন্টিতে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করবেন এরূপ নির্দেশ আইনে দেওয়া হয়েছে। যদি উপযুক্ত সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন না করতে পারে তাহলে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিন্দাভাজন হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জুনিয়র ও ইনফ্যাণ্ট স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠক্রম রচনা করেন। স্থানীয় নীতি নির্ধারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় যে মূল নীতি নির্দেশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে "*the curriculum of the Primary school is to be thought of in terms of activity and experience rather than of knowledge to be acquired and facts to be stored.*"

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লেখা, পড়া, অঙ্ক সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াও নাচ, গান, খেলাধুলায় ছেলেদের উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া ছবি আঁকা, হাতের কাজ, প্রকৃতি পরিচয় প্রভৃতি বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। পনর বছর পর্যন্ত সবাই সেখানে স্কুলে যেতে বাধ্য। এ জন্য কোন খরচ লাগে না। দরিদ্র ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে পোষাক পরিচ্ছদ দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের দুধ দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্কুলে স্কুল ক্লিনিক রয়েছে। সেখানে ডাক্তার ও নার্স আছে। কঠিন অসুখে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা স্কুল থেকেই করা হয়।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন রূপ ॥

১৯০২ খ্রীঃ শিক্ষা আইন পাস হওয়া পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল বেসরকারী কর্তৃত্বাধীন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রধানতঃ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার একাধিপত্য দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডে পাবলিক স্কুল, গ্রামার স্কুল বেসরকারী প্রচেষ্টার ফল। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে পাবলিক স্কুলগুলি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এখানের শিক্ষার্থীরা এমন একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে যে ইংল্যাণ্ডের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এই পাবলিক স্কুলের ছেলেদের দেখা যায়। কিন্তু পাবলিক স্কুলে শুধুমাত্র অভিজাত ও বিত্তবান সম্প্রদায়ের সন্তানেরাই শিক্ষার সুযোগ পেত।

বিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে মাধ্যমিক শিক্ষায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। ১৯১২ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সংহতি সাধনের জন্য স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ শিক্ষা বিধিতে ব্যবস্থা করা হয় বেতন

দেবার অক্ষমতার জন্য কোন শিক্ষার্থীকেই মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তনে হ্যাডো ও স্পেন্স কমিটির রিপোর্ট এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। হ্যাডো কমিটির রিপোর্টের ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বহুমুখী পাঠ্যসূচী অনুকরণের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। স্পেন্স কমিটি ১৯৩৮ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডের সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সংগতি রেখে তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী হবে কর্মকেন্দ্রীক বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে যোগ রেখে শিক্ষার্থীর রুচি প্রবণতা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাকে গড়ে তোলবার সুপারিশ কমিটি করেন।

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই আইনে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরকিশোরীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই আইনে প্রাথমিকোত্তর বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষায়তনগুলোকে মাধ্যমিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে স্তর বা শ্রেণী বৈষম্যের ফলে যে অসাম্য ছিল তা দূরীভূত হয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ পরিচালিত অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে অবৈতনিক করা হয়েছে।

স্পেন্স কমিটির রিপোর্টে তিন শ্রেণীর স্কুলের কথা সুপারিশ করা হয়েছিল। ১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা না হলেও তিন শ্রেণীর স্কুলই ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চালু আছে। এই তিন শ্রেণীর স্কুল হচ্ছে গ্রামার স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, মডার্ণ স্কুল।

॥ ১ ॥ গ্রামার স্কুল—

দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্যের জন্য গ্রামার স্কুলগুলি সাধারণের চোখে একটি বিশেষ সম্মানের স্থান দখল করে আছে। বর্তমানে তিন শ্রেণীর স্কুলেই প্রথম দু'বছর প্রায় একই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তবু গ্রামার স্কুলে শিক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গ্রামার স্কুলে যারা ভর্তি হবে তাদের কাছ থেকে আশা করা হয়, "*disciplined thought and the capacity to wrestle successfully with intellectual questions, they (the pupils) must have high measure of general intelligence, they must be fond of books and readily drawn to abstract ideas and they must be prepared to stay at school long enough to derive real benefits from the studies they will undertake.*"

সাধারণতঃ মেধাবী ছেলেরাই গ্রামার স্কুলে পড়বার জন্য আসে। মানবিক বিষয়-সমূহ ও বিজ্ঞানধর্মী বিষয়সমূহ এখানে পাঠক্রমের অন্তর্গত। গ্রামার স্কুলের শিক্ষাকাল সাত বছর। এগার বছর থেকে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত এখানে ছেলেরা শিক্ষালাভ করে। এখানকার শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ ও শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে ভর্তি হয়।

গ্রামার স্কুলের পাঠক্রমে ধর্মবিষয়ক উপদেশ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রাচীন ভাষা, আধুনিক ভাষা, শিল্পকলা, হাতের কাজ, সঙ্গীত, শরীর চর্চা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। পরে উচ্চশ্রেণীতে আধুনিক ও প্রাচীন ভাষা, বিজ্ঞান ও গণিতে বিশেষ শিক্ষার (*specialisation*) সুযোগ দেওয়া হয়। বড় বড় স্কুলে ইতিহাস, ভূগোল এমন কি ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইংল্যাণ্ডর গ্রামার র শিক্ষার যে মান রক্ষিত হয়, আমেরিকার হাই স্কুলগুলিতে পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার সেইরূপ উচ্চমান রক্ষিত হয় না।

॥ ২ ॥ টেক্‌নিক্যাল স্কুল—

কারিগরী শিক্ষার জন্য জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। তের বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এখানে ভর্তি হয়। শিক্ষাকাল দুই বা তিন বছর। স্কুলগুলি সাধারণতঃ টেকনিক্যাল কলেজের সাথে যুক্ত থাকে। পাঠক্রমে গণিত, বিষয় উপযোগী বিজ্ঞান, এছাড়া ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় শিল্পের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের সহযোগিতায় স্কুলগুলি পরিচালিত হয়। টেকনিক্যাল স্কুলগুলি শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরিচালনা সাধারণ স্কুল থেকে ভিন্নতর

॥ ৩ ॥ মডার্ন স্কুল—

মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থায় মডার্ন স্কুলগুলির আবির্ভাব আধুনিক কালের ঘটনা। পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে বর্তমানে মডার্ন স্কুল নামধারী স্কুলগুলি নিজেদের আসন স্থায়ী করে নিয়েছে। অভিভাবক শ্রেণীর মধ্যেও এই স্কুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যারা খুব মেধাবী নয় অর্থাৎ গ্রামার স্কুলে যাবার যোগ্যতা নেই, যাদের I. Q. ৮০ থেকে ১১০ তারাই মডার্ন স্কুলে ভর্তি ।

যে পরিবেশে শিক্ষার্থীরা বাস করে সেই পরিবেশের উপযোগী ও বৃহত্তর জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা মডার্ন স্কুলে করা হয়। পাঠক্রমে বৃত্তি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই কিন্তু জীবনের প্রস্তুতি ও অবসর বিনোদনের উপযোগী শিক্ষা এখানে দেওয়া হয়। পাঠক্রমে ধর্ম, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজ বিজ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, গার্হস্থ্য শিল্প, হাতের কাজ, বাগান তৈরী প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে সম্ভব বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু বহিঃ পরীক্ষার (*Public Examination*) চাপ নেই তাই শিক্ষকগণ শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুবিধা পান।

॥ ৪ ॥ সর্বার্থসাধক বা বহুমুখী স্কুল (*Comprehensive or Multilateral School*).:—

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীবিভাগ করা হয়

নি, তবু গ্রামার, টেকনিক্যাল ও মডার্ন এই তিন শ্রেণীর স্কুলই সেখানে স্বীকৃতি-লাভ করেছিল। শিক্ষামন্ত্রণালয় ১৯৪৭ খ্রীঃ "*New Secondary School*" নামক পুস্তকে মাধ্যমিক শিক্ষার এই তিনটি ধারাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। সেখানে বলা হয় মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষার্থীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য তিনটি শিক্ষার ধারা করা হয়। এই ভাগের পিছনে কোন মনোবৈজ্ঞানিক সমর্থন নেই বলে একদল শিক্ষাবিদ আপত্তি তোলেন। তাঁরা বলেন ১১ বছর বয়সে শিক্ষার্থীদের কোন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না—এটা প্রস্তুতিকাল। এই প্রতিবাদের ফলে এক শ্রেণীর নতুন বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় যেখানে তিনটি ধারার সমন্বয়ে পাঠক্রম রচিত হয়েছে। এই মিশ্র স্কুলগুলিকে বহুমুখী (*Multi-lateral* বা সর্বার্থসাধক (*Comprehensive*) বিদ্যালয় বলা হয়। কোন কোন স্থানে দু'টি শাখার মিশ্রণেও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে তিনটি ধারায় শ্রেণী বিন্যাস করে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা যে কোন একটি ধারাকে অনুসরণ করতে পারে। নতুন শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এই শ্রেণীর বিদ্যালয় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি।

॥ ৫ ॥ স্বাধীন স্কুল—

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হলেও দেশের সমস্ত স্কুলের উপর সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় নি। *LEA* এর পরিচালনার বাইরেও বহু স্কুল আছে, এই স্কুলগুলি স্বাধীন স্কুল নামে পরিচিত। কোন কোন অভিভাবক আছেন যাঁরা *LEA* পরিচালিত স্কুলে না দিয়ে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের এইসব স্বাধীন স্কুলে দিয়ে থাকেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই বিদ্যালয়গুলি প্রাইভেট স্কুল, পাবলিক স্কুল ও প্রিপ্যারেটরি স্কুল নামে পরিচিত। এই বিদ্যালয়গুলি সরকার থেকে কোন সাহায্য পায় না। স্বাধীন স্কুলগুলির মধ্যে কিছু আছে যেগুলি অনুমোদিত স্কুল বলে পরিচিত, এই স্কুলগুলি *LEA* কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিদর্শিত ও অনুমোদিত।

॥ ৬ ॥ পাবলিক স্কুল—

স্বাধীন স্কুলের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন হচ্ছে পাবলিক স্কুলসমূহ (*Public School*)। এই স্কুলগুলির ইতিহাস অতি প্রাচীন ও বহুদিন ধরে চলার ফলে অধিকাংশ পাবলিক স্কুলের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সাথে সংগতিবিহীন হলেও ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা নানাদিক থেকে প্রশংসনীয়।

পাবলিক স্কুলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে ১৩৮২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত উইন চেষ্টার স্কুল। এর পরেই ইটন—এটি ষষ্ঠ হেনরী ১৪৪০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া হ্যারো,

রাগবী, ওয়েষ্টমিনিষ্টার, সেণ্টপলস, ক্রাইষ্ট হসপিটাল প্রভৃতি পাবলিক স্কুল বিশেষ খ্যাতি-সম্পন্ন। সব পাবলিক স্কুলই যে খুব প্রাচীন তা নয়, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও কিছু কিছু পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাবলিক স্কুলগুলি সাধারণতঃ আবাসিক, তবে অনাবাসিক পাবলিক স্কুলও আছে। কিছু কিছু পাবলিক স্কুল সরকার থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে। আবাসিক পাবলিক স্কুলগুলি ব্যয় বহুল হলেও ইংল্যাণ্ডের অভিভাবকগণ উন্নতমানের শিক্ষা ও শৃঙ্খলার জন্য এই স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাবার সুযোগ পেলে ও আর্থিক সংগতিতে কুলালে অন্য স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাবেন না।

সুপরিচালনা, উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠক্রম, শিক্ষার উন্নত মান, সুযোগ্য শিক্ষকদের ব্যক্তিগত মনোযোগ, আবাসিক বিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খল জীবন যাত্রা প্রভৃতি বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও পাবলিক স্কুলগুলির বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিরূপ সমালোচনা শুরু হয় ও বর্তমান শতকে বিরুদ্ধ সমালোচনা অতি তীব্র রূপ ধারণ করে। পাবলিক স্কুলগুলির বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ইংল্যাণ্ডের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে এই বিদ্যালয়গুলি সংগতিহীন। দ্বিতীয় অভিযোগ এই ব্যয়বহুল বিদ্যালয়গুলি সাধারণের নাগালের বাইরে। এই বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সন্তানেরা পড়বার সুযোগ পায়। এখানে যারা পড়ে তাদের সাথে জনসাধারণের কোন যোগ নেই। জাতীয় জীবনের প্রধান ধারা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। অথচ এরাই রাষ্ট্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে আছে। অভিযোগের মধ্যে সত্যতা আছে। কারণ পাবলিক স্কুলগুলি গণতান্ত্রিক সমাজের সাথে সামঞ্জস্যহীন। এছাড়া বছরে ৭০০০ হাজার থেকে ১০,০০০ হাজার টাকা খরচ করে পড়াবার মত সংগতি খুব কম লোকেরই আছে। বিত্তবান শ্রেণীর সন্তানেরাই শুধুমাত্র টাকার জোরে বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে বিশেষ একটি শ্রেণীর জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা নীতির দিক থেকেও সমর্থনযোগ্য নয়।

গণতান্ত্রিক আদর্শ বিরোধী পাবলিক স্কুলগুলির বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে ওঠায় ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লেমিং কমিটি গঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সাথে কি করে পাবলিক স্কুলগুলির নিকট সম্পর্ক স্থাপন করা যায় ও সাধারণ ঘরের ছেলেরা কি করে পাবলিক স্কুলে পড়বার সুযোগ পেতে পারে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পেশ করবার জন্য ফ্লেমিং কমিটিকে বলা হয়। পাবলিক স্কুলগুলির প্রয়োজনীয়তা সরকার পরোক্ষভাবে স্বীকার করেই নিয়েছিল। উন্নত মানের শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই এগুলিকে বন্ধ করে না দিয়ে কি করে জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আনা যায় ও সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয় সরকার তাই চাইছিল। ফ্লেমিং কমিটি দুটি প্রস্তাব করেন। একটি প্রস্তাবে বলা হয়, স্বাধীন স্কুলগুলির মধ্যে যে সব স্কুল শিক্ষা বিভাগ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করছে সেই স্কুলগুলি থেকে কিছু স্কুল বেছে নিতে হবে। এই স্কুলগুলির বেতনের হার কমিয়ে আনতে হবে, বোর্ডিংএ থাকার ব্যয়ও

কমিয়ে দেওয়া হবে। *LEA* এর জন্য বোর্ডিংয়ে কিছু আসন নির্দিষ্ট থাকবে। এই সব আসনে *LEA* এর সুপারিশ করা ছাত্রদের নেওয়া হবে। স্কুলের পরিচালক-মণ্ডলীতে *LEA* এর প্রতিনিধি থাকবে। প্রথম প্রস্তাবে যে স্কুলগুলির সম্পর্কে বলা হয়েছে তা স্বাধীন স্কুল হলেও সত্যিকারের পাবলিক স্কুল শ্রেণীতে পড়ে না। দ্বিতীয় প্রস্তাবে আবাসিক বা আংশিক আবাসিক স্কুলগুলিতে যাতে *LEA*'র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা ভর্তি হতে পারে সে ব্যবস্থার কথা ছে। এই প্রস্তাবে বলা হয় পাবলিক স্কুলগুলিতে মোট ছাত্রের এক চতুর্থাংশ *LEA* এর বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র নিতে হবে। এর ফলে সাধারণ ঘরের ছেলেরাও বৃত্তির সুযোগ নিয়ে পাবলিক স্কুলে পড়বার পাবে। বিশেষ সুবিধা ভোগীদের একচেটিয়া সুযোগের অভিযোগ আর উঠবে না এই ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীকে দু'বছর বসে থাকতে হ'ত। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয় ১১ বছর বয়সে, আর পাবলিক স্কুলে ভর্তি হবার বয়স ১৩ বছর। এই অসুবিধা দূর করার জন্য শিক্ষার্থীরা যাতে দু'বছর প্রিপ্যারেটরী স্কুলে পড়তে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রিপ্যারেটরী স্কুলগুলিও স্বাধীন স্কুলের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এই স্কুলগুলির অস্তিত্ব পাবলিক স্কুলের উপর নির্ভরশীল। নামেই বোঝা যায় এই স্কুলগুলি প্রস্তুতি (*Preparatory*) ক্ষেত্র। এখানে পাবলিক স্কুলে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জনের প্রস্তুতি চলে। এখানে প্রস্তুতি পর্ব সমাধান করেই সাধারণতঃ ছেলেরা পাবলিক স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পায়।

ফ্লেমিং কমিটির প্রস্তাব অনুসারে সাধারণ ঘরের ছেলেরা পাবলিক স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষার মাধ্যমে ছেলে বাছাই করে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে পাবলিক স্কুলে ভর্তি হবার জন্য ছেলে পাঠায়। কোন কোন ক্ষেত্রে *LEA* থেকে সরাসরি পাবলিক স্কুলে ছেলে পাঠান হয়। এসব ছেলের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার *LEA* বহন করে।

পাবলিক স্কুল জনসাধারণের কাছে আনবার যতই প্রচেষ্টা হোক না কেন সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে এই স্কুলগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গৌরবের সাথেই টিকে আছে। বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেই পাবলিক স্কুলগুলির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিই হচ্ছে। এই স্কুলগুলির প্রশংসনীয় দিকগুলি যেমন—উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি, সুনির্বাচিত পাঠক্রম, উন্নত শিক্ষার মান, সুযোগ্য শিক্ষামণ্ডলীর ব্যক্তিগত যত্ন, আবাসিক বিদ্যালয়ে হাউস সিস্টেম, প্রিফেক্ট সিস্টেম, খেলাধূলা ও অবসর বিনোদনের উন্নত ব্যবস্থার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই অভিভাবকরা পাবলিক স্কুলে ছেলে পাঠাবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। পাবলিক স্কুল ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিরোধী কিন্তু ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় পাবলিক স্কুল অপরিহার্য। তাই ফ্লেমিং কমিটির প্রস্তাব দুটি পুরোপুরি কার্যকরী করলে পাবলিক স্কুলে সাধারণ ছেলেরা অধিকতর সংখ্যায় ভর্তি হবার সুযোগ পাবে ও জনসাধারণ থেকে সরে থাকার অভিযোগ আর থাকবে না।

ভারতের পাবলিক স্কুল :—

ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় পাবলিক স্কুলের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। ইংরেজ শাসনকালে ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুলের অনুকরণে ভারতে পাবলিক স্কুলের সৃষ্টি হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গ তাদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলে পাঠাতেন। এদের সুবিধার জন্য "প্রিন্সেস স্কুল" স্থাপিত হয়। এছাড়া বিত্তবান সম্প্রদায়ের ছেলেদের শিক্ষার জন্য বিলাতের পাবলিক স্কুলের অনুকরণে বেশ কয়েকটি পাবলিক স্কুলের সৃষ্টি হয়। দেশ স্বাধীন হবার পরে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে অসংগতিপূর্ণ পাবলিক স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় কমিশন দেশের ১৪টি পাবলিক স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভারতের বুক থেকে পাবলিক স্কুল লোপ পাওয়া দূরের কথা পাবলিক স্কুলে ছেলে পাঠানোর ঝোঁক সমাজের এক শ্রেণীর মধ্যে বেড়েই চলেছে। বর্তমানে এই ধরনের স্কুলের সংখ্যা ৪০টি। সমাজতন্ত্রের দিকে আমরা যতই অগ্রসর হ'ব মনে হচ্ছে ব্যয় বহুল পাবলিক স্কুলের সংখ্যা বেড়েই চলবে। এই ধরনের স্কুল সম্পর্কে সমাজের এক শ্রেণীর লোক বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। মুদালিয়র কমিশন সে কথা স্বীকার করে নিয়েও এই শ্রেণীর স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখবার সুপারিশ করেছেন। কমিশন অবশ্য এই শ্রেণীর স্কুলগুলির সরকারী সাহায্য বন্ধের সুপারিশ করেছেন। তবে কিছু সরকারী বৃত্তিধারী ছাত্র যাতে এসব স্কুলে পড়তে সুযোগ পায় সেজন্য সুপারিশ করেছেন। সমাজে সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের সন্তানদের জন্য এই শ্রেণীর বিদ্যালয় বাঁচিয়ে রাখবার কোন সার্থকতা আছে কি-না ভেবে দেখা উচিত। বিলাতের নজীর তুলে একে সমর্থন করা যায় না। কারণ সে সব স্কুলের কাছ থেকে দেশ যা পেয়েছে আমাদের দেশের পাবলিক স্কুলের কাছ থেকে আমরা কিছুই পাই নি, কি পাবার কোন সম্ভাবনাও দেখছিনে। পাবলিক স্কুলের উপস্থিতি সমাজের বৈষম্যের চিত্রটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। সেখানে বিশেষ একটি শ্রেণীর সন্তানদের জন্য ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা থাকলে ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়ে দেখা দেবে। দেশের অধিকাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হবে তারা গণতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক রূপে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে বলে মনে হয় না।

॥ ইংল্যাণ্ডের শিক্ষার সাথে ভারতের শিক্ষার তুলনা ॥

ইংরেজ শাসনকালে ভারতের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ সরকারের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে যে শিক্ষাব্যবস্থা ও যে শিক্ষানীতি সে দেশের জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ করেছে ভারতে যদি সেই শিক্ষানীতি অনুসৃত হ'ত তাহলে ভারতেরও অশেষ কল্যাণ হ'ত; কিন্তু একটি পরাধীন শাসিত দেশের জন্যে স্বদেশে অনুসৃত নীতির প্রয়োগ করার কোন প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে বলে ইংরেজ সরকার

মনে করে নি। উনবিংশ শতকে ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয় কিন্তু ভারতে যখনই এই দাবি করা হয়েছে দেশ প্রস্তুত নয় কিংবা অর্থের অভাব প্রভৃতি অজুহাতে তাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। তবে শিক্ষার বুনিয়াদ যে মোটামুটি ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ করে গড়ে তোলা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার সুযোগ এল। আমরা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি কি না, বা আমরা ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ও শিক্ষার কাঠামোকে সামান্য পরিবর্তন করে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি সে সম্পর্কে আলোচনা না করেও ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে আমাদের নিজেদের অবস্থা তুলনা করলে দেখতে পাব আমরা কত পিছিয়ে আছি।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও আমাদের পক্ষে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকরী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা বলতে পারি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পথে প্রথম পদক্ষেপ। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করে 'নঈ তালিম' শিক্ষা পরিকল্পনায় ৭ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক্ বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করবার কথা বলা হয়। আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় নার্শারী শিক্ষা বা প্রাক্ বুনিয়াদী শিক্ষা কোন উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করতে পারে নি। নার্শারী স্কুলের জন্য শহরাঞ্চলে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির স্থানের অভাব, অর্থের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। নার্শারী স্কুল শহরাঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ১৯৫৭ খ্রীঃ ৭৭৩টি নার্শারী স্কুল ছিল। এগুলি সাধারণতঃ নার্শারী, বালমন্দির, প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রভৃতি নামে পরিচিত। নার্শারী স্কুল সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নার্শারী স্কুলের নামে সুবিধাবাদী কিছু লোক লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় শহরে যত্রতত্র সাইনবোর্ড দিয়ে কে. জি. বা নার্শারী স্কুল খোলা হচ্ছে। ছোট চুল আর স্কার্ট পরা শিক্ষিকা থাকলেই আজকাল যে কোন স্কুল কে জি. বা নার্শারী স্কুল হতে পারে। অবশ্য দক্ষিণা-মাসে ১৫ থেকে ২৫ টাকা হওয়া চাই, তা না হলে আভিজাত্য থাকে না।

ইংল্যাণ্ডে নার্শারী স্কুল রয়েছে আমাদের তাই থাকতে হবে একথা বলছি না। যদি নার্শারী স্কুলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় সেটা প্রশংসনীয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা বিলেত থেকে ধার করে নার্শারী স্কুলের নামটা নিয়েছি অথচ নার্শারী স্কুলের কোন সুব্যবস্থাই নেই। এটা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষা ভারতে ইংলণ্ডের মত পাঁচ বছর থেকে শুরু হয়। এখানেও সরকারী বেসরকারী দু' শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ই আছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ইংরেজের দেশে ইংরেজ যা করেছে আমাদের দেশে তা তারা করে নি কিন্তু আমরা তা চিরদিন দাবি করেছি। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। নীতির দিক থেকে

১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হওয়ার কথা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি কিন্তু কবে তা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে সঠিক কেউ বলতে পারে না।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। পাঠক্রম পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতের শিক্ষা-বিদ্‌গণ একটা পরিবর্তন অবিলম্বে প্রয়োজন বুঝতে পারছেন। কিন্তু এখনও সেই চিরাচরিত পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতিই আমরা অনুসরণ করে যাচ্ছি। স্বাস্থ্য পরিদর্শন, স্কুল থেকে দুধ সরবরাহ প্রভৃতি বিষয় আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার সদিচ্ছা প্রকাশ ছাড়া কার্যকরীভাবে আজ পর্যন্ত কিছু করেন নি। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার কিছু পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা নানা কারণে এদেশে প্রসার লাভ করে নি। সরকার চেষ্টা করলেই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে পারেন। ইংল্যাণ্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য যে সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে তা সম্প্রসারিত করতে পারেন।

ইংল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১৮ বছর পর্যন্ত। ভারতে দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। একাদশ শ্রেণীতে এক বছর বেড়ে গিয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ১৫ বছরে শেষ হওয়া উচিত নয় বলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ১৭ বছর পর্যন্ত স্থায়ী করবার কথা অনেকে বলেছেন। দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের যে পরিকল্পনা নিয়ে বিচার বিবেচনা হচ্ছে তা গৃহীত হলে ভারতেও মাধ্যমিক শিক্ষা ১৭ বছরে শেষ হবে। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ভারতের বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা ইংল্যাণ্ডের থেকে ব্যাপক ও শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত। পাঠক্রম রচনায় কমিশন আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক পাঠক্রম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইতিহাস ভূগোলের পরিবর্তে সমাজ, বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে দেখা যায়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ পাঠক্রম অনুসরণের ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের মত এখানেও করা হয়েছে। ভারতের শিক্ষা কাঠামোর শীঘ্রই একটি পরিবর্তন হবার সূচনা দেখা যাচ্ছে। কোঠারী কমিশনের সুপারিশ মত মাধ্যমিক শিক্ষার কাল ১২ বছর হবে বলে স্থির হয়েছে। দুই এক বছরের মধ্যে সমগ্র ভারতে এই পরিবর্তন হবে। তাহলে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাও ১৭ বছরেই শেষ হবে। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীর পরিবর্তে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে। ছাত্রদের তাদের রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় বেছে নেবার সুযোগ একাদশ শ্রেণী থেকে থাকবে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা। বর্তমানে নবম শ্রেণী থেকে যে বিশেষীকরণের রীতি আছে নতুন ব্যবস্থায় তা একাদশ শ্রেণী থেকে শুরু হবে।

ইংল্যাণ্ডে দু'শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। কাউন্টি স্কুল ও ভলাণ্টারি স্কুল। কাউন্টি স্কুলগুলি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। ভলাণ্টারি স্কুলগুলি বেসরকারী তবে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ থেকে সাহায্য পায় ও কিছুটা পরিমাণে তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারতের স্কুলসমূহ অধিকাংশই বেসরকারী। সামান্য কিছু স্কুল সরকার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। বেসরকারী স্কুলগুলির পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় পরিচালক সমিতি, সরকারী শিক্ষা বিভাগ ও বোর্ডের মধ্যে বিভক্ত। প্রাদেশিক মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষাবোর্ডের কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠিত কোন স্কুল নেই। পরিশাসনের দিক থেকে এই ত্রিধা বিভক্ত শাসন ব্যবস্থা স্কুলের পরিচালনার দিক থেকে নানা দিকে অসুবিধার সৃষ্টি করে। ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষায়তনগুলির শোচনীয় অবস্থা, আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, আর্থিক দুর্গতি, শিক্ষকদের নিম্ন বেতনের হার কোনটাই ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থার সাথে তুলনীয় নয়।

ইংল্যাণ্ডে ১৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীর বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ছাত্রদের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, দূরাগত ছাত্রদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা সব কিছুই স্কুল থেকে করা হয়। সব দিক থেকে বিচার করলেই বোঝা যাবে আমরা কত পিছিয়ে আছি।

॥ ইংল্যাণ্ডের বিশেষ শিক্ষা আইনসমূহ ॥

ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা বিংশ শতকের পূর্বে সরকারী, বেসরকারী, ধর্মীয় এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে সামঞ্জস্য বিহীন ও পরস্পরের সহিত সম্পর্ক শূন্য রূপে গড়ে ওঠায় শিক্ষা ক্ষেত্রে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ শিক্ষা আইন কতকগুলি সাময়িক সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু এই সময় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত স্কুল বোর্ড ও ভলাণ্টারী স্কুলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দ্বৈত ব্যবস্থার ফলে বিশৃঙ্খলা এত বেড়ে যায় যে সমগ্র অবস্থা অনুসন্ধান করে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য ১৮৯৪ খ্রীঃ জেমস ব্রাইসের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। ব্রাইস কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সীমারেখা ঠিক করা হয়। কমিশন সমগ্র দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ অনুসারে একটি এডুকেশন বোর্ড গঠিত হয়, এডুকেশন বোর্ড প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করে। মন্ত্রীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পন্ন একজন সভাপতি বোর্ডের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। ব্রাইস কমিশন স্থানীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার কথা বলেন নি, শুধুমাত্র পরিদর্শন ও তদারক করবার সুপারিশ করেছিলেন। তাই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে দ্বৈত কর্তৃত্ব দূর হ'ল না।

উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এক অচল

অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৮৯৯-১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই সময়ে স্কুল বোর্ড ও বেসরকারী স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দূর করবার জন্য ১৯০২ খ্রীঃ শিক্ষা আইন পাস হয়।

॥ ১ ॥ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইন বা ব্যালফুর আইন—

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ব্যালফুর পরিকল্পিত শিক্ষা আইন পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। এই আইনে তৎকালীন শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা দূর করবার প্রচেষ্টা করা হয়। এই আইনের ফলে পরিকল্পনা বিহীন গড়ে ওঠা স্কুলবোর্ডগুলি উঠে যায়। এই স্কুলবোর্ডগুলির স্থানে মিউনিসিপ্যাল এলাকা ধরে ১২০টি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাগুলিকে বলা হয় কাউন্টি কাউন্সিল ও বরো কাউন্সিল। এই সংস্থাগুলিকে নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এদের নাম দেওয়া হ'ল *Part II Authorities*।

যে সকল বরোর লোকসংখ্যা দশ হাজারের বেশী ও যে সব আরবান জেলার লোকসংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশী এরূপ ১৮০টি স্থানের শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব *Part III Authorities*-এর উপর দেওয়া হয়। এই সংস্থাগুলিও মিউনিসিপ্যাল এলাকার ভিত্তিতে গঠিত হয়। এই দুই সংস্থার নাম দেওয়া হয় স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ *Local Education Authorities* (*L. E. A.*)।

আইনে এই সংস্থাগুলিকে একটি করে শিক্ষা কমিটি নিযুক্ত করবার অধিকার দেওয়া হয়। এই শিক্ষা কমিটি সংসদের শিক্ষাকর আদায় বা ঋণ করার বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সংসদের ক্ষমতা পরিচালনা করবেন স্থির হয়। সংসদের সভ্যরাই প্রধানতঃ এই কমিটির সভ্য হবেন, তবে শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ কিছু লোককে বাইরের থেকে কমিটির সভ্য করা হত। কমিটিতে কিছু নারী সভ্যাও থাকত।

শিক্ষা কর ধার্যের অধিকার স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (*L. E. A.*) উপর ন্যস্ত হয়।

দেশের সংযোগহীন বিশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংহত রূপ দেবার জন্য স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগুলির (*L. E. A.*) উপর সারা দেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই সময় থেকে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সাহায্যপুষ্ট স্কুল (*Provided School*) পরিচালনা ও প্রয়োজন মত নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা শুরু করে। এছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত সাহায্যহীন ভলাণ্টারী স্কুলগুলির লৌকিক শিক্ষার পরিচালনার দায়িত্ব *L. E. A.* গ্রহণ করে।

এই সময় থেকে ভলাণ্টারী স্কুলগুলিকে সাহায্য দেওয়া শুরু হয় কিন্তু এককালীন বড় খরচ যেমন স্কুল গৃহ নির্মাণ ও স্কুল গৃহ সংস্কার প্রভৃতির জন্য ব্যয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকেই বহন করতে হ'ত। এই সকল ভলাণ্টারী স্কুলের পরিচালক সমিতি

L. E. A.-র অনুমোদন সাপেক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ভলাণ্টারী স্কুলের পরিচালক সমিতির এক তৃতীয়াংশ সভ্য *L. E A.* কর্তৃক নিযুক্ত হ'ত।

মিউনিসিপ্যাল স্কুল ও ভলাণ্টারী স্কুলের লৌকিক শিক্ষার দায়িত্ব *L. E. A.*-র উপর ন্যস্ত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে স্থির হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইনের *Cooper Temple Clause* বা *Conscience Clause* অনুসারে দিতে হবে। এই ধারায় আছে কোন স্কুলেই ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না। ছাত্রের অভিভাবক ইচ্ছা করলে ধর্মশিক্ষার ক্লাসে ছাত্রকে নাও যেতে দিতে পারেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইনের ফলে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (*L. E. A.*) হাতে সারা দেশের শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ছিল তা দূর হয়ে শিক্ষার একটা সংহতি আসে। পরিচালনার ক্ষেত্রে সমগ্র দেশব্যাপী এই পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার মান উন্নত হয় ও স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রেও সুবিধা হয়। শিক্ষা ব্যাপারে সারাদেশে একই নীতি অনুসৃত হবার ফলে বিশৃঙ্খলার স্থলে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

এই আইনের ত্রুটি হচ্ছে সাহায্যপুষ্ট (*Provided*) ও সাহায্যহীন (*Non-Provided*) স্কুলগুলির মধ্যে পার্থক্যের অবসান না হওয়ার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রের দ্বৈত-নীতি সম্পূর্ণ লোপ পায় না।

Part II ও *Part III Authorities* নামক দু'টি কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি হওয়ায় পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

সাধারণ দু' একটি ত্রুটি রয়ে গেলেও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। এই আইনের ফলেই পরস্পর সংযোগ-হীন বিশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা সমন্বয় ও শৃঙ্খলা আসে।

॥ ২ ॥ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইন (ফিশার আইন) :—

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বিরাট বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। জাতীয় প্রয়োজনে শিক্ষক-ছাত্র সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে জয়ী হওয়াই ইংরেজ শক্তির প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তাই সাধারণ শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হয়। যুদ্ধের সময় ছাত্র সমাজ নানা ভাবে জাতি ও সমাজের সেবায় এগিয়ে আসে। এমন কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত নানাভাবে তাদের সামান্য শক্তি দিয়ে যুদ্ধের কাজে সহায়তা করে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফিশার বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে যদি এতদিন কারও মনে কোন সন্দেহ থাকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর সেই সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে। মহাযুদ্ধের পর জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ শুরু হলে প্রথমেই শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। শিক্ষার কি মূল্য ইংরেজ জাতি

তা যুদ্ধের সময় বুঝতে পারে তাই শিক্ষা সংস্কারকে যুদ্ধ পরবর্তীকালে সর্বপ্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথেই জাতি গঠনমূলক শিক্ষার জন্য এডুকেশন বিল রচিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট বিলটি পার্লামেণ্টে আইন বলে গৃহীত হয়। এই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইন বা তৎকালীন শিক্ষাবোর্ডের সভাপতি মিঃ ফিশারের নাম অনুসারে "ফিশার আইন" নামে পরিচিত।

এই শিক্ষা আইনটি প্রধানতঃ তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত (১) শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে আসে সেজন্য শিক্ষকতা বৃত্তিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করবার জন্য শিক্ষকতার মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয় (২) শিক্ষার প্রসারে যাতে জনগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে সেজন্য শিক্ষায় স্থানীয় জনগণের উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টির আয়োজন করা হয়। (৩) স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (*L. E. A*) ক্ষমতা ও দায়িত্বের প্রসার করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমিক উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা সুশৃঙ্খল ও সর্বাত্মক রূপ দেবার পরিকল্পনা নিয়েই এই শিক্ষা আইনটি রচিত হয়। সর্বস্তরের জনগণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাই এই আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই আইনের প্রধান ধারাসমূহে বলা হয়েছে :—

॥ ১ ॥ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করবে।

॥ ২ ॥ স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (*L. E. A*) সমগ্র ব্যয়ের কমপক্ষে অর্ধেক সরকার মঞ্জুর করবে।

॥ ৩ ॥ স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা রচনা করবেন ও অনুমোদনের জন্য এগুলি শিক্ষাবোর্ডের নিকট পেস করা হবে।

॥ ৪ ॥ প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ২-৫ বছরের শিশুদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক নার্শারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে।

॥ ৫ ॥ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

॥ ৬ ॥ শিশুদের আংশিক সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা লোপ করা হবে। বার বছরের নীচে কোন ছেলেকে কোন কাজে লাগান চলবে না।

॥ ৭ ॥ শিশুদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষসমূহ ছুটির দিনে শিশুদের জন্য বহির্ভ্রমণের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া খেলার মাঠ, ব্যায়াম, সাঁতারের জন্য জলাশয় ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করবে।

ফিশার শিক্ষা এ্যাক্টে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিধান ছিল ১৫ বছর পর্যন্ত বাধ্যতা-মূলক সর্বক্ষণের শিক্ষা (*full time education*) ও ষোল বছর বয়স পর্যন্ত (পরে ১৮ বছর পর্যন্ত) অন্য কাজে থাকাকালীন প্রসারিত বিদ্যালয়ে (*Continuation*

School) শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই আইনের শিক্ষার বাধ্যতামূলক বয়স বর্ধিতকরণের প্রস্তাবটি কার্যকরী করা হয়নি। যুদ্ধের পরবর্তীকালীন জাতীয় অর্থ সংকটের ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিও সীমাবদ্ধ হয়। তারপর নিয়োগকর্তাদের অসহযোগিতার ফলে প্রসারিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা খুব সাফল্য লাভ করে নি।

ফিশার আইনের সব ধারা সমানভাবে কার্যকরী না হলেও পরবর্তীকালে যাবতীয় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বীজ ফিশার আইনেই নিহিত ছিল।

॥ ৩ ॥ ১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইন :—

১৯৩৯ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ড সর্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের মত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালেও ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে শিক্ষাকার্য সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা আইনসমূহের পটভূমিকার দিকে তাকালে দেখা যায় দেশ যখন একটা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তারপর জাতীয় পুনর্গঠনের সময় শিক্ষাকে নতুন করে ঢেলে সাজান হয়েছে। বুয়র যুদ্ধের পর ও প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ডে ১৯০২ খ্রীঃ ও ১৯১৮ খ্রীঃ শিক্ষা আইন পাস হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধ পরবর্তীকালে কি করে দেশকে গড়ে তোলা হবে সে বিষয় পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। এই জাতীয় পুনর্গঠন তালিকায় শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হ'ল।

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনের প্রথম সূচনা দেখতে পাই এড়ুকেশন বোর্ড রচিত সবুজ (*Green Book*) নামে খসড়া দলিলে। ১৯৪১ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে বোর্ডের সভাপতি আর. এ. বাটলার এই দলিল সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেন। এই সংক্ষিপ্ত দলিলে প্রশ্নাকারে শিক্ষা সংক্রান্ত বহু বিষয় উত্থাপিত করা হয়। এই দলিলটি প্রকাশিত হবার পর শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে বহু আলোচনা করেন। সবুজ পত্রের আলোচনা থেকে বহু অনুসন্ধান করে ও অভিজ্ঞ মহলের মতামত সংগ্রহ করে ও বিশ্লেষণ করে মিঃ বাটলার ১৯৪৩ খ্রীঃ জুলাই মাসে "শিক্ষা পুনর্গঠন" নামে একটি পার্লামেণ্টারী শ্বেতপত্র (*White Parer*) তৈরী করেন। ১৯৪৪ খ্রীঃ এই শ্বেতপত্র পার্লামেণ্ট কর্তৃক যথারীতি আইনে পরিণত হয়। এই আইন ১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইন নাম পরিচিত।

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে ১২২টি ধারা ও ৯টি তপশীল পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে কেন্দ্রীয় পরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশ, শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, দপ্তরের কর্মচারীদের কর্তব্য ও উপদেষ্টা সমিতির (*Advisory Councils*) অধিকার ও কর্তব্য। দ্বিতীয় অংশে, আইনবদ্ধ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৎপরবর্তী শিক্ষা, যান্ত্রিক শিক্ষা, পূর্ণ বয়স্কের শিক্ষা, তরুণদের সমাজ সেবার কার্যাবলী সম্পর্কীয় বিধি ও ছাত্রদের চিকিৎসা, স্কুলে দুধ ও খাদ্য সরবরাহ ও এইরূপ বিষয়ের নিয়ম কানুন।

তৃতীয় অংশে স্বাধীন প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভূত স্কুল সম্বন্ধীয় বিধি, চতুর্থ অংশে স্কুল পরিদর্শন, ছাত্রবৃত্তি মঞ্জুর, পিতামাতার অধিকার এবং শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভলান্টারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থ বণ্টন সম্বন্ধে বিধান। পঞ্চম অংশে, এই আইন কি করে কার্যকরী করে তোলা যায় সে সম্পর্কে বিধান।

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনের যে সব ধারা শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে তা হচ্ছে :—

পূর্বের এডুকেশন বোর্ড লুপ্ত হয় ও তার জায়গায় শিক্ষা বিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী হ'ল শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর। পূর্বে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এডুকেশন বোর্ডের সভাপতি। তাঁর কর্তব্য ছিল সীমাবদ্ধ, শিক্ষা বিষয়ক সামান্য কয়েকটি বিষয় মাত্র তিনি দেখাশুনা করতেন। ১৯৪৪ খ্রীঃ আইনের পর তাঁর দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার অনেক বেড়ে গেল। তিনি সমগ্র দেশের সর্বপ্রকার শিক্ষার অগ্রগতি ও পরিচালনা বিষয়ে একমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন। এই আইনের ফলে সমস্ত বিচ্ছিন্ন কর্তৃত্ব একক ভাবে তাঁর হাতে এসে সংহত হ'ল। তাঁর এই অপ্রতিহত ক্ষমতা যাতে স্বেচ্ছাচারে পরিণত না হয়ে পড়ে সেজন্য পার্লামেন্টে একটি বার্ষিক শিক্ষা বিবরণী তাঁকে পেশ করতে হয়। এই আইনের বলে দুইটি উপদেষ্টা সংসদ সৃষ্টি হ'ল। একটি ইংল্যাণ্ডের জন্য অপরটি ওয়েলস এর জন্য। দুটি সংসদ শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক গঠিত; কিন্তু দু'টি সংসদেরই শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীকে উপদেশ দেবার অধিকার রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী কোন বিষয়ে প্রয়োজন হলে সংসদের পরামর্শ চাইবেন। এই ব্যবস্থা শিক্ষামন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারের আর একটি রক্ষাকবচ। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন ও সংযোগহীন সূত্রগুলি একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে এসে যুক্ত হ'ল।

দ্বিতীয় পরিবর্তন সাধিত হ'ল স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (*L.E.A*) ক্ষেত্রে। ১৯৪৪ এর আইনের ফলে কেবলমাত্র এক প্রকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি হ'ল। এখন থেকে *L. E. A* প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অন্যান্য সকল রকমের শিক্ষার পরিচালনা করবে স্থির হ'ল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের আইনের কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার অধিকারী *Part III Authority* লোপ পেল। অবশ্য *Divisoinal Executive* নাম দিয়ে কোথাও কোথাও কয়েকটি শিক্ষা সংস্থা *L. E. A* এর পরিবর্তে কাজ করবার জন্য নিযুক্ত হবার বিধিও হ'ল। এই সংস্থাগুলি প্রকৃতপক্ষে *Part III Authorities* এর নামান্তর। তবে এই সংস্থাগুলি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থারই অধিকারী হ'ল। কিন্তু, এই সব সংস্থার *L.E.A.* এর মত শিক্ষার জন্য ঋণ করার বা শিক্ষা কর আদায় করার অধিকার রইল না, *L.E.A*-গুলির আইনগত কর্তব্য হ'ল তাদের এলাকার সর্বপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজন হলে একাধিক এলাকার একাধিক কাউন্টি ও কাউন্টি বরো সংসদকে (*Council*) যুক্ত করে সেই সকল এলাকার ব্যবস্থার জন্য একটি যুক্ত শিক্ষা বোর্ড গঠন করার ক্ষমতাও শিক্ষামন্ত্রীর রইল।

শিক্ষার তিনটি ক্রমিক স্তর নির্দিষ্ট হ'ল—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৎপরবর্তী উচ্চ শিক্ষা।

পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। আবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১১ বছর বয়স থেকে ১৬ বছর বয়স বা তার চেয়ে বেশী বয়স পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এই ব্যবস্থায় উভয় বিদ্যালয়ের নির্ধারিত নীতি ব্যাহত হ'ত ও মাধ্যমিক বিদ্যলেয়ের কতকগুলি বিষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশ করত। কিন্তু ১৯৪৪ এর শিক্ষা আইনে তিনটি স্তরের ক্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দূর হ'ল।

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (*L.E.A*) উপর সর্ববিধ শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হ'ল, কিন্তু সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন অনুসারে। প্রতিটি *L.E.A* নিজ এলাকাস্থিত সকলের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থাও *L.E.A.*-কে করতে হবে। প্রত্যেকটি *L.E.A* কে নিজ এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রাথমিক ও ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এলাকার লোকের উপযোগী স্কুলের সংখ্যা, স্কুলের সজ্জা ও উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে সেই এলাকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত হবে না। এক বৎসরের মধ্যেই শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রত্যেকটি *L.E.A* তার এলাকার শিক্ষার চাহিদা মেটাবার জন্য কী কী বন্দোবস্ত করা দরকার ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কী আয়োজন করা দরকার সেই সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তরে বিবরণী পেশ করেতে বাধ্য থাকবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও বিকলাঙ্গ লোকদের শিক্ষার পরিকল্পনাও *L.EA.*-কে মন্ত্রী দপ্তরে পেশ করতে হবে। এই পরিকল্পনায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকার ভেদ স্পষ্ট করে নির্দেশ করতে হবে ও ভবিষ্যতে কি ভাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ চলবে তাও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রীর অনুমোদনের পরে, কাজ অগ্রসর হবে। এই বিধি দ্বারা সকলেরই শিক্ষার সমান অধিকার তাই সূচিত হয়। এর আগে *L: E. A.* তার অভিরুচি ও সামর্থ্য অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করত। এর ফলে সর্বত্র শিক্ষার মাপ ও প্রকৃতি একরূপ ছিল না। কিন্তু এই আইনের পরে *L. E. A.*-গুলির কর্তব্য আইনবদ্ধ হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রের এই বৈষম্য দূর হ'ল এবং *L E. A*-এর কর্তব্য পালনে বাধ্যবাধকতা এল।

পূর্বের মিউনিসিপাল স্কুল ও ভলাণ্টারী স্কুলের দ্বৈত নীতির মধ্যেও একটা আপোস রক্ষা হ'ল। এটাও ১৯৪৪ এর আইনের একটা বৈশিষ্ট্য বলতে হবে। ভলাণ্টারী স্কুলগুলি তিন প্রকারের হ'ল। (ক) নিয়ন্ত্রিত স্কুল (*Controlled School*) (খ) সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল (*Aided School*) (গ) বিশেষ রফাযুক্ত স্কুল (*Special Agreement School*)। এই বিধি দ্বারা ভলাণ্টারী স্কুলগুলিকে তাদের প্রয়োজনমত কতকগুলি বিকল্প ব্যবস্থা করার সুযোগ দেওয়া হ'ল। যে ভলাণ্টারী স্কুলগুলির পরিচালকবৃন্দ

স্কুলের গৃহ নির্মাণ, মেরামত বা গৃহের উন্নতি করতে সমর্থ নয়, সেগুলি হবে নিয়ন্ত্রিত স্কুল। এই স্কুলগুলির ক্ষেত্রে *L. E. A.* সব ব্যবস্থা করে দেবে, তার বদলে এই স্কুলগুলি সপ্তাহে দু'ঘণ্টার বেশী ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে না।

যে সকল ভলাণ্টারী স্কুল স্কুলগৃহ নির্মাণ, মেরামত প্রভৃতি অর্ধেক খরচের সংস্থান করতে পারবে তাদের বলা হ'ল সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল। এই স্কুলগুলির ধর্মীয় শিক্ষা দেবার ও শিক্ষক নিয়োগের অধিকার থাকবে।

এ ছাড়া ৫০০টি প্রাইভেট স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে কতকগুলি রফা করেছিল তাদের বলা হয় *Special Agreement Schools.*

১৯৪৪ এর শিক্ষা আইন অনুসারে ৫ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষার বয়স নির্ধারিত হ'ল। স্থির হ'ল যখনই সম্ভব হবে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স ১৫ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

L. E. A.-গুলি বাধ্যতামূলক বয়সের অধিক বয়স্ক ও পূর্ণ বয়স্কের শিক্ষার জন্যও সর্বক্ষণের (*full time*) ও আংশিক সময়ের (*part time*) শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে। পূর্ণ বয়স্কের কাজের অবসর সময় ও তাদের শিক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক শিক্ষা-কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে *L. E. A.* বাধ্য থাকবে। পূর্ণ বয়স্কের শিক্ষাব্যবস্থা এই প্রথম।

উদার ভিত্তিতে ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রদের মিলিত প্রার্থনার ব্যবস্থাও প্রতি স্কুলে রাখতে হবে। আইনবদ্ধভাবে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও এই প্রথম।

L. E. A. পরিচালিত বিদ্যালয়ে ছাত্রবেতন আদায়ের ব্যবস্থা উঠে গেল। এই সকল বিদ্যালয় অবৈতনিক হ'ল।

সকল প্রাইভেট স্কুলগুলিকে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে নাম রেজেস্ট্রী করতে বাধ্য করা হল। যে সকল প্রাইভেট স্কুল উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না, শিক্ষার উপযুক্ত মান রক্ষা করতে পারবে না তাদের নাম রেজেস্ট্রী থেকে কাটা যাবে। এই স্কুলগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকবে।

সব স্কুলেই ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল ব্যবস্থা থাকবে। দুই বৎসর থেকে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছাত্রদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। দরকার হলে বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা *L. E. A.* করবে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে টিফিন ও আহারের ব্যবস্থা করা হবে। এজন্য কোন অর্থ দিতে হবে কি না তা শিক্ষা মন্ত্রী স্থির করবেন। শিক্ষার্থীকে-প্রয়োজন হলে পোষাক দেওয়া হবে, ইচ্ছা করলে সব শিক্ষার্থীকেই *L. E. A.* থেকে পোষাক দেওয়া যেতে পারে, এসব ক্ষেত্রে সম্ভব হলে অভিভাবকের কাছ থেকে কিছু অর্থ নেওয়া হবে। দূরের ছেলেদের স্কুলে আসবার জন্য বিদ্যালয় থেকে পরিবহনের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া সামাজিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা স্কুলগুলি করবে। আইনে ছেলেদের নানারূপ আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করতে

L. E. A.-কে বলা হয়েছে। ছাত্রবৃত্তি বা অন্যান্য ভাবে *L. . A.* ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সাধন ও শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নতুন মাইনের হার নির্ধারণের ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইন যুদ্ধ পূর্বাকালের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রায় আমূল সংস্কার র শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। এই আইনের মত সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা আইন এর পূর্বে আর কখনও হয় নি। এই আইনের ফলে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক হীন শিক্ষাব্যবস্থা একটি সুসমঞ্জস রূপ নেয়। সব রকম স্তরের ছাত্রদের জন্য এরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা এর পূর্বে আর হয় নি। শিশু, কিশোর, পূর্ণ বয়স্ক এমনকি বিকলাঙ্গদের শিক্ষার ব্যবস্থা পর্যন্ত এই আইনে করা হয়। *L. E. A.*গুলির দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন বিধিবদ্ধ হয়েছে তেমনি তাদের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও সামঞ্জস্য এসেছে। সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এক পূর্ণাঙ্গ, সুশৃঙ্খল, সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ রূপ পেয়েছে।

॥ ৪ ॥ ১৯৪৬ ও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইন :—

১৯৪৪-এর শিক্ষা আইন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নবযুগের সূচনা করে। কিন্তু এই আইনের দু'একটি ত্রুটি সংশোধনের জন্য ১৯৪৬ খ্রীঃ এক আইনের প্রয়োজন হয়। পূর্বতন শিক্ষা আইনের কাঠামোর উপর নতুন আইন সামান্য সংশোধন মাত্র।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা আইনের ১৭টি ধারা ও ২টি সিডিউল।

এই আইনের ফলে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (*L.E.A*) ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয় ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়।

আইনে *L. E. A*-গুলিকে বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত স্কুল সমূহের (*Controlled Schools*) সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য অধিকতর অর্থব্যয়ের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

ভলাণ্টারী কর্তৃপক্ষ যদি স্কুলের জন্য গৃহের সংস্থান না করতে পারে তাহলে *L.E.A*-গুলিকে অস্থায়ী স্কুলগৃহের ব্যবস্থার অধিকার দেওয়া হয়।

নিয়ন্ত্রিত স্কুলসমূহের জন্য গৃহ নির্মাণ, মেরামত প্রভৃতির দায়িত্ব *L. E. A* এর উপর ন্যস্ত হয়।

ছাত্রদের পোষাক, আবাসিক স্কুল স্থাপন, ও রক্ষণাবেক্ষণ, অবৈতনিক নার্শারী স্কুল স্থাপন প্রভৃতির দায়িত্ব *L. E. A*-কে দেওয়া হয়।

১৯৪৬ এর আইনে ধর্মীয় উপাসনা সম্পর্কে বলা হয় কাউন্টি ও ভলাণ্টারী স্কুলে সমবেত প্রার্থনা স্কুলের সীমানার মধ্যে হবে। সাহায্যপ্রাপ্ত বা *Special Agreement* স্কুলক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। স্কুলের বাইরে উপাসনার ব্যবস্থা হলে এই স্কুলের কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীর অভিভাবককে ১৫ দিন আগে লিখিত ভাবে জানাবেন।

এই আইনে শিক্ষকদের কয়েকটি সুবিধা দেওয়া হয়। শিক্ষকরা পূর্বে কাউন্টি ব

জেলা কাউন্সিলের সভ্য হতে পারত না এই আইনে সে বাধা দূর হয়। শিশু শিক্ষা, সাধারণ পাঠাগারও পিছিয়ে রয়েছে এমন শিশুদের উন্নতির জন্য যে-কোন সমিতির সদস্য হবার অধিকার শিক্ষকরা লাভ করেন।

এই আইন কার্যকরী করতে যে অর্থের প্রয়োজন পার্লামেন্ট সে অর্থ লাগাবে বলে স্থির হয়।

॥ ৫ ॥ ১৯৪৮-এর শিক্ষা আইন :—

বাটলার আইনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য এই আইন করা হয়। এই আইনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞার ব্যাখ্যা হয়—*Primary education is that which is suited to the requirements of Junior pupils who have not attained the age of ten and half years or of pupil over that age whom it is expedient to educate to the Junior school.* প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের সীমাক্ষেত্র বিশেষ কমানো চলবে এ সিদ্ধান্তের সাথে সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সংজ্ঞার পরিবর্তন প্রয়োজন হ'ল। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হ'ল *which is suited to pupils who have attained the age of ten years and six months whom it is expedient educate together with older children.*

এই অবস্থার ফলে অত্যন্ত মেধাবী ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ ছেলেদের ছয় মাস আগের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়।

এই আইনে আবাসিক বিদ্যালয় ও বিশেষ চুক্তিবদ্ধ স্কুলের ছাত্রদের পোষাকের দায়িত্ব *L. E. A*-কে দেওয়া হয়।

আইনে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হয়। কোন অভিভাবক তার ছেলেকে স্কুলে না পাঠালে *L. E. A.* তাকে আইনের সাহায্যে স্কুলে ছেলে পাঠাতে বাধ্য করে।

L. E. A.-কে নতুন স্কুলের জন্য জমি কেনার অধিকার দেওয়া হয়।

বহু শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স কমানোর বিষয়টির সমালোচনা করেছেন। এত অল্প বয়সে শিশুর আগ্রহ, রুচি ও ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। স্কটল্যাণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স এখন ১২ বছর নির্ধারিত রয়েছে।

॥ শিক্ষা প্রশাসন ॥

কেন্দ্রীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ :—

উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণহীন ও সাহায্যমুক্ত ছিল। চার্চের চেষ্টায় সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং

ধর্মযাজক সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করত। চার্চের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত কিছু প্রাইভেট স্কুল ছিল কিন্তু সেখানেও চার্চ কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে শিক্ষা দিতে হ'ত। সরকারী নিয়ন্ত্রণ শুরুর পূর্বে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৩ খ্রীঃ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী বাজেটে ২০ হাজার পাউণ্ড বরাদ্দ হয়। প্রথম অবস্থায় কোনরূপ শর্ত আরোপ না করে *National Society* ও *British and Foreign Society* নামক দু'টি প্রতিষ্ঠানের হাতে এই অর্থ দেওয়া হ'ত। এই টাকা কি ভাবে ব্যয় হচ্ছে তা দেখাশুনার জন্য ১৮৩৯ ও ১৮৫১ খ্রীঃ যথাক্রমে *Select Committee* ও *Science and Art Dept.* গঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার কাজ কি ভাবে হচ্ছে *Select Committee* তাই দেখত। কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারের কাজ দেখাশুনা করত *Science and Art Dept.* বিভিন্ন লোকের দানে ইংল্যাণ্ডে এক শ্রেণীর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই স্কুলগুলির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য *Charity Commision* নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। কিন্তু, সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার দেখাশুনার জন্য কোন একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় ও একাধিক বিভাগ দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ফলে নানারূপ অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

১৮৩৩ খ্রীঃ থেকে সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু হলেও উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কতটা বিস্তৃত হবে সে সম্পর্কে সরকারই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ইংলণ্ডের জনসাধারণও শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে সরকারী শাসন যন্ত্রের আওতায় নিয়ে আসার পক্ষপাতী ছিল না। তাই ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে দেখা গেল একাধিক সরকারী বিভাগ শিক্ষানিয়ন্ত্রণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তাতে শিক্ষা প্রসার বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় সাধনের জন্য ১৮৯৯ খ্রীঃ এক আইনের বলে *Board of Education* নামে শিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। এর আগে যে সব সরকারী প্রতিষ্ঠান শিক্ষার বিভিন্ন দিকের দেখাশুনা করছিল "শিক্ষাবোর্ড"কে সেই সব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইন পাস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ওয়েলসের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ এই "শিক্ষাবোর্ড" করত।

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনের ফলে ইংলণ্ডের শিক্ষা পুরোপুরিভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। এই আইনে 'শিক্ষাবোর্ড' বাতিল করে শিক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হয়। একজন কেবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়। বর্তমান আইনে শিক্ষা মন্ত্রীই শিক্ষানীতি গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সর্বময় কর্তা। শিক্ষা মন্ত্রীর হাতে প্রচুর ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হলেও তিনি যাতে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে ওঠেন সে ব্যবস্থাও আইনে রাখা হয়েছে। আইনে শিক্ষামন্ত্রীকে

সাহায্যের জন্য উপদেষ্টামণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর শিক্ষামন্ত্রীকে তার দপ্তরের কার্য বিবরণী পার্লামেণ্টে পেশ করতে হয়। শিক্ষাবিভাগের ত্রুটি বিচ্যুতির আলোচনার পূর্ণ সুযোগ পার্লামেণ্টের সদস্যগণ গ্রহণ করেন। এছাড়া ১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হলেও স্থানীয় শিক্ষা পরিচালনায় স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রী উপদেষ্টা মণ্ডলী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা পরিদর্শকদের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করেন। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলেস্‌য়ের দু'টি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা ১৯৪৪ খ্রীঃ আইনে ছিল। পরে কাজের সুবিধার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষক জোগানোর জন্য দুটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক ও সভ্যদের নিয়োগ করেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ও নীতি নির্ধারণে শিক্ষামন্ত্রীকে সাহায্য করাই উপদেষ্টামণ্ডলীর কাজ।

শিক্ষা পরিদর্শকরা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। শিক্ষা পরিদর্শকদের মাধ্যমেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষার নানা খবর সংগ্রহ করে। সরকারী শিক্ষানীতি ঠিকভাবে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ মেনে চলছে কি না তাও জানবার মাধ্যম শিক্ষা পরিদর্শকরা। শিক্ষাপরিদর্শকদের যদিও রাজা বা রাণী নিয়োগ করেন কিন্তু তারা তাদের কাজের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর নিকট দায়ী। তাদের কার্য বিবরণী শিক্ষণ মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করতে হয়। শিক্ষা পরিদর্শকরা বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করে পরিচালকমণ্ডলীর সাথে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিদ্যালয়ের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করে কি ক'রে বিদ্যালয়ের উন্নতি হতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দেন। রুটিন মাফিক পরিদর্শন ছাড়াও পরিদর্শকরা জন প্রতিনিধিদের দ্বারা স্কুল পরিদর্শন করাতে পারেন। এই পরিদর্শন ব্যবস্থায় পরিদর্শকরা জন প্রতিনিধিমণ্ডলীর সভাপতি রূপে কাজ করেন। এই জাতীয় পরিদর্শনের বিবরণ শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়, কোন স্থলে কোন প্রসংশনীয় বৈশিষ্ট্য থাকলে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোচরে আনা হয় ও যাতে অন্য বিদ্যালয়ে সেই বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে তার জন্য উৎসাহিত করা হয়। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা শিক্ষা পরিদর্শকদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

॥ স্থানীয় প্রশাসন ॥

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (Local Educational Authorities):—

উনবিংশ শতকের শেষভাগে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার সরকারী নিয়ন্ত্রণ একাধিক বিভাগের হাতে ন্যস্ত হওয়ার ফলে সমগ্র শিক্ষা

ব্যবস্থা পরস্পর সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে ও পরিচালনার ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সরকারী সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার অভাবের ফলে ও কর্মপ্রচেষ্টায় ঐক্য না থাকায় নিরর্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সময়, অর্থের অপচয় হ'ত। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দূর করে পরিচালনায় সমন্বয় সাধনের জন্য ১৯০২ খ্রীঃ একটি শিক্ষা আইন পাশ হয়! এই আইন ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ব্যালফুর পরিকল্পিত বলে 'ব্যালফুর আইন' নামে পরিচিত।

এই আইনের ফলে শিক্ষা পরিচালনার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে যে সব সংস্থা গঠিত হয়েছিল তা ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। এই সব সংস্থার স্থলে এক একটি পৌর এলাকা ধরে ১২০টি নতুন সংস্থা গঠিত হ'ল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির নাম হ'ল কাউন্টি (*county*) ও কাউন্টি বরোর (*county borough*) শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিজ নিজ এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয়প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হ'ল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির নাম হ'ল পার্ট টু কর্তৃপক্ষ (*Part II authorities*)।

যে সব বরোর লোকসংখ্যা দশ হাজারের উপরে ও যে সব শহর অঞ্চলের (*urban district*) লোকসংখ্যা কুড়ি হাজারের উপরে এমন ১৮০টি স্থানের শুধু মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হ'ল পার্ট থ্রি কর্তৃপক্ষের (*Part III authorities*) উপর।

উভয় প্রকার কর্তৃপক্ষের (*Part II and part III*) নাম দেওয়া হল *Local Education Authorities* সংক্ষেপে *L. E. A.*

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইন পাশ হবার পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডের স্থানীয় শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব *Part II* ও *Part III* কর্তৃপক্ষের উপরই ন্যস্ত ছিল। ১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইন যুদ্ধ পূর্ব শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংশোধন করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি এই আইনের ফলে সংশোধিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়। পরস্পর সংযোগহীন বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা একটি মাত্র সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও যুক্তি সঙ্গত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই শিক্ষা আইনের ফলে যে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয় স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তার মধ্যে অন্যতম।

১৯৪৪ খ্রীঃ এর শিক্ষা আইনে কেবল এক প্রকারের স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি হ'ল। এই আইনে স্থির হল *L. E. A.* প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অন্যান্য সকল প্রকার শিক্ষার পরিচালনা করবে। ১৯০২ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে সৃষ্ট *Part III authorities* এই নতুন আইনে লুপ্ত হ'ল। অবশ্য *Divisional Executives* নাম দিয়ে কোথাও কোথাও কয়েকটি শিক্ষা সংস্থাকে *L. E. A.*-এর পরিবর্তে নিযুক্ত করার ব্যবস্থাও এই আইনে আছে এবং সংস্থাগুলিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার শিক্ষা পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে এই সংস্থাগুলিকে **L. E. A.**-এর মত শিক্ষার জন্য ঋণ করবার বা শিক্ষাকর আদায় করবার অধিকার দেওয়া হয় নি।

*L. E. A.*গুলির আইনগত কর্তব্য হ'ল নিজ নিজ এলাকার সর্বপ্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজন হলে একাধিক এলাকার কাউন্টি ও কাউন্টি বরো সংসদকে যুক্ত করে সেই সকল এলাকার ব্যবস্থার জন্য একটি যুক্ত শিক্ষা বোর্ড গঠন করবার ক্ষমতা শিক্ষামন্ত্রীর আছে।

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপরই সর্বাধিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন অনুসারে ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালনায়। প্রতিটি *L. E. A.* নিজ নিজ এলাকার সকলের নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও বৌদ্ধিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থাও *L. E. A.* কে করতে হবে। প্রতিটি *L. E. A.* নিজ এলাকার প্রয়োজন মেটাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে। কোন এলাকার লোকের উপযোগী প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় না থাকলে ও স্কুলের প্রয়োজনীয় সাজ সজ্জা, শিক্ষা-উপকরণ ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে সেই এলাকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত হবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ছাড়াও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা *L. E A.* কে করতে হয়। আইনে নির্দেশ ছিল প্রত্যেক এলাকার চাহিদা মেটাবার জন্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে *L. E. A.* সমূহ এক বছরের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীকে জানাবে ও শিক্ষামন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অনুমতি দেবেন। *L. E. A* রচিত পরিকল্পনায় প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ পরিষ্কার করে উল্লেখ করতে হবে ও ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের কাজ কি করে চলবে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদনের পর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ অগ্রসর হবে। পূর্বে *L E. A.* নিজ অভিরুচি ও আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করত। এর ফলে সর্বত্র শিক্ষার মান ও প্রকৃতি এক রূপ হ'ত না। নতুন আইন পাশ হবার পর *L. E. A.* গুলির কর্তব্য বিধিবদ্ধ হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূর হ'ল ও *L. E. A.* গুলির কর্তব্য পালনে বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হ'ল।

L. E. A. গুলি বাধ্যতামূলক শিক্ষা বয়স যারা পার হয়ে গিয়েছে তাদের ও পূর্ণ বয়স্কের শিক্ষার জন্য সর্বক্ষণ (*full time*) ও আংশিক সময়ের (*Part time*) শিক্ষা ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকবে। পূর্ণ বয়স্কের কাজের অবসর সময়ও তাদের শিক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে *L. E. A.* বাধ্য। এই প্রথম পূর্ণ বয়স্কের শিক্ষার জন্য সঠিক ব্যবস্থা হ'ল। *L. E. A.* পরিচালিত বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কোন বেতন দিতে হয় না। বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক। এছাড়া *L. E. A.* পরিচালিত স্কুল-সমূহে আরও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা *L. E. A.* করে। ছাত্রদের দুধ ও আহারের ব্যবস্থা, প্রয়োজন বোধ করলে কোন ছাত্রের জন্য পোষাকের ব্যবস্থা *L. E. A.* করবে। এছাড়া অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা সামাজিক ও শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থার দায়িত্বও *L. E. A.*

কে দেওয়া হয়েছে। *L. E. A.* যদি প্রয়োজন মনে করে বৃত্তি দিয়ে বা অন্যভাবে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য দিতে পারে।

১৯৪৪ খ্রীঃ শিক্ষা আইনে যেমন কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে দৃঢ় করা হয়েছে তেমনি স্থানীয় বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের হাতেও প্রচুর ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদি *L. E. A.*গুলি সরকারী শিক্ষানীতি অনুসরণ করে কাজ করে যায় তাহলে শিক্ষামন্ত্রণালয় *L. E. A.* এর কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। *L. E. A.* গুলির উপর স্থানীয় শিক্ষা পরিচালনা সম্পর্কে দায়িত্ব দেওয়া হলেও সমগ্র জাতির জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন শিক্ষামন্ত্রী। এর ফলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা সংহতি সাধিত হয়েছে। পরস্পর সংযোগহীন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা ঐক্য সাধিত হয়েছে ও সমগ্র দেশের শিক্ষামানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় পূর্বেকার বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে শিক্ষা পরিচালনার অনেক উন্নতি হয়েছে।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থা

আধুনিক প্রগতিশীল দেশসমূহের অন্যতম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (*U.S.A.*)। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে আমেরিকার স্থান সর্বাগ্রে। ধনে-বিজ্ঞানে অতি আধুনিক দেশ আমেরিকা। ইউরোপের চিন্তা ও আদর্শ এক সময় আমেরিকার ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন চিন্তা নতুন নেতৃত্বের জন্য ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী। আজকের দুনিয়া আমেরিকা বলতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকেই বোঝে।

ধন কুবেরের দেশ আমেরিকা। অতুল তার বৈভব, অফুরন্ত তার প্রাণশক্তি। সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু আধুনিক নয়, অভিনবও বটে। আধুনিক শিক্ষাদর্শ ও মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আমেরিকায় যত পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে এরকম আর কোথাও হয় নি। এই আধুনিক দেশের অতি আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিসমূহের সাথে ভারতের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির তুলনার ক্ষেত্র অতি সীমাবদ্ধ। তবু আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বুঝতে হলে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা জানা দরকার। ফ্রয়েবেল, মন্তেসরী, প্রোজেক্ট, ডালটন, প্রব্লেম, উইনেকটা, বাটাভিয়া প্রভৃতি পদ্ধতি নিয়ে এখানে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগের সাথে সাধারণ পরিচিতি শিক্ষানুরাগীর থাকা দরকার।

॥ শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ॥

ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে ঔপনিবেশিকরা এসে আমেরিকায় ১৩টি উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই মূল উপনিবেশগুলি নিয়েই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন হয়। ইউরোপের বহু দেশ থেকে উপনিবেশকারীরা এলেও তাদেরও মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল যার ফলে ১৩টি উপনিবেশ মিলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গোড়া পত্তনে বিরাট কোন বাধার সৃষ্টি হয় নি। স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবার পর জাতি গঠনের কাজে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৭৮৩ খ্রীঃ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয় ও প্যারিস চুক্তির ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। ১৩টি উপনিবেশ নিয়ে সার্বভৌম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। যুদ্ধ শেষ হবার ছয় বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কে কোন ধারা (*clause*) ছিল না। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানের দশম সংশোধনে বলা হয় যে সব ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের (কেন্দ্রীয় সরকারের) এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে তা রাজ্যের বা জনসাধারণের সংরক্ষিত ক্ষমতা বলে গণ্য করা হবে। যেহেতু 'শিক্ষা' যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার তালিকায় উল্লেখিত হয় নি তাই 'শিক্ষা' রাজ্যের একটি সংরক্ষিত ক্ষমতা। সংবিধান অনুসারে রাজ্যগুলিকে জনসাধারণের

প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার আয়োজন করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত রাজ্যের এই অধিকারকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে। বিচারপতি ব্রাণ্ডিস বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি সুবিধা হচ্ছে, কোন রাজ্য ইচ্ছা করলে সমগ্র দেশের ইচ্ছার বিরোধিতা না করেও অত্যন্ত সহজভাবে রাজ্যকে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষার পরীক্ষাগারে পরিণত করতে পারে। সংবিধান অনুসারে শিক্ষাকে রাজ্যের সংরক্ষিত ক্ষমতা বলে ধরা হলেও ১৮০৬ খ্রীঃ জেফারসন ও ১৮১৭ খ্রীঃ মেডিসন শিক্ষাকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার আওতায় আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যগুলির প্রবল প্রতিরোধে তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত না হওয়ায় সেখানে কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব বা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় নেই।

শিক্ষা কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার ফলে রাজ্যসমূহ নিজ নিজ রাজ্যের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও আমেরিকার সর্বত্রই শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ নীতি অনুসৃত হয়। প্রতিটি রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা যাতে ১৬ বছর পর্যন্ত (কোন কোন রাজ্যে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত) সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বা বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে, প্রতিটি রাজ্যেই তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতি গঠনের কাজে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজন সম্পর্কে দেশ প্রথম থেকেই সচেতন ছিল। রাজ্যগুলিও তাদের উপর ন্যস্ত এই দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করবার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানের উন্নতি ও দেশ শিল্পোন্নত হবার সাথে সাথে দেশের প্রয়োজন মেটাতে শিক্ষার রূপান্তরের প্রয়োজন দেখা দিল। সমগ্র দেশ ব্যাপী শিক্ষার সাধারণ নীতি যাতে এক হয় সেজন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। রাজ্যসমূহ কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণে রাজী হলেও শিক্ষায় হস্তক্ষেপ মেনে নিতে রাজী ছিল না। অর্থের ব্যাপারে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। এই পরিবর্তন এসেছে ধীরে ধীরে। শিক্ষার আদিযুগ থেকে কি করে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বর্তমান অবস্থায় এসেছে তার ধারাকে লক্ষ্য করলে ভারতের সাথে তুলনীয় একটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

ভারতে আমরা দেখি শিক্ষা রাজ্যের ক্ষমতার এক্তিয়ারভুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে শিক্ষা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ তালিকাভুক্ত হোক। কিন্তু রাজ্যের প্রবল প্রতিরোধে তা সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্য আপনার অধিকারকে ছাড়তে চাইছে না— আমেরিকাতেও নয়, এদেশেও নয়। এদিকে রাজ্যগুলিকে অর্থের জন্য কেন্দ্রের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। এই অর্থ সাহায্যের সুযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি রাজ্যগুলির উপর

চাপাবার ঝোঁক সর্বত্রই দেখা যায়। শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য গ্রহণ ও সেই সাথে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপকে প্রতিরোধ করা দুই দেশেরই সমস্যা।

উনবিংশ শতাব্দী আমেরিকার জাতি গঠন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। একটি কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশ বিগত শতকে শিল্প সমৃদ্ধ, বিজ্ঞানে উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়। উপনিবেশিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তিত অবস্থায় যুগের দাবি ও জাতির প্রয়োজন মেটাতে পারছিল না। রাজ্যগুলির পক্ষে সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে একটি শিল্পোন্নত জাতির শিক্ষার ক্রমবর্ধমান দাবি মেটান সম্ভব ছিল না। তাই ১৮৬০ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যগুলির সাহায্যে এগিয়ে আসুক এই দাবি নিয়ে এক আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু গৃহ যুদ্ধের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষে শিক্ষায় হস্তক্ষেপ সম্ভব হয় নি। গৃহ যুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করবার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয় সেই সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আপন প্রভাব বিস্তারে এগিয়ে আসে। ১৮৬২ খ্রীঃ *Morrial Act* পাস হয়। এই আইনের বলে একটি শিল্পোন্নত দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা ও উন্নত ধরনের কৃষির জন্য কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্র এগিয়ে আসে। এই আইনে এরূপ ব্যবস্থা করা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার কলেজ স্থাপনে জমি দিয়ে সাহায্য করবে। কলেজ স্থাপনে কেন্দ্রীয় সাহায্যের ফলে উন্নত ধরনের ইঞ্জিনীয়ারিং কৃষি ও কারিগরী ও শিক্ষার জন্য কলেজ (*Land Grant College*) স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

Morrial Act আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কারণ শিক্ষায় রাজ্যের একচেটিয়া অধিকারের ক্ষেত্রে এই আইনের বলে প্রথম কেন্দ্র নিজ অধিকার স্থাপনের সমর্থ হয়। ১৮৮৭ খ্রীঃ *Hatch Act* পাস হয়। এই আইনের বলে কেন্দ্র *Land Grant* কলেজসমূহে অর্থ সাহায্য করতে শুরু করে। এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য (*Money Grant*) দিতে শুরু করে। ১৯১৪ খ্রীঃ *Smith Lever* আইন পাস হয়। এই আইনে *Land Grant* কলেজ সমূহে প্রচুর আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। দেশে শিল্পের প্রসারের সাথে বৃত্তি শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক দাবি রাজ্য সরকার মেটাতে পারছিল না। উন্নত ধরনের বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন রাজ্যগুলির সেই আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য কেন্দ্র *Smith Huges Act* পাস করে। এই আইনে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়। দেশ রক্ষার জন্য সুশিক্ষিত সৈন্যদল সৃষ্টির জন্য ১৯২০ খ্রীঃ *National Defence Act* পাস হয়। সৈনিকদের শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজ স্থাপন করা হয়। সৈনিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও পোষাক-পরিচ্ছদ রাষ্ট্র থেকে বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থা হয়। স্কুলে ছাত্রদের আহারের ব্যবস্থা আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই ব্যাপারেও রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সাহায্যের

উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সহস্র সহস্র সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্কুল ও কলেজে তাদের শিক্ষার জন্য তিন মিলিয়ন ডলার সাহায্য করা হয়।

সংবিধান শিক্ষাকে রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহচর্য একটি বাস্তব প্রয়োজন রূপে দেখা দিয়েছিল। সেই প্রয়োজন মেটাতে গৃহযুদ্ধের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। শিক্ষার বহুদিক রয়েছে যেখানে কেন্দ্রীয় সাহায্য ব্যতীত কাজ চালান অসম্ভব। কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে রাজ্যসমূহের আপত্তি নেই। যে অর্থ সাহায্য করবে সেই নীতি নির্ধারণ করবে এই সাধারণ নিয়ম। রাজ্যগুলি অর্থ সাহায্য গ্রহণ করলেও কেন্দ্রের কর্তৃত্ব মানতে রাজী নয়। সংবিধানের নির্দেশে রাজ্য ও কেন্দ্র স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন। কিন্তু বর্তমানে ফেডারেল রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও কেন্দ্রের ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সরকারের ক্ষমতাও বেড়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতের অবস্থার সাথে আমেরিকার অবস্থা তুলনা করা হলে দুই রাষ্ট্রে শিক্ষায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করা যায়। ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব রয়েছে। যেমন, কেন্দ্রশাসিত শিক্ষা, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর জন্য শিক্ষা, বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার শিক্ষা। আমেরিকায় ঠিক এরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব দায়িত্ব রয়েছে, রেড ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। ভারতে শিক্ষা রাজ্যের বিষয় হলেও স্বাধীন ভারতে প্রথম থেকে শিক্ষার জন্য একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিকে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার উন্নতির জন্য সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষায় আংশিক কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সংশোধনের চেষ্টা সফল হয় নি। আমেরিকার মত রাজ্যসমূহ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব মানতে রাজা নয়। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। যেহেতু কেন্দ্র অর্থসাহায্য করছে তাই তার নীতিকে রাজ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া কষ্টসাধ্য নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় কেন্দ্রের সাহায্য শর্ত সাপেক্ষ। কতকগুলি শর্ত মেনে নিলেই হয়ত কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সাহায্য দেওয়া হবে বলে রাজ্যগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় অর্থের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে সে সব শর্ত মেনে নিতে হয়।

সমগ্র ভারতে যাতে মোটামুটি একই রকম শিক্ষানীতি অনুসৃত হয় এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ সচেতন। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে মাধ্যমিক ও কলেজী শিক্ষা কাঠামোতে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে তা কেন্দ্র স্থিরীকৃত নীতি অনুসরণের জন্য হয়েছে। কোঠারী কমিশনের সিদ্ধান্তে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেখানেও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব রাজ্যসমূহ মেনে নিয়েছে। তাই ভারতে শিক্ষা রাজ্যের বিষয় হলেও কেন্দ্রীয় প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের পর থেকে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু ভারতে যেরূপ কেন্দ্রে একজন শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন ও আমাদের কেন্দ্রে যেরূপ শিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে আমেরিকায় তা নেই। আজও সেখানে রাজ্যের শিক্ষানীতি নির্ধারণে বা শিক্ষাদপ্তর পরিচালনার বিষয়ে বিশেষ কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। ১৮৬৭ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার জন্য পৃথক কোন সচিব নেই। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন বিভাগের একটি অংশ।

॥ কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের কাজ ॥

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর শিক্ষা পরিচালনায় রাজ্যের কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ না করলেও বর্তমানে শিক্ষা প্রসারের জন্য যেসব পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে বা সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে কেন্দ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা ও যাতে দেশের সর্বত্র জনসাধারণের উন্নতি বিধায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় সেজন্য উন্নত ধরনের বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থা ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার প্রচার করতে সাহায্য করা।

একক ভাবে রাজ্যের পক্ষে যেসব শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ করা সম্ভব নয় সেই সব কাজ, গবেষণামূলক কাজ, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার প্রসার ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় সরকার যে সব প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করে তার সুষ্ঠ বণ্টন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর করে থাকে। রেড ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার ব্যবস্থাও কেন্দ্রের কাজ।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর প্রধানতঃ তথ্য সংগ্রহ করা, ব্যাখ্যা করা, বিভিন্ন রাজ্যে যাতে শিক্ষার প্রসার হয় সেজন্য সমীক্ষা করা, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ, শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মেলনের আয়োজন প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের হাতে আরও কতকগুলি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বর্তমানে শিক্ষাদপ্তর বিভিন্ন রাজ্যের সহযোগিতায় একটি বৃত্তি-মূলক শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করার ও তাকে কার্যকরী করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে ছোট ছোট ছেলেদের উন্নত ধরনের শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সাহায্য পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব কেন্দ্র নিয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, গণিত ও বিদেশী ভাষা শিক্ষা বিস্তারের জন্য ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য শিক্ষা বিভাগসমূহের সহযোগিতায়

নানারূপ শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা চালানোর জন্য বিরাট একটি পরিকল্পনার দায়িত্ব এই দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর ছাড়াও কেন্দ্রের অন্যান্য দপ্তর নানা বিষয়ে বিশেষীকৃত শিক্ষা (*Specialised Education*) সংক্রান্ত পরিকল্পনা রূপায়িত করে থাকে। যেমন, কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ও ছাত্রদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জাতীয় পরিকল্পনা, অর্থ বিভাগের অধীনে গৃহীত বিদ্যালয়ে সঞ্চয় পরিকল্পনা, অভ্যন্তরীণ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত রেড ইণ্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে রেড ইণ্ডিয়ান শিক্ষা পরিকল্পনা, বিচার বিভাগের অধীনে গৃহীত দেশীয়কৃত নাগরিকগণের শিক্ষা পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন বিভাগের বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন পরিকল্পনা, স্বরাষ্ট্র বিভাগের আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিনিময় পরিকল্পনা ও সহযোগিতামূলক কারিগরী শিক্ষা পরিকল্পনা, সামরিক বিভাগ ও বিমান বিভাগের লোকদের ও প্রবাসী সামরিক কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

॥ রাজ্য শিক্ষাব্যবস্থা ও স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চল ॥

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা বিষয়ে রাজ্যগুলি সর্বেসর্বা। জনসাধারণের প্রতিনিধি-রূপে রাজ্য বিধানসভা শিক্ষাবিষয়ে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। কেবলমাত্র রাজ্য সংবিধান দ্বারা এই ক্ষমতা সীমিত। রাজ্য বিধানসভা প্রত্যক্ষ এই ক্ষমতার ব্যবহার করে না। বিদ্যালয় পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন প্রভৃতি দায়িত্ব রাজ্য শিক্ষা পরিষদ (*State Board of Education*) ও স্থানীয় শিক্ষা পরিষদের (*Local Board of Education*) উপর অর্পিত হয়েছে। যদিও রাজ্য ও স্থানীয় বোর্ডের হাতে শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব রাজ্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যে নিজ নিজ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠায় স্বাভাবিক রাজ্যগুলির শিক্ষা কাঠামো ও শিক্ষানীতির মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবুও শিক্ষা ব্যবস্থায় আশ্চর্য রকম মিল রয়েছে। যেমন, রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের কাজের সুবিধার জন্য শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতি রাজ্যে কয়েকটি করে বোর্ড রয়েছে। বোর্ডগুলি নীতি নির্ধারক সংস্থা। প্রতি রাজ্যের শিক্ষাবোর্ড সেই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আইন কানুন রচনা করে। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন করে প্রধান বিদ্যালয় কর্মাধ্যক্ষ রয়েছেন (*Chief State School Officer, formerly called State Superintendent of Public Institution*)। রাজ্য শিক্ষাদপ্তর রাজ্যের জন্য পরিকল্পনা রচনা ও কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এই শিক্ষা পরিকল্পনা রচনায় শিক্ষাদপ্তর শিক্ষার প্রতিটি স্তর থেকে সুপারিশ আহ্বান করে। রাজ্যের বিদ্যালয়সমূহের পঠন-পাঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ও সুপারিশসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করে রাজ্য শিক্ষা-দপ্তর রাজ্যের শিক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

শিক্ষাবোর্ডের গঠন ও সভ্য সংখ্যা সব রাজ্যে ঠিক একই রকম নয়। বোর্ডের

সভ্য সংখ্যা ৩ থেকে ১৯ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে অধিকাংশ রাজ্যে বোর্ডের সভ্য সংখ্যা ৭ জনের মধ্যে সীমিত। বোর্ডের গঠন রীতিও সর্বত্র একই রকম নয়। কোন রাজ্যের বোর্ডের সভ্যগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। কোথায়ও রাজ্যের গভর্নর তাঁদের নিয়োগ করেন। কোথায়ও কেবল মাত্র সরকারী কর্মচারিগণ পদাধিকার বলে (*ex-officio*) বোর্ডের সভ্য হন এবং তাঁদের নিয়েই বোর্ড গঠিত হয়।

প্রতি রাজ্যেই একাধিক বোর্ড রয়েছে। যেমন বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বৃত্তি শিক্ষা বোর্ড। এর কাজ হচ্ছে রাজ্যের বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনায় রূপদান করা। বৃত্তিমূলক শিক্ষা রূপায়ণে রাজ্যগুলি কেন্দ্র থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে। এছাড়া রয়েছে মূক বধির শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষা বোর্ড ইত্যাদি।

রাজ্য শিক্ষা বোর্ডের পরিচালনার দায়িত্ব প্রধান কর্মাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত। প্রধান কর্মাধ্যক্ষের নিয়োগ পদ্ধতি সব রাজ্যে একই রকম নয়। কোন রাজ্যে তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। কোথায়ও রাজ্য সরকার তাকে নিয়োগ করে। আবার কোথাও শিক্ষা বোর্ডই তাকে নিয়োগ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে রাজ্য শিক্ষাবোর্ড নীতি নির্ধারক সংস্থা। নীতি নির্ধারণ ছাড়াও বিদ্যালয় পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব বোর্ডের উপর ন্যস্ত। রাজ্য বিধান সভা শিক্ষা সম্পর্কে যে সব আইন পাস করে তাকে রূপ দেবার দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ডের। বোর্ড স্কুল পরিচালনার নিয়মকানুন প্রণয়ন করে, রাজ্যের শিক্ষা বাজেট রচনা করে ও বোর্ডের কর্মী নিয়োগ করে। বোর্ডের নির্দেশ মত কাজ হচ্ছে কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখে, শিক্ষার নিম্নতম মান রক্ষিত হচ্ছে কি না সেদিকেও দৃষ্টি রাখে। রাজ্যস্তরে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব রাজ্য শিক্ষা বোর্ড, বিদ্যালয়সমূহের কর্মাধ্যক্ষ ও শিক্ষা-দপ্তরের। তিনটি সংস্থা রাজ্যের শিক্ষার জন্য যুক্তভাবে কাজ করে।

॥ স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ॥

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠন। ঔপনিবেশিকরা যখন প্রথম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে তখন স্থানীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর বাইরের নিয়ন্ত্রণ খুব একটা ছিল না। সেই পূর্বের রীতি অনুসরণ করে এখনও স্থানীয় শিক্ষা কর্মীরাই প্রধানতঃ শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছে। জনসাধারণের সাথে ও সমাজের সাথে শিক্ষার এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

যদিও শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য তবুও প্রতি রাজ্যের বিধানমণ্ডলী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য স্থানীয় পরিচালন অঞ্চল গড়ে তুলেছে। এক একটি বিদ্যালয় অঞ্চল সৃষ্টিতে সেই অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছারই প্রকাশ পায়। প্রতি রাজ্যে বিদ্যালয় অঞ্চলের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাই নেই। কোন রাজ্যে ১৭টি অঞ্চল, কোন রাজ্যে ৩০০ থেকে ৪০০০ বিদ্যালয় অঞ্চল আছে। তবে আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রে মোটামুটি ৪৮,০০০ হাজার বিদ্যালয় অঞ্চল আছে। আয়তনের দিক থেকে বিদ্যালয় অঞ্চলের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আয়তন ছাত্র সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। কোন কোন অঞ্চল কতকগুলি বড় বড় স্কুল নিয়ে গঠিত। আবার কোন কোন অঞ্চল এক শিক্ষক পরিচালিত স্কুল নিয়ে গঠিত। স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলগুলি ডিষ্ট্রিক্ট, টাউন, টাউন সিপ, সিটি ও কাউন্টি প্রভৃতি মণ্ডলে বিভক্ত।

ডিষ্ট্রিক্ট (জেলা নয়) আমাদের দেশের গ্রামের সাথে তুলনীয়। আমেরিকার স্থানীয় আঞ্চলিক ব্যবস্থায় এই হচ্ছে সবচেয়ে পুরানো ও ক্ষুদ্রতম অঞ্চল। বর্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট প্রথা তুলে দিয়ে বৃহত্তর অঞ্চল গঠন করা হচ্ছে।

এর পরেই টাউন। এগুলি অঞ্চল হিসাবে ডিষ্ট্রিক্ট থেকে বড়। ডিষ্ট্রিক্ট অঞ্চল তুলে দিয়ে টাউন অঞ্চল গঠন করা হচ্ছে। টাউন থেকে বড় হচ্ছে টাউন সিপ। গ্রাম ও শহরের স্কুল নিয়ে টাউন সিপ অঞ্চল গঠিত হয়।

অঞ্চলের মধ্যে কাউন্টি ও সিটি হচ্ছে জাতে কুলীন। এগুলিই হচ্ছে ইউনিট হিসাবে সব চেয়ে বড়। এদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কাউন্টি অঞ্চল শুধু গ্রামের ও সিটি অঞ্চল শুধু শহরের স্কুল নিয়ে গঠিত।

স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চল পরিচালনার জন্য যেভাবে ইউনিটগুলি গঠিত হয়েছে তা খুব সুপরিকল্পিত বলা যায় না। প্রথম যুগে যখন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি তখন বিচ্ছিন্ন সামাজিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে সব স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালক-মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তার পিছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না। সেই কাঠামোটিকে বজায় রেখে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা প্রচেষ্টা করায় কখনও কখনও জটিলতার সৃষ্টি হয়।

রাজ্যের ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার জন্য যেমন শিক্ষাবোর্ড রয়েছে তেমনি স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলের কার্য পরিচালনার জন্য স্থানীয় বোর্ড রয়েছে। স্থানীয় শিক্ষাবোর্ডের সভ্য সংখ্যা প্রায়ই ৩ থেকে ৭ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজ্য শিক্ষাবোর্ডের মত অধিকাংশ রাজ্যে স্থানীয় শিক্ষাবোর্ডের সদস্যগণ স্থানীয় অধিবাসী দ্বারা নির্বাচিত হন। কোন কোন রাজ্যে স্থানীয় শিক্ষাবোর্ডের সভ্য সরকার নিয়োগ করে। সদস্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকেন। খুব ছোট ছোট অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে স্কুল বোর্ড একজন করে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করে যিনি বোর্ডের কার্যকরী কর্মাধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। স্থানীয় শিক্ষাবোর্ডসমূহ স্কুলবোর্ড, স্কুল কমিটি, টাউনসিপ বোর্ড, আর এডুকেশন, কাউন্টি বোর্ড আর এডুকেশন প্রভৃতি নামে পরিচিত।

স্থানীয় শিক্ষাবোর্ড নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার পরিচালনা করে। অর্থের ব্যাপারে বোর্ড জনসাধারণের দান, স্থানীয় তহবিল ও রাজ্য সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। বোর্ডের কাজ হচ্ছে রাজ্যের আইন ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নিয়ম-কানুন অনুসারে বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মাবলী তৈরী করা। শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ বোর্ড করে থাকে, পদ্ধতি রূপায়ণের দায়িত্ব স্কুল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের। বিদ্যালয়ের

বাজেট তৈরী ও শিক্ষা পদ্ধতি রূপায়ণের খরচ বাবদ স্থানীয় করের পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্ব যৌথভাবে স্থানীয় স্কুল বোর্ড ও সুপারিন্টেণ্ডেন্টের। শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও রক্ষা করা, বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা, দূরবর্তী স্থানে বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্রদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সব কিছুই যৌথ দায়িত্বে করা হয়। স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনা আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে গঠিত। এদের ক্ষমতা একমাত্র রাজ্যের আইন ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নিয়মাবলী দ্বারাই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ রাজ্যেই শিক্ষার একটা নিম্নতম মান ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অঞ্চলকে সেই মান রক্ষা করতে হয়।

স্থানীয় অঞ্চল ছাড়াও ৩৪টি মধ্যবর্তী বিদ্যালয় পরিচালন মণ্ডল আছে। মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলির কাজ হচ্ছে স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চল ও শিক্ষা দপ্তরের সাথে কাজের সমন্বয় সাধন করা। এমন কতকগুলি ছোট ছোট অঞ্চল আছে যারা নিজ নিজ কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগে অসমর্থ। এই সব অঞ্চলগুলির জন্য ২৭টি রাজ্যে একজন করে কাউন্টি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আছেন যিনি ছোট ছোট অঞ্চলগুলির সাথে কাজ করেন। মধ্যবর্তী সংস্থায় কয়েকজন করে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক আছেন যাদের কাজ হচ্ছে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজে সাহায্য করা। বর্তমানে এই বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

॥ শিক্ষার ব্যয় ॥

ঔপনিবেশিক যুগে শিক্ষা ছিল বেসরকারী ব্যাপার। অতি সামান্য সংখ্যক শিশুই শিক্ষালাভে সমর্থ হ'ত। বিদ্যালয়গুলি ছিল বেসরকারী। ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিছু স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি বিদ্যালয় এমন কি কলেজগুলিকেও সরকার স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান বলে মনে করত। কখন কখন সামান্য অর্থ বা জমি দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হ'ত। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের দেখা শুনা করার কোন দায়-দায়িত্ব সরকারের আছে বলে মনে করা হ'ত না। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর রাজ্য শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও শিক্ষা ছিল বহুদিন পর্যন্ত প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেই যুগে শিক্ষার ব্যয় বহন হ'ত ছাত্রদের দেওয়া বেতন হতে। শিক্ষার খরচ বেড়ে যাওয়ায় আয়ের নতুন পথের সন্ধান শুরু হ'ল। শিক্ষার জন্য সম্পত্তি দান, লটারি, ব্যবসার উপর কর, ব্যাঙ্কের উপর কর ধার্য করে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হল। ১৮০৩ খ্রীঃ ওহিয়ো রাজ্যকে প্রথম কেন্দ্রীয় সাহায্যরূপে জমি দেওয়া হ'ল। শিক্ষা ব্যয় আরও বেড়ে গেলে স্থির হয় রাজ্য ব্যাপী শিক্ষা কর ধার্য করা প্রয়োজন। দেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য দেশের সম্পদের উপর কর ধার্য করা উচিত বলে হোরস ম্যান ও হেনরী বার্নার্ড প্রমুখ ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করেন।

বর্তমানে প্রত্যেক রাজ্যে স্থানীয় শিক্ষাবোর্ড করের মাধ্যমে আয়ের উপর ভিত্তি

করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তুলেছে। প্রত্যেক রাজ্যে অন্ততঃ একটি করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যার ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে কর সংগৃহীত অর্থে।

বিদ্যালয়ের ব্যয় সাধারণতঃ তিনটি ক্ষেত্র থেকে পাওয়া অর্থে নির্বাহ করা হয়। এই তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন সংস্থার দেয় অর্থ। ১৯৫৮-৫৯ খ্রীঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তিনটি ক্ষেত্র থেকে নিম্নহারে সাহায্য পাওয়া গিয়েছে—কেন্দ্রীয় সরকার ৪%, রাজ্য সরকার ৪০%, স্থানীয় তহবিল ৫৬%। ১৯৪০ খ্রীঃ থেকে রাজ্য সরকারের তহবিল হতে শিক্ষার জন্য ক্রমেই বেশী ব্যয় করা হচ্ছে, আর সেই পরিমাণে ব্যয় কমে আসছে স্থানীয় তহবিল হতে ব্যয়ের পরিমাণ। ১৯৫৮-৫৯ খ্রীঃ সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় হয়েছে ২২ বিলিয়ন ডলার।

শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি র‍্যাজ্যের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বাধীন হলেও শিক্ষার প্রতি জাতীয় সরকার উদাসীন নয়। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্যকেই জমি বা আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। জমি সাহায্যের ভিত্তিতে কলেজ (*Land and College*) কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৃত্তি শিক্ষা, বৃত্তি মূলক পুনর্বাসন, বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে সাহায্য দান, কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শিক্ষা পরিবর্তন ও সামরিক বিভাগের লোকদের শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রচুর ব্যয় করা হয়।

প্রতিটি রাজ্য সরকারী বিদ্যালয় সাহায্যের জন্য নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রাজ্য তহবিল থেকে স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চলসমূহের আর্থিক অবস্থার তারতম্য বিচার না করে সাধারণভাবে একই রকম সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়া আর্থিক অবস্থার অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্য সমতা বিধান সাহায্যের ব্যবস্থাও আছে।

বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন নিয়মিত সরকারী সাহায্য পরিকল্পনা নেই। কোন কোন রাজ্যে সরকার থেকে বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। কোথায়ও পাঠ্যপুস্তক দিয়ে সাহায্য করা হয়। আবার কোথায়ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষার জন্য সরকার যে অর্থ সাহায্য করে তা আয়কর, বিক্রয় কর, লাইসেন্স, তামাক, মাদক দ্রব্য, ইত্যাদির উপর ধার্য কর থেকে যে আয় হয় তা থেকে বহন করা হয়।

সরকারী বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার জন্য যে স্থানীয় তহবিল রয়েছে তার আয়ের উৎস হচ্ছে আবাসিক গৃহ, কারনিকভবন, কারখানা প্রভৃতির উপর ধার্য কর। কোন রাজ্যে অন্যান্য দ্রব্যের উপর কর ধার্য করার অধিকার স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, সজ্জিত করা ও রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় বিদ্যালয়

পরিচালন সংস্থার উপর ন্যস্ত। খুব কম সংখ্যক বিদ্যালয় পরিচালন অঞ্চলের বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের সামর্থ্য আছে। এইজন্য অধিকাংশ অঞ্চলকেই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিয়ে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করতে হয়।

॥ শিক্ষার কাঠামো ॥

যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হল প্রতিটি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, বুদ্ধি সংক্রান্ত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক কর্ম ক্ষমতা, নৈতিক দায়িত্ব ও সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ সাধনে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে শিক্ষার সাংগঠনিক রূপটি স্থির হয়েছে। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত—প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, একে সাধারণতঃ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষা বলা হয়; এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাদারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা যাকে উচ্চতর শিক্ষা বলা হয়।

কলেজীয় শিক্ষা স্তরের নিম্নে যে শিক্ষা তার কাঠামো সব রাজ্যে ঠিক একই রূপ নয়। তবে, মোটামুটি কাঠামোর কোন একটিকে রাজ্যগুলি গ্রহণ করেছে। একটি ব্যবস্থায় রয়েছে ৮-৪ বছরের পরিকল্পনা। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা ৮ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৪ বছর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। আর একটি ব্যবস্থাকে বলা হয় ৬-৩-৩ বছরের পরিকল্পনা। অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষা লাভের পর ৬ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ বছর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩ বছর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। তৃতীয় ব্যবস্থাটি হচ্ছে ৬-৬ বছরের পরিকল্পনা। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৬ বছর অতিবাহিত করে ৬ বছর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। ১৭ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাও মাধ্যমিক শিক্ষার একটি অঙ্গ। এই শিক্ষাকাঠামোর মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাধারণতঃ বহুমুখী সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে মানবিক বিষয়সমূহ বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বৃত্তি-মূলক প্রভৃতি সব বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া বড় বড় সহরে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বৃত্তিমূলক বিষয়ের সাথে কলেজেপ্রবেশের জন্য যেসব সাধারণ বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তাও গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে এসব বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা করলে পরবর্তীকালে সাধারণ কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ভারতের বহুমুখী বিদ্যালয়ে রুচি ও শক্তি অনুযায়ী যে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার পিছনে আমেরিকার বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব রয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ছেলেমেয়েরা ইচ্ছা করলে নিম্নস্নাতক কলেজ, কারিগরী প্রতিষ্ঠান, চতুর্থ বার্ষিক কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, আর নয়ত বৃত্তিমূলক

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। নিম্নস্নাতক কলেজের পাঠ্যক্রম সূচী আর চার বছরের কলেজীয় শিক্ষার প্রথম ক'বছরের পাঠ্যক্রম এক।

কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্নস্তরে তাদের পাঠ্যক্রম শুরু করে। কোন কোন রাজ্যে মেডিকেল ছাত্রকে মেডিকেল স্কুলের চার বছরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন বছরের প্রাক্ মেডিকেল পরীক্ষা পাস করতে হবে।

নার্শারী বিদ্যালয়ে তিন থেকে চার বছরের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। অবশ্য রাজ্যভেদে বয়সের ক্ষেত্রে কিছু তারতম্য হয়ে থাকে। কিণ্ডারগার্টেনকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অংশ রূপেই ধরা হয়। নার্শারী বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ বেসরকারীভাবে পরিচালিত হয়।

॥ নার্শারী স্কুল ও কিণ্ডারগার্টেন ॥

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্ প্রাথমিক ব্যবস্থা খুব আধুনিক কি খুব প্রাচীন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রয়েবেলের আদর্শে প্রথম কিণ্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার আয়োজন এই সময় থেকেই সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতকে সুরু হলেও প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয়নি। আমেরিকার শিক্ষাবিদরা খুব অল্প বয়সে শিশুদের কোনরূপ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। এর ফলে নার্শারী শিক্ষা বিংশ শতকের পূর্বে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেনি।

১৯১৯ খ্রীঃ নিউইয়র্কে প্রথমে নার্শারী স্কুল স্থাপিত হয়। এক বছর বাদে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কলেজে নার্শারী ব্যবস্থা হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত নার্শারী শিক্ষা অতি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। রুজভেল্টের নিউডিল আইনে শিশুশিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর থেকে নার্শারী শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। ১৯৪০ খ্রীঃ দেখা যায় কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ৬,৭৫,০০০ জন ও নার্শারী স্কুলে ৩,০০,০০০ জন শিশু শিক্ষা পাচ্ছে।

শিল্পের প্রসারের সাথে কলকারখানায় কর্মরত মায়েদের সন্তানদের দেখাশুনার জন্য কিণ্ডারগার্টেন ও নার্শারী স্কুলের প্রয়োজন বহুদিন থেকেই ছিল। প্রয়োজন মেটাতে কিছু স্কুলও খোলা হয়েছিল, যতই দিন যাচ্ছে এই জাতীয় স্কুলগুলির প্রয়োজন বেড়েই চলেছে। স্কুলের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আজকের আমেরিকায় কর্মরত নারীদের সন্তানদের সুশিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজে প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার তিনটি ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে আছে। পরিবার (*Home*), নার্শারী স্কুল, কিণ্ডারগার্টেন।

সামগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পারিবারিক শিক্ষায় পিতামাতার একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব যাতে পিতামাতা যথাযথরূপে পালন করতে পারেন সেজন্য তাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। শিশু-শিক্ষা ও শিশু পালন সম্পর্কে যাতে পিতামাতা প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারি সেজন্য দেশব্যাপী ট্রেনিং স্কুল ও পরিচালনা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। শিশুর পারিবারিক শিক্ষা ঠিকমত পরিচালিত হচ্ছে কি-না তা দেখবার জন্য অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি, স্বাস্থ্য বিভাগ ও বিভিন্ন গবেষণাগার ও ক্লিনিক রয়েছে।

॥ নার্শারী শিক্ষা ॥

নার্শারীগুলিতে গৃহ পরিবেশ সৃষ্টি করে অত্যন্ত যত্ন ও তৎপরতার সাথে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে সামাজিক বোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়। তারা এক সাথে থাকে, খেলে, খায় এর মধ্যে দিয়ে সহযোগিতা ও সামাজিকতার মনোভাব গড়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকেই স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস ও সদ্ আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা নার্শারীর থেকে পেয়ে থাকে।

রাষ্ট্রচালিত নার্শারীগুলিতে শ্রমিকদের সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া হয় খেলাধুলা, নাচগান, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ জীবন যাপন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তোলা নার্শারী স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমেরিকায় এক বছরের বেশী বয়স থেকে পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েদের নার্শারী স্কুলে নেওয়া হয়ে থাকে। কিছু কিছু প্রাইভেট নার্শারীতে কর্মরত মায়েদের শিশুদের দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেখা শোনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২০০০ নার্শারী স্কুল আছে। এর কিছুটা রাষ্ট্রচালিত কিছুটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত।

আমেরিকায় দু'রকম নার্শারী রয়েছে (১) ডে নার্শারী (২) নার্শারী স্কুল। ডে নার্শারীগুলি সাধারণতঃ কর্মে নিযুক্ত মায়েদের সন্তানদের দেখাশুনার জন্য প্রতিষ্ঠিত। গৃহের অভাব পূর্ণ করাই এদের কাজ। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় শিশুরা এখানে থাকে, তার পর বিকেলে শিশুদের মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

নার্শারী স্কুল দেড় বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৫০০ নার্শারী স্কুল রয়েছে। এই জাতীয় স্কুল গ্রামে নেই, বড় বড় সহরেই নার্শারী স্কুল বেশী দেখা যায়। নার্শারী স্কুলগুলি আবার চার রকমের হয়। (১) স্ব-নির্ভর নার্শারী স্কুল (২) প্রাথমিক স্কুল পরিচালনাধীন নার্শারী স্কুল, (৩) রাজ্যের মিশ্র শিক্ষা পরিকল্পনাধীন নার্শারী স্কুল। (৪) মাধ্যমিক স্কুল পরিচালিত নার্শারী স্কুল। এই স্কুলগুলির পরিচালনার ভিত্তিতে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ১। স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চল, রাজ্য বা কেন্দ্র পরিচালিত নার্শারী স্কুল। ২। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত নার্শারী স্কুল। ৩। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত নার্শারী স্কুল।

নার্শারী স্কুলগুলি হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার প্রস্তুতি ক্ষেত্র। নার্শারী স্কুল বা কিণ্ডারগার্টেনে কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয় না। কে, জি, স্কুলগুলিতে ফ্রয়েবেলের পদ্ধতি অনুসৃত হত। বর্তমান শতকে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি সম্পর্কে সযত্নে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন নতুন পদ্ধতি নার্শারী বা কে, জি স্কুলে অনুসৃত হয়। বর্তমান আমেরিকার শিশু শিক্ষায় ফ্রয়েবেল বা মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষ কোন স্থান নেই। [*"Froebelian principles were discarded as too formalistic, for the same reason the Montessori theory did not find place in the American Kindergarten"—I. L. Kandel*]

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমেরিকাবাসীরা বিশ্বাস করে প্রাথমিক বিদ্যালয়শিক্ষার মধ্য দিয়া প্রতিটি শিশুমনের বিকাশ ঘটে ও সমাজে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ স্থাপনে সহায়তা করে। তাই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর একটা সামাজিক উদ্দেশ্যও আছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন বলে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার নীতি নির্ধারণ ও কর্মপন্থা গ্রহণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা সচেতন হলেও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সেখানে বহু সমস্যা রয়েছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যার তুলনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, সামাজিক-অবস্থা ও প্রয়োগ বিদ্যার ক্রমপরিবর্তন প্রভৃতি মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন ব্যবস্থায় এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এছাড়া রয়েছে সুপ্রীমকোর্টের সিদ্ধান্তের ফলে শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় অঞ্চল তুলে দিয়ে বিদ্যালয় অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করবার সমস্যা।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৬ বছর থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য ৬ষ্ঠ শ্রে পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকাল বিস্তৃত। কোন কোন ক্ষেত্রে নার্শারী বা কিণ্ডারগার্টেনের ৪।৫ বছরের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যক্রম ও ১২।১৩ বছরের ছেলেমেয়েদের ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ধরা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কত হবে সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বিধান নেই। কোথাও ছাত্র সংখ্যা এক হাজারের বেশী, আবার কোন দূর পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়ে পাঁচজন ছেলেমেয়ে রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয় কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত এবং এক একটি পর্যায়ের দায়িত্ব এক একজন শিক্ষককে দেওয়া হয়।

প্রতি বিদ্যালয় অঞ্চলে স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর ন্যস্ত। বিদ্যালয়ের ভালমন্দের সর্বময় কর্তা হচ্ছেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

॥ পাঠ্যক্রম ॥

বিদ্যালয়সমূহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কোন জাতীয় পাঠ্যক্রম নেই। প্রতি রাজ্যে পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ একটি নির্দেশ থাকে। বিভিন্ন স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চল সেই নির্দেশ অনুসারে নিজ নিজ এলাকায় পাঠ্যক্রম স্থির করে। বিস্তৃত পাঠ্যক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবকের পাঠ্যক্রম পরিচালক ও অধ্যক্ষকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সাধনের জন্য যে সকল পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে তার ফলাফল বিচার করে এবং তার উপর কিছুটা ভিত্তি করে বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি বা গণিত শাস্ত্রের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়। পাঠ্যক্রম নির্ধারণের দায়িত্ব পুরোপুরি স্থানীয় সংস্থাগুলির কিন্তু প্রত্যেকটি রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় অঞ্চলের স্থিরীকৃত পাঠ্যক্রমের মধ্যে একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলে কোন জাতীয় পাঠ্যক্রম স্থির করে না দেওয়া হলেও প্রায় সমগ্র শিক্ষার ধারা একই খাতে প্রবাহিত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকায় যেসব বস্তু রয়েছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, পড়া, অঙ্ক শেখা, সামাজবিদ্যা, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা ও শরীর বিদ্যা। কোন কোন বিদ্যালয়ে পড়াবার সময় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তা যাতে ছেলেরা বুঝতে পারে সেজন্য যোগসূত্রটি দেখিয়ে দেওয়া হয়। অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়ালে যেখানে ছাত্রদের বুঝবার সুবিধা সেখানে অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্য নেওয়া হয়। আবার কোথায়ও বিষয়গুলি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে শেখান হয়। সমাজবিদ্যার সাথে কতকগুলি বিষয়ের স্বাভাবিক যোগসূত্র আছে বলে সমাজবিদ্যার সাথে অন্যান্য কতকগুলি বিষয় পড়ান হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি স্তরে বিজ্ঞান পড়ান হয়। শিশু যে প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মেছে ও বড় হয়েছে সেখানকার ভূপ্রকৃতি, গাছপালা, জীবজন্তু, আবহাওয়া, বিদ্যুৎশক্তি, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সম্পর্কে শিশুর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে উন্নততর বিজ্ঞান আলোচনা করে ও পরীক্ষানিরীক্ষা করে।

প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্বাস্থ্য ও শরীর-বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শরীর-বিদ্যা বলতে সাধারণভাবে খেলাধুলা, নৃত্যকলা ইত্যাদি বোঝায়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনায় শিক্ষকরা দৈনন্দিন-জীবনের ব্যবহারিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ জোর দেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে পড়াশুনার সময়ে সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটান হয়।

অঙ্ক প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্নস্তরে একটি প্রধান পাঠ্যবস্তু। নীচের শ্রেণীতে ছেলে-মেয়েদের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শেখান হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শ্রেণীতে ভগ্নাংশ দশমিক ও সরল সুদকষা শেখান হয়। কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে সরল বীজগণিত শেখান হয়। আজকাল অঙ্ক শাস্ত্রের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ বাস্তবিক জীবনের সমস্যার দিক বিচার করে স্থির করা হচ্ছে।

প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া লেখা, কথা বলা ও শোনার মৌলিক ধারণাগুলি আয়ত্তের জন্য ভাষামূলক কলাবিদ্যা শেখান হয়। বানান ও হাতের লেখা এই বিষয়ের

অন্তর্গত। ভাষা সম্পর্কে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন লোকের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করা। এছাড়া পাঠ্যক্রমের যে কোন বিষয় শিক্ষার জন্যই ভাষাশিক্ষার প্রয়োজন। কবিতা, গান, গল্প ও রচনার মধ্য দিয়ে শক্তি বিকাশের চেষ্টা করা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। শিল্পকলা, সঙ্গীত, নাটক এবং নৃত্যকে পাঠ্যক্রমের অঙ্গীভূত করায় পাঠ্যক্রম ব্যাপক ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

॥ উপকরণ ও অভিজ্ঞতা ॥

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিশুর শিক্ষায় সাহায্যের জন্য বিভিন্ন উপাদান যোগায় ও অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা করে। শিশুরা যখন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্কুলের শিক্ষালাভ করে তখন তাদের ডাকঘর, বিমান বন্দর, অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতির সাথে বাস্তব পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্যে তাদের এসব জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভারপ্রাপ্ত লোকেদের কাছে জিজ্ঞেস করে, নিজের চোখে দেখে ব্যবস্থাটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে। তারপর স্কুলে ফিরে এসে যা দেখেছে সে সম্পর্কে একটি বিবরণী তৈরী করে। বইয়ের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা যা জানল তার বাস্তব রূপটি প্রত্যক্ষ করবার জন্য তাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রত্যেক বিষয় শিখবার জন্য প্রতি বিষয়ের উপর পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। এর সাথে সহযোগী শিক্ষা উপকরণ রূপে চলচ্চিত্র, চিত্রিত তালিকা ও অন্যান্য বহু উপকরণ দেওয়া হয়। অনেক জায়গায় বর্তমানে টেলিভিশন ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

॥ প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ ॥

বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারসমূহের সাথে পরিচয় ঘটান ও কি করে সে সব আবিষ্কারকে শিক্ষার কাজে লাগান যায় সে চেষ্টার পরিচয় আমরা আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পাই। টেলিভিশনকে কি করে ব্যাপকভাবে শিক্ষার কাজে লাগান যায় তা নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করবার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে।

মহাশূন্য সম্পর্কে শিশুমনের জিজ্ঞাসাকে চরিতার্থ করার জন্য পাঠ্যক্রমে তার স্থান দেওয়া হয়েছে। ছাত্ররা গ্রহ বিজ্ঞান, মানুষের তৈরী উপগ্রহ, রকেট, মানুষ মহাশূন্যে গেলে কি সমস্যা দেখা দেয় সে সম্পর্কে নানা বিষয় শিখছে।

বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমেরিকার পিতামাতারা সচেতন। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালক ও নির্ধারকগণ তা নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। শিশুরা যাতে সৃষ্টিমূলক

কাজে উৎসাহের সাথে এগিয়ে আসে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে নিয়ে গিয়ে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ছেলেরা প্রায়ই শিক্ষামূলক ভ্রমণে যায়। স্থানীয় রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানলাভ করে। নানারূপ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করতে ছেলেদের উৎসাহিত করা হয়। এভাবে তারা জাতীয় গঠনমূলক কাজের সাথে পরিচিত হয়। তারা যাতে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেরাই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে সেদিকে তাদের উৎসাহিত করা হয়।

মেধাবী ছেলেমেয়েদের দিকে আজকাল বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা ছাড়াও খেলাধুলা, শরীরচর্চা, শিল্প-কলা, নেতৃত্ব গ্রহণ প্রভৃতি কোন-না-কোন দিকে এক একটি ছাত্র বিশেষ মেধার অধিকারী। যে ছাত্র যে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও যার যেদিকে প্রবণতা রয়েছে সেদিকে তার অগ্রগতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়, যাতে তার নিজস্ব বিষয়ে সে পরিপূর্ণ চরিতার্থতার সর্ববিধ সুযোগ পায়।

অগ্রগতি ঃ—বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখার সাথে উন্নতি পরিমাপও করা হয়। সাধারণভাবে সর্বত্র ক্লাস প্রমোশনের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি ছাত্রের বিশেষ অগ্রগতি একই পরিমাণ করা হয় না। আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি ছাত্রের অগ্রগতি পরিমাণ করা হয়। একই শ্রেণীতে বিভিন্ন মানের ছাত্র থাকতে পারে। যেমন, কেউ হয়ত দ্বিতীয় শ্রেণীর একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, কেউ দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরে রয়েছে। আপন আপন শক্তি অনুসারে একই শ্রেণীতে এই অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া হয় না।

বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হয় না। তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বোধ উন্মেষের দিকেও বিশেষ নজর রাখা হয়। প্রতিটি ছাত্র আলাদাভাবে পরীক্ষা করে তাদের পাঠক্রম স্থির করা হয় যার ফলে তাদের চরম উন্নতি সম্ভব হয়। ছাত্ররা এককভাবে বা একত্রিত হয়ে শিক্ষা লাভ করে। সাধারণতঃ ছেলেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। পরিকল্পনা তৈরী করতে ও তাকে রূপদান করতে শেখে। প্রত্যেক ছাত্রের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করবার ও শিক্ষাগত অগ্রগতির দায়িত্ব প্রধানতঃ শিক্ষকের। অনেক সময় ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য মনস্তাত্ত্বিকের সাহায্য নেওয়া হয়।

॥ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা ॥

॥ ১ ॥ বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিকল্পনা—

প্রতিটি ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় ভাল করে ডাক্তারী পরীক্ষা করা

হয়। প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা শেষ করা পর্যন্ত প্রতিটি ছেলেমেয়েকে অন্ততঃ তিন চার বার এরকম পরীক্ষা করা হয়। যদি শিক্ষক বা নার্স কোন ছেলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরীক্ষা করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে তাহলে তাকে ঘন ঘন পরীক্ষা করা হয়। পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। পিতামাতা যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্নবান হন সেজন্য বিদ্যালয় জনস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে একসাথে কাজ করবার চেষ্টা করে। দরিদ্র পিতামাতার সন্তানদের স্বাস্থ্য রক্ষার ও চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হল প্রতিরোধমূলক। যে সব রোগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশী ছড়াতে পারে তার প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

॥ ২ ॥ মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা—

রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় কৃষিবিভাগ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যাহ্ন ভোজনের পরিকল্পনা নিয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যাহ্ন ভোজনে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়। এর ব্যয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেস খাদ্য তহবিল ও ছাত্র-ছাত্রীরা বহন করে। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের সামান্য অংশই বহন করতে হয়। এ ছাড়া বিনা মূল্যে দুধ দেওয়ার একটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ সুরু হয়েছে।

॥ ৩ ॥ গ্রন্থাগার—

বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণীতে সেই শ্রেণীর ছাত্রদের সুবিধার জন্য শ্রেণী উপযোগী একটি নির্দিষ্ট জায়গা রাখা হয়। শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে ছেলেরা গ্রন্থাগারের সুবিধা যোগ গ্রহণ করে। দূরের ছেলেমেয়েদের সুবিধার জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার রয়েছে।

॥ ৪ ॥ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য—

যে সব ছেলেমেয়ে পিছিয়ে আছে, বিদ্যালয়ের কাজ ঠিকমত করতে পারছে না এসব ছেলেদের শ্রেণীর কাজের সাথে সমানে এগিয়ে চলতে সাহায্য করবার জন্য বহিরাগত বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য নেওয়া হয়। ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে এরা ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে আলাপ করেন। পিতামাতা, পরিবারস্থ পরিজন, ডাক্তার মনস্তাত্বিকের সাথে আলোচনান্তে শিশুর সমস্যাকে বুঝে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে সব ছেলেরা পরীক্ষায় ফেল করে বা যাদের আচরণে অসামাজিক মনোভাব ফুটে ওঠে তাদের নিয়েই বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের প্রধান কাজ।

॥ ৫ ॥ মাধ্যমিক শিক্ষা—

আমেরিকার ১৪-১৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬২ জন উচ্চ

বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষা শেষ করে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে শতকরা ৪০ জন পুরোপুরি ও ৯'জন আংশিকভাবে কলেজে যোগদান করে। আমেরিকার অভিভাবক জানে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে কোন স্থায়ী বৃত্তি অবলম্বন করলেই ছেলেমেয়েরা ভাল শ্রমিক ও নাগরিক হতে পারবে। এছাড়া আধুনিক উন্নত শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাহীন ছেলেমেয়েদের স্থায়ীভাবে কোন কর্মে নিয়োগ হবার সুযোগ কমে আসছে। এছাড়া প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের প্রায় বাধ্যতামূলক ভাবে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এসব কারণে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রায় সব রাজ্যেই এক। তরুণদের এই স্তরে ভাষা, গণিত, মানবিক বিষয়সমূহ, স্বাস্থ্য, শিল্পকলা, চারু ও কারুকলা, বিজ্ঞান, গৃহসজ্জা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

তরুণদের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ভাবধারা সৃষ্টি করা শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য। শিক্ষার মধ্য দিয়ে সুনাগরিক তৈরী হবে যারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধার সাথে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকবে ও সৎ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হবে। শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূলক শিক্ষাও দেওয়া হয়।

প্রতি ছেলেমেয়েকে তাঁর যোগ্যতা ও রুচি অনুসারে পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা ও তাদের প্রয়োজনীয় বৃত্তি গ্রহণে শিক্ষাদান, প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে বিদ্যালয়ে, পরিবারে, সমাজে সুন্দর ভাবে বাস করতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে তাই শেখানো হয়।

মাধ্যমিক অন্যান্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, তরুণদের সংগীত, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা। গ্রামে বা শহরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের অর্থ নৈতিক অবস্থা, পারিবারিক ভিত্তি প্রভৃতির কথা চিন্তা করে শিক্ষার ব্যবস্থা করে যাতে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি ছেলেমেয়েদের জীবনে সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে।

॥ ৬ ॥ পাঠ্যক্রম—

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাধারণভাবে ইংরাজী সমাজ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, শরীর রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশুনা করতে হয়। এছাড়া যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিল্পকলা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কোন বিদেশী ভাষা, সঙ্গীত, চারুশিল্প, বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা, জীবিকার উপযোগী শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয় ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করতে পারে। যতদিন ছেলেরা স্কুলে পড়ে ততদিন সপ্তাহে ৫ ঘণ্টা ইংরেজী শিখতে হয়। ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়ের একটি বড় অংশ সমাজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত ও তাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস, বিশ্ব ইতিহাস, সামাজিক ও রাষ্ট্রমূলক আলোচনা থাকে। স্বাস্থ্য ও শরীর-মূলক শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তুতি

হিসাবে যে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হয় তাতে আবশ্যিক বিষয় সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ঐচ্ছিক বিষয় সংখ্যা হ্রাস পায়।

॥ ৭ ॥ পাঠ্যক্রমে বহুমুখী দিক—

উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে যাতে একটা ব্যাপক ও প্রগতিমূলক শিক্ষা দেওয়া যায় সেজন্য বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহে নানা ধরনের পাঠ্যতালিকা ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। বিশেষ বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যতালিকা, কলেজ প্রবেশের প্রস্তুতির জন্য পাঠ্যতালিকা বিদ্যালয়সমূহে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি তালিকা নিজস্ব প্রয়োজনীয় পাঠ্য বিষয় ও বাঁধাধরা ঐচ্ছিক বিষয় আছে। সাধারণতঃ ছাত্রকে সে যে প্রধান বিষয়-সমূহ পড়ছে তার অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়কেই ঐচ্ছিক হিসাবে বেছে নিতে বলা হয়। অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষারত ছাত্ররা কতকগুলি বিষয় একত্র পড়ে। যেমন টাইপ লেখা, সঙ্গীত, চারুকলা, স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষা বিষয়ক শিক্ষা, অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা একত্র পড়ে; মাধ্যমিক শিক্ষার একটি দিক হচ্ছে যান্ত্রিক বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা, যেমন গাড়ী চালান শিক্ষা। এটা ক্রমেই ব্যাপকভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

॥ ৮ ॥ সহ পাঠ্যক্রমিক বিষয়—

সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা ছাড়াও তার বাইরে যে সব কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। এসব কাজের মধ্যে ব্যায়াম, পত্রিকা সম্পাদন, খেলাধূলা, ঐক্য সংগীত, ব্যাণ্ড, বাজনা, আমোদ-প্রমোদের ক্লাব, রেডিও ক্লাব, বিতর্ক সভা, বিভিন্ন রকম ক্লাব, যেমন বিজ্ঞান ক্লাব, ছবি তোলার ক্লাব, ছাত্র সমিতি গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খেলাধূলার মধ্যে ফুটবল, বেস বল, বাস্কেট বল, হকি, টেনিস, কুস্তি, সাঁতার ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। রেডিও ও টেলিভিসন মাধ্যমেও অনেক কিছু দেখান ও শেখান হয়। বিদ্যালয়ের পাঠের সাথে ক্লাসের বাইরে এই সব কাজের কোন পার্থক্যই করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের কাজকে ক্লাসের কাজের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন পত্রিকা সম্পাদনার কাজ বার্তা শিক্ষার ক্লাসের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্য্যাবলীর পরিচালনা ছাত্ররাই করে। এজন্য ক্রেডিট মার্ক দেবার ব্যবস্থা আছে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যে অংশ গ্রহণ করতে হলে বিদ্যালয় ভেদে ৭৫ থেকে ১৫০ ডলার ফি দিতে হয়। এ টাকা সবাই দিতে পারে না, ফলে সবাই এসব ক্রীড়াকলাপে অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

॥ ৯ ॥ শিক্ষা-উপাদান ও অভিজ্ঞতা—

পাঠ্যপুস্তক শ্রেণী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জাতীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য যখনই কোন পাঠ্যপুস্তক রচনা ও ব্যবহার করা হয় তখন সমস্ত

স্কুলের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকের মাঝে একটা সাদৃশ্য বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকার পাঠ্যপুস্তকে অতিরিক্ত বিষয়বস্তু ও উদাহরণের একত্র সমাবেশ করা হয়ে থাকে। বহু সংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকে বহুমুখী কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ থাকে। পুস্তক প্রকাশের সময় শিক্ষার অগ্রগতি ও পরিবর্তনের কথা মনে রেখেই পুস্তক প্রণয়ন করা হয়। পঠনপাঠনের কোন নতুন পদ্ধতি দেশে প্রচারিত হলে সেগুলি পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যালয় কক্ষের সাথেই পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকার ছোট ছোট গ্রন্থাগার থাকে। এমনকি ক্লাসে অধীত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদাদিও লাইব্রেরীতে রাখা হয়। অভিজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান সমন্বিত প্রতিটি স্কুল লাইব্রেরীতেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তক, পত্রিকা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রভৃতি ছাত্রদের সাহায্যের জন্য রাখা হয়।

শিক্ষাকে বাস্তবমুখীন করবার জন্য বহু পদ্ধতি ও উপাদানের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফটো, ছবি, মডেল, সিনেমা স্লাইড, টেপরেকর্ডার মেশিন, ফোনোগ্রাফ, রেকর্ড প্রভৃতি অত্যধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ছাত্রদের মেধাশক্তিকে সুদৃঢ় করে প্রতিভার বিকাশ মেটানোর চেষ্টা করা হয়। বেতার ও টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত বিষয়বস্তুর ক্লাস নেওয়া হয় ও সেখানে শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলিতভাবে আলোচনা করে।

দেখা ও শোনার এই সব আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাহায্যকারী উপাদানের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ পায়। পরিকল্পনা অনুসারে ছাত্রদের ট্রেনে বা বাসে করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে আমেরিকার সরকারের কার্যক্রম, বিধানসভার পরিচালনা পদ্ধতি, বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখানোর জন্য ছাত্রদের দূর দূর স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার শিবির শিক্ষা এবং বহির্বিষয়ক শিক্ষার দিকে ক্রমেই একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা শিবিরে নানা বিষয়ের আয়োজন করা হয়। যেমন প্রকৃতি বিজ্ঞান, প্রাণী বিদ্যা, আবহাওয়া, মানচিত্র অংকন, নক্ষত্র বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব শিক্ষা শিবিরে শিক্ষা সম্পর্কীয় আলোচনার সাথে আমোদ-প্রমোদেরও বহু ব্যবস্থা থাকে।

॥ ১০ ॥ নির্দেশ ও পদ্ধতি :—

আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষা বিষয়ে আমেরিকার শিক্ষকদের প্রচুর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কখন কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া ও কি

শিক্ষা দেওয়া হবে তা ঠিক করায় শিক্ষক যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করেন। ছাত্রদের অগ্রগতি, প্রয়োজন ও ক্ষমতা বিচার করে শিক্ষকগণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

বিস্তৃত পাঠ্যসূচীর পরিবর্তে কোন কোন রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর "শিক্ষা বিষয়ক পথ প্রদর্শক পুস্তক" প্রকাশ করেন। এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রস্তুতি কিরূপ হওয়া উচিত, অধিতব্য বিষয়ের লক্ষ্য, দেখা ও শোনার যন্ত্রাদির উপযুক্ত ব্যবহার, ছোট ছোট দলে ছাত্রদের ভাগ করে শিক্ষা দেওয়া, ছাত্রদের শিক্ষাগত অগ্রগতির মূল্যায়ন, ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও কৃতিত্বের সম্পর্ক, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ঐ পথ প্রদর্শক পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা এই পুস্তিকা রচিত হয়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তাঁদের ছাত্রদের প্রকৃতির সাথে পরিচিত হতে হয়। এছাড়া শ্রেণী কক্ষের মাঝেই ব্যাপক ও বিস্তৃত পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। শ্রেণী কক্ষে ঢুকলেই দেখা যাবে কোথায়ও দু'জন কি তিনজন ছাত্র নতুন কোন পরিকল্পনা প্রকাশের জন্য বুলেটিন তৈরী করছে, কেউ পরিকল্পনা অনুসারে যন্ত্রপাতি সাজাচ্ছে। কেউ ক্লাস লাইব্রেরীর বইগুলি পরীক্ষা করছে, অন্যান্য ছাত্ররা লিখছে, পড়ছে, বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কোন পরিকল্পনার আলোচনা করছে। দিনকে দিন আমেরিকার ক্লাস ঘরগুলি ছোট ছোট নানা রকম কাজের পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছে। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিজেরা হাতে কলমে সব কাজ শিখতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে ও ছোট ছোট দল হিসাবে খুব ঘন ঘন তাদের মধ্যে যোগ্যতার পরীক্ষা হয়। শব্দের বানান পড়া, গণিত, প্রভৃতি বিষয়ে তাদের পুরোন রেকর্ডকে অতিক্রম করে যাবার জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়।

॥ ১১ ॥ ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা—

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর রুচি সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কোন কোন উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষবৃন্দ ছাত্রদের যোগ্যতা অনুযায়ী ছোট ছোট দলে ভাগ করে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সব ছাত্রদের বুদ্ধিমত্তা ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাদের সে বিষয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। বড় বড় স্কুলে ছাত্রদের যোগ্যতার বিভিন্ন স্তর অনুসারে বহুমুখী কর্মসূচী অনুসরণ করা হয়।

আমেরিকায় যোগ্যতা বিচারে ছাত্রদের পৃথক পৃথক করে শিক্ষা দেবার রীতি থাকলেও সর্বত্র এই নীতি অনুসৃত হয় না। কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যোগ্যতা অনুসারে ছাত্রদের পৃথক করার বিরোধী। তারা মনে করেন যে যোগ্যতা ছাত্রদের অনেক পার্থক্যের মধ্যে একটা এবং অন্যান্য ছাত্রদের থেকে এদের পৃথক করলে সামগ্রিকভাবে এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে—যার ফলে অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের

ক্ষতি হতে পারে। এই সব বিদ্যালয় যোগ্যতা অনুসারে বিভক্ত না করে শিক্ষকদের উপর ভার দেন ছাত্রদের নিজস্ব পছন্দ ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দেবার। শিক্ষার অত্যন্ত নিম্নতম পর্যা শড ছাত্রদের থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের পড়ানোর সময় এবং উঁচু শ্রেণীতে গড় ছাত্রদের থেকে উন্নত ধরনের ছাত্রদের পড়ানোর সময় বিশেষ সাহায্য দেওয়া হয়।

বর্তমানে শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী ও প্রতিভাবান ছাত্রদের সম্পর্কে অধিকতর যত্ন নেওয়া হচ্ছে। প্রতিভাবান ছাত্রদের নিয়মিত পাঠ্যসূচীর বাইরেও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে প্রতিভাবান ছেলেরা তাড়াতাড়ি স্কুলের থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে, আর নয়ত কলেজে ঢুকে উন্নততর পাঠ্যসূচী নিয়ে পড়তে পারে। কোন কোন উঁচু বিদ্যালয়ে এমন উন্নত ধরনের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় যাতে ছাত্ররা পরে কলেজ পর্যায়ে অনেক এগিয়ে যেতে পারে।

॥ ১২ ॥ মূল্যায়ন ও পরীক্ষা—

শিক্ষাব্যবস্থার গোড়া পত্তন যেদিন হয়েছে সেদিন থেকেই মূল্যায়ন ব্যবস্থা করতে হয়েছে। মূল্যায়ন পদ্ধতিটি যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর কৃতিত্বের মান নিরূপণের জন্য আমরা যে ব্যবস্থা করি তা হচ্ছে পরীক্ষা। প্রথম যুগে আমেরিকার পরীক্ষার লক্ষ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীরা কি পরিমাণ মুখস্থ করতে পেরেছে ও পরীক্ষার খাতায় মুখস্থ বিষয়টা কতটা লিখতে পেরেছ তা যাচাই করে নেওয়া। আজও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রধানতঃ আমরা মুখস্ত করবার ক্ষমতাই যাচাই করি। মুখস্ত করবার সাথে স্কুলে তাদের স্বভাব :চরিত্রের দিকটাও দেখতে হয়। প্রতিদিন ক্লাসের শেষে শিক্ষক মৌখিক পরীক্ষা নেন ও নম্বর দেন বছরের শেষে। এই নম্বরের উপর ভিত্তি করে তাদের দৈনিক হাজিরা ও স্বভাব চরিত্রের বিচার করে তাদের সাফল্য ও কৃতিত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেওয়া হত।

শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিংশ শতকের সুরুতে প্রচলিত পরীক্ষা সম্পর্কে অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে ওঠে। সেই সময় থেকেই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়। শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, বিষয়ের উপর অধিকার, অর্জিত বিদ্যাকে প্রকাশ করবার শক্তি, তার বিচার বুদ্ধিপরীক্ষার মাধ্যমে কি করে যাচাই করা যায় পরীক্ষাকে সে ভাবে সংস্কার করবার চেষ্টা সুরু হয়। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমেরিকায় বস্তুধর্মী পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের বা অগ্রগতির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয় বলে শিক্ষাবিদগণ মনে করেন। প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করবার জন্য বস্তুধর্মী পরীক্ষা (*Objective Test*) চালু হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় যে নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতি চালু হয়েছে তার মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার করবার চেষ্টা করা হয়। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আচরণ, চরিত্র, দৈহিক পটুতা,

ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব ক্ষমতাকে যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য ও আগ্রহের উপর ভবিষ্যৎ শিক্ষা নির্ভরশীল, এজন্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগুলিকে বিচার করা হয়। প্রচলিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক দিক যাচাই করা সম্ভব নয়। নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থায় তার বিচার বুদ্ধির পরীক্ষা হয়। সব দিক থেকে মূল্যায়ন করেই শিক্ষার্থীর সামগ্রিক কৃতিত্বের পরিমাপ করা হয়। শিক্ষার্থীকে সবদিক থেকে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বৎসরের শেষে কৃতিত্বের প্রমাণপত্র অর্জন করতে হয়। সাফল্যের প্রতীক স্বরূপ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিম্নতম '*D*' চিহ্নিত প্রমাণপত্র পেতেই হবে। শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মান নির্ণয়ক ৫ প্রকার প্রমাণ পত্র দেওয়া হয়। *A. B. C. D. E* এর মধ্যে '*A*' মার্কা প্রমাণপত্র সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক, '*E*' মার্কা অসাফল্যের প্রতীক।

পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে অন্যান্য বহু বিষয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ একটি কার্ডে চিহ্নিত করে অভিভাবকদের কাছে পাঠান হয়। এই রিপোর্ট কার্ডে শিক্ষার্থীর মেধাশক্তির ও বিভিন্ন বিষয়ে ক্ষমতা, দুর্বলতা, ক্রমোন্নতি চিহ্নিত থাকে। এছাড়া কাজ করার অভ্যাস, নাগরিকত্ব, নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ, সহযোগী মনোভাব ও উৎসাহ-মূলক কাজে প্রেরণা প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ থাকে ; অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকেরা মিলিত হয়ে শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার কথা নিয়ে আলোচনা করেন। এতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা বিষয়ক বহু সমস্যার সমাধান হয়।

॥ ১৩ ॥ লাইব্রেরী—

মাধ্যমিক স্কুলে লাইব্রেরীসমূহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বই, পত্রিকা, ছবি, চলচ্চিত্র, টেপরেকর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু ও দ্রব্য সামগ্রীর একটি সংগ্রহশালা। ছাত্র শিক্ষক সবাই লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করে। মাধ্যমিক স্কুলে লাইব্রেরীর তিনটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে (১) পাঠ্যসূচীকে উন্নীত করার জন্য নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবহার (২) আনন্দমূলক পড়াশুনার ব্যবস্থা (৩) ছাত্র সমাজের মধ্যে লাইব্রেরীর অভ্যাস তৈরী করে দেওয়া। ছাত্ররা প্রয়োজন অনুসারে বই ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্লাস ঘরের বাইরে কি বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যেতে পারে। ছোট ছোট দলে ভাগ করে অথবা এককভাবে ছাত্রদের নিজ নিজ বিষয় অনুযায়ী লাইব্রেরীর জিনিসপত্রের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়। লাইব্রেরীর সাথে একটি সম্মেলন কক্ষ থাকে। একদল ছাত্র লাইব্রেরী পরিচালনা পদ্ধতিতে সহকারীরূপে কাজ করে। বই দেওয়া, বই নেওয়া, নির্দিষ্ট জায়গায় সেগুলি রাখা, নতুন বই আসামাত্র সেইগুলির বণ্টন ব্যবস্থা, পত্রপত্রিকাগুলি ফাইলে গুছিয়ে রাখা প্রভৃতি তাদের কাজ।

॥ ১৪ ॥ পরামর্শ ও পরিচালনা—

আমেরিকার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সামনে বহু সুযোগ রয়েছে। এই

সুযোগ যাতে শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য আমেরিকায় চেষ্টার ত্রুটি নেই। শিক্ষাকে বহুমুখী করেই সেখানে কাজ শেষ করা হয় নি। পরামর্শ ও নির্দেশ দানের জন্য সেখানে যেরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে আর কোথায়ও তা দেখা যায় না। শক্তির অপচয় রোধ করতে পরামর্শ ও নির্দেশ দানের ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং আমেরিকায় যথাসম্ভব এই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করা হচ্ছে। পরিচালনা হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যক্তিগত সাহায্য বা ছাত্রদের নিজস্ব ক্ষমতা, প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের মধ্যে তাদের ক্ষমতার ও মানসিক যোগ্যতার পার্থক্যের জন্য তাদের বিশেষ প্রয়োজন বিষয়েও নানা রূপ পাথক্য হয়ে থাকে। সেই কারণে স্কুল পর্যায়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে একটা চরম সিদ্ধান্তে আসা কষ্টসাধ্য। স্কুল ছাত্রদের উন্নতির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ছাত্রদের যোগ্যতা ও বিভিন্ন ক্ষমতার মূল্য নিরূপণ করে নিরূপিত পরিসংখ্যানগুলি ছাত্র, কিছুটা বয়স্ক ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে রক্ষিত প্রতি ছাত্রের রেকর্ড কার্ড তার সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তর বিভিন্ন রাজ্যের সহায়তায় পথ নির্দেশও ব্যক্তিগত সাহায্য বিষয়ক কাজের জন্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করেছে। বড় বড় স্কুলে ছাত্রদের ব্যক্তিগত সহায়তার জন্য একজন করে পরিচালক নিযুক্ত করা হয়।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ॥

জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে উচ্চ বিদ্যালয়ের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সংখ্যাগত বৃদ্ধি গুণগত উৎকর্ষতাকে যাতে কোন প্রকারে হ্রাস না করে সেদিকে জনসাধারণ অত্যন্ত সচেতন। স্কুল ও স্কুলশিক্ষার মানের অবনতি জনসাধারণ সহ্য করতে রাজী নয়।

পরিকল্পিত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা সাহায্যকারী উপাদান ব্যবহারের ফলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটাই উন্নীত হবে।

টেলিভিশানের মাধ্যমে ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য বহুমুখী শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অসাধারিণ উন্নতির সাথে সাথে পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরী হচ্ছে। বিজ্ঞান, গণিত এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে এই পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়।

শিক্ষার সর্বস্তরে প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত প্রতি বিষয়ে একটা অনুবন্ধ

রচিত হয়েছে। এই অনুবন্ধ রচনায় সম্মেলন. ওয়ার্কশপ, বিদ্যালয়ের পারস্পরিক পরিদর্শন, সর্বস্তরে শিক্ষকদের সহযোগিতা নানাভাবে সাহায্য করেছে।

স্কুলের শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে ছাত্রকে কতকগুলো ছোট ছোট পরীক্ষা পার হয়ে আসতে হয়। বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা বেড়েই চলেছে।

সমগ্র শিক্ষা ও পরিচালনা ব্যবস্থাকেই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করা হয়েছে। ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া, সাহায্য ও মূল্য নিরূপণের জন্য এত বিরাট ও ব্যাপকভাবে, ব্যক্তিগত বা দলগত বুদ্ধির পরীক্ষার ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার ও অন্যান্য পরীক্ষানিরীক্ষার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার ব্যবহার ইতিপূর্বে কখনো হয়নি।

শিক্ষায় প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রদের চিহ্নিত করে তাদের আরও ভাল করে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিদেশী ভাষাসমূহ, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা মোটা-মুটি জ্ঞান যাতে ছাত্রদের থাকে সে চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যান্য দেশের সাহিত্য, পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাস ও আধুনিক ভাষাসমূহের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে।

যে সমস্ত ছেলেরা পিছিয়ে রয়েছে কিংবা যাদের মধ্যে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে, তার প্রতিকারের জন্য সংশোধন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

॥ ভারতের শিক্ষার সাথে আমেরিকার শিক্ষার তুলনা ॥

আমেরিকার সাথে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা করলে আপাতদৃষ্টিতে কোথাও কোথাও হয়ত আমরা মিল খুঁজে পাব কিন্তু এই তুলনাকে গভীরে নিয়ে গেলে সাদৃশ্য থেকে বৈসাদৃশ্যটাই আমাদের চোখে পড়বে। বিদেশী শাসক সম্প্রদায় দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল তাকে আমরা জাতীয় শিক্ষা বলে আখ্যা দিতে পারি না। দেশ ও জাতির স্বার্থ অপেক্ষা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিই সেই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তনের চেষ্টা চলেছে। শিক্ষা সংস্কারের জন্য রাধাকৃষ্ণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন ও কোঠারী কমিশন অভিধান প্রমাণ রিপোর্ট পেশ করেছেন। নীতির দিক দিয়ে অনেক পরিবর্তনই তাঁরা চেয়েছেন, কিছু কিছু পরিবর্তন আমরা দেখেছি, প্রধানতঃ বাইরের রূপ পাল্টানো।

আমরা বাইরের দিকটা নিয়েই আলোচনা করলে দেখি আমেরিকার মত ভারতে শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। ভারতের সংবিধান শিক্ষাকে রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত করেছে, দুই দেশেই কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্ব। যেমন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল, সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনীর শিক্ষা ইত্যাদি। শিক্ষা রাজ্যের দায়িত্ব অথচ দুটি দেশেই অর্থের জন্য রাজ্যগুলি কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী। শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন রাজ্য তহবিলে তা নেই। রাজ্যগুলি কেন্দ্র থেকে অর্থ সাহায্য

নিতে প্রস্তুত অথচ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ সহ্য করতে রাজী নয়। কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছে কি করে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করা যায়। সময় সময় আইনের আশ্রয় নেবার চেষ্টা দুই দেশেই হয়েছে। কিন্তু রাজ্যগুলি সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কেন্দ্রের অর্থের বিনিময়ে নিজেদের অধিকার সংকোচনে তারা রাজী নয়। তবু কেন্দ্র তার নীতিকে অর্থ সাহায্য সর্তে রাজ্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

রাজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রাজ্য বিধানসভাই শিক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকারী। শিক্ষা সংক্রান্ত আইন পাস করে রাজ্যের শিক্ষানীতি তারা নির্ধারণ করতে পারেন। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষা বোর্ড দুই দেশেই আছে। স্থানীয় বিদ্যালয় অঞ্চল ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই।

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখী বিদ্যালয় পরিকল্পনা গ্রহণে আমরা আমেরিকা ও ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যসূচীতে থাকলেও নিজ যোগ্যতা ও রুচিমত পছন্দ মত একটি ধারা (*stream*) শিক্ষার্থীরা বেছে নেবে এই নীতিই বর্তমান ভারতের বহুমুখী বিদ্যালয়ে অনুসৃত হচ্ছে। পাঠক্রমে কেন্দ্রীয় বিষয় (*Core Subject*) শিক্ষা ব্যবস্থাও আমেরিকা থেকে গৃহীত হয়েছে। তবে আমেরিকায় ছাত্রদের বিষয় নির্বাচনের যে সুবিধা আছে ভারতে তা নেই। নিজ বিভাগের নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের বাইরে কোন বিষয় গ্রহণের সুযোগ এদেশে নেই। বহু বিদ্যালয়ের বিষয় নির্বাচনের সুযোগও সীমাবদ্ধ, হয়ত তিনটির বেশী পড়বার ব্যবস্থাই সেখানে নেই।

শিক্ষার্থীকে সাহায্য, পরামর্শ দান ও পরিচালনার জন্য *Guidance Officer* ও *Carrier Master*-এর কথা মুদালিয়র কমিশন বলেছে। আমেরিকায় পরিচালনা ও নির্দেশের যে ব্যবস্থা আছে পৃথিবীর কোন দেশের সাথেই তার তুলনা হয় না। আমাদের দেশে দু' একটি বাদ দিলে এর কোন ব্যবস্থা নেই বলা চলে। সহ-পাঠ্যক্রমিক শিক্ষাকে আমরা নীতিগত ভাবে গ্রহণ করেছি। আমেরিকায় তাকে সত্যিকার রূপ দেওয়া হচ্ছে। ও দেশের মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তার সাথে আমাদের দেশের তুলনা চলে না। আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশে চেষ্টা চলছে, যথাসম্ভব শীঘ্র প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা যায় কিনা। সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন আছে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় সহ-শিক্ষার প্রচলন আছে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে মেয়েদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় নেই সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে। আমেরিকার শিক্ষার ব্যয়ভারের একটা বিরাট অংশ রাষ্ট্র বহন করে। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ আমাদের দেশেও অনেক বেড়েছে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা এখনও অনেক কম। জীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, আসবাবপত্র ও শিক্ষা-সরঞ্জামের অভাবের জন্য এদেশে যে অসুবিধা ভোগ করি আমেরিকায় তা হয় না বলেই শোনা যায়। শিক্ষার কাঠামো, পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা কমিশন যে সুপারিশ করেছে তা গৃহীত ও কার্যকরী করা হলে

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আরও অনেক পরিবর্তন আসবে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই আসবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। তার ফলে হয়তো আমরা বিশ্বের প্রগতিশীল দেশগুলির সাথে তুলনীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব। তখন দুই দেশের পার্থক্য অনেক ঘুচবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা দুই দেশই স্বীকার করে নিয়েছে; তবু দুই দেশে বিরাট পার্থক্য। কালে এই পার্থক্য ঘুচবে। আমেরিকার কাছ থেকে যা আমাদের নেওয়া উচিত যতটুকু আমাদের দেশের প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে আমরা সংকোচ করব না। আবার যেহেতু আমেরিকায় চালু হয়েছে অতএব আমাদেরও নিতে হবে সে মনোভাব ঠিক নয়। আমেরিকার সাথে তুলনায় আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি এটি স্বীকার করতে দোষ নেই, কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টা ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এদেশেও অতি অল্প দিনেই একটা শক্তিশালী প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা চলে।

ষষ্ঠ পর্ব

শিক্ষাগুরুদের কথা

প্রথম অধ্যায়

নতুন যুগের সূচনা

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান যুগকে বলা হয় শিশুরযুগ। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষাব্যবস্থা। এই যুগে শিক্ষার সব আয়োজন সব ব্যবস্থাই শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে। শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করাই শিক্ষার লক্ষ্য। আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক। যাকে শিক্ষা দেওয়া হবে তাকে জেনেই তার প্রয়োজন অনুসারে, তার রুচি, প্রবণতা, শক্তি বিচার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কোন একটা পূর্ব পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর উপর চাপিয়ে না দিয়ে শিশুকে নানাদিক থেকে বিচার করে তার প্রয়োজন অনুযায়ী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সেই কথাই চিন্তা করা হয়।

নুতন যুগের স্চনা

শিক্ষায় শিশুর এই গুরুত্ব চিরদিন ছিল না। শিশুর ভূমিকা ছিল শিক্ষায় গৌণ। সমস্ত শিক্ষা-কর্মে তার ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয়। শিশুর উপর একটা পূর্ব নির্দিষ্ট বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। তার রুচি, প্রবণতা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা বিচার করার কথা সে দিন চিন্তা করা হ'ত না। যার জন্য সমস্ত শিক্ষার আয়োজন, সেই শিশু ছিল নিতান্তই কৃপার পাত্র। বয়স্কের ইচ্ছা পূরণ করাই ছিল শিশুর কাজ।

কনস্তান্তিনোপোল পতনের পর ইউরোপের চিন্তাজগতের এক বিরাট বিবর্তনের স্চনা হয়। মধ্য যুগের অবসানে নবযুগের মানুষ যুক্তির আলোকে জীবনের সত্যকে জানবার জন্য সচেষ্ট হ'ল।

নবজাগরণের যুগে প্রাচীন গ্রীসের প্রভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে যে মতবাদ জন্ম নিল তা মানবতাবাদ। এই যুগের বৈশিষ্ট্য যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তার স্বীকৃতি। শিক্ষায় মানবতাবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ইরাসমাস। ইরাসমাস, কুইন্টিলিয়ান কমোনিয়াস প্রভৃতির শিক্ষা চিন্তায় শিশুর গুরুত্বের আভাস মেলে, কমোনিয়াস আধুনিক যুগের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির সম্পর্কে প্রথম নতুন পথের ইংগিত করেন। তিনি শিশুর মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগের স্ষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে আনন্দময় পরিবেশ স্ষ্টির কথা বলেন। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন।

ইংলণ্ডের দার্শনিক জন লকের চিন্তাধারার মধ্যেও শিক্ষার নতুন যুগের সম্ভাবনা স্চিত হয়। খেলার মাধ্যমে আগ্রহ স্ষ্টি করে শিশুকে শিক্ষা দেবার কথা তিনিই প্রথম বলেন। শিশুর জানার আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলে তিনি সে যুগে যথেষ্ট আধুনিকতার পরিচয় দেন।

এদের চিন্তায় অভিনবত্ব থাকলেও মধ্য যুগের সংস্কার থেকে এরা পুরোপুরি শিক্ষাকে মুক্ত করার কথা ভাবতে পারেন নি। মধ্যযুগীয় চিন্তা ধারার উপর বলিষ্ঠ আঘাত করে শিক্ষা সম্পর্কে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করেন রুশো। রুশোর শিক্ষা চিন্তায় আমরা দেখতে পাই পুরাতন সংস্কারকে ভেঙ্গে আধুনিক শিক্ষার দিকে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রুশোর চিন্তায় বহু অসঙ্গতি থাকলেও তিনিই আধুনিক শিক্ষার পথ-প্রদর্শক। পরবর্তীকালের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতিতে রুশোর প্রভাব সর্বাধিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জঁ্যা জঁ্যাকস রুশো (১৭১২-১৭৭৮)

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবি নিয়ে প্রথম এগিয়ে আসেন জঁ্যা জঁ্যাকস রুশো। সাধারণভাবে রুশো ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত রূপেই পরিচিত। তাঁর যুগান্তকারী চিন্তাধারা রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম সর্বক্ষেত্রেই এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। সমাজে যা কিছু গতানুগতিক, প্রাণহীন তাকে আঘাত করে নতুন চেতনা, নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। ফরাসী সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারে নিপীড়িত জনগণকে তিনি যে মুক্তি ও সাম্যের বাণী শুনিয়েছিলেন তা শুধু ফরাসী-রাজতন্ত্রের অবসানই ঘটায় নি তা মুক্তিকামী প্রতিটি নরনারীকেই নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। তাঁর *The Social Contract* গ্রন্থে তিনি প্রথমেই বলেছেন *"Man is born free ; and everywhere he is in Chains"*। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে শৃঙ্খলমুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন শিক্ষায়ও তিনি সেই আদর্শেরই পরিপোষক। শিক্ষাসম্পর্কীয় তাঁর মতবাদ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদেরই পরিপূরক।

শিক্ষা জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা

রুশো শিক্ষাসম্পর্কীয় তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা *Emile* নামক গ্রন্থে অত্যন্ত নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এর পূর্বে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবিকে এত বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করতে কেউ এগিয়ে আসেন নি। রুশোর পূর্বে শিক্ষা ছিল প্রাণহীন। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার্থী—এই তিন অঙ্গের শিক্ষার্থী বা শিশুই ছিল সর্বাপেক্ষা অবহেলিত। শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ, রুচি, ক্ষমতা, তার মানসিক প্রবণতা কিছুরই মূল্য ছিল না। রুশোই প্রথম শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী কৃত্রিম শিক্ষার পরিবর্তে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলেন। লর্ড মর্লি রুশোর 'এমিল'কে শিশুর মুক্তির সনদ (*'It was the charter of youthful deliverance'*) বলে অভিনন্দিত করেছেন। শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করে তিনি আধুনিক শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন।

শিশুমুক্তির সনদ 'এমিল'

রুশোর শিক্ষাসম্পর্কীয় চিন্তাধারার প্রথম আভাস পাওয়া যায় তাঁর *The New Heloise* নামক উপন্যাসে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কৃত্রিম পরিবেশ থেকে শিশুকে মুক্ত করতে না পারলে তার প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হবে না। *The New Heloise* গ্রন্থে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে রুশো বলেছেন, শিশুকে আমরা শিক্ষা দেই না, শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তার বিকাশের জন্য পরিবেশ রচনাই আমাদের কাজ। *New Heloise* গ্রন্থে, মা জলী বলেছেন, 'ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া নয়, ছেলেদের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই আমার কাজ।'

শিক্ষায় মায়ের ভূমিকা

রুশো শিক্ষায় ছিলেন প্রকৃতিবাদী। তাঁর শিক্ষা স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষা। তিনি যে কোনরূপ কৃত্রিমতার বিরোধী। মানুষের তৈরী কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। তিনি 'এমিল' গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন, "*Every thing is good as it comes from the hands of the Author of Nature, but everything degenerates in the hands of man*".

শিক্ষায় প্রকৃতিবাদ

তাই রুশো তাঁর মানসপুত্র এমিল-কে কৃত্রিম সমাজের পরিবেশের বাইরে মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থাপন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেছেন, শিশু প্রচলিত শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করবে না। শিক্ষাব্যবস্থাই ক্রমবর্ধমান শিশুকে অনুসরণ করবে। আমরা শৈশব সম্পর্কে কিছুই জানি না, আমাদের ভ্রান্ত কতকগুলি ধারণা নিয়ে যা করি তাতে শিশুর অধিকতর ক্ষতিই করা হয়। পণ্ডিতেরা শিশু কি শিখবে তার বিধান দিতে ব্যস্ত, কিন্তু সে কতটুকু শিখতে পারে সে খোঁজ নেয় না। তারা শিশুর মধ্যে একজন বয়স্ক মানুষ খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু একবার ভাবে না যে মানুষ হবার আগে তার অবস্থাটা কি।...তাই শিক্ষার্থীকে আগে ভাল ভাবে জানতে হবে, কারণ এটা নিশ্চিত আমরা কিছুই জানি না। "*We know nothing of childhood, and with our mistaken notions, the further we advance the further we go astray. The wisest writers devote themselves to what a man ought to know, without asking what a child is capable of learning. They are always looking for the man in child without considering what he is before he becomes a man···Being thus by making a more careful study of your scholars, for it is certain that you know nothing about them*"—(*Preface to the Emile as quoted in* '*A Short History of Educational Ideas*' *by S. G. Curtis and M. E. A. Boult Wood*).

শিক্ষার জন্য শিশু নয়, শিশুর জন্য শিক্ষা

খৃষ্টান শিক্ষাদর্শ, *Original Sin* নিয়ে মানুষ জন্মায়, তাই মানবশিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে এই ধারণার উপর গড়ে উঠেছে। রুশো ঠিক তার বিপরীত কথা দিয়ে শুরু করলেন; "*that the first impulses of nature are always right, there is no original sin in human heart*" (*Emile*).

স্বভাব-সুন্দর মানব-শিশু সমাজের কৃত্রিমতার মধ্য থেকেই পাপের পথে যায়, তাই রুশো প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুদের স্থাপন করে স্বাভাবিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

রুশোর শিক্ষাকে বলা হয় নেতিবাচক শিক্ষা (*Negative education*)। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি বলেছেন অস্তিবাচক শিক্ষা (*Positive education*)। যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজে শিশু বাস করে সে সমাজের দূষিত প্রভাব থেকে রক্ষা করবার প্রয়োজনেই তিনি প্রচলিত শিক্ষা থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থাপন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে

নেতিবাচক শিক্ষা

বলেছেন। প্রকৃতির কাছ থেকে শিশু যা শিখবে তাই হবে তার স্বাভাবিক শিক্ষা; এখানে শিশু নিজেই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সাহায্যে শিখতে পারবে। অপরিণত মনকে গঠিত করবার জন্য বয়স্কের উপযোগী কতকগুলি কাজ আর উপদেশের বোঝাকে শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়াই হচ্ছে অস্তিবাচক শিক্ষার কাজ। শিশুকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেবার পূর্বে যে-সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা গ্রহণ করবে তাকে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করে তোলাই হচ্ছে নেতিবাচক শিক্ষার উদ্দেশ্য ('*I call a positive education one that tends to form the mind prematurely and to instruct the child in the duties that belong to a man. I call negative education one that tends to perfect the organs that are the instruments of knowledge before giving this knowledge directly—Rousseau)*"। তাই নেতিবাচক শিক্ষাকে যদি মনে করা হয় শিক্ষার অভাব, তাহলে ভুল করা হবে। তিনি প্রাচীন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পুরাতনকে ভেঙ্গেই তিনি তার কাজ শেষ করেন নি, শিশুকে গড়ে তোলবার জন্য তিনি নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতির যে কথা বলেছেন, সেদিকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ গঠনশীল।

রুশোর বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতির ব্যবহারিক রূপ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি এমিল গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মানসপুত্র এমিলের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন, শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। এমিল গ্রন্থের শুরুতেই তিনি বলেছেন, শিশুর মধ্যে আমরা একটি পরিণত মানুষকে খুঁজি। মানুষ হবার আগে শিশুর স্বরূপকে, তার ব্যক্তিসত্তাকে জানতে চাই না—আমরা জানতে চাই না শিশুকে। পরিণত মানুষ হবার আগে শিশু কোন পথ ধরে ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে সেইরূপ বিবর্তনের ইতিবৃত্তই রুশো এমিলের জীবনালেখ্যর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশের স্তরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই চারটি স্তরে সে কি ভাবে শিক্ষা পাবে, তার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তির কি ভাবে বিকাশলাভ ঘটবে সে সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এমিলের শিক্ষার মধ্য দিয়েই আমরা রুশোর শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদি জানতে পারি। এমিলের জীবন কথার মধ্য দিয়ে রুশো তার শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদর্শের বাস্তব দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রকৃতির অনুসারী নেতিবাচক শিক্ষাদর্শই হচ্ছে এমিলের জীবন-কথা।

শিক্ষার স্বরূপ

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দেহ ও মনের বিকাশ লাভ ঘটবে। এই বিকাশের পথ অনুসরণ করেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। রুশো শিশু জীবনের পরিণত রূপ লাভ করবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায় এক থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা, দ্বিতীয় পর্যায় পাঁচ থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা, তৃতীয় পর্যায় বার থেকে পনর বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা, চতুর্থ পর্যায় পনর থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা।

শিক্ষার স্তর

প্রথম স্তরের পাঁচ বছর পর্যন্ত শিক্ষাকালকে দৈহিক বিকাশ ও ইন্দ্রিয়ানুশীলনের শিক্ষাকাল বলা চলে। এই সময় প্রধান চেষ্টাই হবে কি করে শিশুকে সুস্থ, সবল ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলা যায়। এই সময়ে শিশু বাপ-মায়ের কাছেই থাকবে। তাই তার প্রথম শিক্ষা তাদের মায়ের কাছ থেকেই আসবে। বিপরীত প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে তাকে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে এই স্তরে। এক রাশ পোষাকের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকে ননীর পুতুল করে রাখা চলবে না। যতটা সম্ভব ঢিলে-ঢালা পোষাক সে ব্যবহার করবে, পায়ে জুতো নাই-বা রইল, অন্ধকারেই পথ চলতে শিখুক—এই করেই স্বাভাবিক পরিবেশে সে মানুষ হয়ে উঠবে। তার স্বাধীন চলা-ফেরায় কোন বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। গৃহের কারাগার থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। খেলাধূলা সে করবে কিন্তু খেলাধূলার কোন ব্যয়-বহুল উপকরণ তাকে দেওয়া হবে না। ফুল, পাতা, ডাল, মাটি এসব নিয়ে সে খেলবে। শাসন-বাহুল্য যেমন থাকবে না, আদর দিয়ে তাকে বিগড়ে দেওয়াও হবে না। কোন অন্যায় জেদ বা বায়নার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সে কোন অভ্যাসের দাস হবে না। একটি মাত্র অভ্যাসই সে আয়ত্ত করবে, তা হচ্ছে কোন অভ্যাস না শেখা। (*The only habit which the child should be allowed to form is to contract no habit whatsoever*)।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রাকৃতিক অনুসারী

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপরিকল্পনায় রুশো শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশের কথা চিন্তা করেন নি। তাই দৈহিক পুষ্টি ভিন্ন বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য কোন শিক্ষা চর্চার ব্যবস্থা করেন নি, এই সময়ে শিশুর সুস্থ দেহ গড়ে তুলতে হবে। সুস্থ দেহ, সুস্থ মনের আধার—এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেহ সুস্থ হলে মনের অনুগত হবে, দুর্বল হলে মনের উপর দেহের দাবির মাত্রা বেড়ে যাবে। (*"The weaker the body, the more it commands, the stronger it is the better it obeys."*)

এই স্তরে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও তিনি করেন নি। তিনি এই সময় শিশুকে বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন। এ বয়সে শিশু প্রথম চিন্তা করতে শিখবে। রুশো মনে করতেন বেশী কথা বললে চিন্তাশক্তি বিকাশের পথে সেটা অন্তরায় হবে। ভাষা যে চিন্তার বাহন, চিন্তাকে প্রকাশ করতে হলে তা ভাষার মাধ্যমে করতে হবে এবং উন্নত চিন্তার জন্যই যে ভাষার প্রয়োজন—এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না।

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু হবে, বার বছর পর্যন্ত চলবে। এ স্তরকে বলা চলে নেতিবাচক শিক্ষার যুগ। মানুষের-সৃষ্ট কৃত্রিম-পরিবেশ থেকে শিশুকে সরিয়ে নিয়ে স্থাপন করতে হবে উদার প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে। তার জন্য গতানুগতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। খোলা চোখ আর খোলা মন নিয়ে সে প্রকৃতির কাছ থেকে বাস্তব শিক্ষা লাভ করবে। এ সময়ে তার শিক্ষা হবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। স্বাস্থ্যকর স্বাভাবিক পরিবেশে শিশুর দেহের পুষ্টি সাধিত হবে।

রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম সব কিছুতেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। খেলাধূলা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের সাথে উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকবে। বাধা-নিষেধের নিগড়ে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করা চলবে না। স্বচ্ছন্দ বিহার আর স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই শিশু এই স্তরে শিক্ষালাভ করবে।

দ্বিতীয় স্তরের নেতিবাচক শিক্ষা

এই পর্যায়ে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে শিশুর মনকে পিষ্ট করা হবে না। রুশো বলেন, পড়াটা দরকার আমি জানি, কিন্তু পড়া থেকে যখন শিশু উপকার লাভ করবে তখনই তার পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ শিশুর মন পড়ার উপযুক্ত না হওয়ার পূর্বে তার পড়ার ব্যবস্থা করে জীবনকে বিড়ম্বিত করতে তিনি চান নি। তবে এই স্তরে যে কিছুই শেখান হবে না তা নয়। দেহচর্চার উপযোগী দৌড়-ঝাপ, সাঁতার, গাছে চড়া, নানারকম খেলা এসব থাকবে। মাটি, জল, গাছ, ডালপালা দিয়ে দুর্গ এসব তৈরী করতে শিখবে, ছবি আঁকবে। এছাড়া বাইরের প্রকৃতি সম্পর্কে শিশুর মনে কৌতূহল জাগবে। কৌতূহল মেটাবার জন্য সে নানারূপ প্রশ্ন করবে, এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, তাকে গল্প বলে তার জানার স্বাভাবিক স্পৃহা মেটাতে হবে।

শিশুকে এ সময় তিরস্কার বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কিছুই করান হবে না। নিজের কৃতকর্মের ফলাফলের মধ্য দিয়েই সে শিক্ষালাভ করবে। এই ঠেকে শেখার নীতিকে বলা হয় স্বাভাবিক ফলাফল তত্ত্ব (*Natural consequence*)। প্রকৃতিই শিশুর শিক্ষক, প্রকৃতিই তার বিচারক। পুরস্কার কি শাস্তি যাই লাভ করুক সে, প্রকৃতির হাত থেকেই লাভ করবে। এমিল যদি জানালার কাচ ভাঙ্গে তাহলে এজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা আস্‌বে সেই হবে তার শাস্তি। জলে ভিজলে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে—তাকে ঘরে আটক থাকতে হবে, কৃতকর্মের ফল ভোগের মধ্য দিয়েই সে শিক্ষালাভ করবে। স্বাভাবিক ফল লাভের উপর ভিত্তি করে শিশুকে ছেড়ে দেওয়া সব সময় নিরাপদের নয়। ঠাণ্ডা লেগে জর হবে তাই থেকে শিক্ষা হবে একথা মনে করে শিশুকে সারাদিন জলে ভিজতে দিলে স্বাভাবিক ফলাফলটা অনেক সময় বিপজ্জনক হতে পারে।

তৃতীয় স্তরের শিক্ষা বার বছর থেকে পনের বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পর্যায় থেকেই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হবে। শিশু-জীবনের এই পর্যায়ের শিক্ষাকে ইতিবাচক শিক্ষার যুগ বলা যেতে পারে। পূর্বে দুইটি স্তরে শিশুর দেহের পুষ্টি ও ইন্দ্রিয় অনুশীলনের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। দৈহিক অনুশীলনের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে এবার মানসিক বা বৌদ্ধিক অনুশীলনের আয়োজন করা হবে। এই স্তরে শিশুর স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ হয়। এই সময়ে জীবন ও পারিপার্শ্বিক জগত সম্পর্কে তার মনে অজস্র কৌতূহলী প্রশ্নের উদয় হবে। শিশুর এই কৌতূহলকেই শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে, গতানুগতিক পুঁথিনির্ভর শিক্ষার ব্যবস্থা তার জন্য করা হবে না। শ্রেণী কক্ষের বন্ধন থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে প্রকৃতির মুক্তঅঙ্গন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। শিক্ষক

তৃতীয়স্তর শিক্ষাপর্ব শুরু

তার কৌতূহল মেটাবার জন্য সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এজন্য প্রয়োজনে তাকে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য সব কিছুই শেখাতে হবে। সে শুধু শিক্ষকের মুখ থেকেই শুনে শিখবে না। প্রকৃতিবিজ্ঞান সে বাস্তব পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে শিখবে। নিজে পরীক্ষা করে নানা প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবে। তার জ্ঞান যতটা সম্ভব বাস্তব ভিত্তিক হবে।

বই সম্পর্কে রুশোর ধারণা

বই সম্পর্কে রুশোর একটা বীতরাগ ছিল। শিক্ষার এই স্তরেও তিনি এমিলের জন্য কোন বইয়ের ব্যবস্থা করেন নি। তিনি মনে করতেন নিজের চোখে দেখে যা শিখবে তাই হবে সার্থক শিক্ষা। তিনি বলেন, 'আমি বইকে ঘৃণা করি, বই থেকে আমরা এমন কিছু বলতে শিখি যে সম্পর্কে আমাদের নিজের কোন ধারণা নেই।' বই পছন্দ না করলেও একখানা বই তিনি এমিলের অবশ্য পাঠ্য বলে নির্দেশ করেছেন; তা হচ্ছে ডিফোর রবিনসন ক্রুশো। জাহাজ ডুবিতে এক নির্জন জনমানবহীন দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ক্রুশো কি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ও দেশে ফিরে আসতে পেরেছিল সে কাহিনী যেমন কৌতূহল উদ্দীপক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এমিল যাতে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয় সে শিক্ষা দেবার জন্যই হয়ত তাকে রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী পড়তে বলা হয়েছে।

শ্রমের মূল্য

এই স্তরের শিক্ষায় এমিলকে একটা শিল্প শিখতে হবে। জীবিকা অর্জনের জন্য এই শিল্পকে সে বৃত্তি রূপে গ্রহণ করবে না। শ্রমের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হলে এই শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন। কায়িক পরিশ্রম সম্পর্কে যাতে তার মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি না হয়, যাতে এমিল শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখে এজন্যই তিনি তাকে শিল্পশিক্ষা দিতে বলেছেন।

চতুর্থ স্তরের শিক্ষা
সামাজিক শিক্ষা

চতুর্থ স্তরের শিক্ষা হবে পনের কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী। বাল্য ও কৈশোরের স্তর অতিক্রম করে এমিল এবার ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করবে। এতদিন পর্যন্ত তার শিক্ষা ছিল আত্মকেন্দ্রিক। তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্যই সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম তিনটি স্তরের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এমিলের দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে—এবার এর সাথে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করতে হবে—"*We have formed his body, his senses and his intelligence, it remains to give him a heart.*" পরিপূর্ণ আত্মবিকাশই শিক্ষার শেষ কথা নয়—এবার শিক্ষার মধ্য দিয়ে তার সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। মানুষের সাথে মিশে, তাদের সুখ-দুঃখের সাথে পরিচিত হয়ে মানুষকে ভালবাসবে, মানুষকে সম্মান করবে। রুশো শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কিন্তু তার শিক্ষা সমাজবিরোধী নয়। তিনি এমিলকে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজসচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। তবে এমিলের শিক্ষায় তিনি সমাজের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করেন নি।

এই পর্যায়ে এমিল ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। সৌন্দর্যবোধ বিকাশের জন্য সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনা করবে। যৌবনাগমে তার মনে যৌনচেতনা জাগবে, সেজন্য যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক জীবনে পরিচ্ছন্ন যৌনসম্পর্কে ও বিবাহিত জীবনের পবিত্রতার সম্পর্কে তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। তার ভবিষ্যত জীবন-সঙ্গিনী সোফীর সাথে তাকে এই সময় পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এরপর নানাদেশ, নানাজাতি, তাদের রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশভ্রমণে বের হবে। এইভাবে পরিণত যৌবনে শিক্ষা শেষ করে এমিল সোফীকে বিয়ে করে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করবে।

শিক্ষার বহু দিক

নারীশিক্ষা সম্পর্কে রুশোর মতবাদকে প্রগতিশীল বলা যায় না। এমিলের ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী সোফিয়ার শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, নারীশিক্ষার প্রয়োজন পুরুষের জন্য, নারীসম্পর্কে তিনি কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন বলে মনে হয় না। পুরুষের সহচরী বা সহায়িকা ছাড়া নারীজীবনের অন্য কোন ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে করতেন না।

নারীশিক্ষা

রুশো ছিলেন আবেগ-প্রবণ, কিছু পরিমাণ বাস্তব-বিমুখ। তাঁর বাস্তব বিমুখীনতার জন্য তাঁর মধ্যে পরস্পর বিরোধী অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তির সন্ধান মেলে। তাঁর মানসপুত্র এমিলের জন্য তিনি যে কাল্পনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তার সাথে তিনি বাস্তবের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন নি। তিনি যে স্বভাব-অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন সেখানে পিতামাতার সান্নিধ্য থেকে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন, তিনি তাকে মানুষের সমাজের বাইরে রাখতে চেয়েছেন। তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবের সাথে সম্পর্ক বিরহিত। তারপর একজন শিক্ষক সর্বক্ষণ শিশুর সাথে থেকে তাকে পরিচালনা করবে এও বাস্তব নয়। তারপর নেতিবাচক শিক্ষায় সমাজের সমস্ত প্রভাব থেকে শিশুকে মুক্ত রাখতে হবে, কারণ যা কিছু সামাজিক তাই কৃত্রিম। একটি শিশুকে পনর বছর পর্যন্ত কি সমাজের সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা যায়? যদি তা সম্ভবও হয় তাহলে কি করে তাকে আবার সমাজের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হবে?

সমালোচনা

রুশোর দোষত্রুটি ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও তিনিই আধুনিক শিক্ষার পথ-প্রদর্শক। শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে তিনিই প্রথম শিশুকে স্থাপন করেন। শিশুর স্বভাব-প্রবণতা, রুচি, শক্তি প্রভৃতির মূল্য শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিসীম—একথার স্বীকৃতি আমরা প্রথম রুশোর মধ্যেই পাই। প্রকৃতির উদার মুক্তপ্রাঙ্গণ শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পরিবেশ—একথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনিই প্রথম জোরের সাথে বলেন। ইন্দ্রিয় পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে শিশুর আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলার পদ্ধতিকে রুশোর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। শিক্ষাপদ্ধতি ও নীতি সম্পর্কে তিনি যে আভাস দিয়েছেন—তাঁর

রুশোর অবদান

কাছ থেকে সেই ইংগিতগুলিকে নিয়েই পরবর্তীকালে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রণালীসমূহ প্রবর্তিত হয়। রুশো শিশুর নিজস্ব সত্তা ও মানসিক বিকাশের পথকে প্রস্তুত করবার নির্দেশ দিয়ে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর পথ প্রস্তুত করেছেন। তাঁর চিন্তায় যা ছিল অস্পষ্ট তাকেই সুসংবদ্ধ রূপ দিতে চেয়েছিলেন পেষ্টালৎসী। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-প্রয়াসের মধ্যেই পাই।

তৃতীয় অধ্যায়

জোয়ান হেনরিখ পেষ্টালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭)

সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে ১৭৪৬ খ্রীঃ পেষ্টালৎসীর জন্ম হয়। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় স্নেহময়ী জননীর তত্ত্বাবধানে তাঁর বাল্যের শিক্ষা শুরু হয়। কল্যাণময়ী জননীর শুভ প্রভাব তাঁর জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছিল। মায়ের প্রভাব তাঁর জীবন জুড়ে ছিল বলেই তাঁর শিক্ষাচিন্তায় মায়ের প্রভাব বেশী ভাবে পরিলক্ষিত হয়। পেষ্টালৎসীর জীবনব্যাপী সাধনায় বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। বহু ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নতুন শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেন। রুশোর এমিল শিক্ষা জগতে যে নতুন নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল পেষ্টালৎসী তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় তাকেই বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছিলেন। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে তিনি একটি গঠনমূলক রূপ দিয়েছিলেন। রুশোর শিক্ষাদর্শে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একটা বিরোধ দেখা যায়, পেষ্টালৎসী মানুষ ও সমাজের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। গৃহশিক্ষাকেই তিনি শিক্ষার স্বাভাবিক ভিত্তিস্থাপনের ক্ষেত্র মনে করতেন।

রুশোর শিক্ষা চিন্তার বাস্তব রূপায়ণ-প্রচেষ্টা

১৭৬৯ খ্রীঃ তিনি 'বির' গ্রামে একটি খামার স্থাপন করে তার নাম দেন 'নিউহফ্'। এখানে তিনি একটি অনাথ আশ্রম খোলেন। কয়েকটি দুস্থ শিশুকে নিয়ে তিনি বাস্তব জীবনের উপযোগী হাতের কাজের সাথে সাথে তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ছেলেদের চাষ আর মেয়েদের ঘরের কাজ সেলাই প্রভৃতি শেখালেন। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বাস্তবজীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকেই তিনি এখানে প্রধান স্থান দেন। হাতের কাজের সাথে মুখে মুখে সাধারণজ্ঞান, বাইবেল প্রভৃতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু স্কুলটি বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। ১৭৮০ খ্রীঃ বিদ্যালয়টি আর্থিক বিপর্যয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রাথমিক প্রচেষ্টা

এই সময়ে তিনি তাঁর শিক্ষানীতির মূল সূত্রগুলিকে আলোচনা করে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *The Evening Hours of a Hermit* প্রকাশ করেন। এরপর তিনি *Leonard and Gertrude* (১৭৮১ খ্রীঃ) গ্রন্থে একটি কাহিনীর মাধ্যমে তাঁর শিক্ষানীতি প্রচার করেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ সুইজারল্যাণ্ডের ষ্ট্যান্স গ্রামে অনাথ শিশুদের ভার নিয়ে তাদের জন্য একটি স্কুল খোলেন। এই বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি সরকারী সাহায্য পেয়েছিলেন। এই বিদ্যালয়েই তিনি পাঁচটি স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণ মিশিয়ে বর্ণসংযোগ ও স্বরবর্ণের উচ্চারণ ভেদ বোঝাবার সহজতম পদ্ধতি "সিলেবারীজ" (*Syllabaries*) আবিষ্কার করেন। পাঁচটি স্বরবর্ণের সাথে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন বর্ণ মিশিয়ে (যেমন *ba, be, bi, bo, bu,* আবার *ab, eb, ib, ob, ub,*) উচ্চারণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় সাধারণ শিক্ষিত মায়েরাও তাদের সন্তানদের শিক্ষাদায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ষ্ট্যান্সে তিনি লেখাপড়ার সাথে হাতের কাজকে আরও বেশী করে যুক্ত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, শিক্ষার সাথে হাতের কাজ যুক্ত হলে গতানুগতিক শিক্ষার চেয়ে আরও অনেক বেশী ফল পাওয়া যাবে।

শিক্ষার নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ

ষ্ট্যান্সের বিদ্যালয় বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। এর পর কয়েকজন বন্ধুর চেষ্টায় বার্গডোর্ফ-এ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ শুরু করেন। এখানে তিনি ভাষা শেখানোর জন্য রঙীন কাঠের অক্ষর ব্যবহার শুরু করেন। অঙ্ক শেখানোর জন্য ছোট ছোট পাথরখণ্ড ও ছোট ছোট কাঠের টুকরো ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন। এরপর তাঁর কার্যক্ষেত্র ইভারডুনে স্থানান্তরিত হয়। এখানে এসে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির আরও অনেক পরিবর্তন হয়। পূর্বে তিনি *Table of Unit* উদ্ভাবন করেছিলেন, এখানে ভগ্নাংশ শেখানোর জন্য *Table of Fraction* প্রবর্তন করেন। শিশুর নিকট বিমূর্ত অপেক্ষা মূর্তবিষয়ের অবদান অধিক—এটা বুঝতে পেরে তিনি শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপকরণের ব্যবহার শুরু করেন। ফ্রয়েবেল ও মন্তেসরীর শিক্ষাপদ্ধতিতে বহুবিধ উপকরণের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁরা এ সব উপকরণকে এক একটি ভাবের প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পেষ্টালৎসী এসব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপকরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ অর্থের সন্ধান করেন নি। শিশুর শিক্ষাকে সহজ করে তোলার ব্যবহারিক মূল্যের দিক থেকেই এসব উপকরণের সাহায্য তিনি গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা

জীবনের শেষ সময়ে তিনি "*How Gertrude Teaches Her Children*" প্রকাশ করেন। এতে পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-চিন্তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি *The A. B. C of Observation* এবং *The Book for Mothers* প্রভৃতি বই লেখেন।

পেষ্টালৎসী শিক্ষা বলতে শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই বুঝতেন। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন "*Education is the natural, progressive and harmonious*

development of all the powers and capacities of human being." স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে রেখেই তিনি শিশুর বিকাশের সুযোগ করে দিতে চেয়েছেন। শিক্ষা শুধু স্বাভাবিক পরিবেশেই হবে না, শিক্ষা হবে শিশুর স্বভাব-অনুসারী। রুশোর স্বভাব-অনুসারী শিক্ষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করতে চেয়েছিলেন। শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতি জেনেই স্বভাব-অনুসারী শিক্ষার আয়োজন সম্ভব। সেই দিক থেকে পেষ্টালৎসীই শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রথম পথ-প্রদর্শক।

শিক্ষার লক্ষ্য

নিজের জীবনে মায়ের প্রভাবের কথা স্মরণ করে তিনি বলতেন, শিশুর শিক্ষায় মায়ের ভালবাসার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ভার তিনি মায়ের হাতে ছেড়ে দিতে চেয়েছেন।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে শিশুর বাস্তববোধ বিকাশের একটা বিশেষ স্থান আছে। শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে শিক্ষাদানের প্রাথমিক ভিত্তি। তাঁর মতে *Sense Training is the first and foremost training* লেখাপড়ার সাথে হাতে কলমে কাজ যুক্ত করতে হবে।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শিক্ষা

পেষ্টালৎসী শিক্ষায় শিশুর মানসিক বিকাশে স্তর বা ধারাকে অনুসরণ করতে বলেছেন। শিশুকে সহজ থেকে ক্রমে কঠিনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এই ক্রমবর্ধমান জটিলতা মানসিক বিকাশের স্তরকে অনুসরণ করবে। তিনিও রুশোর মত বলেছেন, "শিশু শিক্ষাক্রম অনুসরণ করবে না, শিক্ষাক্রমই শিশুকে অনুসরণ করবে।" তিনি কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানদান করতে চান নি; তার মধ্যে যা আছে যে সম্ভাবনা আছে তাকেই তিনি শিক্ষা বলেছেন। (*"The main object of education is not to teach but to develop."*)

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বহুভাবে পেষ্টালৎসীর নিকট ঋণী। তাঁর দোষ-ত্রুটি ছিল, তিনি ছিলেন আদর্শবাদী, তাই দেখা গিয়েছে, শিক্ষার সূত্রটি ঠিকভাবে বুঝেও তিনি বাস্তবক্ষেত্রে সঠিকভাবে তার প্রয়োগ করতে পারেন নি। তবুও সহজ সরল শিক্ষাদরদী মানুষটি শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন তার ফলে তাঁর উত্তর-সাধকেরা শিক্ষাক্ষেত্রে বহু যুগান্তকারী পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একথা সত্য, তিনি বিশেষ শিক্ষা পান নি, মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না; তবুও তিনিই বাস্তবধর্মী মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাপদ্ধতির পথ-প্রদর্শক। তিনি যা সুরু করেছিলেন, তাঁরই ভাবশিষ্যদের দ্বারা তা সার্থক রূপ পেয়েছে। তিনি নিজেই বলেছিলেন *"I am the initiator and depend it upon others to carry out my views"*। শুধু মনস্তত্ত্বই নয় শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলবার জন্যও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। রুশোর শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজের দাবিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। পেষ্টালৎসী শিক্ষায় ব্যক্তি ও সমাজের

পেষ্টালৎসীর অবদান

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের পথে পরিচালনার কথা বলেন। সবদিক থেকে বিচার করে বলা চলে, গতানুগতি শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুশোর কণ্ঠে যে বিদ্রোহের বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, যে বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শ তিনি প্রচার করেছিলেন, তাকে বাস্তবে রূপ দেবার মধ্য দিয়ে পেষ্টালৎসী আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। রুশোর শিক্ষা-চিন্তাকে বাস্তবে রূপদান করতে তিনিই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

জন ফ্রেডারিক হারবার্ত (১৭৭৬-১৮৪১)

পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নীতির মধ্যে এমন কতকগুলি অসঙ্গতি ছিল যার জন্য তিনি আদর্শের সাথে বাস্তবের সুষ্ঠু সমন্বয় করতে পারেন নি। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর পক্ষে শিক্ষা-নীতিকে দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করানো সম্ভব হয় নি। তাঁর আরব্ধ কাজকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে এগিয়ে আসেন ফ্রেডারিক হারবার্ত। রুশো ও পেষ্টালৎসী শিশুশিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বকে অনুভব করে যে কাজ শুরু করেন হারবার্ত তাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন।

নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তুতি-পর্ব

১৭৬৬ খ্রীঃ জার্মানীর এক কৃষ্টিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে হারবার্ত জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের কাছে তাঁর শিক্ষার শুরু। জেনা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালীন তিনি সে-যুগের খ্যাতনামা দার্শনিক ফিষ্টে ও শিলিং-এর সংস্পর্শে এসে ভাববাদী-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু হারবার্ত ছিলেন যুক্তিবাদী; তাই ভাববাদী-দর্শন তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। এখানে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের ইণ্টার লেকেনয়ের শাসন-কর্তার তিনটি ছেলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এই তাঁর শিক্ষকতার হাতে খড়ি—আর তিনি যে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন সেও এখান থেকেই শুরু। এদের শিক্ষকতার মধ্য দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রের রুচি, আগ্রহ, শক্তি ও ব্যক্তিত্ব বিচারের প্রয়োজন আছে। এখানে দু'বছরের শিক্ষকতাকালে তিনি পেষ্টালৎসীর শিক্ষা প্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৭৯৯ খ্রীঃ তিনি বার্গডর্ফে পেষ্টালৎসীর স্কুলটি দেখে আসেন। এরপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে পেষ্টালৎসীর শিক্ষানীতি ও প্রণালীর মধ্যে যে অসংলগ্নতা ছিল তা সংস্কারে ব্রতী হন। তাঁর কর্মক্ষেত্র গোটিনজেন ও কোনিগসবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে সীমাবদ্ধ। তাঁর শিক্ষানীতি সম্পর্কে পরীক্ষা-

নিরীক্ষার জন্য তিনি কোনিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন।

হারবার্ত ছিলেন দার্শনিক। শিক্ষাতত্ত্বকে তিনি দর্শনের পটভূমিকায় উপস্থাপন করেন। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান। গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিষয়ের অধ্যাপক রূপে যে সব বক্তৃতা করেন ও এই সময়ে প্রকাশিত দু'টি বইয়ে তাঁর শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তাতে দেখা যায় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি নীতি-ধর্মের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে একটি মাত্র কথায় প্রকাশ করা যায় তা হচ্ছে নীতিজ্ঞান (*m ıra itv*)। তিনি বার বার শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে নীতিধর্ম বা নীতিজ্ঞান কথাটি প্রচার করেছেন। শিক্ষা ও নীতিধর্ম এ দুটি কথা তাঁর কাছে প্রায় সমার্থবোধক ছিল। নৈতিক চরিত্র গঠন ও সৎগুণের বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। এই নীতিজ্ঞান ও নীতিবোধকে শিক্ষার সাহায্যে একটি জীবন্ত অভ্যাসে পরিণত করার যে কৌশল তাই হচ্ছে শিক্ষা। তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর সুরুচিবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞানকে বিকশিত করতে চেয়েছেন। শিক্ষার ফলে শিশু যা কিছু অ-সুন্দর যা কিছু অসত্য তাকে ঘৃণা করতে শিখবে। শিশুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে স্বভাবতঃই সত্য সুন্দরের দিকে আকৃষ্ট হয়।

শিক্ষাচিন্তার দার্শনিক ভিত্তি ও শিক্ষার লক্ষ্য

হারবার্ত শিক্ষায় শিশুকে জানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষা যদি হয় শিশুর প্রকৃতি-অনুসারী তাহলে শিশুর মন বা প্রকৃতিকে আগে জানতে হবে। তিনি অ্যারিষ্টটলের 'মন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি (*faculty*) নিয়ে গঠিত' এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, মন একটি অখণ্ড শক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ কোন সহজাত শক্তি নিয়ে জন্মায় না। রুশোর 'শিশু' স্বভাবতঃই সৎ—এ তত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। শিশুর জন্ম সময়ে তার মন থাকে শূন্য। অভিজ্ঞতার দ্বারাই সে সৎ কি অসৎ হয়। এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে জ্ঞানের ভিত্তি। জন্মের পর থেকেই আমরা বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। এই অভিজ্ঞতা দুইটি সূত্র থেকে আমরা লাভ করি—প্রকৃতির কাছ থেকে, আর মানুষের কাছ থেকে। আমাদের সামনে নতুন কোন অভিজ্ঞতা এলে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ও বিয়োগের মধ্য দিয়ে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে নতুনের সমন্বয় সাধিত হয়। পুরাতনের সাথে নতুনের সংযোজন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার অন্বয়ীকরণ (*apperception*) বলা হয়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা পুরাতনের সাথে অন্বিত হয়ে একটি পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে। পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল (*circle*) নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে বিস্তৃতি লাভ করে। এমনি ভাবে চিন্তা-বৃত্ত (*circle of thought*) সম্প্রসারিত হয়। পুরাতন অভিজ্ঞতার সাথে অন্বিত হয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়—পুরাতন জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা নতুন জ্ঞান অর্জন করি—এই তত্ত্ব আধুনিক অনেক মনো-

শিক্ষায় অন্বয়ীকরণ

বিজ্ঞানীও সমর্থন করেছেন। পুরাতন ও নতুনের সংযোগ সাধনের এই যে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া চলছে এতে মনকে পরস্পর-বিরোধী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। মন যখন কোন বিরোধী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তখন পুরাতন অভিজ্ঞতা একে বাধা দেয়। এই বাধার ফলে কোন কোন অভিজ্ঞতা চেতনার মধ্যে স্থান পায় না। কিন্তু এগুলি চিরতরে মন থেকে মিলিয়ে যায় না। মনের অবচেতন কোণে এরা স্থান নেয়। চেতন মনের অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা অবচেতন মনের কোণে লুকিয়ে থাকে এই মতবাদ ফ্রয়েদীয় মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

হারবার্ত তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করেছেন। আধুনিক কোন কোন শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের জন্য একটি গৌণ স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শিক্ষক সেখানে পরিচালক নন তিনি মাত্র পর্যবেক্ষক। হারবার্তের শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষাকর্মের একটি প্রাণবান-অঙ্গ স্বরূপ। শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়া শিক্ষকের কাজ। শিক্ষকই শিশুর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন ও তাকে সুপরিচালিত করে নতুন জ্ঞানার্জনে সহায়তা করবেন। তিনি বাইরের শাসনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও বাইরের থেকে চাপিয়া দেওয়া শৃঙ্খলায় শিশুর নৈতিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে বলে মনে করতেন। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থেকে শিক্ষার্থীর মনে যে শৃঙ্খলাবোধ আসবে সেই স্বতঃ উৎসারিত শৃঙ্খলার কথাই তিনি বলেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য যে নীতিবিজ্ঞান তাকে হারবার্ত পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ, আত্মার স্বাধীনতা, দ্বিতীয় হচ্ছে তার সুসামঞ্জস্য বিকাশ, তৃতীয় সদিচ্ছা, চতুর্থ ন্যায়পরায়ণতা, পঞ্চম স্বাভাবিক সততা। শিক্ষক শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়ে শিশুর চিন্তা, ধারণা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে এই আদর্শ-অনুসারী করবেন—হারবার্ত তাই চেয়েছেন।

শিক্ষকের স্থান ও গুরুত্ব

শৃঙ্খলা

হারবার্তের শিক্ষাতত্ত্বে আগ্রহের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। শিক্ষায় শিশুর আগ্রহের যে কোন মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা আছে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় তার কোন স্বীকৃতি ছিল না। হারবার্ত বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর মনে আগ্রহ সৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজনীয়। আগ্রহ সৃষ্টি হলেই শিশুর মন নতুন বিষয় শিক্ষার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে। শিশুর ইচ্ছাশক্তি উদ্দীপ্ত হলেই শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলবে। বর্তমানকালের শিক্ষাবিদগণ বিশ্বাস করেন বহুমুখী-আগ্রহের (*many sided interest*) সাথে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞানকে যুক্ত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার্থীর বহুমুখী-আগ্রহের উপর নির্ভর করেই শিক্ষায় অনুবন্ধ-প্রণালীর (*correlation*) প্রবর্তন হয়েছে। একটি মূল বিষয়কে (*core-subject*) কেন্দ্র করে এই প্রণালীতে অপর বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যান্য বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বিষয়টির সাথে যুক্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থাপিত হয়।

শিক্ষায় আগ্রহ তত্ত্ব ও অনুবন্ধ প্রণালী

এই যে আগ্রহ সৃষ্টি ও শিখবার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা এর মধ্যে কতকগুলি স্তর রয়েছে। একটি একটি করে স্তরগুলি অতিক্রম করে আমরা অগ্রসর হই। হারবার্ত শিশুর মানসিক গঠন ও আগ্রহের ধারাকে অনুসরণ করে চারটি স্তর বা সোপান রচনা করেছেন। এই ধাপগুলি হচ্ছে **পর্যবেক্ষণ** (*observation*), **ধারণা** (*expectation*), **চাহিদা** (*demand*) **ও কার্য** (*action*)। এই স্তর বিভাগ অনুসারে তিনি শিক্ষা-পদ্ধতিরও চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন—(১) **স্পষ্টতা** (*clearness*), (২) **পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন** (*association*), (৩) **সূত্রনির্ধারণ** (*Generalisation*) (৪) **প্রয়োগ পদ্ধতি** (*Method of application*)। হারবার্তের শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রথম স্তরটির মূল্য অত্যন্ত বেশী; তাই তাঁর ছাত্র জিলার এই স্তরটিকে ভেঙ্গে দু'টি ভাগে ভাগ করেন। **প্রথমটি প্রস্তুতি** (*preparation*), **দ্বিতীয়টি উপস্থাপন** (*presentation*)। হারবার্তের অপর শিষ্য রেইন প্রস্তুতিপর্বে **উদ্দেশ্য** (*aim*) বলে আর একটি নতুন স্তর যোগ করেন।

পঞ্চ সোপান শিক্ষা পদ্ধতি

প্রস্তুতিপর্বে শিশুর পূর্বজ্ঞানকে আশ্রয় করে নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়। প্রস্তুতিপর্বে শিক্ষার্থীর আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে তার মনকে পাঠ্যাভিমুখী করাই শিক্ষকের কাজ। নতুন পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলেই পরবর্তী কাজ অর্থাৎ উপস্থাপন সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়।

প্রস্তুতি

উপস্থাপন পর্বে শিক্ষার্থীর নিকট নতুন বিষয়টি ধীরে ধীরে তুলে ধরতে হবে। প্রয়োজন হলে সমগ্র বিষয়টি কয়েকটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় শিক্ষাকার্য এগিয়ে চলবে। শিক্ষার্থী শুধু নীরব-শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করবে না—পাঠে সেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। শিক্ষক প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর মনকে পাঠে আকৃষ্ট রাখবেন।

উপস্থাপন

সম্বন্ধস্থাপন বা তুলনাপর্বে শিক্ষার্থীর পূর্বলব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাথে নতুন আহরিত জ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। তুলনা বা সম্বন্ধ স্থাপনের কাজ শুধুমাত্র শিক্ষকই করবেন না—শিক্ষার্থীও এতে অংশগ্রহণ করবে।

সম্বন্ধ স্থাপন

যা শেখান হ'ল সেই জ্ঞানমূলক বিষয় থেকে শিক্ষার্থীদের একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, শিক্ষক শুধুমাত্র পথ নির্দেশ করবেন। সূত্রনির্ধারণ সাধারণতঃ জ্ঞানমূলক পাঠের (*knowledge lesson*) ক্ষেত্রে সম্ভব।

সূত্র নর্ধারণ

প্রয়োগ—এই স্তরে শিক্ষার্থী যা শিখল তা সে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পেরেছে কি না তার পরীক্ষা হয়। অর্জিত জ্ঞানের বাস্তবপ্রয়োগ করতে না পারলে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয়

বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারে নি বলেই ধরে নেওয়া হবে। বিষয়ানুসারী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে বা লিখতে দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ ও সে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে সক্ষম কি-না জানা যায়।

প্রয়োগ

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির বহু পরিবর্তন হয়েছে, অনেক নতুন শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে; কিন্তু সব কিছুর মূলেই রয়েছে শিশুকে জানা ও তার মনে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করা। শিশুমনের আগ্রহকে কেন্দ্র করেই কর্মকেন্দ্রীকশিক্ষা (*Activity centred education*) পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। হারবার্তের পঞ্চ-সোপান শিক্ষাপদ্ধতি কিছু পরিমাণে যান্ত্রিক হলেও শ্রেণী-শিক্ষায় এর উপযোগিতাকে আজও অস্বীকার করা যায় না। পাঁচটি স্তরকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি স্তর সৃষ্টি করে (প্রস্তুতি—উপস্থাপন—প্রয়োগ বা অভিযোজন) যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে শ্রেণীশিক্ষার ক্ষেত্রে আজও আমরা তা ব্যবহার করি। হারবার্ত শিক্ষকদের দর্শকের ভূমিকায় স্থাপন করেন নি। শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষকের যে একটা প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে তার স্বীকৃতি হারবার্তের মধ্যে পাই। শিক্ষায় অনুবন্ধ-প্রণালীর কার্যকারিতাকেও অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার যে প্রচেষ্টা পেষ্টালৎসী শুরু করেছিলেন, হারবার্ত শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করে পেষ্টালৎসীর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে পঞ্চ-সোপান পদ্ধতির গুরুত্ব

পঞ্চম অধ্যায়

ফ্রয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২)

শিক্ষায় নবযুগের সূচনা করেন রুশো। রুশোর শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন পেষ্টালৎসী। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাদর্শকে গঠনাত্মক রূপ দিতে গিয়ে তিনিই প্রথম অনুভব করেন শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে সর্বপ্রথম শিশুকে জানতে হবে, শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে। শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে তিনিই প্রথম সচেতনভাবে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য সচেষ্ট হন। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকায় তাঁর সদিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এ কাজে খুব অগ্রসর হতে পারেন নি। তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করবার দায়িত্ব তাঁরই উত্তর-সাধক হারবার্ত গ্রহণ করেন। তাঁরই পথ অনুসরণ করে তিনি শিক্ষা-পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিকভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ঠিক একই সময় পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন উইলহেলম ফ্রয়েবেল।

দক্ষিণ জার্মানীর এক মনোরম পার্বত্য পরিবেশে উইসব্যাক গ্রামে ফ্রয়েবেল (১৭৮২ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় ও পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় বালক ফ্রয়েবেল বিমাতার সংসারে পিতামাতার স্নেহময় সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হন। সঙ্গীহীন জীবনে পল্লী-প্রকৃতিই হয় তাঁর বাল্যজীবনের সাথী। বাল্যে প্রকৃতির এই নিবিড় সাহচর্যের ফলে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করে একটি প্রাণবান সত্তার। জীবন্ত প্রকৃতি, এই ধারণা তাঁর পরবর্তী জীবনে শিক্ষাদর্শে বিশেষ স্থান অধিকার করে। পল্লী-প্রকৃতির স্নেহময় আবেষ্টনীর মধ্যে বালক ফ্রয়েবেল রচনা করেছিলেন আপন ক্রীড়াক্ষেত্র। দশ বছর বয়সে তাঁর ধর্মযাজক মামা তাঁকে নিয়ে যান নিজের কাছে। এখানে এসে তিনি প্রথম শিক্ষার সুযোগ পান। কিন্তু শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। পনর বছর বয়সে তিনি বন-বিভাগে কাজ পান। এখানে কাজ করবার সময় প্রকৃতির সাথে পরিচয় আরও নিবিড় হয়। প্রকৃতির মধ্যে তিনি দেখতে পান এক অলৌকিক শক্তি—যে শক্তি প্রকৃতির মধ্যে তারই প্রকাশ দেখতে পান পৃথিবীর সর্বত্র। সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি ঐক্যের সূত্রের সন্ধান পান, প্রকৃতির সাথে এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে। বনবিভাগে দু'বছর কাজ করবার পর তিনি আবার লেখাপড়ায় মন দেন। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য, কিন্তু অর্থাভাবে পড়া ছাড়তে বাধ্য হন।

ফ্রয়েবেলের জীবনে প্রকৃতির প্রভাব

১৮০৫ খ্রীঃ ফ্রয়েবেল ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এখানে পেষ্টালৎসীর পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এখানেই প্রথম ফ্রয়েবেল নিজেকে প্রথম আবিষ্কার করেন—তাঁর মধ্যে যে সুপ্ত-শিক্ষক ছিল তা নিজ ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে। এখানে দু'বছর শিক্ষকতার পর তিনি ইভারডুনে দু'বছর পেষ্টালৎসীর কাছে থেকে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করলেও তিনি পেষ্টালৎসীর মধ্যে শিক্ষাপদ্ধতির কতকগুলি অসঙ্গতি আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শ সামঞ্জস্যহীন। তিনি যা বলেন কার্যক্ষেত্রে তাকে ঠিক ভাবে রূপায়িত করতে পারছেন না। মনে হয় তিনি নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফ্রয়েবেল পেষ্টালৎসীর শিক্ষানীতিকে সম্পূর্ণতা দেবার কাজে এগিয়ে আসেন।

পেষ্টালৎসীর প্রভাব

১৮১১ খ্রীঃ তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞান পাঠের জন্য প্রথমে গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮১৩ খ্রীঃ তিনি প্রুশিয়ার সৈন্যদলে যোগ দেন। সৈন্যদলের নিয়মানুবর্তিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা প্রভৃতি থেকে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮১৬ খ্রীঃ তিনি কলীহাউ গ্রামে *The Universal German Institute of Education* নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভবিষ্যৎ *kindergarten* শিক্ষাপদ্ধতির প্রস্তুতিপর্ব এখান থেকেই শুরু হয়।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রস্তুতি-পর্ব

এখানে তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য হয় শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ, এই আত্মবিকাশ (*Self Development*) হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শিক্ষার্থীরা এখানে বাগানে কাজ করত, নানা রকম জিনিস তৈরী করত—কাজের মধ্য দিয়েই স্বাধীন-ভাবে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ পেত। বাস্তব জগতকে চেনা আর সেই সাথে কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করবার জন্য নানা কাজ ও কাহিনীর অবতারণ করা হ'ত। দশ বছর এখানে কাজ করবার পর তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যে সব নতুন পদ্ধতির এখানে প্রয়োগ করেন তা লিপিবদ্ধ করে তিনি *The Education of Man* নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

এরপর তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁর উদ্ভাবিত নতুন শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রচারের জন্য তাঁকে সুইজারল্যাণ্ড নিয়ে যান। এখানে যাজকসম্প্রদায় তাঁর বিরোধিতা করলেও সুইস-সরকার তাঁর শিক্ষানীতি প্রবর্তনে আগ্রহ দেখান। ফ্রয়েবেল বার্গডর্ফে একটি অনাথ আশ্রম ও একটি শিক্ষকশিক্ষণ-কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দশ বছর কাল তিনি এখানে গবেষণা করেন। এই দীর্ঘ সাধনার ফলে তাঁর শিক্ষানীতি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এখানে কাজ করতে করতে তিনি শিক্ষার্থী জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্নস্তর ও স্তরভেদে আত্মবিকাশের উপযোগী কতকগুলি খেলা ও কাজ আবিষ্কার করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, শিশুকে উপযুক্ত রূপে গড়ে তুলতে হলে তার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত তিন বছর থেকে। শিশুর জন্য সার্থক শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে হলে মাতার সাহায্য অপরিহার্য। মায়ের কাছ থেকে যে শিক্ষা সে পাবে তা সে শিশুর জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

ফ্রয়েবেল তাঁর পরিণত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৮৩৭ খ্রীঃ ব্ল্যাকেন বুর্গ গ্রামে তিন থেকে সাত বছরের ছেলেদের জন্য একটি শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ তাঁর রচিত এই শিশু-উদ্যানটির নাম দেন কিণ্ডারগার্টেন। এই সার্থক নামটি বিশ্বের শিশুশিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে। বাগানের ছোট ছোট চারাগাছগুলি যেমন মালীর সযত্ন তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে একদিন ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনি শিশু-উদ্যানের শিশুরা সযত্ন-পালিত ও বর্ধিত হয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। খেলা, মনের মত কাজ ও গানের মধ্য দিয়ে এক আনন্দময় পরিবেশ রচিত হয় শিশু-উদ্যানের শিশুদের জন্য। সুইজারল্যাণ্ড থাকাকালীন ফ্রয়েবেল যে সব গান ও খেলা সৃষ্টি করেছিলেন তার সাথে শিশুর বিকাশের স্তর অনুসারে আরও গান ও খেলা সৃষ্টি করেন। উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলবার জন্য তিনি ব্ল্যাকেন বুর্গে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি ধীরে ধীরে জার্মানীর বাইরেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাদর্শ ও নীতি ছিল গণ-তান্ত্রিক, জার্মানীর শাসক ও যাজক সম্প্রদায় এই শিক্ষা পদ্ধতিকে সুনজরে দেখত না। ১৮৫১ খ্রীঃ প্রুশিয়ার সরকার এক হুকুম নামায় প্রুশিয়ার সমস্ত কিণ্ডারগার্টেন বন্ধ করে দেন। শেষ বয়সে এই মর্মান্তিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে ১৮৫২ খ্রীঃ তিনি মারা যান।

কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা ও নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ

ফ্রয়েবেল যখন তাঁর শিক্ষাদর্শ নিয়ে সাধনায় রত তখন ইউরোপে ভাববাদী-দর্শন বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। ফ্রয়েবেল এই ভাববাদী-দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিশু-উদ্যানের রচনাকারী বলে ফ্রয়েবেল খ্যাত হলেও তার কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির পশ্চাতে এক দার্শনিক তত্ত্ব আছে। ছেলেবেলায় প্রকৃতির উদার ক্রীড়াক্ষেত্রে একটি শিশু যে অনুভূতি লাভ করেছিল সেই অনুভূতি পরিণত বয়সে তার শিক্ষাদর্শকে প্রভাবিত করে। সমগ্র সৃষ্টির মাঝেই তিনি এক ঐশী-শক্তির অনন্ত প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যে শক্তি প্রকৃতির মধ্যে এক রূপে প্রকাশিত সেই শক্তিই মানুষের মধ্যে অন্যভাবে প্রকাশিত। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি এক অদৃশ্য ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ঐক্যের সন্ধান। জগৎ ও জীব সম্পর্কে এই যে সমগ্র দৃষ্টি তা তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও অনুসৃত হয়েছে। তিনি মনে করতেন সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলি বিকাশের স্তর আছে, প্রতিটি স্তরই অপরটির সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। মানুষের মনের বিকাশের ক্ষেত্রে একথা সত্য। তাই শিক্ষাদান কাজে শিক্ষার্থীর মনের বিকাশের ধারাকে লক্ষ্য রেখে বিষয়গুলি স্থির করতে হবে। এই বিকাশের ধারা স্বাভাবিক, বাইরের থেকে কোন বাধার আরোপ করলে, বা কিছু চাপিয়ে দিলে স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ হবে। মানুষের জীবন বিকাশের ধারায় শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন—একটির পর একটি স্তর পার হয়ে যায়, এগুলি পৃথক করে দেখলে একটিকে অপরটি থেকে স্বতন্ত্র মনে করলে ভুল করা হবে। আত্ম-বিকাশের ক্ষেত্রে একটি স্তর পূর্ববর্তী স্তরের উপর নির্ভরশীল। পরিপূর্ণতা লাভের পথে একটি স্তর থেকে অপর স্তরে উত্তরণই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। এই চলার পথে কোন ফাঁক নেই—সমগ্র পথটিই একই ঐক্যের সূত্রে গাঁথা। সামগ্রিক দৃষ্টি ও ঐক্যের উপর ফ্রয়েবেল বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির দার্শনিক ভিত্তি

প্রতীকের ব্যবহার ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য। বিশ্বব্যাপী যে ঐশী-শক্তির প্রকাশ, প্রতীকের মধ্য দিয়ে তিনি তার স্বরূপ বা মর্মার্থ তুলে ধরেছেন শিশুর কাছে। শিশু তার সহজাত বুদ্ধি আর কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রতীকের মর্মার্থ উপলব্ধি করে। শিশু যখন বারান্দার রেলিংগুলিকে ছাত্র কল্পনা করে পাঠশালা খুলে বসে তখন সে যে কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে সে প্রতীকের জগৎ। শিশুর বিকাশের স্তর অনুযায়ী প্রতীক স্বরূপ তিনি ছয়টি উপহার (*Gift*) ও অনেকগুলি হাতের কাজ আবিষ্কার করেছেন। প্রথম উপহার হচ্ছে নানা রঙের দু'টি উলের বল বা গোলক। গোলক হচ্ছে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের প্রতীক ; তাই একে ঈশ্বরের প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় উপহার হচ্ছে, কাঠের গোলক, ঘনক (*cube*) ও সিলিণ্ডার। গোলক গতিশীল, কিউব স্থিতিশীল, গোলকের একটি তল, কিউবের ছয়টি কিন্তু দুইটি ঘনত্ব গুণসম্পন্ন। সিলিণ্ডারটি গোলক ও ঘনকের সমন্বয়। দ্বিতীয় উপহারে একই সাথে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের ধারণা সুস্পষ্ট হবে। তৃতীয় উপহারের একটি ঘনক আটটি ভাগে

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রতীকের গুরুত্ব

ভাগ করা—এদিয়ে চেয়ার, সিঁড়ি, দরজা প্রভৃতি তৈরী করা হয়। চতুর্থ উপহারও আটটি লম্বা প্রিসম (*Prism*), পঞ্চম উপহার, একসাথে ঘনক ও প্রিসম, ষষ্ঠ উপহার, এক থেকে পঞ্চম উপহার এক সাথে মিলিয়ে, এসব জিনিস দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈরী করা যায়, বিভিন্ন আকৃতি ও সংখ্যা গণনা শেখান হয়। সপ্তম থেকে নবম উপহার কাঠ, কাঠের টুকরা, দড়ি, আংটি ইত্যাদি। এ দিয়ে পরিধি, পরিমাণ ও আয়তন সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। প্রতিটি উপহারের পিছনেই তিনি এক একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। সেই রহস্যময় ব্যঞ্জনার দিকে না গিয়েও প্রত্যেকটি উপহারের শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব উপযোগিতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে কাদা, বালি, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি দিয়ে নানা জিনিস তৈরী করতে শেখান হয়। এতে সৃজনী শক্তির বিকাশ, আত্মবিশ্বাস, হস্ত সঞ্চালনের দক্ষতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। নানা জিনিস সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। পেষ্টালৎসীই প্রথম হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রবর্তন করেন—ফ্রয়েবেল কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে ছবি আঁকা ও হাতের কাজ দুইয়ের উপরে বিশেষ জোর দেন।

প্রকৃতি পাঠ

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রকৃতিপাঠের ব্যবস্থা আছে। শিশুরা বাগানে কাজ করে ছোট ছোট ফুলের গাছ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে নানা জ্ঞান লাভ করে। পশুপাখীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

গান ও খেলা

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে শিশুদের মন মাতানো ছড়া ও গান। খেলা আর গানকে তিনি তাঁর শিক্ষায় অত্যন্ত উচ্চে স্থান দিয়েছেন। খেলার আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে—খেলার আনন্দের মধ্য দিয়েই শিশু কর্মের প্রেরণা পায়। ফ্রয়েবেল বলেছেন—"*Play is the highest achievement of child development at this stage, since it is spontaneous expression according to the necessity of its own nature of the child's inner being.*

ছেলেদের গানের মধ্যে ৭টি মায়ের গান ও ৫০টি খেলার গান। গানগুলির সাথে রয়েছে নানা বর্ণের ছবি আর নাচ। গানের সাথে নানা রকম নাচের মধ্য দিয়ে শিশুদের অঙ্গসঞ্চালন হয়। এছাড়া গানের সাথে মার্চের শিক্ষা দেওয়া হয়, কাজের সাথে সাথে গানের ব্যবহারও আছে। গান ও খেলাগুলি শিশুর বিকাশের স্তর অনুযায়ী করা হয়েছে।

শিশু শিক্ষায় গল্প

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে গল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। শিশুরা গল্প শুনতে ভালবাসে তাই গল্পের মধ্য দিয়ে যা শেখান হয় তা তারা আনন্দের সাথেই শেখে। এতে ভাষা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। শিশুর কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করা হয়। দেহের জন্য যেমন খেলা, মনের খোরাক তেমনি গল্প। একটায় দেহের অপরটায় মনের তৃপ্তি।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা বলা হয়। তাঁর উদ্ভাবিত

প্রতীকের রহস্যময় ব্যাখ্যা ও ভাববাদী আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে শিক্ষানীতিকে জড়িয়ে ফেলায় অনেক সময় তাঁর শিক্ষাদর্শ দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিতে লেখা ও পড়া একেবারে শেষ স্তরে স্থান পেয়েছে। লেখা ও পড়াকে যথোচিত গুরুত্ব তিনি শিশুর শিক্ষায় দেন নি। তার বিরুদ্ধসমালোচনা সত্ত্বেও শিশু-উদ্যানের অভিনবত্ব-শিক্ষায় এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে। শিশু-শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্রয়েবেল প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব অনস্বীকার্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হারবার্ত স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩)

উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে স্পেন্সার একজন বিশিষ্ট দার্শনিক। অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি সমসাময়িক কালে চিন্তাজগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন; কিন্তু উনবিংশ শতকে তিনি দার্শনিক রূপে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বিংশ শতকে আজ তা অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। তাঁর নিজের যুগ তাঁর প্রতিভার যে সম্মান দিয়েছিল তার কতকগুলি ত্রুটির জন্য পরবর্তী যুগ তাঁকে আর সে সম্মান দেয় নি। স্পেন্সার দার্শনিকরূপে প্রধানতঃ পরিচিত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রও তাঁর চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়েছে। চিন্তাজগতে তিনি ছিলেন একান্তই নিঃসঙ্গ। চিন্তার ক্ষেত্রে এই নিঃসঙ্গতাই তাঁর শক্তি ও দুর্বলতার উৎস। অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাথে যেখানেই মতের অমিল হয়েছে সেখানেই তিনি তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন। এই পরমত অসহিষ্ণুতা তাঁর অন্যতম দুর্বলতা। তিনি ছিলেন স্বভাব-বিদ্রোহী, স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী ও নিজের মতামত সম্পর্কে অত্যন্ত গোঁড়া। স্পেন্সারের চেষ্টায় ইংল্যাণ্ডের শিক্ষানীতি বৈজ্ঞানিক প্রভাবে প্রভাবিত হয় ও সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। আধুনিক যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের যে দাবি তা স্পেন্সারের চিন্তায় প্রথমেই মুখর হয়ে উঠেছিল।

স্পেন্সারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৈজ্ঞানিক

১৮২০ খ্রীঃ ডার্বি শহরে স্পেন্সার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন শিক্ষক ও বিজ্ঞান বিষয়ে ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। বাল্যে পিতার কাছ থেকে স্পেন্সার জড়বিদ্যা ও রসায়নের মূল তত্ত্বগুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন কিন্তু সেখানে প্রাচীন রীতিতে ল্যাটিন ও গ্রীক শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হ'ত, বিজ্ঞান বিষয়ক চর্চা ও গবেষণার সুবিধা না থাকায় তিনি সেখানে শিক্ষা-গ্রহণে অস্বীকার করেন ও নিজ অভিরুচিমত বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় রত থাকেন। এই সময় তিনি লক্ষ্য করেন, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি পরস্পরের সাথে নিবিড় সম্বন্ধ-

শিক্ষা

যুক্ত। এই ধারণাকেই তিনি পরবর্তীকালে একটি সুসংহত রূপ দিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে সুসমন্বিত দর্শন (*Synthetic Philosophy*) রূপে দাঁড় করাতে যত্নবান হন।

১৮৩৭ খ্রীঃ তিনি তাঁর পিতার সহকারীরূপে শিক্ষকতায় যোগ দেন। একাজে তিনি বেশীদিন ছিলেন না। এর পর তিনি দশ বছর রেলের ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করেন। একাজেও তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। এর-পর তিনি লেখকের বৃত্তি গ্রহণ করেন ও বিখ্যাত 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত এখানে কাজ করবার পর তিনি স্বাধীনভাবে লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর চিন্তার-ক্ষেত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি দিক কমই আছে যেদিকে প্রসারিত হয় নি। এদিক থেকে তিনি ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে অনন্যসাধারণ। তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী সমালোচক কিন্তু তাঁর সমালোচনায় গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। তিনি এই শক্তিকে প্রধানতঃ পরের ছিদ্রানুসন্ধানেই নিয়োগ করেছেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির সাথে হৃদয়-বৃত্তি ও সহানুভূতির যোগ স্থাপন করতে পারেন নি বলেই তাঁর প্রতিভার একটা বিরাট অংশ অপচয়িত হয়েছে। *S. J. Curtis* ও *M. E. A. Boult Wood* তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—"*Rarely in history of human-thought has such a high degree of intellectual power been exercised to so little lasting purpose* (*A short History of Educational Ideas*)

স্পেন্সারের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষাক্ষেত্রে স্পেন্সারের দান ১৮৫১ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৯ খ্রীঃ পর্যন্ত লেখা চারটি প্রবন্ধের মধ্যেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ। ১৮৬০ খ্রীঃ এই প্রবন্ধ চতুষ্টয় "*Education Intellectual, Moral, Physical*" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। স্পেন্সার ছিলেন পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। ব্যক্তির জীবন বিকাশে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ তিনি সর্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার অসারতার আলোচনার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রবন্ধ শুরু করেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটি আলোচনা করে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষা হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন যাপনের প্রস্তুতি (*Preparation for complete living*)। শিক্ষার সাধারণ সংজ্ঞা থেকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণায় পৌছান যায় না। তাই তিনি জীবনের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ আত্মরক্ষণ (*Self Preservation*) মূলক কাজের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন। স্পেন্সার বলেন, বিজ্ঞানের যে সব বিষয় আত্মরক্ষণ ও জীবনের সুস্থ সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত, পাঠ্যবিষয়ে তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি জীবনের প্রয়োজন সাধনকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে নির্দেশ করেছেন। কোন বিষয় শিক্ষণীয়, কোন বিষয়ের কি মূল্য তা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে স্থির হবে। যা ব্যক্তির জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারে তাই শিক্ষা হিসাবে

শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত

মূল্যবান। এদিক থেকে প্রয়োগবাদী দর্শনের সাথে তাঁর মিল আছে। জীবনে কোন বিদ্যা কতটুকু প্রয়োজনে আসতে পারে তাই বিচার করে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের আপেক্ষিক মূল্য স্থির করেছেন ও জীবনে তাদের মূল্যানুসারে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। যে সমস্ত কাজ জীবন রক্ষায় (*Self Preservation*) প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক তার মূল্য সর্বাধিক। তারপর তিনি স্থান দিয়েছেন যে সব কাজ জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহে গৌণভাবে সাহায্য করে। তৃতীয় হচ্ছে, সন্তান পালনের জন্য অত্যাবশ্যক কাজসমূহ। চতুর্থ, ব্যক্তির সামাজিক সম্বন্ধ নির্ণয় ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ। অবসর বিনোদন ও আনন্দ বিধানের উপায় স্বরূপ সাহিত্য বিষয়ক পাঠকে তিনি পাঠক্রমের সর্বনিম্নে স্থান দিয়েছেন। শিক্ষার এই গুরুত্ব নির্ণয়ক স্তর-বিভাগ থেকে বিষয়গুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ভুল হবে—এগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়েই শিক্ষাকে সার্থক ফলপ্রদ করে তুলবে।

শিক্ষায় প্রয়োগবাদী চিন্তার সহিত মিল

স্পেন্সার ছিলেন ইতিহাসের কঠোর সমালোচক। সে যুগের ইতিহাস ছিল রাজা রাণীর কাহিনী আর রাজদরবারের ও রাজঅন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রের বিবরণে পূর্ণ। এই জাতীয় ইতিহাস পাঠে সমাজের বিকাশ, সমাজের রীতিনীতি, দেশের অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু জানবার বা কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা জন্মাবার পক্ষে সহায়ক ছিল না। তাই এই জাতীয় ইতিহাস স্কুলের ছেলেদের পড়ানোর কোন সার্থকতাই নেই—স্পেন্সারের এই মত অনেকেই সমর্থন করেন। ইতিহাসের স্থলে এইজন্য তিনি বিবরণমূলক সমাজ-বিজ্ঞান (*Descriptive sociology*) পড়ানোর কথা বলেছেন। স্পেন্সারের পর থেকে দেশের সামাজিক ও শিল্পোন্নতির কাহিনী আধুনিক ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। স্পেন্সার দার্শনিক মিলের মত চিন্তার শৃঙ্খলা নির্ধারণে বিষয়ের প্রভাবকে স্বীকার করতেন। এজন্য তিনি পাঠক্রম নির্ধারণে বিজ্ঞান বিষয়সমূহকে সাহিত্য ও কলা বিষয়ক বিষয়সমূহ অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইতিহাস সম্পর্কে অভিমত

স্পেন্সার তার বৌদ্ধিক শিক্ষা (*Intellectual learning*) প্রবন্ধে তোতাবৃত্তি ও বস্তুগত শিক্ষার অপব্যবহারের নিন্দা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি শিক্ষাপদ্ধতির সুপরিচিত নীতিসমূহ (*Maxims of Education*) গঠন করে শিক্ষাপদ্ধতিতে তার ব্যবহারের কথা বলেন। বহু আলোচিত তাঁর শিক্ষানীতিগুলিতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-পদ্ধতিতে কি রীতি অনুসৃত হবে সে সম্পর্কে কতকগুলি নিয়মকে মেনে চলতে বলেছেন—(১) সহজ থেকে জটিলের দিকে যাওয়া (*Proceed from simple to complex*), (২) অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টের দিকে যাওয়া (*from indefinite to definite*), (৩) মূর্ত হতে বিমূর্তের দিকে যাওয়া (*from concrete to abstract*), (৪) শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা ও ধারা মানুষের জীবনধারার ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা অনুসারী হওয়া (*Racial Recapitulation*), (৫) অভিজ্ঞতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে

শিক্ষানীতি : Maxim of Education

যুক্তির দিকে যাওয়া (*from empirical to rational*), (৬) শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা। শিক্ষাসম্পর্কীয় এই নীতিসমূহ শিক্ষা-পদ্ধতি বিজ্ঞানকে যথেষ্ট প্রগতিশীল করেছে, আবার ঠিক আক্ষরিকভাবে এই নীতি-সমূহের প্রয়োগ প্রচেষ্টা বিভ্রান্তির সৃষ্টিও করতে পারে। যদি সহজ থেকে জটিলের দিকে যাবার সাধারণ নীতিটি সম্পর্কে বিচার করা যায় তাহলে দেখি 'সহজ' কথাটি যেভাবে আমরা বুঝি ঠিক সেইভাবে শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করলে সর্বক্ষেত্রেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না। 'সহজ' কথাটি আপেক্ষিক (*relative*), একে শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। যা যুক্তির দিক থেকে সহজ বলে আমাদের মনে হয় মনবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করে দেখা গিয়েছে, তা সব সময় সহজ নয়। আমরা জানি একটি সম্পূর্ণ বাক্য শেখানোর আগে একটি একটি করে শব্দ শেখান যুক্তির দিক থেকে সঙ্গত। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেছে একটি একটি করে শব্দ না শিখিয়ে ছোট ছোট বাক্য দিয়ে শুরু করলে ভাষা শেখান সহজ হয়। অর্থাৎ যুক্তি নির্ভর হয়ে শিশু-মনোবিজ্ঞানের দিকে চোখ বুজে থাকলে সহজ-কঠিন বুঝতে ভুল হবে।

স্পেন্সার মনে করতেন জ্ঞান সঞ্চয় করলেই বিশেষ শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। একথা তিনি বিচার করেন নি যে, জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি হলেই হয় না—তার প্রয়োগ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজন আরও বেশী। স্পেন্সার পূর্ণ বয়স্কের প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মূল্য নির্ধারণ করেছেন—কিন্তু একথা বিচার করেন নি, যা পরবর্তী জীবনে বয়স্কদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় হতে পারে, শিশুর কাছে তা অর্থহীন। কারণ, যে স্তরে পৌছালে শিশু সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করবে বা বুঝতে পারবে শিশু সে স্তরে পৌছাবার পূর্বেই তাকে তা শেখাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

জ্ঞানসঞ্চয় ও তার প্রয়োগ

শিক্ষায় বিজ্ঞানের দাবিকে মেনে নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের শিক্ষায় এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের যেটুকু সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার শিক্ষাক্রমে তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আর যেখানে উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানের সূত্রগুলি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেখানে তার কার্যকরী প্রয়োগ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। যে যুগে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, বিভিন্ন শিল্পে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ হচ্ছে, সেই সময় শিক্ষায় বিজ্ঞানের প্রতি অবহেলাকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। তাঁর লেখায় হিউরিষ্টিক (*Heuristic*) শিক্ষাপদ্ধতির সমর্থন পাওয়া যায়। শিশু নিজেই পর্যবেক্ষণ করবে, নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তাকে খুব কম বলা হবে, যত বেশী সে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে—স্পেন্সার বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাই চেয়েছেন।

শিক্ষায় বিজ্ঞানের স্থান

স্পেন্সার নৈতিক-শিক্ষা প্রবন্ধে শিক্ষায় প্রকৃতিবাদ মতাবলম্বীদের সমর্থন করেছেন। উপযোগবাদীদের (*Utilitarian*) মত তিনি বলেন, যে আচরণের সামগ্রিক ফলাফল

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিতকর সে আচরণই ভাল আচরণ। আর যে আচরণের ফলাফল অহিতকর সেই আচরণই মন্দ আচরণ। মানুষের আচরণে সুখ বা দুঃখ কি ফল লাভ হ'ল তারই মাপকাঠিতে সেই আচরণ ভাল কি মন্দ বিচার হবে।

প্রকৃতিবাদ

স্পেন্সার নৈতিক-শিক্ষা বিষয়ে স্বাভাবিক শৃঙ্খলাকে শ্রেয়ঃ মনে করতেন। তিনি বলেন "*Nature illustrates to us in simplest way the true theory and practice of moral discipline.*

শৃঙ্খলা

শাস্তি সম্পর্কেও তিনি প্রকৃতিবাদীদের মত বলেছেন, অন্যায় কর্মের ফল শিশু স্বাভাবিকভাবেই লাভ করবে। যে ছেলে সবার সাথে যেতে চাইবে না সে সঙ্গীহীন হয়ে একা পড়ে থেকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। যে ছেলে রোজ খেলনা ভাঙ্গে তা থেকে সে বঞ্চিত হবে—এজন্য তাকে অন্য শাস্তি দিতে হবে না। অবশ্য স্বাভাবিক শাস্তির জন্য শিশুকে ছেড়ে দেওয়ার একটা সীমা আছে। তিন বছরের একটি শিশু যদি ধারাল ক্ষুর নিয়ে খেলতে থাকে তাহলে নিজের কৃতকর্মের ফল সে নিজে ভোগ করবে বলে ছেড়ে দেওয়া চলে না—এক্ষেত্রে শাসনের প্রয়োজন আছে। স্পেন্সার শাস্তির প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্তির দিক থেকে বিচার করেছেন, সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করেন নি।

শাস্তি

স্পেন্সারের শেষ দৈহিক-শিক্ষা প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান। সে সময় শিক্ষার্থীর পুষ্টির জন্য খাদ্য, খেলা, নিয়মিত ব্যায়াম ও বিশ্রাম এসব দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হ'ত না। এ সম্পর্কে তাঁর লেখা পরবর্তী যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মুক্ত বায়ু, পুষ্টিকর খাদ্য, দৈহিক ব্যায়াম, যথাযোগ্য বস্ত্র এ সব যে শিক্ষার সাথে দরকার একথা তিনি জোরের সাথে বলেন। আর আজ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ করবার কোন স্থান নেই।

দৈহিক-শিক্ষা

স্পেন্সারের পর আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি তবু ঊনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের প্রাচীনপন্থী শিক্ষাধারা ও শিক্ষাচিন্তায় তিনি এক বিরাট পরিবর্তনের দ্বার মুক্ত করেন। শিক্ষায় আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চার প্রয়োজনীয়তাকে তিনিই ইংলণ্ডের জনসমক্ষে তুলে ধরেন ও তাঁরই চেষ্টায় সেখানে বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। বিষয় নির্বাচনে গতানুগতিক প্রথার অনুবর্তন করা হ'ত। তার প্রয়োজন বা মূল্যের বিচার করা হ'ত না। শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের আপেক্ষিক মূল্য স্থির করে তিনিই প্রথম জীবনে কোন বিদ্যার (বিষয়ের) কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত তা স্থির করে পাঠক্রম নির্ধারণ করেন। শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই এই পরিমাপ সম্ভব কি সঙ্গত নয় তবুও তাঁর শিক্ষাদর্শের এই দিকটি জীবনের প্রকৃত সমস্যা সমাধানে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য "পরিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্তুতি" এই মতবাদকে আশ্রয় করেই তিনি প্রয়োজনের মাপকাঠিতে শিক্ষার মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর এই প্রয়োজনধর্মী শিক্ষার প্রতিধ্বনি

মূল্যায়ন

আমরা *Pragmatic* দর্শনের মধ্যে শুনতে পাই। স্পেন্সারের এই আদর্শটিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত বলে সমালোচনা করা হয়, কারণ তিনি ব্যবহারিক জীবনের উপকরণগুলির উপর ও ব্যক্তির কল্যাণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু আত্মরক্ষামূলক (*Self Preservation*) বিষয়ের গুরুত্বকে কি আমরা বাস্তব-ক্ষেত্রে অস্বীকার করতে পারি—ব্যক্তির সংরক্ষণ কি সমাজ-সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নয় ? তাঁর আর একটি ত্রুটি জ্ঞানার্জনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি। তাঁর স্তরবিভাগ সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু তিনিই শিক্ষায় জ্ঞানের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার স্থান নির্ধারণ করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়

মেরিয়া মন্তেসরী (১৮৭০-১৯৫২)

ফ্রয়েবেলের পর যে মহীয়সী মহিলা নব নব উদ্ভাবনী শক্তিদ্বারা শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেছেন তার নাম মেরিয়া মন্তেসরী। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীতে সে প্রচেষ্টা সার্থক রূপ লাভ করে। বহু শিক্ষাবিদ্ আধুনিক শিশু-শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের সবার দানেই আজকের শিক্ষা "শিশু-কেন্দ্রীক শিক্ষা" রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রূপায়ণে মন্তেসরীর দান অবিস্মরণীয়। তিনি শিক্ষা-দার্শনিক ছিলেন না। চিকিৎসার ক্ষেত্র থেকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আসেন। ১৮৭০ খ্রীঃ ইতালীর চিরাভেলীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, ডি, উপাধি লাভ করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান-সম্মত মানসিক চিকিৎসালয়ের সহকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এখানে কিছুদিন অভিজ্ঞতা লাভের পর তাঁকে *Orthoprenic* স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখানে পরিচালিকা রূপে তিনি স্বল্পবুদ্ধি বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাদের শিক্ষার জন্য ফরাসী চিকিৎসক এডওয়ার্ড সেগুঁইন আবিষ্কৃত ও অনুসৃত পশ্চাৎপদদের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে ডাঃ মন্তেসরী বিশেষ ফল লাভ করেন। এখানে পশ্চাৎপদ্ শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে কয়েকটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন ও রোমের কয়েকটি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে আশাতীত ফল লাভ করেন। তখন তাঁর মনে হয় স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন পশ্চাৎপদ্ শিশুদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে, সুস্থ স্বাভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে তা অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হবে। এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর নব-উদ্ভাবিত শিক্ষা পদ্ধতি এক নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ এসে যায়। *The Roman Association for Good Building*

নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

নামক একটি প্রতিষ্ঠান বস্তির তিন থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৯০৪ খ্রীঃ *Casadei Bambini* বা *Children's House* নামে শিশুনিবাস স্থাপন করে। বস্তি সঙ্ঘ এই শিশুনিবাস পরিচালনার জন্য মন্তেসরীকে আহ্বান জানায়। এখানে তিনি চার বছর কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষা-প্রণালী "শিশু নিবাসের" শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করে তিনি সাফল্য লাভ করেন। এরপর তিনি তাঁর শিক্ষাপ্রণালী প্রচারের জন্য বই লেখেন। ধীরে ধীরে তাঁর অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি বহু বিদ্যালয়ে অনুসৃত হতে থাকে। বর্তমান বিশ্বে শিশুশিক্ষার পদ্ধতিরূপে মন্তেসরী-পদ্ধতি সর্বত্রই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যে সব শিক্ষাপদ্ধতি শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে, মন্তেসরী প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি তার মধ্যে অন্যতম।

রুশোর প্রভাব, শ্রেণী শিক্ষার বিলোপ

রুশোর পরবর্তী অন্যান্য বহু শিক্ষাবিদের মত মন্তেসরীও রুশোর আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মন্তেসরীর শিক্ষানীতিতে শিশুর ব্যক্তিত্ব, তার স্বাভাবিক প্রবণতা, তার বিশেষ আগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান আহরণের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা হবে শিশু-কেন্দ্রীক, প্রতিটি শিশুর একটি নিজস্ব সত্তা আছে, শিশুর শিক্ষা অগ্রসর হবে তার বিকাশের স্তর অনুসরণ করে। শ্রেণীগত শিক্ষায় শিশুকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি শ্রেণীশিক্ষা (*Class teaching*) অবৈজ্ঞানিক বলেছেন। তাঁর শিক্ষায় প্রতিটি শিশু একটি *unit*, শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এখানে নেই। বিভিন্ন শিশুর বিকাশের গতি বিভিন্ন, তাই পরিচালিকার কাজ হবে সেই বিকাশের গতি-প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে তার শিক্ষাব্যবস্থা করা। এজন্য শিক্ষাবিদ্ এডামস্ বলেছেন, "*...that the knell of class-teaching has been rung. The question who tolled the bell ?...the evidence seems to point to Dr. Montessori*" (*Modern Development in Educational Practice—Sir John Adams*)।

স্বাধীনতা পুরস্কার বা তিরস্কার নয়

মন্তেসরী-শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হচ্ছে স্বাধীনতা, প্রতিটি শিশু নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী এককভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে। পুরস্কারের লোভ বা তিরস্কারের ভয় দেখিয়ে শিশুকে দিয়ে জোর করে কিছু করান অস্বাভাবিক। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয়, শ্রেণী-শিক্ষার বন্ধনে বেঁধে রাখলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথই রুদ্ধ হবে। প্রাণচঞ্চল শিশুদের ক্লাসে আটকে রাখার অবস্থাকে তিনি "পিনে বদ্ধ সারি সারি প্রজাপতির" সাথে তুলনা করেছেন। স্বাধীনতা অর্থে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় দিতে বলেন নি, ছেলেদের শৃঙ্খলমুক্তির কথাই বলেছেন। স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হবে স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্জাত শৃঙ্খলার (*Internal of Free discipline*) মধ্য দিয়ে।

মন্তেসরী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমগ্র সত্তার সুসামঞ্জস্য পরিপূর্ণ বিকাশের কথাই ভেবেছেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে নিজের চেষ্টায় শিক্ষা করবার সুযোগ দেওয়া

হয়। শিখবার সাজসরঞ্জাম তাকে দিলে শিশু নিজেই শিখবার চেষ্টা করবে। এজন্য তিনি কতকগুলি খেলনার উদ্ভাবন করেন। খেলনাগুলি এমনভাবে তৈরী যদি শিশু কোন ভুল করে তাহলে নিজেই ভুল শুধরে নিতে পারবে। একে বলা হয় স্বয়ং-শিক্ষা (*Auto education*)। শিশুর কাজে পরিচালিকা যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করবেন।

স্বয়ং-শিক্ষা

মন্তেসরী-শিক্ষানিকেতনে শিক্ষিকা নেই, আছে পরিচালিকা (*Directress*)। তিনি শাসন করবেন না, সাহায্য করবেন। জননীর স্নেহ নিয়ে পরিচালিকা সর্বদা পাশে থাকবেন। পরিচালিকাকে শিশুর মনস্তত্ত্ব জানতে হবে। শিশুরা সেখানে নিজের আগ্রহে খেলবে, শিখবে, কোথাও কাজ করবে। পরিচালিকা তাদের সবার দিকে লক্ষ্য রাখবেন, উৎসাহ দেবেন, প্রয়োজন হলে তাদের সাথে খেলায় মাতবেন, কোথাও ওদের কাজের সঙ্গী হবেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিশুরা মগ্ন থাকবে যার যার কাজে। এথ যে কোন জোর নেই বা জবরদস্তি নেই, কোন নিপীড়ন নেই। ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে কাজ করাবার চেষ্টা তিনি করবেন না। একক বা দলবদ্ধভাবে 'শিশু নিবাসের' শিশু-শিক্ষার্থীরা যে শৃঙ্খল ও সুরুচির পরিচয় দেয় তা স্বাধীনতারই ফল। কোন শিশুর কাজে যদি অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মায় তাহলে সেখানে পরিচালিকা হস্তক্ষেপ করেন।

শিক্ষিকা নয়, পরিচালিকা

মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর ইন্দ্রিয়-নিচয়ের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন *Didactic Apparatus* পরিকল্পনা করেছেন। এতে আছে নানা আকারের নানা মাপের কাঠের ফলক ও কাঠের লাঠি, কাঠের সিলিণ্ডার, রঙীন পুতুল, ধাতুর ঘণ্টা, মঞ্চ, কাঠের সিঁড়ি, বিভিন্ন শব্দ উৎপাদনের জন্য বন্ধ কাঠের বাক্স, বড় বড় হরফে লেখা কাঠের রঙীন বর্ণমালা, কার্ডবোর্ডের বাক্সে কার্ডের উপর লেখা বিভিন্ন অঙ্ক ইত্যাদি। এসব উপকরণ দিয়ে ছেলেদের রঙ চেনা, স্পর্শ শক্তি ও স্মরণ-শক্তির বিকাশ, বিভিন্ন আকৃতি ও আকাশ সম্পর্কে ধারণা, অক্ষর সম্পর্কে ধারণা, সংখ্যার প্রতীক দণ্ডের সাহায্যে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গণনা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

Didactic Apparatus

শিশুরা বিদ্যালয়ে এলে প্রথমে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। হাতমুখ ধোয়া, স্নান করা, পোষাকপরিচ্ছদ পরা, তারপর ধীরে ধীরে ঘর পরিষ্কার, বাসনপত্র পরিষ্কার, খাবারের টেবিল সাজান, সবই যাতে তারা নিজেরা করতে পারে সেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শরীর চর্চার জন্য বিভিন্ন প্রকার খেলনা, গানের সাথে নাচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

স্বাবলম্বনের শিক্ষা

শিক্ষানিবাসের সাথে বাগানের ব্যবস্থা রাখা হয়। এখানে প্রকৃতি-পাঠের মাধ্যমে উদ্ভিদ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে, এছাড়া পশু পালনের ব্যবস্থা করে পশুজীবনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করা হয়।

শিশুরা ছবি আঁকতে ভালবাসে। তাদের নানারকম রঙীন পেন্সিলে প্রথমে আঁকতে শেখান হয় পরে তুলি দিয়ে আঁকতে দেওয়া হয়।

মন্তেসরী পদ্ধতিতে লেখা ও পড়া একসাথে শেখান হয়। মোটা কাগজের অক্ষর কেটে শিরিষ কাগজ এঁটে দিয়ে তার উপর আঙ্গুল চালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। আঙ্গুল চালনা করবার সময় শিক্ষকের সাথে সাথে শব্দটির বারবার উচ্চারণ করে, অক্ষরটির সাথে পরিচয় ঘটে। গণনা শিক্ষায় প্রথম টাকা আনা-পয়সার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ১ থেকে ১০ ইঞ্চি দাগ দেওয়া কাঠির সাহায্যে গণনা লিখতে ও পড়তে শেখান হয়। শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী পদ্ধতি দুই-ই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মন্তেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে বহু ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে কিণ্ডারগার্টের নামে পরিচিত শিশুবিদ্যালয়ে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় মিশ্রপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। দুইটি শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ঐক্য রয়েছে কিন্তু বৈষম্যও কম নয়।

শিক্ষা-পদ্ধতি

ফ্রয়েবেল (কে. জি.) ও মন্তেসরীর শিক্ষা-পদ্ধতির তুলনা ঃ

মন্তেসরী পদ্ধতিতে শিশুদের ব্যক্তিগতভাবেও খেলার কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। কিণ্ডারগার্টেন (কে. জি) ব্যবস্থায় দলগতভাবে কাজ করা হয়। কে. জি পদ্ধতিতে শিক্ষিকা শিক্ষা পরিচালনা করেন। মন্তেসরী ব্যবস্থায় পরিচালিকা শিশুর কাজের দিকে শুধু দৃষ্টি রাখেন। শিশু কোন উপহার (*Gift*) নিয়ে খেলবে কে. জি-তে তা শিক্ষিকা ঠিক করে দেন, খেলা ও কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে। মন্তেসরী পদ্ধতিতে শিশু নিজের ইচ্ছামত খেলনা নিয়ে খেলা করে—খেলার বা কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই—শিশু যতক্ষণ খুশী খেলতে পারে। মন্তেসরী শিশুদের কাছে অধিক গল্প বা রূপকথা বলার বিরোধী। ফ্রয়েবেল মনে করতেন, গল্পের মধ্য দিয়ে শিশুদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফ্রয়েবেলের *Gift*-এর পিছনে একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে কিন্তু মন্তেসরীর *Didactic Apparatus*-এর পিছনে কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্য বা গূঢ় অর্থের কল্পনা করা হয় না। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থায় লেখা-পড়া ও বইয়ের ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নি। মন্তেসরী পদ্ধতিতে বইয়ের ব্যবহার ও লেখাপড়া শেখায় যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে শিশুকে স্থাপনের যে প্রচেষ্টা রুশোর সময় থেকে শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে সেই আন্দোলন সার্থকতা লাভ করে। শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা-আন্দোলনের সার্থকতায় মন্তেসরীর দান অপরিসীম। শ্রেণীশিক্ষার বিলোপ-সাধন করে তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন তা শিক্ষাক্ষেত্রে এক সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। শিশুর বিকাশের জন্য সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হলেও ত্রুটি তার শিক্ষাপ্রণালীতে দেখা যায়। তিনি ইন্দ্রিয়-শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন কিন্তু কল্পনাশক্তির বিকাশ ও গঠনমূলক কাজের দিকে ততটা জোর দেন নি। কয়েকটি নির্দিষ্ট শিক্ষা-উপকরণ নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা করায় শিশুর আত্মবিকাশ কিছুটা ব্যাহত হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মন্তেসরী-পদ্ধতি শিক্ষার এক নতুন ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে।

মন্তেসরীর অবদান

অষ্টম অধ্যায়

জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাধারা যে দু'জন শিক্ষাবিদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে জন ডিউই তাঁদের অন্যতম। ডাঃ মন্তেসরী ও ডিউই দুজনেই উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রধানতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সীমাবদ্ধ। মন্তেসরী ছিলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ; তিনি মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে সব সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর প্রচেষ্টা শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ডিউই ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। আধুনিক শিক্ষার বিবর্তনে তাঁর অবদানকে বুঝতে হলে তাঁর দর্শনকে বুঝতে হবে। ডিউইর শিক্ষা সম্পর্কীয় অভিমত ও দর্শন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ১৮৫৯ খ্রীঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বার্লিনটন গ্রামে এক সাধারণ পিউরিটান পরিবারে জন ডিউই জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে বিদ্যালয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ভারমণ্ট বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার পর তাঁর বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে স্নাতক শ্রেণীর পাঠ শেষ করে পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পান। কিছুকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর তিনি গবেষণামূলক বিশ্ববিদ্যালয় হপকিন্সের দিকে আকৃষ্ট হন। এখানে তিনি খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী ষ্টানলী হল ও প্রয়োগবাদী (*Pragmatist*) দার্শনিক চার্লস পিয়ার্সের সাথে পরিচিত হন। হপকিন্সের *Ph. D.* ডিগ্রী নিয়ে সেখান থেকে তিনি মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এরপর আবার ফিরে মিচিগান ও পরে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন।

প্রস্তুতি পর্ব

চিকাগো থাকাকালীন ১৯০১ খ্রীঃ তিনি তাঁর স্ত্রীর সহায়তায় স্কুল খোলেন। এই বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে তিনি তাঁর শিক্ষানীতি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। তিনি স্কুলটির নাম দেন *Laboratory School* ; বর্তমানে এই বিদ্যালয় ডিউই স্কুল নামে খ্যাত। এই বিদ্যালয়টি হচ্ছে আধুনিক যুগের প্রথম গবেষণামূলক বিদ্যালয়। ডিউই হলেন এই বিদ্যালয়ের পরিচালক (*Director*)। শিক্ষা সম্পর্কে ডিউই যে সব গবেষণা করেছিলেন ও নীতি নির্ধারণ করেছিলেন এখানে স্বাধীনভাবে তার পরীক্ষা শুরু করেন। নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। মাত্র ১৬ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় শুরু হয়, সুপরিচালনার গুণে অল্পদিনের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা হয় ১৫০ জন। এই সময়ে এলাফ্লাগ নামে এক মহিলা ডিউইর সাথে যোগ দেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক শিক্ষিকা। ডিউইর শিক্ষা-পদ্ধতির অভিনবত্বে আকৃষ্ট হয়ে তিনি এখানে আসেন ও দীর্ঘদিন অধ্যক্ষের কাজ করেন। এই বিদ্যালয়ের সাফল্যের জন্য ডিউইর স্ত্রীও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন এই বিদ্যালয়ের ভাষাশিক্ষা বিভাগের প্রধানা।

গবেষণামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এই *Laboratory School*-এ ডিউই সমস্যামূলক শিক্ষাপদ্ধতির (*Problem Method*) প্রথম প্রয়োগ করেন। এই শিক্ষাপদ্ধতিই তাঁর শিষ্যরা বিশেষ করে কিউপ্যাট্রিক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে *Project Method* বা কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষা-পদ্ধতিতে রূপ দেন। ডিউই স্কুলে চার থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেরা নানারূপ কাজ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করে। পূর্বনির্দিষ্ট ধরা বাঁধা কোন শিক্ষাপদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয় না, স্বতন্ত্রভাবে কোন বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীরা নানারূপ গঠনমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করতে করতে তারা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করে। চিরাচরিত শিক্ষা-পদ্ধতির দোষত্রুটি-গুলি দূর করবার জন্য বৃহত্তর সমাজ জীবনে প্রবেশ করে শিশুকে যে সব কাজ জানতে হবে—যেমন রান্না, ছুতোরের কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলেন। বিদ্যালয় এখানে বৃহৎ মানব সমাজেরই অংগ—সমাজের প্রতিচ্ছবি। শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পরের সহযোগিতায় শিক্ষা এখানে এগিয়ে চলে। শিক্ষা এখানে অনাগত জীবনের প্রস্তুতি। শুধু প্রস্তুতি নয়—শিক্ষাই জীবন। বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক আছে বলেই ছেলেরা এ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ বোধ করে। শিশুর জীবনে যে শিক্ষা কার্যকরী হবে সুস্থ সামাজিক জীবনের উপযোগী সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারবে সে ভাবেই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যক্তির প্রয়োজন ও গোষ্ঠীর প্রয়োজন ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় দিক থেকেই মানুষকে গড়ে তোলাই হচ্ছে এ শিক্ষার আদর্শ।

সমস্যামূলক পদ্ধতির প্রয়াস

এ প্রসঙ্গে ডিউইর শিক্ষাদর্শনের স্বরূপ ও তাৎপর্যকে জানবার প্রয়োজন আছে। তাঁর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। ডিউই মনে করতেন, শিক্ষা দর্শনকে আলাদা করে দেখা ভুল। বাল্যজীবন থেকে পরিণত দার্শনিক মতবাদ গড়ে ওঠা পর্যন্ত ডিউই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সাথে পরিচিত হন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে সব মতবাদ দ্বারা সাময়িকভাবে প্রভাবিত হন। নিষ্ঠাবান পিউরিটান পরিবারে জন্মগ্রহণ ও সেই পরিবেশে বর্ধিত হবার ফলে তিনি বাল্যে বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে তিনি টি. হাক্সলী ও ডারউইনের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও ডারউনের বিবর্তনবাদ পরস্পর বিরোধী। তারপর হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মনোবিজ্ঞানী ষ্টানলী হল ও প্রয়োগ-বাদী দার্শনিক চার্লস পিয়ার্সের দ্বারা প্রভাবিত হন। এরা দুজনেই ছিলেন বস্তুবাদী। এদের মতবাদ ডিউইর মনে গভীর রেখাপাত করে। এরপর ডিউইর পরিচয় হয় হেগেলীয় দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী মরিসনের সাথে। হেগেল ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। ভাববাদীরা বলেন এ সৃষ্টির সবকিছু স্রষ্টার চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ—এ জগতের সব কিছুই ঐশী শক্তির প্রকাশ। ভারতবাসীরা সৃষ্টির পশ্চাতে দৈবীসত্ত্বার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সেই একই বহুরূপে প্রকাশিত। জগতে নতুন কিছু ঘটতে পারে না—যা কিছু ঘটে তা সব কিছুই স্রষ্টার কল্পনায় বিধৃত।

হেগেলের প্রভাব বেশীদিন ডিউইর জীবনে স্থায়ী হয় নি। এই সময়ে তিনি উইলিয়াম জেমসের সাথে পরিচিত হন এবং তাঁরই প্রভাবে তিনি ভাববাদী দর্শনের বিরোধী প্রয়োগবাদী মতবাদ (*Pragmatism*) গ্রহণ করেন। ভাববাদীরা বলেন, সত্য চিরন্তন—অপরিবর্তনীয়—ধ্রুব। প্রয়োগবাদীরা বলেন, পরিবর্তনশীল জগতে সত্য কখনও ধ্রুব বা সনাতন হতে পারে না। সত্য মানেই যুগ-সত্য।

যুগে যুগে মানুষের সমাজের পরিবর্তন হয়েছে; এই পরিবর্তনের সাথে তার প্রয়োজনেরও রূপ বদলেছে। পুরান প্রয়োজনের পরিবর্তে নতুন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দু'শ বছর আগে যে আদর্শের যে মূল্য ছিল, বর্তমানে পরিবর্তিত জগতে আজ তা মূল্যহীন—এক সময়ে তার মূল্য ছিল বলে কি তাকে আঁকড়ে থাকতে হবে? সত্যাসত্যের বিচার হবে প্রয়োজনের মাপকাঠিতে। যা সাফল্য আনবে তাই সত্য। প্রয়োজনের পরিবর্তনের সাথে সাথে সত্যেরও রূপান্তর হবে। প্রাচীন দার্শনিক মতবাদের ততদিনই মূল্য থাকবে যতদিন তা মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধানের সহায়ক থাকবে। জেমসের এই দার্শনিক মতবাদ ডিউই গ্রহণ করেন। তার এই প্রয়োজন-সিদ্ধি ও কার্যসিদ্ধির মতবাদকে *Instrumentalism* বলা হয়—"*Everything is provisional, nothing ultimate. Knowledge is always a means, never an end in itself it is purely instrumental, hence the title of Deweys Philosophy instrumentalism*" (*R. R. Rusk*)

প্রয়োগবাদ

এই দর্শনের পটভূমিকায় ডিউই তার শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। পরিবর্তনশীল জগতে সত্য যেমন পরিবর্তনশীল—গতিশীল জগতে শিক্ষাও তেমনি গতিশীল (*Dynamic*)। তিনি মনে করতেন সমাজের উন্নতি করতে হলে—মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে সর্ব প্রথম প্রয়োজন সুশিক্ষা। শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি জীবনকে শিক্ষা থেকে পৃথক করে দেখেন নি। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের প্রস্তুতি, না আরও বেশী—শিক্ষাই জীবন। শিক্ষা ও জীবন তাঁর কাছে সমার্থবোধক—শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা। তিনি বলেন "*there is nothing to which education is subordinate save more education. The educational process has no end beyond itself—it is its own end.*"

গতিশীল শিক্ষা

ডিউই স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয়কে সমাজ-জীবনের অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ডিউই ব্যক্তির প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি। মানুষে মানুষে গুণগত পার্থক্য থাকবেই, কিন্তু ব্যক্তিগত বিভিন্নতার (*individual difference*) জন্য শিক্ষায় প্রতিটি ব্যক্তির জন্য বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে তেমনি শিক্ষার্থীর জীবনে সামাজিক দিকটাও দেখতে হবে। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্র কোথায়? সমাজে জন্মগ্রহণ করে সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করবার সুযোগ পায়। শিশু সমাজ থেকে গ্রহণ করবে আবার সমাজকে তার যা দেবার আছে তাই

দেবে। এই দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যেই সমাজ ও ব্যক্তি এগিয়ে চলবে। যেহেতু শিক্ষা সমাজ-জীবনের অঙ্গ তাই শিক্ষার সাথে সমাজ-জীবনের অতীত অভিজ্ঞতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এদিক থেকে হারবার্তের মত তিনিও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন *"Education is the process of remaking experience"*

বিদ্যালয় ও সমাজ

ডিউই শিক্ষাকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বলে মনে করতেন না। শিশুর শিক্ষা তার বর্তমানের সাথেই জড়িত, এ শুধু বাঁচবার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি নয়—বেঁচে থাকবার ক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষা *'Education therefore is a process of living, not a preparation for future living (Dewe-)*

যেহেতু শিক্ষা বর্তমান জীবন ও সমাজের সাথে জড়িত তাই শিশুর শিক্ষার পরিবেশকে, তার বিদ্যালয়কে আদর্শ সমাজের অনুরূপ করে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করে, গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয় যদিও সমাজজীবনের অঙ্গ তবুও সমাজজীবনের যে জটিলতা ও কলুষতা শিশুকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে, বিদ্যালয় যেন সমাজের সেরূপ প্রতিচ্ছবি না হয়। বিদ্যালয় সমাজে শান্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে শিশু যূথবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ভালমন্দ বুঝতে শিখবে। তার নীতিবোধ জাগরণের জন্য অন্য কোন উপাদানের প্রয়োজন হবে না। বিদ্যালয়-জীবনের বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তার নীতিবোধ জাগ্রত হবে।

শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান সম্পর্কে ডিউই প্রাচীন ও আধুনিক কোন মতবাদই গ্রহণ করেন নি। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে দেখি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যমণি হচ্ছেন শিক্ষক—শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষক কেন্দ্রীক। তিনি যা শেখাবেন শিশু তাই শিখবে—এখানে তিনি 'এক ও অদ্বিতীয়'। এ ব্যবস্থায় শিশুর প্রয়োজন, ক্ষমতা, আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা কিছুই বিচারের প্রয়োজনীয়তা নেই। পূর্বনির্ধারিত একটা শিক্ষাক্রম শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। শিক্ষক তার খুশীমত পদ্ধতি অনুসরণ করতেন—এই ছিল প্রাচীন শিক্ষারীতি ও শিক্ষক।

শিক্ষকের স্থান

আধুনিক কোন কোন শিক্ষাপদ্ধতিতে আবার শিক্ষককে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক যদি দর্শকই থাকবে তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার সাথে নতুন অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করবে কে? শিক্ষকের কাজ হচ্ছে এই দুইকে অন্বিত করা। শিক্ষক বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক সমাজের বাইরে নয়—তিনি সমাজের একজন সভ্য। গণতান্ত্রিক সমাজের সভ্যরূপে তিনিও বিদ্যালয়ের কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন। শিশুর বিকাশকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন তা তিনি প্রয়োগ করবেন। তিনি তাঁর সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতা নিয়ে শিশুকে পথের সন্ধান দেবেন। শিশুর কল্যাণে তাকে জীবনে প্রবেশ লাভ করবার পথ সুগম করে দিতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে নিয়োগ করবেন। এ জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাকে শাসন করতে হবে। সমাজের কল্যাণবোধ দ্বারাই তিনি

শিশুকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করবেন। তাই শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ডিউই বলেছেন :—"*What concerns him, as teacher is the way in which that subject matter may become a part of experience; what there is in the child's present that is useable with reference to it, how such demands are be used! how his own knowledge of the subject-matter may assist in interpreting the child's needs and doings, and determine the medium in which the child should be placed in order that his growth may be properly directed*" (*Dewey's 'The child and the curriculum'*, *as quoted in A Short Hist ry of Educational Ideas By S. J. Curtis and M. E. A. Boult Wood*).

ডিউই প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা কোন পূর্বনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করে না। শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা অনুসারে তার শিক্ষা এগিয়ে চলবে।

স্তর অনুসারে শিক্ষা শিশুকে অনুসরণ করবে

শিক্ষার স্তর বিভাগ ডিউই গ্রহণ করেছেন। শিশুর জীবনের স্তর অনুসরণ করে ধাপে ধাপে শিক্ষা এগিয়ে চলবে। তিনি শিক্ষাকালকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম স্তরে পরিবেশ পরিচিতি। আট বছর পর্যন্ত এই স্তর চলবে। খেলাধূলা ও পরিবেশ পরিচিতির মধ্য দিয়ে সে শিক্ষা লাভ করবে। এই স্তরে কোন পাঠক্রম নেই—ঘর সাজানো, ঘর পরিষ্কার, রান্নার কাজ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সে সমাজচেতনা লাভ করবে।

দ্বিতীয় স্তর আট বছর থেকে বার বছর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এই স্তরকে বলা হয়েছে মনোযোগের কাল। এই সময়ে তার কৌতূহল আর মনোযোগ শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয় তাকে শেখাতে হবে। কৌতূহল বশে নানারূপ সমস্যা সমাধান করতে সে শিখবে। এই সময়ে প্রাসঙ্গিকভাবে সে কিছুটা ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি শিখবে।

তৃতীয় স্তরে শিক্ষার্থী যখন পৌঁছাবে তখন তার মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। তাই এই সময় তাকে সব কিছু শেখান হবে। তবে শিক্ষা পুঁথিকেন্দ্রীক হবে না। শিশুর কাছে সমস্যার সৃষ্টি করা হবে, শিশু তার সমাধান খুঁজে বের করবে।

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতিকে জানতে হলে তার আগ্রহ তত্ত্ব (*Theory of Interest*) ও সক্রিয়তা-তত্ত্ব (*Theory of Activity*) জানা দরকার। আমরা দেখছি

আগ্রহ ও সক্রিয়তা

হারবার্ত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারলে শিক্ষাপ্রচেষ্টা সার্থক হবার কোন সম্ভাবনা নেই। হারবার্ত বলেন, শিশু যখন কোন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তখন সে তাকে পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করে আয়ত্ত করতে চায়। শিশু নতুন জ্ঞান আহরণ করে পুরাতন জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করে। পুরাতনের সাথে অন্বিত করে নতুনকে জানার আগ্রহের ফলেই সার্থক-শিক্ষা সম্ভব। এই যে নতুনকে জানার আগ্রহ, এর

পিছনে রয়েছে একটা প্রচেষ্টা বা উদ্যম (*effort*), এই প্রচেষ্টা স্বতঃউৎসারিত নয়, এই প্রচেষ্টা চেষ্টাকৃত বা আরোপিত। যেমন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেন—এই আগ্রহ আরোপিত।

ডিউই শিক্ষায় আগ্রহ-তত্ত্বে বিশ্বাসী। তিনি হারবার্তের সমালোচনা করে বলেছেন, শিক্ষার্থীর আগ্রহ একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া (*mechanical process*) নয়। শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আগ্রহ ও উদ্যমের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি খুঁজে পান নি। এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই, আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে আলাদা করে পৃথক পৃথক দু'টি প্রক্রিয়া ভাবলে চলবে না। আগ্রহ যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই আসবে। এর জন্য কোন পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নেই। কোনরূপ তাড়না বা বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রচেষ্টা সৃষ্টি সম্ভব নয়। আগ্রহ ও প্রচেষ্টা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আগ্রহ ও তত্ত্ব

শিক্ষায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়েই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি শিশুর বিকাশের পথ একই নির্দিষ্ট রূপ ধরে আসবে না। শিশুর আত্মবিকাশের প্রচেষ্টায় তার আগ্রহ অনুসারে শিক্ষা হবে বিভিন্নমুখী।

শিক্ষায় শিশুর কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা ডিউইর বহু পূর্ব থেকেই আমরা দেখেছি। শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক সৃজনী প্রতিভা রয়েছে তাই তার সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েবেলের শিক্ষা-পদ্ধতিতে এই সক্রিয়তা (*Theory of Self Activity*) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ডিউই তার শিক্ষাপদ্ধতিতে সক্রিয়তা-তত্ত্বকে যে ভাবে গ্রহণ করেছেন তার সাথে পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদদের সক্রিয়তা-তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ডিউইর পূর্বে সক্রিয়তা সম্পর্কে মনে করা হ'ত, কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর দৈহিক পরিপুষ্টি সাধিত হয় ও মানসিক সম্ভাবনাগুলি বিকাশের সুযোগ পায়। ডিউই কর্মপ্রবণতাকে বা সক্রিয়তাকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞান আহরণের পশ্চাতে এই সক্রিয়তাকে সক্রিয়রূপে দেখি। কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই বিনা আয়াসে বিনা চেষ্টায় লাভ করি না। দৈনন্দিন কর্মজীবনে আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হই। আমাদের স্বাভাবিক কর্ম-প্রবণতাবশে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা দেখে মানুষ কর্ম-বিরত হয় না। সে সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে ওঠে। নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ও সমস্যা সমাধানের উপযোগী নানা তথ্যের সন্ধান করে। সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই সে সত্যের সন্ধান লাভ করে। অর্থাৎ সত্যকে লাভ করতে হলে সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তা করতে হবে। সক্রিয়তা থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয় সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

সক্রিয়তা তত্ত্ব

শিক্ষাপদ্ধতির পাঁচটি স্তর

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানতঃ তার সক্রিয়তা-তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সক্রিয়তা থেকে যে সমস্যার উদ্ভব ও সমস্যা সমাধানের

জন্য যে কর্ম-তৎপরতা তাকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে পাঁচটি স্তর খুঁজে পাই। এই স্তরগুলি হচ্ছে :—

॥ এক ॥ সক্রিয়তা (*Activity*)—মানুষ তার স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতাবশে সক্রিয় হয়ে উঠবে।

॥ দুই ॥ সমস্যা (*Problem*)—কর্মে নিযুক্ত হয়ে মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে। নতুন সমস্যা এসে তার কর্ম প্রচেষ্টাকে বাধা দেবে।

॥ তিন ॥ তথ্য (*Data*)—সমস্যা সমাধানের জন্য সে কর্ম তৎপর হয়ে সমাধানের উপযোগী বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করবে।

॥ চার ॥ প্রকল্প (*Hypothesis*)—সমস্যা সমাধানের উপযোগী সংগৃহীত তথ্য থেকে যে ধারণা হবে তার মধ্য থেকে একটি ধারণাকে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়রূপে গ্রহণ করবে।

॥ পাঁচ ॥ অভিক্রিয়া (*Experiment*)—সমস্যা সমাধানের গৃহীত সম্ভাব্য উপায়কে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

ডিউইর এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বলা হয় *Problem Method.* ডিউইর শিক্ষায় গতানুগতিক শ্রেণী-শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। বাস্তব পরিবেশে প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ও নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে ডিউই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করেছেন। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে কতটা পারদর্শিতা অর্জন করেছে তার পরিমাপ হবে না। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিমাপ করা হবে শিশু সমাজজীবনের কতটা উপযোগী হয়েছে ও সমাজ থেকে তার কতটা সাহায্যের প্রয়োজন।

ডিউইর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতির বহু সমালোচনা হয়েছে তবু বিংশ শতাব্দীতে আমরা শিক্ষার যে নব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করছি তাতে ডিউইর দান সর্বাধিক।

মূল্যায়ন

গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার কি রূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তিনি তাঁর সমস্ত লেখার মধ্য দিয়ে নতুন অলোকসম্পাত করেছেন। আদর্শ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও রূপ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শকে প্রচার করেছেন। শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য দুই পরস্পর বিরোধী মতবাদের সমন্বয়ে সম্ভব এবং আদর্শ গণতান্ত্রিক শিক্ষার অর্থই হচ্ছে এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। ডিউই একথা অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন। আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে কোন বিরোধ নেই—এখানে একে অপরের পরিপূরক। আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুকরণ করে চলবে, ডিউইর এই মতবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

শিক্ষার এই সর্বাধিক রূপটিকে ডিউই যে ভাবে তুলে ধরেছেন এর পূর্বে শিক্ষাকে সে

দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আর বিচার করা হয় নি। শিক্ষাই জীবন ও শিক্ষা জীবনের সমব্যাপী। শিক্ষা সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নতুন।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর *Problem Method* থেকেই তার শিষ্য কলিপ্যাট্রিক *Project Method* প্রবর্তন করেন।

বিদ্যালয় যে সমাজের একটি অঙ্গ, সমাজেরই প্রতিচ্ছবি এই মতবাদ তিনিই প্রচার করেন। বিদ্যালয়কে সমাজধর্মী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়েই তিনি এই ভাবধারা প্রচার করেন। বিদ্যালয়কে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে যে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি হবে সেখানে শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই বাস্তব শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। বিদ্যালয় পরিবেশ যতটা স্বাভাবিক সমাজধর্মী ও ততটা স্বাভাবিক হবে।

আধুনিক শিক্ষায় ডিউইর প্রভাব ও দান সম্পর্কে *Jerome Nathonson*-এর ভাষায় বলা যায়, "*The Deweyan revolution in education we see has already carried us a long way.*"

নবম অধ্যায়

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)

আধুনিক শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি ইউরোপীয় শিক্ষাধারা। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রীক শিক্ষাকে আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাবিদ্‌দের দান বলেই জানি। ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের দুই মহান পুরুষের অবিনশ্বর দানের সম্বন্ধে আমরা প্রায় অজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী ভারতের শিক্ষায় যে নব যুগের সৃষ্টি করেছেন তা যে কোন যুগের যে কোন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদের অমরকীর্তির সাথে তুলনীয়। কাব্য-সাহিত্যের এমন একটি দিক নেই যা রবীন্দ্র-প্রতিভার যাদু স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্র-প্রতিভা শুধু কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়। রবীন্দ্রনাথ ভাবুক কবি, দার্শনিক; কিন্তু তিনি শুধু কল্পলোক বিহারী নন। কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহারের ভূমি—তবু কর্মক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তিনি যে কর্ম্মযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন সেখানে আমরা পরিচয় পাই অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের জীবনের অপর একটি দিকের। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কীয় চিন্তাধারা ও তার বাস্তব রূপায়ণের প্রচেষ্টা তাঁকে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টা শুধু ভারতের নয়, ভারতের বাইরের মনীষীদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাজগতে যে বাণী প্রচার করেছেন ও কর্মক্ষেত্রে তাকে যে ভাবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা শুধু ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বমানবের কাছে নতুন বার্তা বহন করে এনেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী তাই আজ মহামানবের মিলন ক্ষেত্র।

বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে এদেশের নাড়ীর কোন যোগ নেই। দেশের অধিকাংশ লোককে নিরক্ষর রেখে দেশের সামান্য অংশের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সে ছিল একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করতে চায় ইহাই তাঁর সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া, সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল, কেরাণীগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রীর বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব, কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।" যে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর দেহ-মন-আত্মাকে নিয়মের নিগড়ে বেঁধে প্রয়োজন মত ছাঁচে ঢালাই করে নিতে চায় তিনি শিশুকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সেই বিদ্যালয়ের কারাগার থেকে। এই মুক্তির পথ সন্ধান করতে তিনি দেশবিদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করেছেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতাকে সম্যক উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। একথা সত্য, তিনি বিভিন্ন শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে যে ভাবে প্রকাশ করেছেন সে সমগ্র চিন্তাকে তিনি রূপ দিতে পারেন নি, তবু তাঁর আদর্শের সার্থক রূপায়ণ হয়েছে বিশ্বভারতীর মধ্যে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হচ্ছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্য-নাট্য নিয়ে আমরা যে পরিমাণ হৈ চৈ করি ঠিক সেই পরিমাণ অজ্ঞতা আমাদের তাঁর গভীর চিন্তামূলক শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ সম্পর্কে। তাঁর গভীর চিন্তামূলক শিক্ষা-প্রবন্ধগুলি নিয়ে যদি গবেষণা করা হ'ত ও তার সার্থক রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হ'ত তাহলে শিশু-কেন্দ্রীক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা আমরা বহু পূর্বেই গড়ে তুলতে পারতাম।

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার স্বরূপ ও তার ব্যর্থতা

দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা মোটেই মধুর নয়। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী সর্বত্রই তিনি স্কুলের যে রূপ দেখেছেন, যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন তা অত্যন্ত বেদনার। তাই তিনি লিখেছেন, "ছেলেদের ভাললাগা মন্দলাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিস আছে, বিদ্যালয় হইতে সে চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত।" যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল সেখানে শিক্ষার্থীর ভাললাগা না-লাগার প্রশ্ন কোনদিনই বিচার করে দেখা হয় নি। কোন রকমে ডিগ্রীলাভ করিয়ে দেবার ব্যবস্থাই ছিল বিদ্যায়তনগুলিতে। বাল্যজীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এই বিদ্যায়তনগুলিতে সেই অভিজ্ঞতা থেকে একদিন তিনি লিখেছিলেন, "অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে

যান্ত্রিক শিক্ষা ও কবির অভিজ্ঞতা

একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না।" যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে কি করে শিশুদের মুক্তি দেওয়া যায় এ নিয়ে তিনি প্রথম পরীক্ষা শুরু করেন শিলাইদহ থাকতে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও গ্রামের কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে তিনি প্রথম শিক্ষকতা স্থরু করেন। পুত্রকে তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কাছে সঁপে দেন নি। পল্লী প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণে প্রথম যে শিশুশিক্ষার আয়োজন করেছিলেন তাই পরিণত রূপ নেয় শান্তিনিকেতনে। ১৩০৮ সনের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে তিনি 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে উপনিষদের বাণী গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন। উপনিষদের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রভাবেই তিনি প্রাচীন তপোবনের শিক্ষাদর্শের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই সাথে শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি শিশুর ভাললাগা-মন্দলাগা, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রচলিত প্রাণহীন কৃত্রিম শিক্ষার স্থানে তিনি শিশুর শিক্ষায় এক আনন্দময় স্বচ্ছন্দ জীবন-প্রবাহ বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তিনি যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপেই শিশু-কেন্দ্রীক শিক্ষা। তপোবনের সভ্যতায় বিশ্বাসী হলেও তিনি পাশ্চাত্যের জড়-সভ্যতাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার সমন্বয় তাঁর শিক্ষাদর্শের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

শিশু-কেন্দ্রীক শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা একটা বিশেষ দেশ বা কালের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার যে কথা বলেছেন তা জীবনের খণ্ডিত রূপ নয়। জীবনকে তিনি সমগ্রভাবে উপলব্ধির কথা বলেছেন—"বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা।" ভারত পরিপূর্ণতাকে চেয়েছিল, এই পরিপূর্ণতার সাথেই নিখিলের যোগ।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় কৃত্রিমতাকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের সাথে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের নিবিড় যোগসাধন করতে চেয়েছিলেন— "প্রকৃতির ক্রোড়ে জন্মে যদি প্রকৃতির শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকি তাহলে শিক্ষা কখনও সার্থক হতে পারে না"; মুক্ত প্রকৃতির প্রাঙ্গণই যে শিশুদের নিজস্ব ক্রীড়াভূমি একথা তিনি বার বার বলেছেন। "বন আমাদের সজীব বাসস্থান···অতএব বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় হইতে অনেক দূরে নির্জন মুক্ত-আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।"

প্রকৃতির কোলে শিক্ষা

মুক্ত প্রকৃতির সাথে শুধু নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করলেই চলবে না, কাজের মধ্য দিয়ে পড়ার পরিবেশকে আনন্দ মধুর করে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের জমিতে ফসল ফলবে, গো-শালায় গরু থাকবে। "গো-পালনে ছাত্রদের যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে,

বেড়া বাঁধিবে, এইভাবে তাহারা প্রকৃতির সাথে শুধু ভাবের সম্পর্ক নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।" তাই তিনি প্রাচীন তপোবনের আদর্শে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। যেখানে বিলাস-ব্যসনহীন সরল আড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত তরুণ শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তুলবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ। পরস্পর মেলামেশার মধ্য দিয়েই জ্ঞানকে অনুভূতির সাহায্যে আত্মস্থ করা সম্ভব। তিনি আদর্শ গুরুর কল্পনায় তপোবনের গুরুকেই দেখেছেন। "দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ, নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত।...শিষ্যের জীবনে প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে।" গুরু-শিষ্যের মধ্যে সহজ সম্পর্ককেই তিনি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছেন। শিষ্যেরা সন্তানের মত সেবা করে তাঁর কাছ থেকে বিদ্যাগ্রহণ করতেন। "উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।"

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিজেকে প্রকাশ করবার ভাষা হিসেবে মাতৃভাষাই শ্রেষ্ঠ। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিখতে শক্তির যে অপচয় হয় সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন। বার বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর নিজের শিক্ষাও ইংরেজী-বর্জিত ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি নিজে বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনায় ব্রতী হন। বহু প্রবন্ধে তিনি শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করবার কথা বলেছেন। তাঁরই চেষ্টার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা অধিকতর মর্যাদা লাভ করে।

মাতৃভাষায় শিক্ষা

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সকল রকম কষ্ট স্বীকার করে, সকল প্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে একথা যেমন তিনি বলেছেন আবার শিক্ষা যাতে নীরস একঘেঁয়ে হয়ে না ওঠে সে জন্য সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলবার জন্য, "ছেলেদের জন্য নানা রকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সাথে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি,...কোন নিয়ম দ্বারা পিষ্ট না হয়, এই আমার অভিপ্রায় ছিল।...তারপর ক্রমশঃ নানা ঋতু উৎসবের প্রচলন হয়েছে আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমাদের লক্ষ্য ছিল।"

আনন্দময় শিক্ষা

সুকুমার কলাচর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের আনন্দময় স্বরূপের বিকাশলাভ ঘটে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, এজন্য তিনি সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুচারু শিল্পের চর্চার ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনে করেছিলেন। কলাভবন,

সঙ্গীত ভবন শান্তিনিকেতনের ছ'টি শাখা। ভারতের চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম।

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের উপর আমরা আজকাল জোর দিচ্ছি। আজকাল শিক্ষার্থীই ভবিষ্যৎ ভারতের নাগরিক। নাগরিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ত করে তুলতে তার শিক্ষা বিদ্যালয়-জীবনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়ার দরকার। যখন স্কুল স্বায়ত্তশাসনে (*School Self-Government*) চিন্তা এদেশে কোথাও দেখা দেয় নি সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে ১৯০৫ খ্রীঃ স্কুল স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করেন। সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীরূপে (*Co-curricular activities*) ভারতের বিদ্যালয়ে তিনিই স্কুল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তক।

স্কুল স্বায়ত্তশাসন

এ ছাড়া গান, নাচ, অভিনয়, নানা উৎসব প্রভৃতি যে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এ তত্ত্বে তিনি শুধু বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় এগুলি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। প্রকৃতির সাথে নিবিড় যোগাযোগের কথা তিনি শুধু প্রচারই করেন নি, তিনি ছেলেদের পাঠকক্ষের বাইরে এনে আলো বাতাসে-ভরা মুক্ত প্রাঙ্গণে বৃক্ষের ছায়ায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন শুধুমাত্র বিদ্যা চর্চারই ক্ষেত্র নয়, তিনি এখানে শিক্ষাকে কেবল জ্ঞানমুখী না রেখে বৃত্তিমুখীনও করেছেন। বিশ্বভারতীতে তিনি জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করেছেন। বোলপুরের সন্নিকটে সুরুলে শ্রীনিকেতনে তিনি ব্যবহারিক শিক্ষার নানাবিধ ব্যবস্থা করেন। এখানে চাষবাস, গো-পালন, তাঁত বোনা, কাপড় ছাপানো, ট্যানিং, চামড়া ও মাটির জিনিস তৈরি হাতে কলমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

বৃত্তিমুখীন শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে আমরা যে উচ্চাদর্শের সাক্ষাৎ পাই তার সম্পূর্ণ বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয় নি। তবু বিশ্বভারতীর মধ্যে যে শিক্ষাদর্শ রূপায়িত হতে চলেছে তা শুধু ভারতের নয় সমগ্র জগতের শিক্ষাবিদ্‌দের আকর্ষণের স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষার কথা বলেছেন, সে শিক্ষা "ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়।" তিনি বলেছেন, "বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা পেতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।" ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ব্যক্তি সত্ত্বার সাথে বিশ্বসত্ত্বার মিলনকেই তিনি শিক্ষা বলে মনে করতেন। জাতীয়তাবোধের বিকাশের শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন বা কথা চিন্তা করেই তিনি শিক্ষা-সংস্কারে ব্রতী হন নি। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই দেশ বা জাতির সংকীর্ণ গণ্ডি পার হয়ে বিশ্বভারতী আজ বিশ্ব-মানবের তীর্থভূমি।

শিক্ষাক্ষেত্রে কবির অবদান

দশম অধ্যায়

মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শ

ভারতীয় জাতীয়-আন্দোলনের নেতারা জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকেই ইংরেজদের শিক্ষানীতি ও ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে একদল ইংরেজীশিক্ষিত কর্মচারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল সে শিক্ষা সম্পর্কে জাতীয় নেতারা কোনদিন উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নি। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে শিক্ষাব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও বিংশ শতাব্দীতে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা যে রূপ নেয় তা ছিল জাতীয় আদর্শ ও আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিরহিত। ১৯০৫ খ্রীঃ প্রথম যখন জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় সেই সাথে জাতীয়-শিক্ষা আন্দোলনও শুরু হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় ত্যাগ ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য দাবি উঠতে থাকে। বাংলায় ১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (*National Council of Education*) স্থাপিত হয়। এরপর যখন মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন ছাত্রদের তিনি ইংরেজদের তৈরী গোলামখানা ছেড়ে আসবার আহ্বান জানান। হাজার হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। দেশের বিভিন্ন স্থানে *National School* স্থাপিত হয়। তারপর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসার সাথে সাথে ছেলেরা আবার স্কুলে ফিরে যায়। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দেশের উপযোগী নয়, এ শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন—এ দাবি জাতীয় নেতারা বার বার করতে থাকেন। কিন্তু সর্বভারতীয় কোন জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা নিয়ে তখনও কোন আন্দোলন শুরু করা হয় নি।

ইংরেজদের শিক্ষনীতি ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

১৯৩৭ খ্রীঃ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু হবার পর কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন দেখা দিল। কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল—দেশের শাসনভার গ্রহণ করলে মাদক বর্জন নীতি গ্রহণ করবে ও দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। মাদক বর্জন কার্যে পরিণত করতে হলে রাজস্বের ক্ষতি, এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী যখন উভয় সংকটের সম্মুখীন তখন জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলবার জন্য এগিয়ে এলেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজি শুধু দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করেন নি, দেশের সামগ্রিক উন্নতি ছিল তাঁর চিন্তায়। তাই দরিদ্র দেশের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে যখন কংগ্রেস নেতারা দিশেহারা সেই সময়ে প্রকাশিত হ'ল 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজির বৈপ্লবিক শিক্ষাপরিকল্পনা। তিনি প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে বললেন, "বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি কোন দিক থেকেই দেশের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে উপযোগী নয়। ইংরেজীকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করবার ফলে স্বল্প সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিতের সাথে বিরাট সংখ্যক অশিক্ষিতের চিরদিনের জন্য একটা বিভেদ সৃষ্টি

বুনিয়াদী শিক্ষার পটভূমি

হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়বার পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করবার ফলে উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় মানসিক দিক থেকে নিজের দেশের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাকে অপব্যয় বলা চলে, কারণ শিশুরা যা কিছু শিখল তা কিছুদিন বাদেই ভুলে যায়। এ শিক্ষা তাদের জীবনে কোন কাজেই আসে না।" জীবনের সাথে প্রয়োজনহীন শিক্ষার স্থানে তিনি এমন একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা জীবনের বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তোলে। তিনি বললেন, "প্রাথমিক শিক্ষা সাত বছর কাল ব্যাপী হবে। এই স্তরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা ও জীবনের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিক্ষায় ইংরেজীর কোন স্থান থাকবে না।"

"ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য যে সব শিক্ষা দেওয়া হবে তা যতটা সম্ভব কোন একটা লাভজনক বৃত্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। বৃত্তি শিক্ষায় দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন বৃত্তির মধ্যে দিয়ে ছাত্ররা নিজেদের বেতন দিতে পারবে, সাথে সাথে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে।"

গান্ধীজির পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে নতুনতরভাবে তিনি শিক্ষা-পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এ শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রীক, এ ব্যবস্থায় একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা হবে। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা, শিক্ষা হবে স্ব-নির্ভর (*Self-supporting*)। শিল্প থেকে যে আয় হবে তাই দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। শিক্ষাকে গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে গ্রাম্যজীবনের উপযোগী করে তুলতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

গ্রামীণ ভারতের উপযোগী করে গান্ধীজি যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তাকে বলা হয় 'বুনিয়াদী শিক্ষা' (*Basic Education*)। এই শিক্ষাই হবে ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ভিত্তিভূমি, যার বুনিয়াদের উপরে গড়ে উঠবে পূর্ণ বিকশিত সার্থক জীবনের ইমারত। গান্ধীজি বলেছেন, "*Basic education is not a technique, it is a way of life. It aims at integrated all round development of personality of the individual and also building up of a Society on truth, justice and non-violence.*"

বুনিয়াদী শিক্ষা-দর্শনের গোড়ার কথা হচ্ছে, জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। গান্ধীজির পরিকল্পিত এই শিক্ষাসংগঠন একদিন শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে সেই আশা ও আশ্বাসের কথাই রয়েছে এই শিক্ষাব্যবস্থার মর্মমূলে। তাই গান্ধীজি বলেছেন,—

বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শ

My plan······is thus conceived as the spear head of a social

revolution. It will provide a healthy and normal basis of relationship between the city and the village, and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatural division between the haves and have not."

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে জাকির হোসেন কমিটি বলেছেন,—

"The scheme envisages the idea of co-operative community, in which the motives of social service will dominate all the activities of children"

গান্ধীজি ভারতের সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী। সত্য ও অহিংসার পথ তাঁর জীবনের পথ। তিনি যে সমাজ-বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন তা হিংসার পথ ধরে আসবে না। ভারতের গ্রামের পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে তিনি সামগ্রিক জীবন গঠনের দিক থেকেই দেখেছেন। শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের পরিকল্পনা তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়েই করতে চেয়েছেন। কর্মের সাথে জ্ঞানের বন্ধন করে পুঁথিগত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের যে ব্যবধান তা তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঘুচিয়েছেন।

গান্ধীজির শিক্ষা-পরিকল্পনা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত। বুনিয়াদী শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়। শিশুরা সর্বদাই কর্মচঞ্চল, নীরস পুঁথির মাধ্যমে যে শিক্ষা তা শিশুমন গ্রহণ করতে সঙ্কোচিত হয়। এই নিষ্প্রাণ শিক্ষার মধ্যে শিশু তার স্বাভাবিক বিকাশের পথটি খুঁজে পায় না। এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর সহজ কর্মপ্রবণতাকে পঙ্গু করে দেয়। শিশুর মনে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা যোগাতে পারে না। শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা রয়েছে তার বিকাশের পথ যদি সুগম করতে হয় তাহলে তাকে কাজ দিতে হবে। শিশু চায় খেলা আর কাজ। বুনিয়াদী শিক্ষায় দশজনে মিলে কাজের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে তাতে শিশুর ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ও ঔৎসুক্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশু-কেন্দ্রীক শিক্ষাকর্মের যে স্বাধীনতা, তার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশের সাথে ইন্দ্রিয়গুলি সুনিয়ন্ত্রিত হবে, বুদ্ধি মার্জিত হবে, স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে শিশু আত্মশক্তিতে আস্থাবান হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তার সমন্বয়

গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষায় লেখাপড়া শেখার সাথে ব্যক্তিগত-স্বাস্থ্য ও সামাজিক-স্বাস্থ্য এ দুই দিক সম্পর্কেই শিশু যাতে সচেতন হয় সে ব্যবস্থা করেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষায় সাফাই ও স্বাস্থ্যরক্ষা মূল কাজের অন্যতম।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে গতানুগতিক পুঁথিকেন্দ্রীক শিক্ষার পথকে ত্যাগ করে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে। কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে শিল্পকাজের মাধ্যমে পাঠক্রম নির্ধারিত বিষয় এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য

শিল্পকেন্দ্রীক অনুবন্ধ প্রণালী

পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিক্ষাদানের প্রণালী অনুবন্ধ-প্রণালী (*correlation*) নামে পরিচিত। শিল্প শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুকে কারিগর বানানোই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য নয়। এ শিক্ষায় শিশু যান্ত্রিকভাবে শিল্পটিকে আয়ত্ত করবে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করে শিশু শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবে। গান্ধীজি বলেছেন—*Every handicraft has to be taught not merely mechanically as is done today but scientifically, that is to say, the child should learn the why and wherefore of every process.*" কোন একটি নির্দিষ্ট বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার অন্য বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনের প্রয়োজনীয় বৃত্তিকেও এখান থেকেই শিখে নিতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষায় জাকির হোসেন কমিটির সুপারিশ অনুসারে নিম্ন শিল্পকেই মূলশিল্প বলে গ্রহণ করা হয় :—

১। সূতা কাটা ও বয়নশিল্প।

২। কৃষি।

৩। চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, কার্ড-বোর্ডের কাজ বা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে কোন একটি শিল্প।

সাধারণতঃ সূতা কাটা ও বয়ন বা কৃষিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বুনিয়াদী শিক্ষায় গ্রহণ করা হয়। দেখা গিয়েছে এই দু'টি শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। বয়নশিল্পের জন্য প্রয়োজন সূতা, সূতার জন্য দরকার তুলা, তুলা পেতে হলে চাষ করবার পূর্বে জানতে হবে মাটির গুণ, কোন মাটিতে কি জন্মায় সে সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। চাষের পর গাছটি হলে—গাছ, ফুল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা জন্মায়, তারপর তুলা থেকে সূতা, তাকে রঙ করে নক্সা কেটে বস্ত্র বয়ন, তারপর উৎপাদিত মাল বিক্রি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে জ্ঞান এমনিভাবে একটি বিষয় থেকে অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে বিষয়ান্তরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে একটির পর একটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী বাস্তবভাবে শিক্ষালাভ করে। অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। জ্ঞানের একটি বিষয়ের সাথে অপরটি যুক্ত, জীবনের অখণ্ডতার সাথে জ্ঞানের এই যে অখণ্ডতা তা বুনিয়াদী শিক্ষায় বজায় রাখা হয়েছে।

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ

অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেবার পথে একটি প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যথাসম্ভব বৃত্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দিবার ফলে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি অতি সামান্যভাবেই এই পদ্ধতিতে শেখান যায়। এগুলি বৃত্তির প্রয়োজনে অতি সামান্যভাবেই তার সাথে সংযুক্ত; তাই এ সম্পর্কে জ্ঞান সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন হয়ে বুনিয়াদী শিক্ষায় এইসব বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন পাঠ্যসূচী রচিত হয়েছে। অনুবন্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেটুকু শেখান যায় তা থেকে অনেক বেশী তথ্যরাজি স্বতন্ত্র পাঠ্য-সূচীতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

অনুবন্ধ প্রণালীর অসুবিধা

বুনিয়াদী শিক্ষায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সর্বভারতীয় ভাষারূপে হিন্দীকে দেবনাগরী হরফে ভারতে গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার যৌক্তিকতায় সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা থেকেই ইংরাজীর নির্বাসনের যৌক্তিকতায় অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজি হয়ত ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের কথাই চিন্তা করেছিলেন তাই বুনিয়াদী শিক্ষাক্রমে ইংরাজীর স্থান নেই।

মাতৃভাষা ও হিন্দী

গান্ধীজি যখন বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা করেন তখন তিনি ৭ থেকে ১৪ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য সাত বছরের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলেন। তাঁর ধারণা ছিল সাত বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখবে। চোদ্দ বছরের পর শিক্ষা সম্পর্কে তখন কিছু বলা হয়নি। গান্ধীজি তাঁর পরিকল্পনার এই ত্রুটি দূর করার জন্য ১৯৪৫ খ্রীঃ 'নঈ তালিম' পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি বলেন বুনিয়াদী শিক্ষা হবে জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষা। নয়া তালিম বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ মাত্র। এতে চারটি স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে ;—

বুনিয়াদী শিক্ষার কাঠামো

॥ এক ॥ প্রাক-বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়েদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা।

॥ দুই ॥ বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

॥ তিন ॥ উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা—১৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্কদের শিক্ষা।

॥ চার ॥ প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা।

'নঈ তালিমের' প্রতি স্তরেই কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষার ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাক বুনিয়াদী শিক্ষায় খেলাকে কাজের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ শিশুর কাছে খেলা আর কাজে কোন পার্থক্য নেই। 'হিন্দুস্থানী তালিম সঙ্ঘ' বিভিন্ন স্তরের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ শ্রীমশরুওয়ালা মন্তব্য করেছেন, এই নয়া তালিমের মধ্য দিয়েই সমাজ-বিপ্লব সাধিত হবে।

গান্ধীজির পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। গান্ধীজির প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশ হবার পর পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনার জন্য ডঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে দু'টি রিপোর্ট পেশ করেন। গান্ধী জ নিজে ১৯৪৫ খ্রীঃ "নঈ তালিম" পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সার্জেণ্ট কমিশন যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য যে শিক্ষা-পরিকল্পনা করেন সেখানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে পরিমার্জিত করে গ্রহণ করবার সুপারিশ করা হয়েছে। তারপর মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনা পেশ করবার পর বুনিয়াদী শিক্ষাকে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবার প্রয়াস চলেছে।

প্রাথমিক স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষাকেই আমরা জাতীয়-শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছি। গান্ধীজি পরিকল্পিত শিক্ষাই আজ গ্রামীণ-ভারতের শিক্ষার আদর্শ ব্যবস্থারূপে গৃহীত হয়েছে।

গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করবার পর তাঁর শিক্ষাকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য জাকির হোসেন কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তার বহু সমালোচনা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সমালোচনা হয় শিক্ষাকে আর্থিক দিক থেকে স্ব-নির্ভর (*Self-supporting*) করে তোলবার প্রস্তাব সম্পর্কে। প্রথম থেকেই একে অবাস্তব বলা হয়। শিল্পের উৎপাদন থেকে স্কুলের ব্যয় বা শিক্ষকের বেতন সংগ্রহ করতে হলে স্কুল কারখানায় পরিণত হবে। সাধারণ শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিই হবে বিদ্যালয়গুলির একমাত্র লক্ষ্য।

শিল্পের জন্য অত্যন্ত বেশী সময় নির্ধারিত হয়। দিনের সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। বাকী যে সময়টুকু পাওয়া যাবে তাতে অন্য বিষয়গুলি ভালভাবে পড়ান সম্ভব নয়।

অনুবন্ধ প্রণালী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান ভিত্তি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অনুবন্ধ প্রণালীকে প্রসারিত করা সম্ভব নয়। যে ক্ষেত্রে এই প্রণালীকে অনুসরণ করা সম্ভব নয় সেখানেও এই পদ্ধতি মাধ্যমে বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেষ্টা করলে তা অবাস্তব ও কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় শুধুমাত্র পল্লী অঞ্চলের কথাই বলা হয়েছে। শহরের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্প নির্ধারণের কথা বলা হয় নি।

বুনিয়াদী শিক্ষার সাত বছরের পূর্বে শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে সে সম্পর্কে কোন কথা বলা হয় নি ও বুনিয়াদী শিক্ষাস্তর অতিক্রম করে শিক্ষার্থী কি করবে সে সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নি।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে শিক্ষায় ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ইংরেজীকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় নি।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির সফল রূপায়ণের জন্য যে ধরনের উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাপরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

গান্ধীজির অবদান

পুঁথিগত শিক্ষার অভিশাপ থেকে শিশু-শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিয়ে জাতীয় ভাবধারা-পুষ্ট ভারতীয় পরিবেশের উপযোগী যে শিক্ষাদর্শ গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেন তার উপযোগিতা আজ প্রশ্নাতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। একটা অবাস্তব শিক্ষাব্যবস্থা যা বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থে এদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল সেই ত্রুটিপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজনেই গরীব দেশের উপযোগী করে গান্ধীজি একটি বাস্তব শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিশু-কেন্দ্রীক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহকে স্বীকার করে নিয়ে শিল্প-কেন্দ্রীক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে। কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ফলে শিশু-শিক্ষার্থী একদিকে নীরস একঘেঁয়েমি থেকে রক্ষা পেয়েছে, অপর দিকে তার

সৃজনী প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। পুঁথিকেন্দ্রীক পাঠে কায়িক শ্রম-বিমুখতা ও শ্রম সম্পর্কে একটা অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয়। বাস্তবধর্মী শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মূল্যবোধ জন্মায় ও শ্রমের মর্যাদা দিতে শেখে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষা লাভ করবে। এতে তার বুদ্ধি ও কর্মকুশলতায় দেহ ও মনের সমান বিকাশ লাভ ঘটবে। একটি শিল্পে কুশলী হয়ে উঠলে সেই শিল্পকেই বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে পারবে। সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় শিক্ষার্থী সমাজ-সচেতন হবে। শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়ায় বিদেশী ভাষার নিষ্পেষণে শিশু-মন পিষ্ট হবে না। বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনা সম্পর্কে গান্ধীজি বলেছিলেন—*The scheme is a revolution in the education of the village-children.* সমগ্র ভারতের শিক্ষায় গান্ধীজি-প্রদর্শিত পথ সত্যই এক নব-যুগের সূচনা করেছে।

[বর্তমান আলোচনা গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বুনিয়াদী শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাসের জন্য আমার আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা সমস্যার ইতিহাস দেখুন।]

যে বইগুলি বি. এড., বি. টি'র জন্য অবশ্য চাই

১। **শিক্ষাতত্ত্বের রূপ রেখা** ১২·০০
বিভূরঞ্জন গুহ, শান্তি দত্ত, সুনন্দা ঘোষ, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য

২। **শিক্ষা-মনোবিদ্যা** ১৮·০০
অধ্যাপক সুশীল রায়

৩। **শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিবেশ** (৪র্থ সং) ১২·০০

৪। **শিক্ষাদর্শ পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস** ১৫·০০

৫। **নবভারতের শিক্ষা কমিশন** ৫·০০
রণজিৎ কুমার ঘোষ

৬। **সমাজ বিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতি** (২য় সং) ৯·০০
কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু ও অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখার্জী

৭। **মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যা** ১৫·০০
ডঃ জগদিন্দ্র মণ্ডল

৮। **গণিত শিক্ষণ পদ্ধতি** ১০·০০
অধ্যাপক শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ

৯। **শিশু ভোলানাথের রাজত্বে** ১৩·০০
অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ

১০। **বাংলা পড়ানো রীতি ও পদ্ধতি** ১০·০০

১১। **অর্থনীতী পৌরনীতি শিক্ষণ পদ্ধতি**
অধ্যাপক সত্যগোপাল মিশ্র

১২। **সংস্কৃত শিক্ষার পথ নির্দেশ**
অধ্যাপক প্রণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। **তর্কবিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতি**
অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ

॥ এডুকেশনাল বুক করপোরেশন ॥
১২৭/এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

Cover Printed by MAHANANDA PRESS, 42A, Beadon Row, Cal-6